লৌকিক শব্দকোষ

বাংলাভাষার
আঞ্চলিক ও লোকসংস্কৃতিমূলক
অভিধান

প্রথম খণ্ড

ডক্টর শ্রীকামিনীকুমার রায়, এম. এ., পি-এইচ্. ডি.

ভারতের জাতীয় অধ্যাপক
ডক্টর শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম. এ., ডি. লিট.
মহাশয়ের লিখিত 'পরিচয়' সংবলিত

'লোকভারতী'
।। কলিকাতা ৪১ ।।

প্রকাশক :
কে. কে. রায়
'লোকভারতী'
৫/১ হরিদেবপুর রোড
কলিকাতা-৪১

পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ
এপ্রিল, ১৯৬৭
বৈশাখ, ১৩৮৪

বাঁধাই : জে. ইউ. বাইণ্ডাস্
৩১ মদন মিত্র লেন
কলিকাতা-৬

মুদ্রক :
শ্রীসুজিতকুমার রুদ্র
নিপুণ মুদ্রণ
৩২ মদন মিত্র লেন
কলিকাতা-৬

উৎসর্গ

সহধর্মিণী প্রিয়বালা রায়কে

'নানান্ দেশের নানান্ ভাষা।
বিনে স্বদেশীয় ভাষা পূরে কি আশা॥
কত নদী সরোবর কিবা ফল চাতকীর।
ধারা-জল বিনে কভু ঘুচে কি তৃষা॥'

—নিধুবাবু

সূচীপত্র

তৃতীয় অধ্যায়

চাষ-আবাদ

চতুর্থ অধ্যায়

উদ্ভিদ

পঞ্চম অধ্যায়

জীবজন্তু

ষষ্ঠ অধ্যায়

আত্মীয় কুটুম্ব

সপ্তম অধ্যায়

নামাবলী

লৌকিক শব্দকোষ-এর **দ্বিতীয় খণ্ডের** শব্দাংশের সংক্ষেপিত সূচী। প্রথম অধ্যায় : মনুষ্য-দেহ (ক) দেহের বিভিন্ন অংশ। (খ) দৈহিক বিকার। দ্বিতীয় অধ্যায় : খাদ্য-পানীয়। তৃতীয় অধ্যায় : বসনভূষণ (ক) কাপড়চোপড় (খ) অলঙ্কারপাতি (অঙ্গভিত্তিক নামের বিন্যাস)। চতুর্থ অধ্যায় : ব্যবসা ও পেশা। পঞ্চম অধ্যায় : যানবাহন (ক) নৌকা, (খ) গোরুর গাড়ি, (গ) ঘোড়ার গাড়ি, (ঘ) ডুলি পালকি। ষষ্ঠ অধ্যায় : বিশেষক শব্দ। সপ্তম অধ্যায় : নৈসর্গিক ব্যাপার। অষ্টম অধ্যায় : বিবিধ শব্দ। নবম অধ্যায় : লৌকিক দেবদেবী ও পীরফকিরের সংক্ষিপ্ত বিবরণ। নির্বাচিত শব্দের নির্ঘণ্ট। পাঠপঞ্জী।

পরিচয়

সকল ভাষারই দুইটি করিয়া মুখ্য রূপ থাকে—সাহিত্যের ভাষা এবং কথ্য ভাষা বা মুখের ভাষা। আবার সাহিত্যের ভাষার মধ্যেও লঘু গুরু ইত্যাদি নানা style বা শৈলী থাকে এবং এই শৈলীগুলির মধ্যে যে পার্থক্য পাই, তাহা মুখ্যতঃ শব্দগত হইলেও, বহুস্থলে ব্যাকরণগতও বটে। এই বিভিন্ন প্রকারের বা শৈলীর সাহিত্যের ভাষা মোটামুটি সর্বত্র শিক্ষিত জনের বোধগম্য এবং অশিক্ষিত জনেও ইহার প্রয়োগে অভ্যস্ত। সাহিত্যের ভাষা এই মুখের বা কথ্যভাষার আধারেই প্রতিষ্ঠিত। কোনও ভাষা এবং সেই ভাষাকে আশ্রয় করিয়া যে জীবনযাত্রা-পদ্ধতি এবং ধ্যান-ধারণা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে—এক কথায় সেই জাতির অন্তর্নিহিত "সংস্কৃতি" পূর্বাপর বুঝিতে হইলে সাধুভাষার অতিরিক্ত প্রধান প্রধান কথ্যভাষার সহিত অল্পবিস্তর পরিচয় থাকা অপরিহার্য্য। কোনও কোনও ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, একেবারে নিছক মৌখিক ভাষার নিজের একটি সৌন্দর্য্য ও ব্যঞ্জনা-শক্তি আছে, তাহাকে আশ্রয় করিয়া আবার "মৌখিক ভাষার সাহিত্য"ও কখনও কখনও আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। যে ভাষা মৌখিক ভাষার উপর বিশেষ করিয়া তাহার শব্দাবলীর উপর স্থাপিত বা আধারিত হয়, সেই ভাষার ভাব-প্রকাশ-শক্তি ততই সূক্ষ্ম ও সুন্দর রূপে দেখা দেয়। অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখিতে পাই যে, শক্তিশালী লেখক আবশ্যক মতো মৌখিক ভাষার শব্দ উচ্চকোটির সাহিত্যের মধ্যেও স্থান দিয়া সেই সাহিত্যের দ্যোতনা-শক্তি বৃদ্ধি করিয়াছেন। কোনও ভাষাকে ভালো করিয়া জানিতে হইলে, সেই ভাষার বিভিন্ন মৌখিক রূপের সহিত পরিচিত হওয়া বিশেষভাবে আবশ্যক হইয়া পড়ে। অনেক সময়ে সাহিত্যের "উন্নত ভাষা"য় এমন অনেক শব্দ পাওয়া যায়, যেগুলির বিশিষ্ট অর্থ, সম্পূর্ণ অর্থ বুঝিতে হইলে মৌখিক ভাষার শরণাপন্ন হইতে হয়। এই হেতু কোনও ভাষার সমগ্র বোধ ও বিচারের জন্য মৌখিক ভাষার শব্দাবলীর সহিত পরিচয় থাকা অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে।

বাঙ্গালা বা অন্য কোনও ভাষার সম্পূর্ণ অভিধান রচনা করিতে হইলে, সেই ভাষার dialectal words অর্থাৎ উপভাষার বা কথ্যভাষায় বহু বহু শব্দের বিচারও করিতে হয়। বিভিন্ন প্রকারের কথ্যভাষার আবার একই শব্দের অর্থ বিভিন্ন প্রকারেরও হইতে দেখা যায়, এবং সেই-হেতু সাহিত্যের প্রয়োগেও এই

কথ্যভাষার অর্থ-বিভেদ কখনও কখনও সংক্রামিত হয়। অতএব দেখা যাইতেছে যে, সম্পূর্ণ অর্থ গ্রহণের জন্য কথ্যভাষার শব্দকেও (তাহার বিশিষ্ট অর্থের সহিত) উপেক্ষা করা যায় না।

বঙ্গবাসী শিক্ষিত জন যখন প্রায় শতাধিক বৎসর পূর্বে তাহার মাতৃভাষার সম্বন্ধে সচেতন হইল, তখন হইতেই কথ্য বা প্রাদেশিক বাঙ্গালার নানা রূপের প্রতি এবং অর্থের প্রতি তাহার দৃষ্টি পড়িল। বিদেশী পোর্তুগীস এবং ইংরেজের হাতেই সর্বপ্রথম বাঙ্গালা ভাষার চর্চার সূত্রপাত হয়। এই বিদেশী পণ্ডিতেরা যাহা হাতের কাছে পাইয়াছেন, তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া ব্যাকরণ ও অভিধান লিখিয়া গিয়াছেন। যেমন ১৭৩৪ খ্রীষ্টাব্দে পোর্তুগীস পাদ্রি মানুএল দা আস্‌সুম্প্‌সাউ পূর্ববঙ্গের ঢাকা জেলার ভাওয়ালের কথ্য ভাষা, যাহা তিনি শিখিয়াছিলেন, তাহাই আলোচনা করিয়াছেন, বাঙ্গালীর সাধুভাষা বা সাহিত্যের ভাষা সম্বন্ধে তাঁহার তেমন কোনও আগ্রহ ছিল না। তেমনই ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে অবস্থাগতিকে পড়িয়া ইংরেজ নাথানিয়েল ব্রাসি হালহেড বাঙ্গালা সাধুভাষা লইয়া তাঁহার বাঙ্গালা ব্যাকরণ লিখিলেন ও ছাপাইলেন, এবং তাঁহার কয়েক বৎসর পরে ওগ্যুস্ত্যাঁ ওস্যঁ চন্দননগরে বসিয়া স্থানীয় বাঙ্গালারই একখানি ছোটো অভিধান প্রণয়ন করেন। সমগ্রভাবে বাঙ্গালার সাহিত্যিক ও মৌখিক ভাষার চর্চার সময় তখনও আসে নাই।

পরে ইংরেজ রাজত্বের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে, বিলাত হইতে আগত রাজ-কার্য্যে নিযুক্ত ইংরেজরা ও ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে আগত ইংরেজ পাদ্রিরা সাধুভাষার দিকেই দৃষ্টি দিলেন। ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে রাজা রামমোহন রায় ইংরেজি ভাষায় তাঁহার বাঙ্গালা ব্যাকরণ রচনা করিলেন (বাঙ্গালা ভাষায় ইহার অনুবাদও বাহির হয়)। ইহা ছিল "গৌড়ীয়" অর্থাৎ গৌড়ীয় সাধু-ভাষার ব্যাকরণ। ক্রমে ইংরেজি ইস্কুলে বাঙ্গালা ভাষার পঠন-পাঠন স্থান লাভ করিল, এবং বাঙ্গালী ছাত্র ও ছাত্রীগণ তথা লেখকগণের সুবিধার জন্য বাঙ্গালা অভিধানও সংকলিত হইতে লাগিল। এই সকল অভিধানে বিশেষভাবে সাহিত্যে ব্যবহৃত ও লোকমুখে অপ্রচলিত কঠিন কঠিন সংস্কৃত শব্দই স্থান পাইল, এবং মৌখিক ভাষার শব্দ, বাঙ্গালীর পক্ষে সহজবোধ্য সাধারণ খাঁটি বাঙ্গালা শব্দ তেমন বিশেষ স্থান পাইল না। কারণ সহজেই অনুমেয়।

কিন্তু বিগত খ্রীষ্টীয় শতকের শেষার্ধ হইতেই বাঙ্গালী তাহার মাতৃভাষার সাহিত্য সম্বন্ধে সচেতন হইল। একদিকে নূতন যুগোপযোগী সাহিত্য সৃষ্টির

কার্য্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী, রাজকৃষ্ণ রায়, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রমেশচন্দ্র দত্ত, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রমুখ মনীষী আত্মনিয়োজিত হইলেন। তেমনই গত শতকের চতুর্থ পাদ হইতে বাঙ্গালী তাহার ভাষার প্রাচীন সাহিত্য সম্বন্ধে আরও অবহিত হইল, এবং তাহার মাতৃভাষার চর্চাতেও মনোনিবেশ করিল। গত শতকের আটের কোঠায় বাঙ্গালী তাহার প্রাচীন সাহিত্যের নষ্টকোষ্ঠী উদ্ধারে যত্নবান্ হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার মাতৃভাষারও সর্বাঙ্গীণ আলোচনায় মন দিল। সারদাচরণ মিত্র, অক্ষয়কুমার সরকার, জগদ্বন্ধু ভদ্র, রমণীমোহন মল্লিক—ইঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে আসিলেন রমেশচন্দ্র দত্ত, রামগতি ন্যায়রত্ন, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, এবং পরে দীনেশচন্দ্র সেন—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস রচনায় মনোনিবেশ করিলেন। ১৮৯২ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ স্থাপিত হইল, এবং এই প্রতিষ্ঠান সেই যুগের তাবৎ সমস্ত বাঙ্গালী লেখক ও উচ্চশিক্ষিত বাঙ্গালীকে তাহার মাতৃভাষার ও সাহিত্যের আধুনিক রীতি-সম্মত গবেষণায় উদ্বুদ্ধ করিল। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—ইঁহারা এই কার্য্যে অগ্রণী হইলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের এই প্রায় পঁচাত্তর বৎসরের ইতিহাস এক হিসাবে হইতেছে বাঙ্গালীর ভাষা ও সাহিত্যের মধ্য দিয়া নিজেকে বুঝিবার চেষ্টার ইতিহাস। প্রাচীন সাহিত্যের নূতন নূতন কৃতী গবেষক দেখা দিলেন; যেমন চট্টগ্রামের আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, ঢাকার সতীশচন্দ্র রায়, বাঁকুড়ার যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি, বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ প্রমুখ পণ্ডিতদের হাতে বাঙ্গালা প্রাচীন সাহিত্যের ইতিহাস রচনার মূল্যবান্ সামগ্রী সংগৃহীত হইল।

এদিকে বাঙ্গালা ভাষার আলোচনায় যাঁহারা বাঙ্গালীকে এই যুগে পথ দেখাইলেন, তাঁহাদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ অন্যতম প্রধান, এবং আরও ছিলেন হরপ্রসাদ, রামেন্দ্রসুন্দর, যোগেশচন্দ্র। বাঙ্গালা ভাষার সম্যক আলোচনায় যে গ্রামীণ শব্দের সংগ্রহ ও আলোচনা অপরিহার্য্য, এইরূপ বোধ ও বিচার বাঙ্গালা ভাষার অনুশীলনের ক্ষেত্রে সর্বজনস্বীকৃত হইল। এই বিষয়ে অন্যতম পথিকৃৎ ছিলেন রবীন্দ্রনাথ এবং তদ্ভিন্ন জর্জ আব্রাহাম গ্রীয়রসন প্রমুখ পাশ্চাত্ত্যের কতিপয় ভাষাতাত্ত্বিক আমাদের পথনির্দেশক হইয়াছিলেন। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে গ্রীয়রসন তাঁহার যে অপূর্ব ও অমূল্য পুস্তক Bihar Peasant Life প্রকাশ করেন, তাহাতে কিভাবে গ্রাম্য শব্দ জীবনের নানা পর্য্যায় অনুসারে এবং বিভিন্ন

অঞ্চল ধরিয়া সংগ্রহ করিতে হয় তাহার একটা দিগ্‌দর্শন আমরা পাইলাম। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ হইতে রীতিমত বাঙ্গালার গ্রাম্য ভাষার বা বিভিন্ন কথ্য-ভাষার শব্দ সংগ্রহ করিয়া বিভিন্ন অনুসন্ধিৎসু লেখক প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এই বিষয়ে ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। প্রস্তুত গ্রন্থে শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার রায় মহাশয় বিভিন্ন সময়ে সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত এই প্রকার বাঙ্গালার প্রাদেশিক ও গ্রাম্য শব্দ-সংগ্রহের একটি তালিকা দিয়াছেন, তাহা হইতে কতটুকু কাজ এ সম্বন্ধে বাঙ্গালীর হাতে হইয়াছে, তাহার একটা মোটামুটি ধারণা হইতে পারিবে। পরিষৎ-পত্রিকা ভিন্ন অন্যান্য পত্র-পত্রিকাতেও এইরূপ শব্দ-সংগ্রহ প্রকাশিত হইয়াছে। সেগুলিরও সম্পূর্ণ পঞ্জী অপেক্ষিত।

কিন্তু এই সমস্ত গ্রাম্য ও প্রাদেশিক শব্দ লইয়া বৃহৎ সংগ্রহ পুস্তকাকারে এখনও বাহির হয় নাই—অন্ততঃ পশ্চিমবঙ্গে। বহুদিন পূর্বে ইংরেজ বঙ্গভাষাবিদ্ সিভিলিয়ন J. D. Anderson কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটি হইতে পার্বত্য ত্রিপুরা অঞ্চলের বাঙ্গালার একটি নাতিদীর্ঘ শব্দ-সংগ্রহ, ইংরেজি প্রতিশব্দের সহিত প্রকাশিত করিয়াছিলেন। কিন্তু যাহা পশ্চিমবঙ্গে হইতে পারে নাই, তাহা পূর্ববঙ্গের (পাকিস্তান রাষ্ট্রের) মাতৃভাষাপ্রেমী বাঙ্গালী সম্পন্ন করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। ইঁহারা প্রায় সকলেই মুসলমান এবং মাতৃভাষা সম্বন্ধে ইঁহাদের ভালোবাসা ও গর্ব পশ্চিমবঙ্গেও বিশেষ করিয়া অনুকরণযোগ্য। ইঁহারা পূর্ববঙ্গের তেরটি জেলার বিভিন্ন কথ্যভাষার একটি বিরাট শব্দ-সঞ্চয়ন আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন, এবং এই মূল্যবান্ সংগ্রহের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। এই কথ্যভাষার অভিধানের একটি বিশেষ গুণ এই যে, যে অঞ্চলের ভাষার শব্দ তাঁহারা ধরিয়া দিয়াছেন, সেই অঞ্চলের লোকের মুখে সেই শব্দ কিভাবে ব্যবহৃত হয়, তাহার উদাহরণ দিয়াছেন। সুতরাং ইহাতে শুদ্ধ একটি কথ্যভাষার শব্দের জীবন্ত স্বরূপটি ধরিয়া দেওয়া হইয়াছে। পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের মিলিত চেষ্টায় আঞ্চলিক ও কথ্যভাষা এবং সাধুভাষা উভয়কে মিলাইয়া সমগ্র গৌড়বঙ্গের ভাষার একটি সম্পূর্ণ রূপ একই মহাগ্রন্থে আমরা ধরিয়া দিতে পারিতেছি না।

যাহা হউক, কাঠবিড়ালীর সেতুবন্ধে সহায়তার মতো এই শব্দ-সংগ্রহ-কার্যে যাহার যতটুকু সাধ্য করিলে সমবেতভাবে কাজ অনেকটা অগ্রসর হইতে পারে। এই শব্দ-সংগ্রহের সংকলয়িতা শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার রায় মহাশয় নিজের যতটুকু শক্তি তদনুসারে এই কার্যে নামিয়াছেন। ইনি বাঙ্গালীর

জীবনের বিভিন্ন পর্য্যায় বা দিক অবলম্বন করিয়া শব্দগুলি সাজাইয়াছেন। একই শব্দের বিভিন্ন প্রাদেশিক রূপ ইনি ধরিয়া দিয়াছেন, ইহাতে এই পুস্তকের উপযোগিতা আরও বাড়িয়াছে। একটি সহজবোধ্য পদ্ধতি ইনি এই বিষয়ে অবলম্বন করিয়াছেন। গ্রীয়রসনের Bihar Peasant Life-এর ছায়া এই পুস্তকের উপর পড়িয়াছে, এবং সেইজন্য ইহার মূল্য সকলেই স্বীকার করিবেন। সারা বাঙ্গালায় জীবনযাত্রা-পদ্ধতিতে, চিন্তাপ্রণালীতে, রহন-সহনে যে সাম্য আছে, তাহা একই শব্দের বিভিন্ন বিচিত্র রূপের মধ্যেও প্রকাশ পাইয়াছে। বইখানি সহৃদয় পাঠকের নিকট উপাদেয় এবং উপন্যাসের মতো সুখপাঠ্য। ইহার বৈজ্ঞানিক মূল্য তো আছেই, সাংস্কৃতিক দিকও ইহার আর একটি গুণ।

আশা করি, এই বইখানি—বিশেষতঃ যখন পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ উভয়ই পশ্চিমবঙ্গে আসিয়া মিলিত হইয়াছে,—সমস্ত বাঙ্গালীর কাছেই সমাদর লাভ করিবে। ইতি ২৬ আষাঢ়, বঙ্গাব্দ ১৩৭৫। ১০ জুলাই, খ্রীষ্টাব্দ ১৯৬৮॥

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

"মাতাকে সংস্কৃতভাষার সমাসসন্ধি-তদ্ধিতপ্রত্যয়ে দেবীবেশে ঝলমল করিতে দেখিলে গর্ব বোধ হয় সন্দেহ নাই, কিন্তু ঘরের মধ্যে কাজকর্মের সংসারে আটপৌরে কাপড়ে তাঁহাকে গেহিনী বেশে দেখিতে যদি লজ্জা বোধ করি তবে সেই লজ্জার জন্য লজ্জিত হওয়া উচিত। * * * বাংলাভাষাকে তাহার সকলপ্রকার মূর্তিতেই আমি হৃদয়ের সহিত শ্রদ্ধা করি, এইজন্য তাহার সহিত তন্ন তন্ন করিয়া পরিচয়-সাধনে আমি ক্লান্তি বোধ করি না।"

—রবীন্দ্রনাথ

ভূমিকা

নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যদিয়া 'লৌকিক শব্দকোষ' তথা বাংলা ভাষার আঞ্চলিক ও লোকসংস্কৃতিমূলক অভিধান, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ, প্রথমখণ্ড প্রকাশিত হইল। ইহা যে আর প্রকাশ করিতে পারিব, ভরসা ছিল না। পাণ্ডুলিপি বেশ কয়েক বৎসর পূর্বেই তৈয়ার করিয়াছিলাম; পরিকল্পনা ছিল, তাহা লইয়া আবার গ্রামে গ্রামে যাইব, গ্রামের লোকেদের পাশে, তাহাদের দাওয়ায় দরবারে বসিব, কোনও ভুলভ্রান্তি, অসঙ্গতি থাকিলে সংশোধন করিয়া লইব; সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেক নূতন শব্দ, নূতন তথ্য সংগ্রহ করিয়া আনিব। কিন্তু এমন সময় আমার সহধর্মিণী, সর্বকার্যে উৎসাহদাত্রী আচম্‌কা চিরবিদায় লইলেন! মুহূর্তে আমার চেষ্টাউদ্যম সবকিছু স্তব্ধ হইয়া গেল।

ভগ্নহৃদয়, ভগ্নস্বাস্থ্য, নিঃসঙ্গ বার্ধক্য,—দিন যেন আর কাটিতে চায় না। অবশেষে হিতৈষী বন্ধুদের উপদেশে ও আগ্রহাতিশয্যে লৌকিক শব্দকোষের প্রস্তুত সংস্করণের প্রকাশনে মনোযোগী হইলাম। কিন্তু নিঃসম্বল আমি, টাকাকড়ি কোথায় পাইব? অগত্যা বাংলাভাষাপ্রেমী অনেক প্রতিষ্ঠানের দ্বারস্থ হইলাম। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, সাহিত্য অকাদেমি, অ্যাকাডেমি অব্‌ ফোকলোর, বাঙলা সাহিত্য অ্যাকাডেমি, লেখক সমবায় সমিতি, সকলেই অর্থাভাবের কথা জানাইলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের উপর আমার অনেকখানি ভরসা ছিল। এই প্রতিষ্ঠান-সৃষ্টির অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বাংলার লৌকিক শব্দ-সংকলন প্রকাশ। আমি বহু বৎসরের একক চেষ্টায় যাহা করিয়াছি, সাহিত্য পরিষৎ তাহার মুদ্রণে অনিচ্ছা প্রকাশ করায় খুবই বেদনা পাইয়াছি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অবশ্য রাজি হইয়াছিলেন, যদি আমি কিছুদিন অপেক্ষা করিতে পারিতাম। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং ভারত সরকার এই শ্রেণীর প্রকাশনের ক্ষেত্রে কিছুটা সাহায্য করেন বটে, কিন্তু সে সাহায্য আদায় করিতে টেবিলে টেবিলে ঘুরিবার, চিঠিপত্র লিখিয়া মাসের পর মাস অপেক্ষা করিবার আমার আর বয়স নাই।

যাহা হউক, আমার পুত্রদ্বয় শ্রীমান্‌ নভোজিৎ এবং শ্রীমান্‌ বিশ্বজিৎ অসচ্ছলতার মধ্যেও এই গ্রন্থ প্রকাশনের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিয়া এবং আরও নানাভাবে সাহায্য করিয়া আমাকে সমস্ত দুশ্চিন্তা ও দুর্ভোগ হইতে রক্ষা করিয়াছে। মঙ্গলময় ইহাদের সর্ববিধ কল্যাণ করুন।

মাত্র ১৮৪ পৃষ্ঠা শব্দাংশ লইয়া 'লৌকিক শব্দকোষ' প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। পরে ২৮৮ পৃষ্ঠা (তন্মধ্যে ২২৮ পৃষ্ঠা শব্দাংশ) বুকে করিয়া উহার দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়। বর্তমান গ্রন্থ প্রথমাংশের তথা প্রথম খণ্ডের পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ। ইহার কলেবর অনেকখানি বৃদ্ধি পাইয়া ৩৮৪ পৃষ্ঠায় দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু দুইটি খণ্ডের মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬৭২-এ পৌঁছিলেও, এখনও হাজার হাজার শব্দ সংকলন ও প্রকাশনের অপেক্ষায় মুখিয়া আছে। ৭৩ বৎসর বয়সে নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে একক চেষ্টায় আমি কতটুকু আর করিতে পারি? এইবার মাতৃভাষাপ্রেমী আমার গবেষক যুবক বন্ধুরা লৌকিক শব্দকোষ-এর একটি পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া আমাকে রেহাই দিন। তাঁহাদের পথ সুগম হউক।

বর্তমান সংস্করণটির অপূর্ণতা হ্রাস করিতে যাঁহারা আমাকে নানাভাবে সাহায্য করিয়াছেন, উৎসাহ দিয়াছেন, তাঁহাদের কয়েকজনকে মাত্র এখানে স্মরণ করিতেছি: 'রাঢ়ের সংস্কৃতি ও ধর্মঠাকুর' গ্রন্থ প্রণেতা ডঃ অমলেন্দু মিত্র আমাকে বীরভূমের শব্দ-সংগ্রহ ব্যাপারে প্রভূত সাহায্য করিয়াছেন; তাঁহার গ্রন্থটি হইতেও নিঃসঙ্কোচে অনেক তথ্য গ্রহণ করিয়াছি। কুলটিকরির 'বসুধা' সম্পাদক শ্রীসুকুমাররঞ্জন ঘোষ মহাশয়ের নিকট হইতেও মেদিনীপুরের অনেক আঞ্চলিক শব্দ পাইয়াছি। ইঁহাদের উভয়কে আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। অ্যাকাডেমি অব ফোকলোর প্রতিষ্ঠানের ডঃ দুলাল চৌধুরী তাঁহাদের আঞ্চলিক শব্দ-সংগ্রহ হইতে 'লৌকিক শব্দকোষে' ব্যবহারের জন্য অনেক শব্দ দিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। শ্রদ্ধাস্পদ ডঃ সুকুমার সেন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ বন্ধুবর ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক ডঃ ক্ষুদিরাম দাস, ডঃ তুষার মহাপাত্র,—ইঁহারা কত বিষয়ে কতভাবে যে আমার আরব্ধ কার্যে সাহায্য করিয়াছেন, পরামর্শ দিয়াছেন, বলিয়া শেষ করিতে পারিব না। ভাষাতত্ত্ববিশারদ পরমপণ্ডিত বন্ধুবর ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক বাংলাদেশে নানা দায়িত্বপূর্ণ কাজে ব্যস্ত থাকিয়াও লৌকিক শব্দকোষের অপূর্ণতা হ্রাসে নানাভাবে সাহায্য করিয়াছেন, সর্বদা আমার ভগ্ন দেহ-মনে শক্তি যোগাইয়াছেন। কৃতজ্ঞচিত্তে সে-সকল স্মরণ করিতেছি। সাহিত্য অকাদেমির পূর্বাঞ্চল-সচিব শ্রীশুভেন্দু মুখোপাধ্যায়, শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীনারায়ণ চৌধুরী, শ্রীনচিকেতা ভরদ্বাজ, শ্রীকালীচরণ ঘোষ, শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, ডঃ বিজনবিহারী ভট্টাচার্য,

ডঃ পঞ্চানন চক্রবর্তী, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, গৌরকিশোর ঘোষ, অনিল কুমার ভৌমিক, জ্যোৎস্না সিংহ রায়, শঙ্কর রুদ্র, সন্তোষ রায়, পুলকেন্দু সিংহ, অমল রায়—ইঁহাদের কাছেও কি আমি কম ঋণী? কতবার কতভাবে ইঁহাদের মূল্যবান সময় নষ্ট করিয়াছি, কত সাহায্য, কত পরামর্শ লইয়াছি।

গ্রন্থখানির পরিবর্ধিত সংস্করণ আজ প্রকাশিত হইতে দেখিলে যিনি সর্বাপেক্ষা আনন্দিত হইতেন, প্রথমেই বলিয়াছি, আমার দুর্ভাগ্যবশত তিনি আজ পরলোকে—তিনি আমার সহধর্মিণী। তবু আমার সান্ত্বনা যে, তাঁহার জীবদ্দশায়ই গ্রন্থখানি তাঁহার নামে উৎসর্গ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম।

প্রায় পঞ্চাশ বৎসর আগেকার কথা। ১৯২৯ সালে এম. এ. পাশ করিয়াই গবেষণার কাজে প্রবৃত্ত হই। এই প্রেরণা দিয়াছিলেন যাঁহাদের চরণতলে বসিয়া শিক্ষালাভ করিয়াছিলাম, তাঁহারাই। তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন পরম শ্রদ্ধেয় ডক্টর শ্রীদীনেশ চন্দ্র সেন, ডক্টর শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার, শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ।

আজন্ম পাড়াগাঁয়ের মানুষ আমি, গ্রামের দিকেই দৃষ্টি পড়িল। সেখানকার সাধারণ মানুষের বিচিত্র আচার-অনুষ্ঠানের তথ্য এবং ততোধিক বিচিত্র তাহাদের মৌখিক ভাষার শব্দ সংগ্রহের ক্ষেত্রে মাটিকাটা মজুর হিসাবে কাজ আরম্ভ করিলাম। প্রথমত আমি ময়মনসিংহ, ঢাকা, ত্রিপুরা ও শ্রীহট্ট অঞ্চলের মধ্যেই আপনাকে ব্যাপৃত রাখিয়াছিলাম, ক্রমে আমার অনুসন্ধান-ক্ষেত্র সমগ্র বাংলায় বিস্তৃত করিয়াছি।

আমার অনুসন্ধানের প্রথম ফল 'ময়মনসিংহের সাধারণ গৃহস্থ মুসলমান পরিবারে অনুষ্ঠিত কয়েকটি সিন্নী ও আচার-নিয়মের বিবরণ'—প্রবন্ধাকারে ১৩৩৯ সালের সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার তৃতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। অনন্যব্রত হইয়া কাজ করিয়া যাইতে লাগিলাম। কিন্তু বাণীর অধিকাংশ সেবককেই চিরকাল যে বেদনা পোহাইতে হয়, আমার ক্ষেত্রেও তাহার অন্যথা হইল না। নানা প্রতিকূল অবস্থার চাপে পড়িয়া শীঘ্রই আমাকে কর্মান্তরে চাকুরিসূত্রে আবদ্ধ হইতে হইল। অবসর অল্প, তবু আশা উদ্যম একেবারে ছাড়িলাম না, 'আলায়ে ধরিয়া সাবধানে অন্তর প্রদীপখানি' চলিতে লাগিলাম। সাধনার ফল মধ্যে মধ্যে দৈনিকে ও সাময়িক পত্রিকায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, কিন্তু সুপরিকল্পিতভাবে কিছু করিতে পারি নাই।

মানুষের 'সুন্দর' মানুষকে কাঁদায়, নব নব কর্মপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করে। চাকুরি হইতে অবসর গ্রহণের পর আমার 'সুন্দর'ও আবার আমাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল। যৌবনের প্রারম্ভে যে কাজে হাত দিয়াছিলাম, বার্ধক্যের ঘরে আসিয়া আবার তাহাতে আত্মনিয়োগ করিলাম। 'লৌকিক শব্দকোষ' এই আত্মনিযুক্তিরই ফল। ইহার সম্বন্ধে বিস্তারিত বলিবার পূর্বে আমার পূর্বসূরীদের ও সহধর্মীদের চিন্তাচেষ্টা ও কার্যকলাপ শ্রদ্ধার সহিত এখানে স্মরণ করিতেছি।

বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের সাধারণ লোকের মৌখিক ভাষার শব্দগুলি সংগ্রহ করিয়া একখানি গ্রাম্য শব্দকোষ প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা সুধীসমাজ অনেকদিন হইতেই উপলব্ধি করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু এই ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট প্রণালীতে কাজ বেশী দূর অগ্রসর হয় নাই। অনেকেই নিজেদের খেয়ালখুশি মত, ব্যক্তিগত কৌতূহল নিবারণার্থ এক এক অঞ্চলের কিছু কিছু শব্দ সংগ্রহ করিয়াছেন এবং সেগুলি খ্যাত অখ্যাত নানা পত্রপত্রিকায় সময়ে সময়ে প্রকাশিত হইয়াছে। নানা অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানও এই ব্যাপারে কখনো কখনো উদ্যোগী হইয়াছেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের নাম এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইঁহারা একরূপ গোড়া হইতেই আঞ্চলিক শব্দ-সংগ্রহের কাজে ব্রতী হইয়াছিলেন এবং একটি শব্দ-সমিতিও গঠন করিয়াছিলেন। এই সমিতির সভাপতি ছিলেন গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সম্পাদক হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত। সভ্যগণের মধ্যে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, নগেন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ মনীষীবৃন্দ।[১] কিন্তু এই সমিতির কাজও বিশেষ অগ্রসর হয় নাই। তবু শব্দ সংকলনের ক্ষেত্রে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অবদান উপেক্ষণীয় নহে। বিভিন্ন বর্ষের সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় বিভিন্ন অঞ্চলের অনেক শব্দ প্রকাশিত হইয়াছে এবং গ্রাম্য ভাষার বিভিন্ন দিক লইয়া উহাতে এ পর্যন্ত অনেক মনীষী অনেক আলোচনাও করিয়াছেন। এস্থলে রবীন্দ্রনাথের 'শব্দতত্ত্ব'ও 'বাংলা কৃৎ ও তদ্ধিত' প্রবন্ধ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এখানে এই পত্রিকা টিতে প্রকাশিত বিভিন্ন অঞ্চলের শব্দ-সংগ্রহের এবং যাঁহারা সংগ্রহ করিয়াছেন, তাঁহাদের মোটামুটি একটা পরিচয় দেওয়া যাইতেছে।

সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা :—

৮ম বর্ষ (১৩০৮) বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শব্দ-সংগ্রহ

১ সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩১৪

৯ম বর্ষ (বরিশাল) শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ
১২শ বর্ষ (ময়মনসিংহ) শ্রীরাজেন্দ্রকুমার মজুমদার
(রংপুর) শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী
১৪শ বর্ষ (মালদহ) পণ্ডিত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী
(পাবনা) শ্রীরাজকুমার কাব্যভূষণ
১৫শ বর্ষ (যশোহর) শ্রীমোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য
(কুচবিহার) এস. বসু
১৬শ বর্ষ (ঢাকা) শ্রীপরমেশপ্রসন্ন রায়
(নদীয়া ও চব্বিশপরগনা) শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু
১৮শ বর্ষ (মালদহ) শ্রীহরিদাস পালিত
(কুচবিহার) শ্রীঅম্বিকাচরণ গুপ্ত
১৯শ বর্ষ (বগুড়া) শ্রীসুরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত
(নদীয়া) শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
(ব্রহ্মপুত্রোপত্যকা) শ্রীদেবনারায়ণ ঘোষ
(টাঙ্গাইল) শ্রীকৃষ্ণনাথ সেন
২১শ বর্ষ (মানভূম) শ্রীহরিনাথ ঘোষ
২২শ বর্ষ (মুর্শিদাবাদ, জঙ্গীপুর) শ্রীরাখালরাজ রায়
২৬শ বর্ষ (চট্টগ্রাম) শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়
৩১শ বর্ষ (খুলনা) শ্রীনরেন চক্রবর্ত্তী
৩৩শ বর্ষ (মুর্শিদাবাদ, কাঁদি) মোল্লা রবীউদ্দিন আহমদ
৩৪শ বর্ষ (মুর্শিদাবাদ) মোল্লা রবীউদ্দিন আহমদ
(বীরভূম) শ্রীগৌরীহর মিত্র
(ফরিদপুর, কোটালিপাড়া) শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী
৩৭শ বর্ষ (শ্রীহট্ট) শ্রীকুঞ্জগোবিন্দ গোস্বামী
৩৯শ বর্ষ (ময়মনসিংহ) শ্রীকামিনীকুমার রায়
৫০শ বর্ষ (দক্ষিণবঙ্গ) শ্রীঅবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
৫১শ বর্ষ (নদীয়া) শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী
(চব্বিশপরগনা) ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
৬৪শ বর্ষ (খুলনা) শ্রীঅমলেন্দু ঘোষ
৬৮শ বর্ষ (ভারতের গ্রাম জীবন) শ্রীনির্মলকুমার বসু

৭২শ বর্ষ (অতিরিক্ত বাঙলা প্রবাদ) কল্যাণী দত্ত

৭৪শ বর্ষ (খুলনা) শ্রীঅমলেন্দু ঘোষ

সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ছাড়া অপর বহু পত্র-পত্রিকাতেও শব্দ-সংগ্রহ প্রকাশিত হইয়াছে। এখানে সেগুলিরও মোটামুটি একটা তালিকা দেওয়া যাইতেছে: পঞ্চপুষ্প, ফাল্গুন, ১৩৩৮ (যশোহর) শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। বসুন্ধরা, ১ম, ২য় ও ৩য় সংখ্যা, ১৩৫৭ (কৃষিবিষয়ক শব্দ) কামিনীকুমার রায়। মাসিক বসুমতী, মাঘ, ১৩৫৭ (কথ্যভাষা) কামিনীকুমার রায়। সুবর্ণ বণিক সমাচার, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৮ (বাংলার আঞ্চলিক শব্দ-সংগ্রহ) কামিনী কুমার রায়। প্রবাসী, অগ্রহায়ণ, ১৩৫৯, পৌষ, ১৩৬০, মাঘ, ১৩৬২ (হিজলী) অক্ষয়কুমার কয়াল। দেশ, ৩২শ বর্ষ, ৩৪ সংখ্যা হইতে পরবর্তী কতিপয় সংখ্যায় প্রকাশিত আঞ্চলিক শব্দ: (তমলুক) শিশির কুমার হালদার, (বীরভূম) বারিদবরণ ঘোষ, (হুগলী) 'স্মরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, (শ্রীহট্ট) অবিনাশ চৌধুরী, (কোচবিহার) কনককুমার গুহ, (মানভূম) গৌরকিশোর ঘোষ, (বর্ধমান) কল্যাণ কুমার রায়, (বাঁকুড়া)—। চতুষ্কোণ, কার্তিক, ১৩৭৫ (চট্টগ্রামের ছড়া) সুনীল চক্রবর্তী। চতুষ্কোণ, কার্তিক ১৩৭৬ (রাঢ়ী উপভাষা) সুধাংশু হালদার। সমকালীন, চৈত্র, ১৩৭৬ (ছড়া-প্রবাদে গ্রাম বাংলার সমাজ) তারাপদ সাঁতরা। বিশ্বভারতী পত্রিকা, বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৭৭ (উত্তর বঙ্গের নারীর ভাষা) নির্মল দাশ। কুলটিকরির শ্রীসুকুমাররঞ্জন ঘোষ সম্পাদিত 'বসুধা'র বিভিন্ন সংখ্যা।

বাঁশপাহাড়ী (অ্যাকাডেমি অব ফোকলোর)। লোকসংস্কৃতি, আঞ্চলিক শব্দ সংখ্যা, ১৩৮৩ (অ্যাকাডেমি অব ফোকলোর)।

১২৩০ সালে প্রকাশিত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কলিকাতা কমলালয়' গ্রন্থে কলিকাতা অঞ্চলের কথিত ভাষার শব্দের একটি তালিকা স্থান পাইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত সেকালের আরও অনেক গ্রন্থে ('বাঙলা অভিধান গ্রন্থের পরিচয়', শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য দ্র) অভিধানের উপকরণ-মূলক শব্দসূচী পাওয়া যায়। সেই সকল সূচীতেও আঞ্চলিক শব্দেরই প্রাধান্য।

সম্প্রতি Asiatic Society হইতে প্রকাশিত ডাঃ চারুচন্দ্র সান্যাল মহাশয়ের The Rajbansis of North Bengal গ্রন্থে উত্তরবঙ্গের রাজ-বংশীদের কথিত ভাষার অনেক শব্দ বিষয়ানুসারে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

১৩৭২ সালের পূজাসংখ্যা 'কল্যাণী'তে 'বঙ্গীয় গ্রাম্য শব্দকোষ' প্রবন্ধে চিন্তাহরণ চক্রবর্তী মহাশয় গ্রাম্য শব্দ সংকলন সম্পর্কে আমাদিগকে অনেক তথ্য পরিবেশন করিয়াছেন : ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে Lewan সাহেব 'Hill Tracts of Chittagong and the dwellers therein with Comparative Vocabularies of the dia'ects' নামে একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন। ইহাতে চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলের গ্রাম্য শব্দ স্থান পাইয়াছে। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে J. D. Anderson পার্বত্য ত্রিপুরার গ্রাম্য শব্দ সংগ্রহ করিয়া 'A short list of words of the Hill Tippera Language' প্রকাশ করেন। ১৯২৩ সালে Memoirs of the Asiatic Society of Bengal-এর সপ্তমখণ্ডে F. E. Pargiter সাহেবেরও একটি শব্দ-সংকলন প্রকাশিত হয়।

প্রায় ২৫০ বৎসর পূর্বে (১৭৩৪ খ্রীঃ) পোর্তুগীস পাদ্রি মানুএল দা আসুম্প্‌সাউ (Manoel Da Assumpcam) বাংলাদেশের ঢাকা জেলার ভাওয়াল পরগনার কথ্য ভাষার কতিপয় শব্দ অবলম্বন করিয়া তাঁহার Voca bulario Em Lingua Bengalla & Portugueza প্রস্তুত করেন। এই বাংলা-পোর্তুগীজ শব্দসূচী ১৭.৩ খ্রীঃ লিসবন হইতে প্রথম প্রকাশিত হয়।

১৩৩৪ সালে কুমিল্লা (বাংলাদেশ) ভিক্টোরিয়া কলেজের কর্তৃপক্ষ শ্রীগৌর চন্দ্র গোপ-সংগৃহীত ত্রিপুরা জেলার কথ্য ভাষা পুস্তিকাকারে প্রকাশ করেন। বাংলাদেশ স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হইবার কয়েক বৎসর পূর্বে সেখানকার কয়েকজন বাংলাভাষা তথা মাতৃভাষাপ্রেমী মনীষীর উদ্যোগে বাঙলা একাডেমী, ঢাকা হইতে 'পূর্ব পাকিস্তানী আঞ্চলিক ভাষার অভিধান' তিন খণ্ডে প্রকাশিত হয়। ইহার সম্পাদকমণ্ডলীর মধ্যে ছিলেন প্রসিদ্ধ ভাষাতত্ত্ববিদ্‌ ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। তিনি The New Oxford Dictionary-র ন্যায় বাংলা ভাষার একখানি পূর্ণাঙ্গ অভিধান প্রণয়নের জন্যও ছাত্রসমাজকে রাজমিস্ত্রীর যোগানদারের ন্যায় মালমশলা সংগ্রহ করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'শব্দতত্ত্ব' ও 'বাংলা-ভাষা পরিচয়ে' মৌখিক ভাষার বহু শব্দ লইয়া বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, বাংলার ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে যতগুলি উপভাষা প্রচলিত আছে, তাহাদের উপকরণগুলি সংগ্রহ করিয়া বাংলাভাষার একখানি বৈজ্ঞানিক ব্যাকরণ রচনা। বহু বৎসর পূর্বেই (১৩১২) তিনি এই সংগ্রহ ব্যাপারে ছাত্রদের অবহিত করিয়াছিলেন।

১৮৯৫ সালের জুন মাসের 'দাসী' পত্রিকায় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়

তাঁহার 'প্রাদেশিক কথিত বাঙ্গলা' প্রবন্ধে (১৩৭২ সালের আষাঢ় সংখ্যা 'কল্যাণী'তে পুনর্মুদ্রিত) সাধারণের কথিত ভাষার কতকগুলি শব্দ-বৈশিষ্ট্য লইয়া আলোচনা করেন। কত যুগ আগেই তিনি বাংলার আঞ্চলিক ভাষার একখানি শব্দকোষ রচনার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন।

১৩৪৯ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা প্রবাসীতে বঙ্গীয় শব্দকোষ প্রণেতা হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আষাঢ় সংখ্যায় অধ্যাপক চিন্তাহরণ চক্রবর্তীও সাধারণ্যে প্রচলিত ভাষার একখানি কোষগ্রন্থের অভাবের কথা উল্লেখ করেন।

এই সকল বিবরণ হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, আঞ্চলিক শব্দগুলির বৈচিত্র্য এবং বৈশিষ্ট্যের প্রতি সুধীসমাজের দৃষ্টি বহু পূর্বেই আকৃষ্ট হইয়াছে এবং ঐ সকল শব্দ সংগৃহীত হইয়া একটি পূর্ণাঙ্গ শব্দকোষ প্রকাশিত হউক, ইহা সকলেরই ঐকান্তিক ইচ্ছা।

বাংলার বাহিরের দিকে দৃক্‌পাত করিলেও অন্য রাজ্যের গ্রাম্য শব্দ সংগ্রহের এবং অভিধান প্রণয়নের কার্যে অনেক মনীষীর ঐকান্তিক প্রয়াস ও নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রসঙ্গক্রমে এখানে সে সকলেরও কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা যাইতে পারে :

খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে হেমচন্দ্র সূরি গুজরাট ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলের প্রায় চার হাজার দেশী শব্দ সংগ্রহ করিয়া 'রত্নাবলী' বা 'দেশী নামমালা' অভিধান সঙ্কলন করেন।

উত্তর ভারতে হিন্দী ভাষাভাষী অঞ্চলে গ্রাম্য শব্দ-সংগ্রহের কাজ উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতেই আরম্ভ হয়। প্রধানত পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণই এই কার্যে প্রথম হস্তক্ষেপ করেন। হিন্দী কৃষি-অভিধান সংকলনের ক্ষেত্রে Patrick Carnegy-র নাম সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য। তাঁহার 'Kutcherry Technicalities' ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে এলাহাবাদ মিশন প্রেস কর্তৃক প্রথম প্রকাশিত হয়। ইহা দ্বিতীয়বার ছাপা হয় ৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে।

Mr. Carnegy-র পর ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে William Crooke তাঁহার 'A Digest of Rural and Agricultural Terms' প্রকাশ করেন। ইহা অযোধ্যা এবং তৎসংলগ্ন অঞ্চলের গ্রাম্য এবং কৃষি-শব্দের সংকলন। এই দুইটি সংকলন গ্রন্থ আপিস আদালতের কর্মচারীদের বিশেষ সহায়ক হইয়াছিল।

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে Dr. Grierson-এর বিখ্যাত 'Bihar Peasant Life' প্রকাশিত হয়। ইহার ১৯২৬-এর সংস্করণে প্রায় বার হাজার শব্দ স্থান পাইয়াছে।

শব্দগুলি বিষয় অনুসারে সাজানো। গ্রন্থশেষে বর্ণানুক্রমে শব্দসূচীও দেওয়া হইয়াছে। যে কোনও ভারতীয় উপভাষার অভিধান প্রণয়নের ক্ষেত্রে Dr. Grierson-এর গ্রন্থকে পথ প্রদর্শক বলা যাইতে পারে।

Dr. Grierson-এর বহু বৎসর পর শ্রীহরিহরপ্রসাদ গুপ্ত আজমগড় ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলের কুটীরশিল্প বিষয়ক প্রায় ২৫০০ আড়াই হাজার গ্রাম্য শব্দের একটি সংগ্রহ প্রকাশ করিয়া এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উচ্চ সম্মান লাভ করেন।

১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ডঃ অম্বাপ্রসাদ 'সুমন' আলিগড় অঞ্চলের কৃষকদের মধ্যে প্রচলিত ব্রজভাষার শব্দ সংগ্রহ করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন।

হিন্দী আঞ্চলিক ভাষার সুপরিকল্পিত ও সুবিন্যস্ত শ্রেষ্ঠ কোষগ্রন্থ হইতেছে ডঃ বিশ্বনাথ প্রসাদের 'কৃষি-কোষ।' ইহার প্রথম ভাগ ১৯৫৯ সালে বৃহৎ ভূমিকাসহ প্রকাশিত হয়। একজন সমালোচক বলিয়াছেন 'It is the light house in the ocean of the dialect dictionaries.'[১]

উত্তর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বুন্দেলী, কুমায়ুনী প্রভৃতি উপভাষার শব্দ-সংগ্রহের কাজেও অনেকে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন।

ইংরেজী ভাষার Dialect Dictionary অধ্যাপক রাইটের (Joseph Wright) আর এক বিস্ময়কর কীর্তি।

ফরাসীর দক্ষিণপূর্ব অঞ্চলের প্রোভাঁস নামক উপভাষায় সাহিত্য রচনা করিয়া মিস্ত্রাল (Frederic Mistral) জগদ্বিখ্যাত হন এবং ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্বসভার সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান Nobel পুরস্কার লাভ করেন। এই প্রসঙ্গে উপভাষায় সাহিত্যসেবা করিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন, এইরূপ আরও দুইএক জনের নাম করা যাইতে পারে। ব্যাভেরিয়ার কার্ল স্টাইনার (Carl Joseph Steiner) জার্মাণের এক উপভাষায় এবং কবি রবার্ট ব্যর্ন্‌স্ (Robert Burns) স্কচ উপভাষায় সাহিত্য-কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন।

* * *

দেশ বিদেশের এত সব চিন্তাচেষ্টা এবং দৃষ্টান্তের মুখে ভাবিলাম, আর বসিয়া থাকা নয়, কর্তব্য এখনই গ্রহণ করিতে হইবে। 'মাটির প্রদীপের' যতটুকু সাধ্য ততটুকুই সে করিবে, হউক তাহা সামান্য। হৃদয়যন্ত্রে কেবলই অনুরণিত হইতে লাগিল :

---

১ Ram Prakash Kulshreshtha, Folklore, December, 1967.

'কে লইবে মোর কার্য ?—কহে সন্ধ্যারবি।
শুনিয়া জগৎ রহে নিরুত্তর ছবি।
মাটির প্রদীপ ছিল, সে কহিল, স্বামী,
আমার যেটুকু সাধ্য করিব তা আমি।'

'লৌকিক শব্দকোষ' সেই কঠোর কর্তব্য সম্পাদনেরই প্রথম পদক্ষেপ মাত্র। ইহা বাংলার (পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশ) বিভিন্ন অঞ্চলের বাংলা ভাষাভাষী সাধারণ মানুষের (masses) মৌখিক ভাষার অভিধান এবং লোকসংস্কৃতি বিষয়ক গ্রন্থ।

যে সকল শব্দ শিক্ষিত সমাজের দরবারে এবং আদর্শ ভাষার সাহিত্যে অপ্রচলিত, অথচ লোকের মুখে মুখে বহু প্রচলিত, সেগুলিকে অনেকেই গ্রাম্য শব্দ বলিয়া থাকেন। বর্তমান গ্রন্থ ঐ সকল শব্দেরই সংগ্রহ হইলেও ইহার নামকরণে 'গ্রাম্য' কথাটি ব্যবহৃত হয় নাই। কারণ গ্রামকে আমরা যতই ভালবাসি না কেন, আমরা গ্রাম্য হইতে চাই না, কেহ আমাদিগকে গ্রাম্য বা গেঁয়ো বলিলে খুশি হই না। তাই বাংলা ভাষার আদি ও প্রধান মূলধনকে 'গ্রাম্য' অবজ্ঞা হইতে বাঁচাইয়া 'লৌকিক' করা হইয়াছে।

'শব্দকোষ' নামটি সম্পর্কেও কয়েকটি কথা বলিবার আছে। লক্ষাধিক শব্দে যেখানে একটি পূর্ণাঙ্গ শব্দকোষ প্রকাশিত হইবার সম্ভাবনা আছে, সেখানে মাত্র কয়েক হাজার শব্দের একটি পুস্তিকার 'শব্দকোষ' নামকরণ প্রগল্‌ভতা মনে হইতে পারে। বিশ্বকোষ, বাঙ্গালা শব্দকোষ, বঙ্গীয় শব্দকোষ, ভারতকোষ, তারপরই এই সামান্য প্রচেষ্টাকে 'লৌকিক শব্দকোষ' নাম দিতে সত্যই সংকোচ বোধ করিয়াছি। তবে কিনা ভরসা রাখিতে হয়। কবিগুরু বলিয়াছেন, 'নিশিদিন ভরসা রাখিস, ওরে মন, হবেই হবে।' আমার এই অকিঞ্চন যে একদিন ভূমার আকারে তাহার নামের মর্যাদা রক্ষা করিবে না, তাহা কে বলিবে ?

সংগ্রহ-বৃত্তান্ত

মুখের ভাষা জীবন্ত। চলমান জীবনের পথে নিত্যই উহার ভাণ্ডারে নূতন নূতন শব্দ সংযোজিত হইতেছে। বিভিন্ন উৎস হইতে আমার এই শব্দ সংগ্রহ-কার্য বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হইয়াছে :

(১) পথে চলিতে, হাটেবাজারে, খেতে-খামারে, হেঁশেলে-দরবারে, কোথাও

বেড়াইতে, যখনই যেখানে কাহারো মুখে কোনও নূতন শব্দ শুনিয়াছি, কোনও নূতন তথ্যের সন্ধান পাইয়াছি, টুকিয়া লইয়াছি, কিংবা বাড়িতে আসিয়া লিখিয়া রাখিয়াছি। কিন্তু অযাচিতভাবে আর কতটুকু পাওয়া যায়? কার্য সম্পাদনেও বিলম্ব ঘটে। তাই প্রায়ই গ্রামে গ্রামে গিয়া বিভিন্ন শ্রেণীর লোকেদের নিকট হইতে জিজ্ঞাসা করিয়া করিয়া এক একটি বস্তু বা বিষয়সংশ্লিষ্ট শব্দ ও তথ্যাদি সংগ্রহ করিতে হইয়াছে। দুই চোখে যাহা পড়িয়াছে, প্রথমত স্থানে বসিয়া একসঙ্গেই সকলের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছি; পরে আবার সেগুলি বিষয় অনুসারে ভাগে ভাগে সাজাইয়াছি। শব্দ-নির্দিষ্ট বস্তুগুলি সম্পর্কে চাক্ষুষ জ্ঞান লাভ করায় এক অঞ্চলের সহিত অপর অঞ্চলের তুলনামূলক আলোচনা করা সহজ হইয়াছে। এই সংগ্রহ-কার্যে শুধু বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদেরই শরণাপন্ন হই নাই, দশ বারো বছরের বালকের নিকট হইতেও অনেক সময় অনেক তথ্য সংগ্রহ করিয়া লইয়াছি। এক অঞ্চলের সংগ্রহ যথাযথ করিতে পারিলে তাহার উপর ভিত্তি করিয়া অপর অঞ্চলের কাজ অনেকটা সহজ হইয়া যায়। একই নামধাম বা তথ্য বার বার না লিখিয়া উহাদের পার্শ্বে শুধু আঞ্চলিক পার্থক্যগুলি লিখিলেই চলে। লৌকিক শব্দকোষের জন্য সংগ্রহ-কার্য অনেক ক্ষেত্রে এই আদর্শেই পরিচালিত হইয়াছে।

এখানে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, কোনও অপরিচিত ব্যক্তির পক্ষে গ্রামে গিয়া সাধারণ লোকের মুখ হইতে তথ্য সংগ্রহ করা খুব সহজ ব্যাপার নয়। অপরিচিত লোক দেখিলেই তাহাদের মনে নানা সন্দেহের উদয় হয়; এই সন্দেহ আরও দৃঢ় হয়, সঙ্গে যদি খাতাপত্র থাকে। ট্যাক্সের ভয়, লেভির ভয়, মজুতদারির ভয় ইত্যাদি তাহাদের সারল্যকে বিনষ্ট করে। এজন্য নিজের বিদ্যাবুদ্ধির স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দিয়া একেবারে মাটির মানুষ বনিয়া যাইতে হয়। চেয়ারের জন্য অপেক্ষা না করিয়া দাওয়ায় উঠিয়া ছোট ছেলেটির সঙ্গে একেবারে বস্তায় বসিয়া পড়িতে হয়, টুরিতে করিয়া মুড়ি খাইতে হয়, জল পিপাসায় পানি চাহিতে হয়, মনসাথোলায় মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিতে হয়। এতসব করিয়া তবে মাটির মানুষের হৃদয়ের কপাট খোলা যায়।

(২) যেখানে স্থানে (spot) যাওয়া সম্ভব হয় নাই, সেখানে সেই স্থানেরলোক খুঁজিয়া বাহির করিতে হইয়াছে। কিন্তু লোক হইলেই ত চলে না, একেবারে কাদামাটির মানুষ চাই; আপন আপন গ্রামের সঙ্গে, সমাজের সঙ্গে যাহাদের নাড়ী চলাচলের নিবিড় যোগ আছে, যাহারা অপরিচিতের সঙ্গেও নিজেদের

সহজ সরল ভাষায় কথা বলিতে, ভাব প্রকাশ করিতে সঙ্কোচ বোধ করে না, তাহাদের হাতেই রহিয়াছে বাংলা শব্দ-ভাণ্ডারের ও লোকসংস্কৃতির চাবিকাঠি। লক্ষ্য করিয়াছি, একই পরিবারে বাপের ব্যবহৃত একটি শব্দ ছেলেয় বুঝে না। যখন আমি দেয়ালে পেরেক ঠুকিতে শিলটি চাই, তখন আমার নাতনী জিজ্ঞাসু নেত্রে অবাক হইয়া চাহিয়া থাকে। তখন আবার বুঝাইয়া বলিতে হয়, 'বুঝিস্ নে? নোড়া চাইছি, শিল মানে নোড়া।' মুহূর্তে একটা হাসির রোল উঠে। আমার নাতনী আজন্ম কলিকাতায় লালিত পালিত; তাহার পক্ষে কলিকাতার 'নোড়া'কে যে ময়মনসিংহে 'শিল' বলে, তাহা জানিবার কথা নয়। শব্দ-সংগ্রহের ক্ষেত্রে এইরূপ নানা দিক বিবেচনা করিয়া এক এক অঞ্চলের খাঁটি মানুষটির কাছে গিয়া, বসিতে হইয়াছে। কিন্তু এই সুযোগ আর বেশীদিন থাকিবে না। দেশের রূপ, জিনিসপত্রের রূপ, আচার-ব্যবহারের রূপ সব বদলাইয়া যাইতেছে। বিশেষত দেশ বিভাগের ফলে বাংলার এক অংশ হইতে আর এক অংশে গিয়া সরেজমিনে শব্দ ও তথ্য সংগ্রহ করা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে।

মাটির মানুষ যাহারা বাংলাদেশ হইতে এদিকে চলিয়া আসিয়াছে, তাহাদিগকেও আর ১৫/১৬ বৎসর পর পাওয়া যাইবে না। সুযোগ থাকিতে বাংলাদেশের যে যে অঞ্চলে যাওয়া সম্ভবপর হয় নাই, সেইসব অঞ্চলের অনেক শব্দ, শব্দ-নির্দিষ্ট বস্তু বা অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস উহাদের নিকট হইতেই সংগ্রহ করিতে হইয়াছে; সন্দেহস্থলে একই অঞ্চলের একাধিক ব্যক্তির শরণাপন্ন হইয়াছি। অন্যান্য অঞ্চলের সংগ্রহের ক্ষেত্রেও যেখানে স্থানে যাওয়া বা সাক্ষাৎভাবে কোনও অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া সম্ভব হয় নাই, সেখানেও ঐরূপেই উপযুক্ত লোকের নিকট হইতে তথ্য আহরণ করিতে হইয়াছে। কখনো কখনো চিঠিপত্রের আদান-প্রদানের ভিতর দিয়াও সংগ্রহ-কার্য চলিয়াছে।

(৩) শত চেষ্টা এবং পরিশ্রম সত্ত্বেও কাহারো একার পক্ষে লোকসংস্কৃতির ও বাংলা শব্দভাণ্ডারের সমস্ত আঞ্চলিক উপকরণ আহরণ করা সম্ভবপর নহে। সুপরিকল্পিতভাবে না হইলেও এপর্যন্ত পূর্বসূরীদের চেষ্টায় বাংলার কোন কোন অঞ্চলের কিছু কিছু শব্দ ও তথ্য আহৃত হইয়াছে এবং সেগুলি বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় এবং দুই চারিটি গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। ইতিপূর্বে এই সম্পর্কে উল্লেখ করিয়াছি। পূর্বসূরীদের ঐসকল সংগ্রহ হইতে লৌকিক শব্দকোষে বিষয় অনুসারে অনেক শব্দ গৃহীত ও আলোচিত হইয়াছে।

(৪) শব্দ-সংগ্রহের আর একটি উৎস হইল বিভিন্ন সাহিত্যিকের গ্রন্থ ও প্রবন্ধাদি। বাংলা ভাষার খ্যাতনামা লেখকদের অনেকের রচনাতেই আঞ্চলিক ভাষার অল্পবিস্তর শব্দ, আঞ্চলিক বাগধারা স্থান পাইয়াছে। কাহারো কাহারো গ্রন্থে অভিধানের উপকরণমূলক শব্দসূচীও আছে। লৌকিক শব্দকোষের কান্তিপুষ্টি বর্ধনে এইগুলিও কম সাহায্য করে নাই। কিন্তু নির্বিচারে কিছুই গ্রহণ করি নাই, সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের লোকেদের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া, কোনও বিষয় সম্পর্কে কৃতনিশ্চয় হইয়া তবেই গ্রহণ করিয়াছি।

লৌকিক শব্দকোষ-এর দ্বিতীয় খণ্ডে আলোচিত গ্রন্থ, পত্র-পত্রিকা ও প্রবন্ধাদির একটি বিস্তৃত তালিকা (পাঠপঞ্জী) দিয়াছি। এখানেও কয়েকটি গ্রন্থের ঋণ স্বীকার করিতেছি। পত্রপত্রিকাদির কথা পূর্বেই বলিয়াছি।

আদ্যের গম্ভীরা (শ্রীহরিদাস পালিত), আসাম ও বঙ্গদেশের বিবাহ পদ্ধতি (শ্রীবিজয়ভূষণ ঘোষ চৌধুরী), কবি কৃষ্ণরাম দাসের গ্রন্থাবলী (ডঃ শ্রীসত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত), বাংলার লৌকিক দেবতা (শ্রীগোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু), বাংলার স্ত্রী-আচার (শ্রীইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী), বাংলার চালচিত্র (আব্দুল জব্বর), বাগর্থ (ডঃ বিজনবিহারী ভট্টাচার্য), ব্রতদর্পণ (শ্রীসুদেব চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়), ভারতীয় বনৌষধি (শ্রীকালীপদ বিশ্বাস ও শ্রীএককড়ি ঘোষ), রাঢ়ের সংস্কৃতি ও ধর্মঠাকুর (ডঃ অমলেন্দু মিত্র), রামেশ্বর রচনাবলী (ডঃ পঞ্চানন চক্রবর্তী সম্পাদিত), শব্দতত্ত্ব ও বাংলা ভাষা পরিচয় (রবীন্দ্রনাথ), পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি (বিনয় ঘোষ), The Rajbansis of North Bengal (Dr. Charu Chandra Sanyal), মনীষা মঞ্জুষা ১ম ও ২য় খণ্ড (ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক), বগুড়ার লোকসাহিত্য (খোদেজা খাতুন, বাঙলা একাডেমী, ঢাকা), বাঙলা অভিধান গ্রন্থের পরিচয় (শ্রীযতীন্দ্র মোহন ভট্টাচার্য), চণ্ডীমঙ্গল (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও সাহিত্য অকাদেমি প্রকাশিত), ভাষার ইতিবৃত্ত (ডঃ সুকুমার সেন), পূর্ব পাকিস্তানী আঞ্চলিক ভাষার অভিধান (বাঙলা একাডেমী, ঢাকা), বাংলা সাহিত্যে আরবী ও ফারসী শব্দ (ডঃ হরেন্দ্রচন্দ্র পাল), শ্রীকৃষ্ণকীর্তন (শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ), আলালের ঘরের দুলাল (টেকচাঁদ ঠাকুর), মৈমনসিংহ গীতিকা (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়), বঙ্গসাহিত্য পরিচয় (ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন), হাওড়ার লোক-উৎসব (তারাপদ সাঁতরা), সীমান্ত বাংলার লোকযান (ডঃ সুধীরকুমার করণ), হিন্দুর আচার অনুষ্ঠান (শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী),

Bihar Peasant Life (Grierson), The Origin and Development of the Bengali Language (Dr. Suniti Kumar Chatterji), The History of the Bengali Language (B. C. Mazumdar), Bhargava's Anglo-Hindi Dictionary (Prof. R. C. Pathak), চলন্তিকা (শ্রীরাজশেখর বসু), বঙ্গীয় শব্দকোষ (শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়), বাঙ্গালা ভাষার অভিধান (শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস), বাংলা শব্দকোষ (শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি), ভারতকোষ (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ), শব্দকল্পদ্রুম। ইত্যাদি।

শব্দ নির্বাচন

লৌকিক শব্দকোষে সমগ্র বাংলার (পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশ) বিভিন্ন অঞ্চলের সাধারণ মানুষের মৌখিক ভাষার (Regional dialects) শব্দ স্থান পাইয়াছে। এই সকল শব্দের অধিকাংশই প্রচলিত আদর্শ (Standard) কোষগ্রন্থগুলিতে পাওয়া যাইবে না। আবার আদর্শ ভাষার সাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং সাধারণ অভিধানে গৃহীত যে সকল সংস্কৃত বা তৎসম এবং বিদেশী শব্দের অর্থে, উচ্চারণে বা প্রয়োগে অঞ্চলে অঞ্চলে তেমন কোন পার্থক্য নাই, সেই সকল শব্দও এই গ্রন্থের আওতা হইতে যথাসম্ভব বাদ দেওয়া হইয়াছে। যে সকল শব্দ এখনও বাংলার সর্বাঞ্চলে সর্বসাধারণের হইয়া উঠে নাই, আদর্শ ভাষার সাহিত্যে এবং শিক্ষিত সমাজে একরূপ অপাঙ্‌ক্তেয় হইয়া আছে, অথচ এক এক অঞ্চলে বংশপরম্পরায় লোকের মুখে মুখে প্রচলিত থাকিয়া হেঁশেলে দরবারে, মাঠে ঘাটে, হাটে বাটে, কলকারখানায়, ধানে গানে সর্বত্র সকল বিষয়ে আপনার জীবনীশক্তির পরিচয় দিতেছে, লৌকিক শব্দকোষে সেই সকল অখ্যাত শব্দকেই বেশী মর্যাদা দেওয়া হইয়াছে। মোটকথা, শব্দকোষ বিভিন্ন অঞ্চলের সাধারণ বাঙালীর ঘরোয়া ভাষার তথা একেবারে মাতৃভাষার কোষগ্রন্থ। ইহার অধিকাংশ শব্দই ব্যাকরণের ভাষায় অর্ধ-তৎসম, তদ্ভব, দেশী ও বিদেশী। ব্যাকরণে 'তদ্ভব'র অর্থ করা হইয়াছে, 'তৎ' অর্থাৎ সংস্কৃত বা মূল স্থানীয় আর্যভাষা হইতে 'ভব' অর্থাৎ উৎপত্তি যাহার। ভারতীয় আর্যভাষার ক্রমবিবর্তনের ভিতর দিয়া আমরা এই শব্দগুলি লাভ করিয়াছি। আর্যদের আগমনের পূর্বে এই দেশে যাহারা বাস করিত, তাহাদের ভাষা হইতে

যে সকল শব্দ বাংলায় গৃহীত হইয়াছে, সেগুলিকে বলা হয় 'দেশী' শব্দ। ইহাদের মধ্যে অস্ট্রিক, দ্রাবিড়, মোঙ্গল ইত্যাদি ভাষাবর্গের অনেক শব্দ আছে। এই শব্দগুলিও অল্পবিস্তর পরিবর্তনের মধ্য দিয়াই আমাদের ভাণ্ডারে আসিয়াছে। বিদেশী শব্দগুলি সম্বন্ধেও এই একই কথা খাটে। যেমন, School ইস্কুল, Table টেবিল। কিন্তু কি তদ্ভব, কি দেশী, কি বিদেশী কাহারো পরিবর্তন সর্বত্র সকল অবস্থায় একই নিয়মে একই রূপে সাধিত হয় নাই। মূল এক হইলেও স্থানকালের দূরত্ব, পরিবেশের বিভিন্নতা প্রভৃতি নানা প্রভাবের ফলে এক একটি শব্দ বহুরূপী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যেমন সংস্কৃতের 'অঙ্গন' শব্দটি বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রূপ পাইয়াছেঃ আঙ্গিনা / আঙিনা-ক, আগনা / আগনে-বর্ধ. হু. বী. মে, এগন্যা-বাঁ, আগন্যা-মু, আগিনা / এঘিনা-জ. কো। শুধু রূপের দিক দিয়াই নয়, শব্দ ব্যবহার এবং অর্থের দিক দিয়াও অনেকক্ষেত্রে এই পার্থক্য লক্ষিত হয়। যেমন, 'ঘর' শব্দের উৎপত্তি 'গৃহ' হইলেও, কোথাও ইহার অর্থ,—দল, গানের দল, কোথাও বা প্রতিদিন। আবার প্রত্যেক অঞ্চলেই এমন শত শত শব্দ আছে, যেগুলি অন্য অঞ্চলে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না এবং সেগুলি অন্য শব্দের বিকৃতরূপ বলিয়াও মনে হয় না; উহারা স্বমহিমায় এক একটি উপভাষায় প্রতিষ্ঠিত আছে। লৌকিক শব্দকোষে ইহাদের অনেকের সম্বন্ধেই বিচার-বিবেচনা এবং নানা দিক আলোচনা করা হইয়াছে। যেহেতু ইহা লৌকিক শব্দকোষ, সাধারণ অভিধান নয়, তজ্জন্য ইহাতে শব্দগুলির অর্থ নির্ণয়ের ক্ষেত্রেও সাধারণ লোকের কাছে উহারা কি অর্থ বহন করে, কেন করে, ইত্যাদির উপরই বেশী জোর দেওয়া হইয়াছে। এক একটি শব্দ যে বস্তু, ব্যক্তি, অনুষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠানকে নির্দেশ করে, তাহাদেরই শুধু পরিচয় দেওয়া হয় নাই, প্রায়ই নামদাতাদেরও পরিচয়, তাহাদের ধ্যান-ধারণা, বিশ্বাস, সংস্কার ইত্যাদির প্রতিও ইঙ্গিত করা হইয়াছে। মোটকথা, লৌকিক শব্দকোষে বাংলার লোকসমাজের কথাও অল্পবিস্তর স্থান পাইয়াছে। বাংলার এক অঞ্চলের মানুষের কাছে অপর অঞ্চলের মানুষের ঘরবাড়ি, গৃহসামগ্রী, চাষ-আবাদ, আচার-অনুষ্ঠান ইত্যাদির শুধু বাহিরের রূপই নয়, অন্তরের রূপটিও ফুটিয়া উঠুক, শব্দাদির বিন্যাস ও বিবৃতির ভিতর দিয়া সর্বদা সেই চেষ্টাই করা হইয়াছে।

শব্দবিন্যাস প্রণালী

লৌকিক শব্দকোষ-এর প্রস্তুত পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ, প্রথম খণ্ডে দশটি অধ্যায়ে প্রধান দশটি বিষয় স্থান পাইয়াছে।

সংগৃহীত শব্দগুলিকে শব্দ-নির্দিষ্ট বিভিন্ন বিষয় অনুসারে ভাগ করিয়া এক এক বিষয়ান্তর্গত শব্দ এক এক অধ্যায়ে অকারাদি বর্ণানুক্রমে বড় হরফে সাজানো হইয়াছে। কিন্তু বিশেষ বিশেষ শব্দের যথোচিত বিবৃতি ও আলোচনার স্থান করিবার জন্য এবং ভবিষ্যতে শব্দের বিষয়গত বিভাগ তুলিয়া দিয়া প্রচলিত অভিধানের আদর্শে সমস্ত শব্দ অকারাদি বর্ণানুক্রমে বিন্যস্ত ও বিবৃত করিবার, কিংবা বিষয়-বিভাগ রাখিয়া পরিশিষ্টে বিস্তৃত শব্দ-সূচী দিবার পরিকল্পনা থাকায়, সব শব্দের সব উচ্চারণভেদ এবং আঞ্চলিক সমনাম পৃথক পৃথক স্থানে আর বর্ণানুক্রমে দেখানো হয় নাই, সেগুলিকে সংশ্লিষ্ট শব্দের কোটেই ছোট হরফে রাখিয়া দিয়াছি। শুধু তাহাই নহে, অনেক বহুপরিচিত শব্দের সঙ্গে তৎসংক্রান্ত যাবতীয় শব্দের বিবৃতি ও আলোচনা একত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। যেমন, গোরু সংক্রান্ত ১৩০টির উপর শব্দ গোরুর ঘরে (১৮৭ পৃঃ), নারিকেল সংক্রান্ত প্রায় ৫০টি শব্দ নারিকেলের কোটে (১৫২ পৃঃ) স্থান পাইয়াছে। পেঁপের (১৫৭ পৃঃ) ২৩টি উচ্চারণভেদ এবং সমনামের মধ্যে মাত্র কয়েকটিই বড় হরফে বর্ণানুক্রমে বিন্যস্ত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে কচু (১৩৩ পৃঃ), কলা (১৩৫ পৃঃ), পাট (১৫৪ পৃঃ), পান (১৫৫ পৃঃ), ঢেঁকি (৬৪ পৃঃ), হুঁকা (৮২ পৃঃ), ক্ষেতমজুর (৯৫ পৃঃ) প্রভৃতি শব্দও উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহাদের এক একটির ছায়াতলে বহু শব্দ, বহু তথ্য আত্মগোপন করিয়া আছে।

জানি, দুর্বোধ্য শব্দের অর্থগ্রহণের জন্যই যাঁহারা শব্দকোষ ব্যবহার করেন, তাঁহারা এইরূপ শব্দবিন্যাস-প্রণালী অনুমোদন করিবেন না, কোষকারের প্রতি ত্যক্তবিরক্তই হইবেন। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ অভিধান রচনা ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিষয়গত সজ্জার পরিবর্তে আদ্যন্ত বর্ণানুক্রমিক রূপসজ্জাটি বাঞ্ছনীয় হইলেও শব্দের বিষয়গত বিন্যাসকে পণ্ডশ্রম বলা যায় কি? বাংলা ভাষার পূর্ণাঙ্গ অভিধান রচনার পক্ষে সর্বাগ্রে যাহা প্রয়োজন সেই শব্দ-সংগ্রহের কাজ এখনও বিস্তর বাকি আছে। বাংলার গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া আমার এই ধারণাই হইয়াছে যে, প্রচলিত অভিধানগুলিতে এবং সাহিত্য-পুস্তকাদিতে বাংলা ভাষার এক দশমাংশ শব্দও ধরা পড়ে নাই। এমতাবস্থায় অবশিষ্ট বিপুল সংখ্যক শব্দ-

সংগ্রহের কাজে শব্দের বিষয়গত বিন্যাস ভাবীকালের মাতৃভাষাপ্রেমী সংগ্রাহকদের প্রভূত সাহায্য করিবে বলিয়াই আমি মনে করি। জেলা বা অঞ্চল সঙ্কেত সহ শব্দগুলির বিষয় বিভাগ থাকিলে একজনের সংগ্রহে একটি বিষয়ে যে যে শব্দ, শব্দার্থ বাদ পড়ে, পরবর্তী আর একজনের অনুসন্ধানে তাহা সহজেই ধরা পড়িবে। এইরূপে যখন বহুজনের ক্রমাগত চেষ্টায় নানা বিষয়ক শব্দ সংগ্রহের কাজ অনেকটা অগ্রসর হইবে, তখনই বিষয়-বিভাগ তুলিয়া দিয়া আদ্যন্ত বর্ণানুক্রম অনুসরণ করা যুক্তিযুক্ত হইবে।

পক্ষান্তরে এক একটি বিষয় অনুসারে শব্দগুলি বিন্যস্ত থাকায়, সারা বাংলার এক একটি বিষয় সম্পর্কে একটা সামগ্রিক চিত্র প্রত্যেকের মানস-লোকে ভাসিয়া উঠিবে। বাংলার ঘরবাড়ি, গৃহ-সামগ্রী, বাংলার চাষ-আবাদ, বাংলার ফলফুল, বাংলার জীবজন্তু, বাঙালীর আচার-অনুষ্ঠান, বাঙালীর ধ্যানধারণা, সংস্কার প্রভৃতির সঙ্গে সামগ্রিকভাবে সকলের পরিচিত হইবার সুযোগ ঘটিবে।

অধিকাংশ আঞ্চলিক শব্দের সঙ্গে উহাদের সংগ্রহ-স্থানের বা প্রচলন-স্থানের (জেলা বা অঞ্চল সঙ্কেত) উল্লেখ করা হইয়াছে। এরূপ স্থলে শব্দের পৃষ্ঠে একটি (-) হাইফেন দিয়া সংশ্লিষ্ট অঞ্চল বা জেলা সঙ্কেত (উহার এক বা একাধিক আদ্যঅক্ষর) বসানো হইয়াছে। কোনও শব্দ একাধিক স্থানে প্রচলিত থাকিলে প্রথম স্থান-সঙ্কেতের পর (.) বিন্দু চিহ্ন দিয়া দিয়া অন্যান্য স্থান-সঙ্কেত নির্দেশ করা হইয়াছে। যেমন, **কোস্তা**-চ. য. খু—ফুলঝাড়ু।

যে ভাষার যে শব্দ হইতে লৌকিক শব্দটি উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়, অনেক ক্ষেত্রে [ ] তৃতীয় বন্ধনীর ভিতর সেই ভাষাটি মূল শব্দসহ বা সেই শব্দ ব্যতিরেকে একটি সঙ্কেত দ্বারা (সংশ্লিষ্ট ভাষার আদ্য অক্ষর দ্বারা) নির্দেশ করা হইয়াছে। যেমন, **আগল** [স° অর্গল]—দরজার হুড়কা। **তক্তাপোষ** [ফা°]—শয্যাধার। কখনো বা ভাষা সঙ্কেত না দিয়া ঐরূপ বন্ধনীর ভিতর মাত্র মূল শব্দটি দেওয়া হইয়াছে। যেমন, **খালই** [<ক্ষারক]—মাছের চুপড়ি।

(/) ইলেক চিহ্ন দ্বারা একই শব্দের সাধু ও চলিত রূপকে, কিংবা একাধিক উচ্চারণ বা বানানকে, অথবা একই অঞ্চলে প্রচলিত দুই বা ততোধিক সমার্থক শব্দকে পৃথক করা হইয়াছে। যেমন, উঠান / উঠন। ঢেঁকশাল / ঢেঁশকাল। ঠিকা / ভেজা।

অনেক ক্ষেত্রে শব্দার্থ স্পষ্ট করিবার জন্য ( ) প্রথম বন্ধনীর মধ্যে প্রয়োগ-

উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে। উদাহরণটি কোনও গ্রন্থের উদ্ধৃতি হইলে (' ') উদ্ধার-চিহ্ন এবং গ্রন্থ-সঙ্কেত বা গ্রন্থকারের নাম-সঙ্কেত ব্যবহার করা হইয়াছে। যেমন 'কামিলা'র কারুশিল্পী অর্থটি স্পষ্ট করিবার জন্য একটি প্রয়োগ-উদাহরণ এইরূপে বিন্যস্ত করা হইয়াছে : ('কেমন করিয়া কৈল কামিলার বেটা। শঙ্খের উপরে এত নির্মাণের ঘটা ॥'—রারচ)

এক এক অঞ্চলের সমধিক প্রচলিত প্রায় প্রত্যেক শব্দের সঙ্গেই উহার পর্যায় বা সমার্থক শব্দগুলি সংশ্লিষ্ট অঞ্চল বা জেলা সঙ্কেত সহ দেওয়া হইয়াছে। সাধারণত এক একটি শব্দের বিবৃতির পর 'তৎপর্যায় :—' বা 'পর্যায়শব্দ :—' এইরূপ লিখিয়া উহার সমার্থক বা পর্যায়শব্দ বিন্যস্ত করা হইয়াছে। কোথাও কোথাও ইহার ব্যতিক্রমও ঘটিয়াছে। সন্দেহস্থলে বা বহুপ্রচলিত শব্দের ক্ষেত্রে অঞ্চল সঙ্কেত দেওয়া হয় নাই। তুল্যভাবসূচক অর্থ ও পর্যায়শব্দগুলি প্রায়ই (,) কমাচিহ্ন দ্বারা এবং ভিন্নার্থক শব্দ অঞ্চল-সঙ্কেত সহ বা উহা ব্যতিরেকে (।) দাঁড়ি দ্বারা পৃথক করা হইয়াছে। যেমন,

পেয়ারা [পো° pera, হি° অমরূদ, ই° guava]—বালকবালিকাদের অতি প্রিয় ফল। তৎপর্যায় :—আঞ্জির-দচ, আঁজির-রাঢ়, সবরি-পূব, সবরি আম-ম. ঢা, আম সবরি-ষ. পা, গৈয়ব-ম, গৈয়া-ঢা. ব. ফ, গ'য়ে-য. খু, গয়ম-নো, টাম সুপারি-জ. কো। (১৫৮ পৃঃ)। কেঠো—কাঠের বাটি। কচ্ছপভেদ।

লৌকিক শব্দকোষে যেরূপ **বর্ণানুক্রম** অনুসরণ করা হইয়াছে :

অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ এ ঐ ও ঔ ং ঃ ঁ
ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ ট ঠ ড ড়
ঢ ঢ় ণ ত থ দ ধ ন প ফ ব ভ ম য
য় র ল শ ষ স হ

বানান

লৌকিক শব্দকোষে সাধারণভাবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রস্তাবিত 'বাংলা বানানের নিয়ম' ও রাজশেখর বসু মহাশয়ের 'চলন্তিকা' অনুসরণ করা হইয়াছে। সংস্কৃত বা তৎসম শব্দের বানানে কোনও পরিবর্তন করা হয় নাই। তদ্ভব, দেশী এবং বিদেশী শব্দগুলির বানান উচ্চারণ অনুযায়ী লিখিতে গিয়াও ক্ষান্ত হইয়াছি। কারণ তাহাতে শব্দগুলি অযথা ভারাক্রান্তই হইত, কোনও কূলকিনারা পাওয়া যাইত না। শব্দের উচ্চারণে শুধু রাঢ়, পশ্চিমবঙ্গ, পূর্ববঙ্গ, উত্তরবঙ্গ এইরূপ

এক অঞ্চলের সহিত অপর অঞ্চলেরই পার্থক্য আছে, তাহা নহে। এই পার্থক্য একই অঞ্চলেরও জেলায় জেলায়, মহকুমায় মহকুমায়, গ্রামে গ্রামে, এমন কি সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে সম্যক পরিস্ফুট। আমগার (আমাদের), এইমোত্তোন (এইমাত্র), কৈশল (কৌশল), ঝ্যাতকোন (যতক্ষণ), বেতা (ব্যথা)—এই ধরনের উচ্চারণ বিকৃতির ক্ষেত্রে মূল শব্দগুলির প্রতিই লক্ষ্য রাখা হইয়াছে বেশী। তবু অনেকস্থলে উহাদের ঈষৎ পরিবর্তিত রূপগুলিও বিভিন্ন অঞ্চলের শব্দ হিসাবে দেওয়া হইয়াছে। যেমন 'আঙ্গিনা' শব্দটির আঙিনা, আগনা / আগনে, এগঞা, আগঞা, আগিনা / এঘিনা—আঞ্চলিক উচ্চারণভেদগুলিও দেখানো হইয়াছে। তাহাতে ভাষাতত্ত্বের গবেষকদের আলোচনার সুবিধা হইতে পারে।

সংস্কৃত বা তৎসম শব্দের বানান যথাযথ রাখা হইয়াছে ; উহাতে কোনও পরিবর্তন করা হয় নাই।

কি সংস্কৃত, কি অসংস্কৃত কোন প্রকারের শব্দেই (´) রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণ দ্বিত্ব করা হয় নাই। যেমন, কার্তিক, কর্তা, ফর্সা।

অসংস্কৃত (তদ্ভব, দেশী, বিদেশী) শব্দের বানানে সংস্কৃত ণত্ববিধি অনুসৃত হয় নাই। যাবতীয় শব্দে দন্ত্য 'ন' ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমন, কোনা, কোরান, পরগনা, ধরন, পান, কান, রানী, চুন।

শ, ষ, স-এর ব্যবহারে তদ্ভব শব্দের ক্ষেত্রে যথাসাধ্য মূল শব্দের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করা হইয়াছে। যেমন, মোষ <মহিষ, সরিষা <সর্ষপ, শীষ < শীর্ষ, পাঙ্গাশ < পিঙ্গশ, শাশুড়ী < শ্বশ্রূ। ব্যতিক্রম : মিন্‌সা / মিন্‌সে <মনুষ্য।

দেশী এবং বিদেশী শব্দে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 'শ' বা 'স' লেখা হইয়াছে। ব্যতিক্রমও ঘটিয়াছে। যেমন, তক্তাপোষ।

সংস্কৃতে তস্‌ ও শস্‌ প্রত্যয়ান্ত শব্দ প্রয়োগে বিসর্গান্ত হয়। যেমন, প্রধানতঃ ক্রমশঃ। কিন্তু প্রস্তুত শব্দকোষে এই সমস্ত শব্দের অন্ত্যবিসর্গ বাদ দেওয়া হইয়াছে। যেমন, সাধারণত, ইতস্তত, বস্তুত, প্রায়শ, ক্রমশ।

অধিকাংশ বাংলা শব্দেরই (অর্ধ-তৎসম, তদ্ভব, দেশী ও বিদেশী) অন্ত্য-ব্যঞ্জন হসন্ত ধ্বনিরূপে উচ্চারিত হয়। বাংলা উচ্চারণের এই সাধারণ নিয়ম মনে রাখিয়া শব্দের অন্ত্যব্যঞ্জনে (্) হস্‌ চিহ্ন বড় একটা ব্যবহার করা হয় নাই।

'ৎ' কে স্বতন্ত্র বর্ণ হিসাবে না ধরিয়া হস্‌যুক্ত 'ত্‌' রূপে ধরা হইয়াছে। কিন্তু অনেক তৎসম শব্দের শেষে মূলে 'ৎ' থাকিলেও বাংলায় 'দ' ব্যবহার করা হইয়াছে। যেমন, বিপদ <বিপৎ, সম্পদ <সম্পৎ, হৃদ <হৃৎ।

বর্গীয় এবং অন্তঃস্থ 'ব' তে কোনও পার্থক্য করা হয় নাই। উভয় 'ব' যুক্ত শব্দই একসঙ্গে 'ফ'-এর পর দেওয়া হইয়াছে।

'ক্ষ' কে স্বতন্ত্র বর্ণ হিসাবে না ধরিয়া 'ক্‌+ষ্‌' যুক্তবর্ণ রূপে ধরা হইয়াছে এবং 'ক্ষ' যুক্ত শব্দ 'খ' এর পূর্বে বসিয়াছে।

মূল সংস্কৃত শব্দের আদিতে বা মধ্যে 'ঈ' থাকিলে বাংলা শব্দেও 'ঈ' রাখিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। যেমন, শীষ <শীর্ষ, দীঘি <দীর্ঘিকা, কুমীর<কুম্ভীর। ব্যতিক্রম ঃ পিদিম<প্রদীপ, ছিরফল< শ্রীফল।

দেশী এবং বিদেশী শব্দে (মূলে যাহাই থাকুক) নির্বিচারে 'ই' অথবা 'ঈ' ব্যবহার করা হইয়াছে। যেমন, কাজি, উকিল/উকীল।

স্ত্রীলিঙ্গ, ব্যক্তি বা জাতি, ভাষা এবং বিশেষণ বোধক শব্দের শেষে 'ঈ' ব্যবহার করা হইয়াছে। যেমন, মাসী, পিসী, বাঘুনী, ঢাকী, ঘরামী, বাঙালী, ইংরেজী, হিন্দী, বেশী, রেশমী। তবে ব্যতিক্রমও অনেক আছে। যেমন, গাই, দিদি, ঝি, বিবি, কচি, মাঝারি, তৈয়ারি।

মূলে ঈ থাকিলেও মনুষ্যেতর প্রাণী, গুণ, কর্ম, পেশা, দ্রব্য, জড়পদার্থ ইত্যাদি বাচক বিশেষ্য শব্দের শেষে 'ই' বসিয়াছে। তবে দুই এক স্থলে ব্যতিক্রমও ঘটিয়াছে। যেমন, হাতি / হাতী।

মূল শব্দে 'ঊ' থাকিলেও প্রায় সমস্ত বাংলা শব্দেই 'উ' ব্যবহার করা হইয়াছে। সুতা<সূত্র, কুয়া<কূপ। ব্যতিক্রম ঃ পুব, পূব।

'ে' এ-কারের সাধারণ উচ্চারণ এবং বক্র উচ্চারণ প্রায় পাশাপাশি রাখা হইয়াছে। যেমন, নেকড়া / ন্যাকড়া।

ং, ঙ, ঙ্গ-র ব্যবহারে সঙ্গতি রক্ষা সম্ভবপর হয় নাই। বাংলার বহু অঞ্চলে 'ং' এবং 'ঙ' র প্রাধান্য। আবার কোথাও 'ঙ্গ'র উচ্চারণ স্পষ্ট, এজন্য অনেক ক্ষেত্রে নির্বিচারে তিনটিই ব্যবহৃত হইয়াছে।

ঁ চন্দ্রবিন্দুযুক্ত এবং চন্দ্রবিন্দুহীন শব্দ একসঙ্গে বর্ণানুক্রমে বিন্যস্ত হইয়াছে।

আঞ্চলিক উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য

প্রচলিত বর্ণমালার সাহায্যে বিভিন্ন অঞ্চলের উচ্চারণ অনুযায়ী সকল শব্দের যথাযথ বানান লেখা দুরূহ ব্যাপার, বলিতে কি অসাধ্য। এখানে বিভিন্ন অঞ্চলের প্রধান প্রধান উচ্চারণ বৈশিষ্ট্যগুলি মোটামুটি উল্লেখ করা যাইতেছে :

কলিকাতার আদর্শ ভাষার উচ্চারণে শব্দের আদিতে (ে) একারের প্রাবল্য দেখা যায়। যেমন—কেষ্ট, পেঁয়াজ, পেয়ালা, বেয়াই, বেয়ান, বেড়াল, রেকাব, শেয়াল। কেনা, চেরা, লেখা। কিন্তু পূর্ববঙ্গের প্রায় সর্বত্র এবং রাঢ়ের বহু অঞ্চলে এই সকল শব্দের আদিতে (ি) ইকার উচ্চারিত হয়। যেমন, কিষ্ট, পিঁয়াজ, পিয়ালা, বিয়াই, বিয়ান, বিড়াল, রিকাব, শিয়াল। কিনা, চিরা, লিখা।

কলিকাতার আদর্শ ভাষায় ধোয়া, বোনা, মোছা, শোনা। বাংলার অপর বহু অঞ্চলে ধুয়া, বুনা, মুছা, শুনা।

আদর্শ ভাষায় কুচো, খুড়ো, পুজো, বুড়ো,। অপর বহু আঞ্চলিক ভাষায় কুচা, খুড়া, পুজা, বুড়া।

কলিকাতার ভাষায় গিলে, পিসে, বিছে, মিছে। অপর বহু আঞ্চলিক ভাষায় গিলা, পিসা, বিছা, মিছা।

আদর্শ ভাষার আগু ওকার কোথাও (মে. বাঁ) কোন কোন শব্দে লোপ পায়। যেমন, গোলা—গলা, ঝোড়া—ঝড়া, নোড়া—নড়া, পোড়া—পড়া, মোটা—মটা। আবার কোথাও (পূব. শ্রী. ত্রি) ওকার উকারে রূপান্তরিত হয়। যেমন, গুলা, ঝুড়া, নুড়া, পুড়া, মুটা।

সাধুভাষার কলিকা, কুনিকা, খড়িকা, ধনিয়া সরিষা, আদর্শ ভাষায় কলকে, কুনকে, খড়কে, ধনে, সরষে ; পূর্ববঙ্গে কইল্‌কা, কুইন্‌কা, খইড়্‌কা, ধইন্যা / ধইনা, সষ্যা / সইর্‌ষা।

সাধুভাষায় কাঁড়িয়া, কুঁচিয়া, দেখিয়া, ধরিয়া, মারিয়া ; আদর্শ ভাষায় কেঁড়ে, কুঁচে, দেখে, ধরে, মেরে ; পূর্ববঙ্গের ভাষায় কাইড়্যা / কাইড়া, কুইচ্যা / কুইচা, দেইখ্যা / দেইখা, ধইর্যা / ধইরা, মাইর্যা / মাইরা।

পূর্ববঙ্গের উচ্চারণে অপিনিহিতির প্রভাব অত্যন্ত বেশি। 'ই' পূর্বোক্ত শব্দগুলিতে স্পষ্ট করিয়া লেখা হইয়াছে বটে, কিন্তু উচ্চারণে 'ই' ধ্বনির একটা রেশ মাত্র থাকে. মেদিনীপুরে হাল্যা, হেল্যা, মায়্যা, তেরাপেথ্যা প্রভৃতির উচ্চারণেও অপিনিহিতির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

কটুয়া, কাঠুয়া, পাটুয়া, বটুয়া প্রভৃতি শব্দ পূর্ববঙ্গের উচ্চারণে কট্যায়া/ কউটা, কাঠ্যায়া / কাউঠা, পাট্যায়া, বটুায়া শুনা যায়।

এখানে বিভিন্ন অঞ্চলের আরও কতগুলি উচ্চারণ বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে :

পূর্ববঙ্গ, শ্রীহট্ট এবং কুমিল্লার বহু অঞ্চলে সাধারণ লোকের (বিশেষ করিয়া অশিক্ষিত ও স্ত্রীলোকের) মুখে অনুনাসিক চন্দ্রবিন্দুর উচ্চারণ শুনা যায় না। যেমন, হাস (হাঁস), বাশ (বাঁশ), ফাসি (ফাঁসি), চান্দ (চাঁদ), ফান্দ (ফাঁদ)। আবার রাঢ়ের কোনো কোনো অঞ্চলে চন্দ্রবিন্দুর দিকে বিশেষ ঝোঁক দেখা যায়। যেমন, খোঁকা, চাঁ, বিঁড়া, সাঁপ, হাঁসি। কোথাও কোথাও অনুনাসিক আকার আঁ আঁ্যা রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন, ক্যাঁথা, বাঁকা, ক্যাঁকড়া। চট্টগ্রামে আঁই (আমি,) আঁর (আমার) ঢেঁই (ঢেঁকি) শুনা যায়।

বাংলার কোন কোন অঞ্চলে (পূব. শ্রী. ত্রি. চট্ট. নো) পদান্ত্য বা পদমধ্যস্থিত 'ট' ও 'ঠ' 'ড' রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন, বাডা (বাটা), বেডা (বেটা), মিডা (মিঠা), খাডাল (খাটাল), কডা (কটা), ফাডা (ফাটা)। ঐ সকল স্থানে 'ড়'-এর স্থানেও প্রায়ই 'র' শুনা যায়। যেমন, কাপর (কাপড়), পরা (পড়া), গারি (গাড়ি)। কেহ কেহ আবার শুদ্ধ করিয়া লিখিতে যাইয়া 'কাপড় পর' স্থলে 'কাপর পড়' লেখেন।

বাংলার বহু অঞ্চলে সাধারণের মুখে 'ন' স্থানে 'ল' এবং 'ল' স্থানে 'ন' উচ্চারিত হয়। ন স্থানে ল : লদী (নদী), লব্বই (নব্বই), লৌকো (নৌকো), লইতন (নূতন), লাল (নাল)। ল স্থানে ন : নক্ষী (লক্ষ্মী), নাজ (লাজ) নোভ (লোভ), নেবু (লেবু), নিচু (লিচু), নাঙল (লাঙল), নেপা (লেপা)।

এ-কারের সাধারণ উচ্চারণ ছাড়াও বাংলার বহু স্থানে উহার বক্র উচ্চারণ শুনা যায় : ত্যাল (তেল), ব্যাল (বেল), দ্যাশ (দেশ), ক্যামন (কেমন), দ্যায় (দেয়), প্যাঁজ (পেঁয়াজ), হ্যামবাবু (হেমবাবু)।

রাজসাহী ও পাবনা অঞ্চলে সাধারণ লোকের মুখে কুড়্যাল (কুড়াল), কোলগ্যা (কলকে), চুম্যা (চুমা), বাগিচ্যা (বাগিচা), ভাতিজ্যা (ভাতিজা), সরিষ্যা (সরিষা) শুনা যায়। উচ্চারণ অনুযায়ী ইহাদের ঠিক ঠিক বানান লিখিয়া প্রকাশ করা যায় না। এখানে কিছুটামাত্র আভাস দেওয়া হইল।

বাংলায় কোন কোন অঞ্চলে শব্দের আদ্য 'র' লোপ পায় এবং তৎযুক্ত স্বরের উচ্চারণ বজায় থাকে। যেমন, রামচন্দ্র—আমচন্দ্র, রাত্তির—আত্তির,

রান্নাঘর—আন্নাঘর, রূপরায়—উপরায়। আবার অনেক ক্ষেত্রে শব্দের আদিস্থিত স্বরবর্ণে 'র'-এর আগম হয়। যেমন, আম—রাম, উপেন্দ্র—রুপেন্দ্র, উই—রুই।

আদর্শ ভাষায় শ, ষ, স তিনেরই উচ্চারণ শ-এর অনুরূপ। কিন্তু পূর্ববঙ্গে অনেক শব্দের আদ্য শ বা স 'হ' রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন, হালা (শালা), হগুন (শকুন), হতীন (সতীন), হত্ত (সত্য), হাদ (স্বাদ), হামুক (শামুক), হাউরী (শাশুড়ী), হামাল (সামাল), হে (সে)। কিন্তু হভা (সভা,) হত (শত), হুভঙ্কর (শুভঙ্কর), হহী (শশী) বড় শুনা যায় না; এইসব শব্দে শ-ধ্বনি অবিকৃত থাকে।

অনেক শব্দে হ-এর উচ্চারণ 'হ' ও 'অ'-এর মাঝামাঝি। যেমন, 'হইল', 'হয়', 'হাঙ্গামা' ইত্যাদি শব্দের হ-এর উচ্চারণ হ বা অ কোন বর্ণ দ্বারাই ঠিক ঠিক প্রকাশ করা যায় না। পূর্ববঙ্গের উচ্চারণ বুঝাইতে অনেকে অ বা 'অ ব্যবহার করেন।

বর্গের চতুর্থ বর্ণও বাংলার কোন কোন উপভাষায় মহাপ্রাণতা ত্যাগ করিয়া কতকটা তৃতীয় বর্ণের ধ্বনিতে পরিণত হয়। প্রাদেশিক উচ্চারণ বুঝাইতে অনেকে ধান, ধামা, ভাত, ঘর শব্দগুলি যথাক্রমে দ'ান, দ'ামা, ব'াত্, গ'র লেখেন বটে, কিন্তু তাহাতে যথার্থ উচ্চারণ প্রকাশ পায় না। বস্তুত এইসব শব্দের আঞ্চলিক উচ্চারণ অনুযায়ী বানান লিখিবার পক্ষে প্রচলিত বাংলা বর্ণমালা যথেষ্ট নহে।

বাংলার বহু অঞ্চলে কর্ম ও সম্প্রদানের একবচনে 'কে' স্থানে 'রে' বিভক্তি হয়। যেমন, আমারে, তোমারে, তাহারে, ভিখারীরে।

সম্বন্ধে বহুবচনে 'গা', 'গর'। যেমন, আমারগা বাড়ি, আমাগর গাই।

অধিকরণে 'ৎ' বা 'ত্' (উত্তরবঙ্গে ও পূর্ববঙ্গে সমধিক) বিভক্তি হয়। যেমন, মাটিত্ (মাটিতে), বাড়িত্ (বাড়িতে), বিছানাত্ (বিছানাতে), নদীত্ (নদীতে)।

বাংলায় 'য'-এর মূল উচ্চারণ না থাকিলেও অনেক য-ফলা যুক্ত অন্ত্য বর্ণের পূর্বে 'ই' ধ্বনির আভাস পাওয়া যায়। কাইর্জ্জ (কার্য্য), সইত্ত (সত্য), আচাইর্জ্জ (আচার্য্য), অপরিহাইর্জ্জ (অপরিহার্য্য)। অন্তঃস্থ 'ব'-এর মূল উচ্চারণও কোন শব্দে ধরা পড়ে। যেমন 'স্বামী' শব্দটি স্ত্রীলোকের মুখে প্রায়ই 'সোয়ামী' শুনা যায়; এইরূপ 'সোয়াদ' (স্বাদ)।

ধ্বনিতত্ত্ব বা উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য লইয়া আমরা আর অধিক দূর অগ্রসর হইব না। প্রত্যেক অঞ্চলের উপভাষাতেই উচ্চারণে এবং বাগ্‌ধারায় (idiom) এত সব বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য আছে যে, তাহার সবগুলি কোনও দিন লিখিত আদর্শ ভাষায় গৃহীত হইবে না বা হইতে পারে না। ডক্টর বিজনবিহারী ভট্টাচার্য মহাশয় সত্যই বলিয়াছেন, "উচ্চারণ অনুসারে বানান পদ্ধতি স্থির করিতে গেলে তাহা বাঙ্গালা ভাষায় একটা প্রলয় আনয়ন করিবে।" (বাগর্থ)।

শব্দের প্রচলন স্থান

শব্দের প্রচলন স্থানের উল্লেখ অনেকের কাছেই বিভ্রান্তিকর মনে হইতে পারে। এজন্য কয়েকটি কথা গোড়াতেই স্পষ্ট করিয়া বলা আবশ্যক মনে করি। যে শব্দটি নদীয়ার বলিয়া নির্দিষ্ট করা হইয়াছে, তাহা যে ঐ জেলার সর্বত্রই সকলের মুখে শুনা যায় এবং তৎসংলগ্ন চব্বিশপরগনা, যশোহর, ফরিদপুর, পাবনা বা অন্য কোথাও উহার প্রচলন নাই বা একই অর্থে আর কোনও শব্দ ঐসব অঞ্চলে ব্যবহৃত হয় না, এইরূপ মনে করা হইলে ভুল করা হইবে। বাংলার কোনও অঞ্চল দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত নহে, সর্বদাই এক অঞ্চলের লোকের সহিত অপর অঞ্চলের লোকের নানাসূত্রে যোগাযোগ ঘটিতেছে। ফলে এক অঞ্চলের ভাষার প্রভাব, উহার শব্দ, বাগ্‌ধারা ইত্যাদি অপর অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়িতেছে। তদুপরি উচ্চারণে এবং শব্দের ব্যবহারে একই জেলার মধ্যেও বিভিন্নতার অন্ত নাই। এই বিভিন্নতার মুখে অঞ্চল বা জেলাসঙ্কেত দ্বারা মাত্র এই আভাসই দেওয়া হইয়াছে যে, সংশ্লিষ্ট শব্দটি কোন্ অঞ্চলের লোকের মুখের ভাষা হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছে। তুল্যার্থক আরও শব্দ সেই অঞ্চলে প্রচলিত থাকিতে পারে এবং নির্দিষ্ট শব্দটির ব্যবহার সেই অঞ্চলের সকলে নাও জানিতে পারে। আবার এই শব্দটির সন্ধান দূরবর্তী কোনও বিচ্ছিন্ন গ্রামেও পাওয়া যাইতে পারে। একটি লোকাচার যেখানে ঢাকার উচ্চকোটি সমাজের বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, হয়ত আর একজনের অনুসন্ধানে তাহা বীরভূমের অন্ত্যজদের মধ্যেও ধরা পড়িতে পারে। এইরূপে এক একটি শব্দের, শব্দ-নির্দিষ্ট বিষয়-বস্তুর ব্যাপ্তি বুঝা যাইবে এবং তাহাতে হয়ত জাতির অনেক লুপ্ত ইতিহাস উদ্ধার করা সম্ভব হইবে।

লৌকিক শব্দকোষে বাঙালীর দৈনন্দিন ও সাংস্কৃতিক জীবনের রঙ্গভূমি হইতে শব্দাদি সংগ্রহ করিয়া বিভিন্ন অঞ্চলের একার্থক শব্দগুলি, আবার একই

শব্দের বিভিন্ন অর্থগুলি পাশাপাশি রাখা হইয়াছে। ফলে এক অঞ্চলের যাবতীয় শব্দের তথা শব্দনির্দিষ্ট বিষয়বস্তুর সঙ্গে অপর অঞ্চলের বাঙালীর সহজেই পরিচয় ঘটিবে; শুধু তাহাই নহে, সমগ্র বাংলাদেশ, সমগ্র বাঙালীজাতিও তাহার নখদর্পণে প্রতিভাত হইবে বলিয়াই মনে করি। মনে হয়, ঢাকা, কলিকাতা, বীরভূম, শ্রীহট্ট, নদীয়া, চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, জলপাইগুড়ি সকলে নিজেদের দূরত্ব ও বিচ্ছিন্নতা ভুলিয়া গিয়া একই মজলিসে বসিয়া নিজেদের ঘরের কথা, প্রাণের কথা শুনিবার সুযোগ পাইবে।

শব্দ বৈচিত্র্য

বাংলা ভাষার শব্দ-ভাণ্ডারে শুধু ভারতীয় আর্যগণের সংস্কৃত শব্দেরই প্রাচুর্য নহে, যুগে যুগে অপর বহু জাতির বহু ভাষার শব্দ আসিয়া ইহাতে সঞ্চিত হইয়া ইহাকে এক বিশাল শব্দ-রত্নাকরে পরিণত করিয়াছে। ইহাতে যে কত মণিমুক্তা, আমাদের ব্যবহারিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের কত তথ্য ও তত্ত্ব, কত কথাকাহিনী, কত ঐতিহাসিক উপাদান আত্মগোপন করিয়া আছে, তাহা সম্পূর্ণ উদ্ধার করা কাহারও একক চেষ্টায় সম্ভবপর নহে। সংস্কৃত এবং অপর বহু ভাষার বহু শব্দ অর্থ, বানান এবং উচ্চারণের দিক দিয়া প্রায় অবিকৃত থাকিয়া সরাসরি বাংলা ভাষায় আসিয়াছে। আবার বহু শব্দ ক্রমবিবর্তনের ভিতর দিয়া পরিবর্তিত আকারে আমাদের ভাণ্ডারে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। সংস্কৃত এবং বিদেশী ভাষা হইতে আগত অনেক শব্দেরই মূল আমরা ধরিতে পারি; কিন্তু আর্যদের আগমনের পূর্বে এই দেশে যাহারা বস বাস করিত, তাহাদের ভাষা হইতে যে সকল শব্দ বাংলায় গৃহীত হইয়াছে এবং বৈয়াকরণেরা যেগুলিকে 'দেশী শব্দ' বলিয়া অভিহিত করেন, তাহাদের অনেকগুলিরই বংশ পরিচয় আমাদের জানা নাই। জ্ঞাতমূল এবং অজ্ঞাত মূল,—এই উভয় শ্রেণীর শব্দ দ্বারাই বাংলা ভাষার কান্তিপুষ্টি এবং উহার শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে এবং হইতেছে।

যে পাথেয় লইয়া ভারতীয় আর্যগণ এতদঞ্চলে আসিয়াছিলেন, একমাত্র তাহাই তাঁহারা সম্বল করিয়া বসিয়া থাকেন নাই। আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে, নূতন নূতন পরিস্থিতিতে অনেক গ্রহণ-বর্জন তাঁহাদিগকে করিতে হইয়াছে। বাংলার মাটিতে আর্য অনার্য দ্রাবিড় চীন শক হূণ পাঠান মোগল ইংরেজ কত জাতি যুগে যুগে আসিয়া স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে ঘর

বাঁধিয়াছে, তাহাদের সহিত আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছে। জাতিকে জাতি লোপ পাইয়াছে, কিন্তু তাহাদের সংস্কৃতির ছাপ, ভাষার ছাপ বাঙালীর জীবনের সর্বস্তরে, তাহার সংসারে, সমাজে, ধর্মে, কর্মে, ভাষায় ও সাহিত্যে রহিয়া গিয়াছে। বাঙালী জাতি পৃথিবীর অপর বহু জাতির ন্যায়ই একটি মিশ্র জাতি; বাংলা ভাষাও তাহাই,—সেই মিশ্র জাতির একটি মিশ্র ভাষা।

আমাদের সাহিত্যে বাংলা ভাষার শব্দ-ভাণ্ডারের সকল ঐশ্বর্য, সকল সম্পদ এখনও ধরা পড়ে নাই। সেগুলির অধিকাংশই মুখের ভাষায় প্রচলিত থাকিয়া আপনার অটুট জীবনীশক্তির পরিচয় দিতেছে। এক একটি শব্দের কত রূপ, কত অর্থ, কত প্রতিশব্দ জেলায় জেলায়, মহকুমায় মহকুমায়, গ্রামে গ্রামে ছড়াইয়া আছে। শব্দের উচ্চারণে এবং ব্যবহারে অঞ্চলে অঞ্চলে পার্থক্য আছে, আবার একই অঞ্চলে একই পরিবেশের মধ্যেও এই পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। মুর্শিদাবাদের জঙ্গীপুরে ব্যবহৃত অনেক শব্দ, শব্দার্থ কান্দি অঞ্চলে অপরিচিত; তমলুকের 'কাঁথা' হিজলীতে 'গাঁথা'; ময়মনসিংহের 'চাউল' টাঙ্গাইলে 'চাইল'; ঢাকার 'চিকা' কলিকাতায় 'ছুঁচো'; আবার চব্বিশপরগনায় 'চিতি' এক জাতের সাপ, জলপাইগুড়িতে প্রজাপতি। একই গ্রামে শিক্ষিতেরা বলে, 'শোব', 'নব্বুই', অশিক্ষিতেরা বলে 'শুবো', 'নব্বই'। আমাদেরই এক আত্মীয়ের বাড়িতে একই তরকারিফলকে গিন্নী বলেন 'মিঠালাউ', বড় বউ বলে 'বৈতাল', ছোট বউ বলে 'ডিংলা', ঝি বলে 'কুমড়া'।

বাংলা ভাষার এই যে শব্দ-বৈচিত্র্য, একই শব্দের নানা অর্থ, আবার একই অর্থে একই শব্দের নানা প্রতিরূপের, নানা শব্দের ব্যবহার, ইহার মূলে অনেক কারণ থাকিতে পারে; তন্মধ্যে একই ভাষাভাষী অঞ্চলে বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর সহাবস্থান ও সংমিশ্রণ কারণটিকেই অনেকে প্রাধান্য দেন। আদিতে একই গোষ্ঠীর লোক যে একই বস্তুকে কখনো এই নামে, কখনো ওই নামে, কখনো বা আর এক নামে অভিহিত করিত, তাহা মনে হয় না। কোনও মানবগোষ্ঠী দ্বারা নিজেদের জ্ঞানবিশ্বাস ও চিন্তাধারা অনুযায়ী একটি বস্তুকে বিশেষ একটি নামে চিহ্নিত করাই স্বাভাবিক। কিন্তু উন্নতিশীল মানবগোষ্ঠীর কেহই তো চিরকাল একই অঞ্চলে স্বাতন্ত্র্যের পাঁচিল তুলিয়া বসিয়া থাকে নাই; তাহাদের পরিক্রমণ ও সম্প্রসারণ ঘটিয়াছে; এক গোষ্ঠীর মানুষ অপর গোষ্ঠীর মধ্যে ঘর বাঁধিয়াছে; একের সহিত অপরের নানা সম্পর্ক,—বৈবাহিক সম্পর্ক,

সামাজিক সম্পর্ক, ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছে। পরস্পরের মধ্যে ভাব আদান-প্রদানের একটা সাধারণ ভাষাও গড়িয়া উঠিয়াছে ; সেই ভাষায় বিভিন্ন ভাষাভাষী গোষ্ঠীর ব্যবহৃত শব্দ, বাগধারা অবশ্যই অল্পবিস্তর স্থান পাইয়াছে। এইরূপে এক একটি বস্তুর এক গোষ্ঠীর দেওয়া এক নামের সঙ্গে বহু গোষ্ঠীর বহু নাম যুক্ত হইয়াছে। শুধু বাংলাভাষী অঞ্চলেই নহে, সর্বত্র সকল দেশেই, যেখানেই বিভিন্ন জাতের মানবগোষ্ঠীর মেলামেশা হইয়াছে বা সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে, সেখানেই এইরূপ শব্দ-বৈচিত্র্য দেখা দিয়াছে, একই অর্থে এক শব্দের পরিবর্তে বহু শব্দ ব্যবহৃত হইতেছে। উপরে একই পরিবারে একটি তরকারিফলের চারটি নাম ব্যবহার সম্পর্কে যে উদাহরণটি দেওয়া হইয়াছে, তাহার মূলেও আছে এই একই কারণ। 'মিঠালাউ' বলিতে অভ্যস্ত পরিবারে আসিয়াছে 'বৈতাল' ব্যবহারকারী অঞ্চলের এক বধূ ; আবার এই পরিবারেরই আর এক বধূর পিত্রালয় সেই অঞ্চলে, যে অঞ্চলে উক্ত ফলটি 'ডিংলা' নামে পরিচিত ; ইহাদেরই সংসারে কাজ করে যে ঝি, সে 'বৈতাল' বা 'ডিংলা'কে আশৈশব 'মিষ্টি কুমড়া' বা 'কুমড়া' বলিয়াই জানে। এইরূপে বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর লোকেদের সহাবস্থানের ফলে একই বস্তু বহু নামের 'নামাবলী' পরিয়া একই বাংলাভাষীর ঘরে নির্বিবাদে কাজ করিয়া যাইতেছে।

আমাদের অতি পরিচিত 'ঝাঁটার' কত প্রতিশব্দ, কত তাহাদের উচ্চারণ-ভেদ : ঝাঁটা / ঝেঁটা / ঝ্যাঁটা, খাংরা / খেংরা / খ্যাংরা, খররা, খরকা / হরকা, বাড়ুন / বাড়োন, আইটা, পিছা, শলাপিছা, শলা, বাদিনি, সামটা, কোস্তা, ঘরবরা, হাচুন / সাচুন, হুরইন / ফুরইন ইত্যাদি।

চাল মাপিবার বাঁশের বা বেতের ছোট একটি পাত্র বাঙালীর ঘরে কত বিচিত্র নামেই না অভিহিত হয় ! কাঠা, কুনকে, কুনি, কোঁচা, কোনা, খুবি, টালা, ঠিকে, দন, দোন, পাই, পালি, পুরা, পোয়া, বেতি, রেক, সের ইত্যাদি।

এইরূপ শব্দ-বৈচিত্র্য শুধু বাংলা ভাষায়ই নহে। তামিল ভাষায় বায়ুর ৩৪টি, জলের ৫০টি, মেঘের ৩৫টি, পৃথিবীর ৬২টি এবং পর্বতের ৬০টি একার্থক (synonyms) শব্দ পাওয়া যায়।[1] অন্যান্য ভাষার কথা থাক্।

বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর সহাবস্থান এবং সংমিশ্রণ ছাড়া একই বস্তুর বিভিন্ন নাম

1. The History of the Bengali Language, B. C. Mazumdar.

করণের আরও নানা কারণ আছে। মুখের ভাষার অধিকাংশ শব্দই শব্দ-নির্দিষ্ট বস্তুটির কিছুটা পরিচয় বহন করে। বহু শব্দ দ্বারা একই বস্তুকে চিহ্নিত করিলেও এক একটি শব্দ বস্তুটিকে ভিন্ন ভিন্ন গুণ বা আকার সম্পন্ন করিয়া আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করে। কোনও শব্দের ভিতর দিয়া বস্তুটির আকৃতির, কোনও শব্দ দ্বারা উহার প্রকৃতির, কোনওটি দ্বারা বা উহার অন্য কোন বৈশিষ্ট্যের আভাস পাওয়া যায়। বিভিন্ন মানবগোষ্ঠী বিভিন্ন পরিবেশের মধ্যে নিজেদের বিদ্যাবুদ্ধি ও সংস্কারাদি অনুসারে কোনও বস্তু বা বিষয়কে বিশেষ বিশেষ নামে চিহ্নিত করে। একটি বস্তুর অনেক দিক। সামান্য একটি শব্দ দ্বারা উহার সকল দিক প্রকাশ করা সম্ভবপর নহে। এজন্য প্রায়ই বস্তুটির দুই একটি বৈশিষ্ট্য-মাত্র এক একটি শব্দের উপাদানরূপে গৃহীত হয়। সকল মানুষের ধ্যান-ধারণা এবং গ্রহণ-বর্জনের ক্ষমতা একরূপ নহে। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন স্তরের লোকের কাছে স্থান-কাল-ভেদে ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য ধরা পড়াই স্বাভাবিক। ফলে একই বস্তু, একই প্রাণী বা একই বিষয় নানা নাম-রূপ গ্রহণ করে। গায়ে ভীষণ উগ্র গন্ধ বলিয়া মূষিকের আকৃতি এক শ্রেণীর প্রাণীকে সংস্কৃতে গন্ধমূষিক বলা হয়। উহারই প্রাদেশিক এক নাম 'চিকা' (সংস্কৃতে 'চিক্ক' শব্দটিও পাওয়া যায়)। হয়ত প্রাণীটির 'চিক্ চিক্' শব্দ হইতেই কোন কোন অঞ্চলে উহার 'চিকা' নাম দেওয়া হইয়াছে। চিকা শুধু চিক্ চিক্ শব্দই করে না,—এটা ওটায়, বিশেষ করিয়া খাদ্যদ্রব্যে মুখ দেওয়া উহার একটি বিশ্রী স্বভাব। এই স্বভাবের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া বাংলার অপর কোন কোন অঞ্চলের মানুষ উহাকে 'ছুঁচো' নামে অভিহিত করিয়াছে। একটি জালের কথা বলি। যেমন, 'খেপলা জাল'। এই জালের কতকাংশ কনুই-এর উপর তুলিয়া বাকি অংশ মুঠ করিয়া ধরিয়া, শরীর একটু ঝাঁকিয়া মাছের ঝাঁকের উপর ঘুরাইয়া উড়াইয়া জোরে নিক্ষেপ করিতে হয়। একটি জালের এতগুলি দিক কখনও কোন একটি শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা সম্ভবপর নয়। তাই কোন কোন অঞ্চলের মানুষ উহার ক্ষেপণের দিকটার উপর বেশি জোর দিয়া উহার নাম রাখিয়াছে 'খেপলা জাল', 'খ্যাপলা জাল', 'খ্যাওলা জাল', 'খেয়া জাল'। বাংলায় 'ফিকা জাল' কথাটিও শুনা যায়। শরীর একটু ঝাঁকিয়া ফেলিতে হয় বলিয়া ইহার আর এক নাম 'ঝাঁকি জাল'। কনুই-এর উপর তুলিয়া লইতে হয় বলিয়া ইহাকে 'কনুই জাল'ও বলা হয়। মুঠ করিয়া ফেলিতে হয় বলিয়া কোথাও আবার ইহা 'মুঠ জাল' নামে পরিচিত। ঘুরাইয়া উড়াইয়া দূরে

নিক্ষেপ করিতে হয় বলিয়া ইহার 'ঘুরনি জাল', 'উড়া জাল' নামও শুনা যায়। এক একটি বৈশিষ্ট্য প্রকাশক সব শব্দ একত্র করিয়া তবেই আমরা বস্তুটিকে সুন্দররূপে, অনেকটা পরিপূর্ণরূপে জানিতে পারি।

শব্দ-নির্দিষ্ট কোন কোন বস্তুর স্থানীয় বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও এখানে কিছু বলা আবশ্যক মনে করি। বহু অঞ্চলে একটি শিল্পবস্তুর একই নাম ব্যবহৃত হইলেও উহার শিল্প-রীতিতে প্রত্যেক অঞ্চলেরই কিছুটা স্থানীয় বৈশিষ্ট্য থাকে। এক 'কলসী' নামে অভিহিত হইলেও গাঙ্গেয় অঞ্চলের কলসীর গড়ন, আর পূর্ববঙ্গের কলসীর গড়ন এক নহে। তমলুক এবং কাঁথির কলসীর মধ্যেও পার্থক্য লক্ষিত হয়। দক্ষিণ চব্বিশপরগনার 'ঝাঁকা'র সহিত নদীয়ার ঝাঁকার মিল নাই। ধামা, থাদি, আঁগৈল, ঢাকি একই পর্যায়ভুক্ত হইলেও উহাদের গড়নে বিভিন্নতা আছে। বীরভুমের লাঙ্গল-জোয়ালের গড়ন, আর ময়মনসিংহের গড়ন একরূপ নহে; ঘরবাড়ি সম্বন্ধেও ঐ একই কথা খাটে।

এই সকল পার্থক্যের মূলে যে কারণটি প্রধান বলিয়া মনে হয়, তাহা হইতেছে একই ভাষাভাষীর মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন শিল্পী গোষ্ঠীর বিদ্যমানতা এবং এক একটি শিল্প-শৈলীর প্রতি এক এক গোষ্ঠীর পুরুষানুক্রমে আনুগত্য ও রক্ষণশীল মনোভাব। লৌকিক শব্দকোষে শব্দোদ্দিষ্ট বস্তুগুলির এইরূপ আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যথাসম্ভব উল্লেখ করা হইয়াছে। ফটো এবং নক্সা দিতে পারিলে কাজ অনেকটা সহজ হইত; তবু আক্ষরিক বর্ণনার ভিতর দিয়া যতদূর সম্ভব এক অঞ্চলের মানুষের কাছে অপর অঞ্চলের মানুষের এক একটি বস্তুর যথার্থ রূপ তুলিয়া ধরিতে চেষ্টা করা হইয়াছে।

শুধু একার্থক শব্দেরই প্রাচুর্য নহে, বাংলা ভাষায় বিভিন্নার্থক শব্দেরও অবধি নাই। অনেক শব্দের বাহ্যিক রূপ এবং উচ্চারণ এক, কিন্তু অর্থ একাধিক। এই অর্থ-পার্থক্যের প্রধান কারণ স্থানের দূরত্ব বা পরিবেশের অনৈক্য হইতে পারে। আবার একই অঞ্চলে একই পরিবেশের মধ্যেও বিভিন্ন অর্থদ্যোতক এক শব্দের অস্তিত্ব দেখা যায়। বর্তমান গ্রন্থ হইতে এখানে এইরূপ বিভিন্নার্থক শব্দের কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে:

'তাওয়া' বলিতে ময়মনসিংহে বুঝায়, পিতলের এক ধরনের হাঁড়ি; বরিশালে বুঝায়, আগুনের বিশেষ ধরনের মাটির পাত্র; হুগলী, বর্ধমান, মেদিনীপুর ও পাবনায় বুঝায়, রুটি সেঁকিবার লোহার অগভীর পাত্র। 'চাকি' কলিকাতা অঞ্চলে লুচি বেলিবার গোল পিঁড়ি, পূর্ববঙ্গের বহু অঞ্চলে উহা গম, কলাই

ইত্যাদি পেষিবার জাঁতা, ময়মনসিংহে পদ্মের ফল এবং উত্তরবঙ্গে গোল কর্ণাভরণ। অবশ্য, চাকি-উদ্দিষ্ট এই চারটি বস্তুর মধ্যেই গোলত্বের একটা সাদৃশ্য আছে। 'চটি' বাংলায় বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয় : ঢাকা এবং ময়মনসিংহ অঞ্চলে 'চটি' ছোট বাখারি, রাঢ় অঞ্চলে তালপাতার আসন এবং বাংলার প্রায় সর্বত্র পাতলা বই, সরাই এবং জুতা বিশেষ। আবার এমন অনেক শব্দ আছে, যেগুলি কোনও বিশেষ অর্থে বাংলার সবত্র প্রচলিত থাকিলেও, অঞ্চলে অঞ্চলে উহারা আরও নানা অর্থে, সম্পূর্ণ নূতন অর্থে ব্যবহৃত হয়। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে :

'কাতলা' নামীয় মাছের সঙ্গে বাঙালীমাত্রই পরিচিত। কিন্তু বাংলার উপ-ভাষা এবং বিভাষাগুলিতে শব্দটি আরও নানা অর্থে ব্যবহৃত হয়। 'কাতলা' যশোহর ও পাবনায় হাড়িকাঠ; আবার পাবনারই কোন কোন অঞ্চলে উহা ঠাস বোনা কাপড়ের পাজামা বিশেষ। কোথাও বড় দাকে কাতলা বলা হয়। বরিশালে ঢেঁকির খাঁজ কাটা খুঁটি, যাহার উপর আঁকশলি বসে, তাহারও নাম কাতলা; গাঙ্গেয় অঞ্চলে ইহা পুয়া / পোয়া নামে পরিচিত।

ভাষাচার্যগণ বলেন, বিভিন্ন অর্থবোধক বিভিন্ন শব্দ ধ্বনি পরিবর্তনের ফলে এবং অন্য কারণে একই রূপ ধারণ করে। ('ভাষার ইতিবৃত্ত')।

অন্য কারণের মধ্যে পূর্বোক্ত বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর একত্র বসবাস এবং সংমিশ্রণ কারণটিও থাকিতে পারে।

এক অঞ্চলের মানুষ যে নামটি দ্বারা একটি বস্তুকে চিহ্নিত করে, অপর অঞ্চলের মানুষ সেই নামটি দ্বারাই অপর বস্তুকেও চিহ্নিত করিতে পারে। এইরূপ দুই অঞ্চলের মানুষ যখন একত্র হয় তখন একটি নামেই দুইটি বস্তু পরিচিত হইয়া পড়ে। পূর্ববঙ্গের বহু অঞ্চলের 'বিছা' প্রাণীটি হইতেছে কলিকাতা অঞ্চলের 'শুঁয়াপোকা'। কলিকাতা অঞ্চলেও 'বিছা' শব্দটি প্রচলিত আছে; কিন্তু তদ্দ্বারা তিন জাতের একটি স্বতন্ত্র প্রাণীকে বুঝায়,—উহারা হইতেছে কাঁকড়া বিছা (বিচ্ছু), তেঁতুলে বিছা ও সরস্বতী বিছা। পূর্ববঙ্গে এই তিন জাতের বিছাই চেলা বা সাপচেলা নামে অভিহিত হয়। দেশবিভাগের পর উদ্বাস্তু পূর্ববঙ্গবাসীর সহিত গাঙ্গেয় অঞ্চলের অধিবাসীদের ঘনিষ্ঠ মিলন ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে। ফলে একই অঞ্চলে স্বতন্ত্র দুইটি প্রাণীর একই নাম দাঁড়াইয়া গিয়াছে। কিন্তু ইহাতে তেমন সমস্যার সৃষ্টি হয় না, কারণ বাক্যের অন্বয় বা বক্তার মুখের কথা হইতেই আমরা অনেক সময় প্রযুক্ত শব্দটির অর্থ গ্রহণ করিতে পারি। যাহারা বিছাকে

শুঁয়াপোকা বলিয়া জানে, তাহারা বলে, 'বিছা গায়ে লাগে'; আর বিছা যাহাদের কাছে তেঁতুলে বিছা, তাহারা বলে, 'বিছায় কামড়ায়।'

আবার শব্দের অর্থ নির্ণয়ে 'নামে কিবা আসে যায়' কথাটিও স্মরণ রাখা দরকার। আমরা আমাদের সন্তানের যে নাম রাখি, অধিকাংশক্ষেত্রেই দেখা যায়, তাহা নামধারীর আকৃতি-প্রকৃতির বা গুণপনার তেমন কোনও পরিচয় বহন করে না; তাহা নামদাতারই শিক্ষা-সংস্কৃতির, তাহার ধ্যান-ধারণার, তাহার সামাজিক জীবনের আভাস দেয়। বর্তমান গ্রন্থে বিবৃত ব্যক্তিবাচক নামগুলি ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

আক্ষরিক অর্থের লোপ

অনেক শব্দ বা সাঙ্কেতিক বাক্য আক্ষরিক অর্থে বা পরিচিত অর্থে ব্যবহৃত না হইয়া অন্য কোনও বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। ইহার মূলে আছে নানা অন্ধ সংস্কার, ভয়ভীতি, অপ্রিয়তা নিবারণ ইত্যাদি নানা কারণ।

কেহ বসন্তরোগে আক্রান্ত হইলে বলা হয়, 'অমুকের উপর মায়ের দয়া হয়েছে।' আমাদের দেশের মেয়েরা অনেক সময় অমঙ্গলসূচক কোনও কথা সোজাসুজি না বলিয়া অন্য কোন কথা দ্বারা (প্রায়ই বিপরীতার্থক শব্দ দ্বারা) উদ্দিষ্ট বিষয়টি ঘুরাইয়া প্রকাশ করে। ইহার মূলে আছে অন্ধ সংস্কার বা ভয়। বসন্ত একটি ভীষণ রোগ; ইহার নাম লইলে যদি সে আরও ভীষণ হইয়া উঠে, অধিষ্ঠাত্রী দেবী শীতলার কোপ যদি আরও বাড়িয়া যায়, তাই উহাকে 'মায়ের দয়া' বলিয়া উহার ভয়াবহতাকে মনের কোণে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিবার চেষ্টা করা হয়। আবার মায়ের কোপকেও মায়ের দয়া বলিয়া শরণ লইলে সত্যই যদি তাঁহার দয়ার উদ্রেক হয়। একই কারণে শিশুদের গুটিজাতীয় রোগ বিশেষকেও 'মাসীপিসী' নামে অভিহিত করা হয়।

রাত্রিতে বাঘকে বলা হয়, 'পোকা', সাপকে বলে 'লতা', 'কাঠি'। 'কাঠির ঘা' বলিলে বুঝায় সর্পদংশন। রাত্রিতে চোর বলা নিষিদ্ধ, তখন সে 'রাতের কুটুম' হইয়া দাঁড়ায়। রাত্রিতে যখন বলা হয়, 'বাড়িতে কাঙলা পড়েছে', তখন বুঝিতে হইবে, বাড়িতে ডাকাত পড়িয়াছে বা ডাকাতে মানুষ কাটিয়াছে।

বাদায় (সুন্দরবনে) অসুখ অশান্তির কথা প্রকাশ করিতে হইলে বলা হয়, 'বাদাই, ভাল আছি'। সেখানে 'অমুকের ভাল হইয়াছে' বলিলে বুঝিতে হইবে, অমুকের মৃত্যু ঘটিয়াছে বা অমুক ব্যাঘ্র কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে।

ঘরে কোন জিনিস না থাকিলে গৃহিণীরা 'নাই' না বলিয়া বলেন 'বাড়ন্ত'। 'ঘরে চাল বাড়ন্ত' মানে ঘরে চাল নাই। 'নাই' বলিলে যদি কোনদিনই না থাকে! শাঁখা 'খুলিয়া রাখা' কথাটি সধবাদের মুখে যোয়ায় না, তাহারা বলে, 'শিথলে রাখা'। খুলিয়া ফেলা বা খুলিয়া রাখার মধ্যে হয়ত একটা আশঙ্কা মনের কোণে উঁকি দেয়। প্রিয়জনকে বিদায় জানাইতে আমরা বলি, 'এসো' —বলি না, 'যাও'। 'যাও' কথায় আমাদের বুকটা যেন ছ্যাঁৎ করিয়া উঠে। মৃত্যুকে বলি, 'গঙ্গা-প্রাপ্তি', যদিও অনেকক্ষেত্রেই ঘটনার ত্রিসীমানার মধ্যেও গঙ্গা থাকে না।

আরও কতকগুলি শব্দ লইয়া আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, উহাদেরও আক্ষরিক অর্থ এবং উদ্দিষ্ট অর্থ এক নহে :

কুমিল্লা জেলার কোথাও কোথাও **'আধঘরা'** (৩ পৃঃ) কথাটি প্রচলিত আছে। উহার আক্ষরিক অর্থ, অর্ধেক ঘর বা ঘরের অর্ধ ভাগ ; কিন্তু তদঞ্চলে 'আধঘরা' বলিতে বুঝায় বৈঠকখানা। এইরূপ অর্থ পরিবর্তনের কারণ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারা যায়, এক সময়ে সাধারণ গৃহস্থের বাড়িতে বৈঠকখানা বলিয়া কিছু ছিল না। শয়ন-গৃহেরই এক অংশ বেড়া দিয়া পৃথক করিয়া তাহাতে বাহিরের লোকজনদের বসিতে দেওয়া হইত। কালক্রমে এইরূপ বসিবার এবং আলাপ আলোচনা করিবার ঘরের অংশ বিশেষের নাম হইয়া দাঁড়ায় 'আধঘরা', স্থানীয় উচ্চারণে অনেকটা 'আদ্‌গরা।' বর্তমানে একটি পৃথক সম্পূর্ণ ঘর বৈঠকখানারূপে ব্যবহৃত হইলেও তাহার 'আধঘরা' নাম একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই।

চণ্ডীশালের আক্ষরিক অর্থ, চণ্ডীর ঘর অর্থাৎ যে ঘরে চণ্ডীদেবতার পূজা হয় বা চণ্ডীর ঘট স্থাপিত থাকে। কিন্তু মেদিনীপুরের হিজলী অঞ্চলে এই কথাটি রান্নাঘর অর্থে ব্যবহৃত হয়। ইহার পশ্চাতে ইতিহাস আছে। ভাল রান্না করিতে জানা স্ত্রীলোকের অন্যতম প্রধান গুণের মধ্যে গণ্য হয়। আমরা কবিকঙ্কণচণ্ডীতে দেখিতে পাই, বিবাহের পাত্রী হিসাবে ফুল্লরার গুণ সম্পর্কে বলা হইতেছে,

'রন্ধন করিতে ভাল এই কন্যা জানে।
যত বন্ধু আইসে তারা কন্যাকে বাখানে॥'

রান্না যাহাতে ভাল হয়, সকলে খাইয়া প্রশংসা করে তদুদ্দেশ্যে গৃহিণীরা চণ্ডীর শরণ লইতেন, রান্নাঘরে তাঁহার ঘট বসাইয়া গলায় আঁচল জড়াইয়া

প্রার্থনা করিতেন। এখনো এই প্রথা বিরল নহে। এই হইতেই রান্নাঘরের এক নাম হইয়া দাঁড়ায় 'চণ্ডীশাল' (১৫ পৃঃ)।

বাঁকুড়ার কোন কোন অঞ্চলে পূজামণ্ডপকে 'মেলা', তথা চণ্ডীমণ্ডপকে 'দুর্গামেলা' বলা হয়। মেলার আক্ষরিক অর্থ, যেখানে বহুলোক মিলিত হয়। চণ্ডীমণ্ডপে এককালে গ্রামের মজলিস বসিত, পাঠশালা জমিত, সামাজিক অনেক বিষয়ের বিচার নিষ্পত্তি হইত; শুধু তাহাই নহে, গ্রামের যুবকবৃন্দেরাও সেখানে খেলাধুলার আড্ডা জমাইত। এই মেলামেশা হইতেই দেবতার মণ্ডপ 'মেলা' নাম পরিগ্রহ করে।

গোচালা'র (১২ পৃঃ) মূল অর্থ, যে ঘরে গোরু-বাছুর রাখা হয়। কিন্তু সে অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হয় না। পূর্ব-ময়মনসিংহে গোচালা বলিতে বুঝায়, যে ঘরে গোরুর খাইবার খড় নাড়া রাখা হয়। এইরূপ অর্থ পরিবর্তনের কারণ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিলে জানা যায়, পূর্বে গোচর-ভূমির অভাব ছিল না, গো-মহিষাদি সারা বৎসর কাঁচা ঘাস খাইয়াই পুষ্ট হইত, খড়-নাড়া সংগ্রহ করিয়া রাখিবার তেমন প্রয়োজন হইত না; কালক্রমে গোচারণ ভূমি শস্যক্ষেত্রে পরিণত হইতে থাকে এবং মাঠের নেড়া ধানগাছগুলিও (নাড়া) কাটিয়া আনিবার আবশ্যকতা দেখা দেয়। অনেকে এইগুলি আর পৃথক ঘরে না রাখিয়া গোচালার তথা গোশালারই একপাশে মাচার উপর সাজাইয়া রাখিত। এইরূপে গোচালার অর্থ-পরিবর্তন ঘটে এবং বর্তমানে মাত্র খড় নাড়া রাখিবার ঘরকেই গোচালা বলা হয়।

গোবাট, গোপাট (৯৯ পৃঃ) শব্দগুলির বর্তমান অর্থ দাঁড়াইয়াছে—গ্রামের সাধারণ পথ। ঐরূপ নামকরণের ভিতর দিয়া সেকালের মানুষের একটা সঙ্গতির আভাস পাওয়া যায়। তখন গোরু ছিল মানুষের সম্পদ, গোধন; গোপালন ছিল তাহাদের অন্যতম প্রধান উপজীবিকা। প্রতিদিন অসংখ্য গো-মহিষাদির যাতায়াতের ফলে লোকালয় হইতে গোচরভূমি পর্যন্ত যেসকল পথের সৃষ্টি হইত, সেই সকল পথই গোবাট নামে পরিচিত হইত, অনুমান করা যায়। বর্তমানে অনেক গোবাটই লোপ পাইয়াছে; যেগুলি আছে, সেগুলিও মানুষের যাতায়াতের পথে রূপান্তরিত হইয়াছে। কিন্তু অর্থের পরিবর্তন ঘটিলেও নামটি পূর্ববৎ আছে।

এইরূপে দেখা যাইবে অনেক শব্দেরই কালক্রমে অর্থ-পরিবর্তন ঘটিলেও উহাদের বাহ্যিক রূপের কোনও পরিবর্তন ঘটে নাই এবং সেগুলির মধ্যে জাতির

অনেক ঐতিহাসিক উপাদান প্রচ্ছন্ন আছে। উপভাষাগুলিতে এমন সব শব্দ আছে, ঐতিহাসিক উপাদান হিসাবে যেগুলির মূল্য অত্যন্ত বেশী। লৌকিক শব্দকোষে এইরূপ বহু শব্দ পাওয়া যাইবে। 'বাঙালীর ইতিহাস' গ্রন্থে ডঃ নীহাররঞ্জন রায় বলিয়াছেন :

'আমাদের ব্যবহারিক ও সাংস্কৃতিক দৈনন্দিন জীবনের মূল অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় ভাষাভাষী আদি কৌমসমাজের মধ্যে! সেই হেতু আমাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রাচীনতম আভাস এই দুই ভাষার এমন সব শব্দের মধ্যে পাওয়া যাইবে, যেসব শব্দ ও শব্দ-নির্দিষ্ট বস্তু আজও আমাদের মধ্যে কোনো না কোনোরূপে বর্তমান। ....আমাদের আহার-বিহার, বসনভূষণ ইত্যাদি সম্বন্ধে কিছু ইঙ্গিত এই সুদীর্ঘ শব্দেতিহাসের মধ্যে পাওয়া যাইবে। এই হিসাবে এই শব্দগুলিই আমাদের প্রাচীনতম ঐতিহাসিক উপাদান এবং নির্ভরযোগ্য উপাদানও বটে।'

কতকগুলি শব্দে ইতিহাস ও লোকসংস্কৃতির নানাদিক ধরা পড়ে :

আম (১৩০ পৃ) একটি উৎকৃষ্ট ফল। সকলেই খায়; ইহাদ্বারা নানা উপাদেয় খাদ্য-সামগ্রী তৈয়ার করে; আম এবং আমজাত দ্রব্যের ব্যবসা করিয়া আর্থিক সংস্থানও হয়; আমকাঠ জ্বালানিরূপে ব্যবহার করে, আমের তক্তা নানা কাজে লাগে। এইসব কারণে আম, আমগাছ মানুষের কাছে বিশেষ মূল্যবান। কিন্তু এইখানেই শেষ নয়। আমকে বাঙালী মহিলারা পুণ্য অর্জনের সহায়ক বলিয়াও মনে করেন। বারুণী-স্নান তাঁহাদের কাছে 'আম-বারুণী', সেদিন তাঁহারা গঙ্গায় জোড়া কাঁচা আম উৎসর্গ করেন। অরণ্যষষ্ঠী বাংলার কোথাও কোথাও 'আম-ষষ্ঠী'; এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে সন্তানের হাতে ষষ্ঠীর আশীর্বাদ স্বরূপ একটি আম অবশ্যই দিতে হয়। পুণ্যকামী বাঙালীরা দেবতার উদ্দেশে এবং গুরু-পুরোহিতকে আম উৎসর্গ (আম উচ্ছুগ্যে) করে। ঘটের মুখে সে আমসরং (আম্রপল্লব) স্থাপন করিয়া দেবতার উদ্দেশে ভক্তি-কামনা জানায়। বিবাহ-বাসরে, 'কলাতলে' আম পাতার বেষ্টনী রচনা করে। সে আমগাছ, কাঁঠালগাছ রোপণ করে শুধু আম কাঁঠাল খাইবার বা ব্যবসা করিবার জন্যই নহে। সে মনে করে, আম-কাঁঠালের বাগান করিলে তাহার স্নেহের দুলালী ছায়ায় ছায়ায় শ্বশুরবাড়ি যাইতে পারিবে। 'আম-কাঁঠালের বাগান দেব ছায়ায় ছায়ায় যেতে'—তাহার প্রাণের কথা। আম-বাগানের সহিত বাঙালীর ইতিহাসের এক বিষাদমাখা অধ্যায়ও জড়িত রহিয়াছে। পলাশীর 'আম্রকুঞ্জে'র

কথা স্মরণ করিয়া এখনো সে দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে। আবার শান্তিনিকেতনের 'আম্রকুঞ্জ' বিশ্বের কাছে তাহার আর এক রূপ তুলিয়া ধরে।

কলা (১৩৫ পৃঃ) ছেলে বুড়া সকলেরই অতি প্রিয়। বাঙালী কলা খায়, থোড় খায়, মোচা খায়, বাস্‌না দিয়া উনন ধরায়, কলার বাগান করিয়া অর্থ উপার্জন করে। কিন্তু ইহাই যথেষ্ট নয়। কলা এবং কলাগাছকে সে তাহার মনোজগতের কারবার দরবারের মধ্যেও স্থান দিয়াছে। তাহার এমন আচার-অনুষ্ঠান খুব কমই আছে যাহাতে কলা দেওয়া হয় না। কাঁটালি কলা না হইলে লক্ষ্মী পূজা হয় না, আরও অনেক পূজা-ব্রতই অপূর্ণ থাকে। দেশগাঁয়ে একটা কথা আছে, 'সর্বঘটে কাঁটালি কলা'। কলা বারমাসই পাওয়া যায় এবং একটি উৎকৃষ্ট ফলও বটে। তাই হয়ত আচার-অনুষ্ঠানে কলার এত প্রাধান্য। কিন্তু স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, মর্তমান ইত্যাদি আরও ভাল কলা থাকিতে বীচি যুক্ত কাঁটালি কলা কেন ? মনে হয়, সংশ্লিষ্ট ব্রতাদির উদ্ভবের কালে এই জাতের কলাটিই সুলভ ছিল। সাধারণ মানুষের মন রক্ষণশীল, একবার যাহা দেবতার পূজার উপকরণ হিসাবে নির্দিষ্ট হইয়া গিয়াছে,তাহার আর সে পরিবর্তন করিতে চায় না। মর্তমান কলা বিদেশাগত বলিয়াও একটা জনশ্রুতি আছে, গোঁড়া রক্ষণশীল সমাজে পূজাদি অনুষ্ঠানে বিদেশী বস্তু কদাচিৎ ব্যবহৃত হয়। এই কারণেই হয়ত গোলাপ ফুলের রানী হইলেও পূজায় লাগে না।

কলা সম্পর্কে আরও নানা সংস্কার আছে। চাঁপা কলা পূজায় দিতে নাই, উহা নাকি বিশ্বামিত্র ঋষির সৃষ্টি। এই লোকবিশ্বাসের পশ্চাতে মনে হয় এই সত্যটিই নিহিত আছে যে, আদিতে চাঁপা (চিনি চাম্পা) জাতের কলার চাষ বাংলায় ছিল না, পরে বিশ্বামিত্র, কি অপর কাহারো দ্বারা উহা এদেশে প্রবর্তিত হয়। ততদিনে হয়ত অন্য কলা শাস্ত্রীয় পূজাদিতে সুনির্দিষ্ট হইয়া গিয়াছে। বিশ্বামিত্র ঋষির প্রতি যে বশিষ্ঠাদি ঋষির জাতক্রোধ ছিল, তাহা ত সুবিদিত।

কিন্তু কলা বিবিধ মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের উপকরণ হইলেও 'কলা অযাত্রা', 'কলা খাইয়া কোথাও যাইতে নাই,' এইরূপ সংস্কারও অনেকের মধ্যে বদ্ধমূল। একই সমাজে একই বস্তু সম্পর্কে এইরূপ পরস্পর বিরুদ্ধ মতের অস্তিত্ব বিভিন্ন মতাবলম্বী মানবগোষ্ঠীর সংমিশ্রণের ফল বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে।

শুধু কলা নয়, বাঙালীর সামাজিক এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানে কলাগাছও একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছে। **'কলাতল'**, **'কলাতলা'**

কলাতলায় স্নান' (২৪৩ পৃঃ), 'কুঞ্জ' (২৪৪ পৃ) প্রভৃতি শব্দ-নির্দিষ্ট বিষয় লইয়া আলোচনা করিলে মানবগোষ্ঠীর যেন আদিম চিন্তাধারারই আভাস পাওয়া যায়। বাংলার প্রায় সর্বত্রই হিন্দুসমাজে বর-কন্যার বিবাহ-কালীন স্নান চারটি কলাগাছ বেষ্টিত স্থানে অনুষ্ঠিত হয়। ছাঁদনাতলায়ও বহু অঞ্চলে কলাগাছ পুঁতিয়া বর-প্রদক্ষিণ ও সম্প্রদানাদি সম্পন্ন হয়। বিবাহে কলাতলাকে এত প্রাধান্য দেওয়ার মূলে হয়ত ছিল বহু সন্তানলাভের ঐকান্তিক ইচ্ছা ও প্রয়োজন। সেই আদিম যুগে ধনবলের চেয়ে লোকবলই ছিল প্রধান বল। এক মানবগোষ্ঠীর উপর অপর মানবগোষ্ঠীর প্রভুত্ব এই লোকবলের উপরই অধিক নির্ভর করিত। কলার ঝাড় বাড়ির আঙ্গিনায়ই থাকিত; সেই ঝাড়ের দিকে চাহিয়া মানুষের হয়ত মনে হইত, কি দ্রুত ইহাদের বংশ বৃদ্ধি হয়! এক একটি গাছ ঘেরিয়া দেখিতে দেখিতে কত চারা বাড়িয়া উঠে! প্রকৃতিরাজ্যের এই দৃষ্টান্ত হইতে আদিম মানুষের মনে এই ধারণা হওয়া বিচিত্র নয় যে, কলাতলে বর-কন্যার মিলন ঘটিলে কলার ঝাড়ের মতই দ্রুত বংশবৃদ্ধি হইবে। এই আদিম চিন্তাধারা হইতেই হয়ত এককালে কলাগাছের বেষ্টনীর ভিতর বিবাহ-প্রথার উদ্ভব হইয়াছিল।

কোন কোন সমাজে বাঁশের কঞ্চি পুঁতিয়াও বিবাহ হইতে দেখা যায়। এই প্রথার মূলেও ঐ একই চিন্তাধারা থাকা বিচিত্র নয়। বাঁশের ঝাড়ও কলার ঝাড়ের মতই বাড়ে। এখানে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ধান্যদূর্বা দিয়া আশীর্বাদ করিবার মূলেও হয়ত মানুষের অনুরূপ আদিম চিন্তাধারাই প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। তাহারা দেখিত, দূর্বাঘাস সহজে মরে না, বৃদ্ধিও পায় অতি দ্রুত। কাজেই দূর্বা দিয়া আশীর্বাদ করিলে কল্যাণীয় কল্যাণীয়ারা দীর্ঘায়ু হইবে, এইরূপ মনে করা বিচিত্র নয়। ধানকে সাধারণ মানুষ লক্ষ্মী মনে করে এবং বহু অঞ্চলে ধানছড়া ও কুন্‌কেভরা ধান লক্ষ্মীর প্রতীকরূপে পূজিত হয়। কাজেই ধান দিয়া আশীর্বাদ করিবার মধ্যে 'সুখ-সম্পদ বৃদ্ধি হউক' এই কামনাই যেন প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে।

সাধারণ মানুষ কলাপাতাকেও শুধু পাতা হিসাবেই দেখে না, কলাপাতার অগ্রভাগ (আগপাতা, মাজপাতা) তাহার কাছে পবিত্র; এই পাতায় সে দেবতার উদ্দেশে ভোগনৈবেদ্য সাজাইয়া দিয়া হৃদয়ের কামনা ব্যক্ত করে। জীবনের এক মহাক্ষণে—বিবাহকালে, সে কলার মাজপাতা (মাজদর্পণ ও ধুতুরাকাটাইল ২৫০ পৃঃ) হাতে রাখে। কলার খোলাও (বাকলা) তাহার

কাছে অবজ্ঞার নয়; খোলে, খোলের তৈয়ারী ডোঙ্গায় সে পিতৃপুরুষের উদ্দেশে পিণ্ডাদি দান করে (১৩৬ পৃ)।

গৃহপ্রবেশ কিংবা গৃহ হইতে যাত্রা করিবার কালে, বিবিধ মঙ্গল অনুষ্ঠানে, সম্মানিত অতিথি-অভ্যাগতের সংবর্ধনায় সে কলাগাছ পুঁতে, দশপ্রহরণ ধারিণীর পূজার আগে কলাগাছের পূজা করে (কলাবউ ২৬৭ পৃ), কলা-বিবাহের (২৬৭ পৃ) অনুষ্ঠানে যোগ দেয়, নিজে কলাগাছের সঙ্গে মালাবদল করে (গাছবেড়া ২৪৫ পৃ)।

কলার মান্দাসের (ভেলা) সঙ্গে বাঙালীর ধর্ম ও সমাজ জীবনের কত কাহিনীই না জড়িত আছে! কলার ভুরা তাহার কাছে শুধু পারাপারের ডিঙ্গিই নহে, বেদনার মূর্ত প্রতীক।

এইরূপে দেখা যাইবে এক একটি শব্দের অন্তরালে কত সংস্কৃতির ধারা, কত কথাকাহিনী প্রচ্ছন্ন আছে।

মাছ (১৭২ পৃ) বাঙালীর আর একটি অতি প্রিয় খাদ্য। মাছকে বাঙালী শুধু খাদ্য তালিকার মধ্যেই রাখে নাই। মাছ তাহার একটি প্রধান মাঙ্গলিক দ্রব্য। বৈবাহিক তত্ত্ব-সামগ্রীর মধ্যে মাছ (পোনামাছ) একটি থাকিবেই। শ্রীপঞ্চমীতে জোড়া ইলিশ (১৭২ পৃ) ঘরে আনিয়া সে উৎসব করে। অতি নগণ্য যে পুঁটি মাছ তাহাকেও সে সিঁদুরের ফোঁটা দিয়া বহুমূল্য গহনাদির পার্শ্বে স্থান দেয় (যাত্রাপাতা, ২৮১ পৃ)। বোয়াল মাছ নিকৃষ্ট শ্রেণীর মাছ; দেখিয়াছি, এই মাছও প্রতিদিন ব্রাহ্মণ-সেবিত দেবী দয়াময়ীর (জামালপুর, ময়মনসিংহ) ভোগে দেওয়া হয়।

রাঘব বোয়াল (১৭৮ পৃ) মাছ বটে। কিন্তু ইহাও বাঙালীর অসংখ্য রূপকথা, ব্রতকথার মধ্যে আসিয়া আসর জমাইয়াছে। রাঘব বোয়ালের সেই গহনার পুঁটুলি ভক্ষণের ভিতর দিয়া (মঙ্গলচণ্ডীর ব্রতকথা) বাঙালীর মানস-নেত্রে ভাসিয়া উঠে তাহার অতীত স্বর্ণযুগের চিত্র, যখন বণিকদের পণ্যভরা ডিঙ্গা সমুদ্র-পথে যাতায়াত করিত।

কালভেদে অবশ্য, রাঘব বোয়াল এখন বাংলা ভাষার বক্রোক্তিতে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। বড় বড় পুঁজিপতি, শিল্পপতি প্রভৃতিকেই এখন সাধারণ লোক রাঘব বোয়াল বলিয়া থাকে।

পান-তামাকঃ আমাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও ধর্মজীবনে পান-তামাক একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছে। অতিথি-অভ্যাগতকে

পান তামাক দিয়া আদর আপ্যায়ন করিবার রীতি অতি প্রাচীন এবং এখনো বাংলার পল্লীগ্রামে প্রায় সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যেই সমভাবে ইহা চলিয়া আসিতেছে।

'পানখিল', 'পানচিনি', 'পান দেওয়া', 'পান লওয়া' (২৫৩ পৃ) প্রভৃতি শব্দের মুকুরে বাঙালীর সেকালের, এমন কি বর্তমান কালেরও সমাজচিত্র প্রতিফলিত হয়। বিবাহোপলক্ষে আত্মীয়-বান্ধব এবং স্বসমাজের ঘনিষ্ঠ সকলকে পান দিয়া নিমন্ত্রণ করিবার রীতি এক সময়ে বহুপ্রচলিত ছিল। এখনো বাংলা এবং আসামের বহু স্থানে, বহু সমাজে পল্লী অঞ্চলে এই প্রথার প্রচলন দেখা যায়।

শুধু বিবাহোপলক্ষেই নয়, এককালে হয়ত সকল প্রকার নিমন্ত্রণই পান দিয়া করা হইত। সম্মানিত ব্যক্তিকে লোক মারফত সাদর সম্ভাষণ ও আহ্বান জানাইতে হইলেও, সঙ্গে পান পাঠাইয়া দিবার রীতি সুপ্রচলিত ছিল। আমাদের মধ্যযুগের সাহিত্যে তাহার প্রচুর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

হিন্দুর বিবাহাদি শুভকার্য, দেবকার্য, পিতৃকার্য,—কিছুই পান ছাড়া সম্পন্ন হয় না। দেবতার পূজায়, উৎসবে-পার্বণে, পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধে, বিবাহাদি অনুষ্ঠানে পান-সুপারি অপরিহার্য উপকরণ। হিন্দুর সামাজিক জীবনে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও সুদূরপ্রসারী অনুষ্ঠান হইতেছে বিবাহ। এই বিবাহের সূচনা হইতে সমাপ্তি পর্যন্ত পান-সুপারির অত্যাবশ্যকতা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়।

চট্টগ্রামের নানাস্থানে মুসলমান সমাজে 'তেলোয়াই' নামে একটি প্রথা এখনো প্রচলিত আছে। বিবাহের কয়েকদিন পূর্বে কনের পিতা বরের বাড়িতে একদফা উপহার পাঠাইয়া থাকেন। উহাতে 'পানের ঝাড়'ই প্রাধান্য লাভ করে। সাধারণত একটি আমের ডালের প্রতি পাতার সঙ্গে পানের খিলি ঝুলাইয়া দেওয়া হয়। একটি মজুর সেই ডালটি কাঁধে করিয়া বরের বাড়িতে লইয়া যায় এবং সকলে তাহা হইতে পান তুলিয়া খায়; অবশিষ্ট পান পাড়ায় বিতরিত হয় ('আরাকান রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য' দ্র)।

পানপড়া (২৭৫ পৃ)—ইহা হইতে আমাদের সমাজের সেকালের আর এক রকম পরিচয় পাওয়া যায়। সেকালে পুরুষেরা প্রায়ই বহুবিবাহ করিত; সপত্নীদের মধ্যে এজন্য স্বামীকে আপন বশে রাখিবার তীব্র প্রতিযোগিতা চলিত। অনেকে এই ব্যাপারে বশীকরণমন্ত্র, ঔষধ, কবচ ইত্যাদির আশ্রয়

লইত। শুধু যে সপত্নীরাই এক্ষেত্রে অগ্রণী ছিল, তাহা নহে; পুরুষ-নারী দুষ্টপ্রকৃতির যে কেহ ঈপ্সিত জনকে করায়ত্ত করিবার জন্য অনেক সময় বশীকরণ ঔষধাদি প্রয়োগ করিত। পান অতি লোকপ্রিয় এবং পান দিয়া আদর আপ্যায়নের প্রথা বহুপ্রচলিত বলিয়াই পানের ভিতর ওষুধ পুরিয়া কিংবা পান মন্ত্রপূত করিয়া কাহাকেও খাওয়ানো খুব সহজ ছিল।

এই 'পানপড়া'র ভীতি কোন কোন সমাজে এখনো আছে বলিয়াই মনে হয়। অতিথি-অভ্যাগতকে পান সাজিয়া দিবার রীতি সকল সমাজে নাই। একটি বাটায় করিয়া পান, সুপারি ও চুন-খয়ের আগন্তুকের সামনে পৃথক পৃথক রাখা হয় এবং তিনি নিজ হাতে পান সাজিয়া খান। দক্ষিণ-পূর্ব ভারতের আর্যেতর জাতির মধ্যে এই রীতি সমধিক প্রচলিত। লক্ষ্য করিয়াছি, যেসব সমাজে পান সাজিয়া দেওয়া হয়, সেইসব সমাজেও কেহ কেহ পানের খিলিটি মুখে দিবার পূর্বে প্রথমে শুঁকিয়া লন, কিংবা খিলির অগ্রভাগ দাঁতে কাটিয়া ফেলিয়া দেন। এইরূপ করার মূলে সেকালের পানপড়া-ভীতির প্রভাব প্রচ্ছন্ন আছে কি না কে বলিবে?

বাংলাদেশে এমন কয়েকটি ব্রত আজও প্রচলিত আছে, যেগুলির একমাত্র বা মুখ্য উপকরণ পান-সুপারি। ময়মনসিংহে গোটা পান ও সুপারি দিয়া 'ছুবচনাই' ব্রত (সুবচনী?) করা হয়। 'ঠুনকাপীর' নামক এক পীরের উদ্দেশেও পান-সুপারি উপকরণে এক ব্রত অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

আসামের গারো, খাসী প্রভৃতি পার্বত্য জাতির এবং যবদ্বীপ, সুমাত্রা ও মালয়বাসীর মধ্যেও পান-তামাক খাওয়ার এবং পান-তামাক দিয়া ভদ্রতা রক্ষার রীতির ব্যাপক প্রচলন দেখা যায়। তাহাদের সমাজেও কেহ কাহারো বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইলে পান-তামাক না দেওয়াটা ভয়ানক অভদ্রতার মধ্যে পরিগণিত হয়। মালয়ে কোন কোন সম্প্রদায়ে এই লইয়া পরিবারে পরিবারে, সমাজে সমাজে বিবাদের সূত্রপাত হয় এবং এই সূত্র ধরিয়া অনেক সময় রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা-হাঙ্গামা পর্যন্ত হইতে দেখা যায়।[১] গারো, খাসী, হাজং প্রভৃতির মধ্যে ভ্রমণ করিয়া দেখিয়াছি, নিজেদের ঘরে না থাকিলেও প্রতিবেশীর বাড়ি হইতে পান-তামাক আনিয়া তাহারা আগন্তুকের হাতে তুলিয়া দেয়।

পান-সুপারি ও তামাকের উৎপত্তি ও প্রচলন সম্পর্কে আসামের খাসীদের

1. Ancient Rites & Ceremonies by Keith Murray.

মধ্যে সুন্দর একটি উপকথা প্রচলিত আছে। কোনও সময়ে দুই বন্ধু ছিল, একজন খুব ধনী, আর একজন খুব দরিদ্র। ধনী বন্ধু প্রায়ই তাহার দরিদ্র বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইত, কিন্তু দরিদ্র বন্ধু আপনার অসচ্ছলতার জন্য আর প্রতিনিমন্ত্রণ করিতে পারিত না। ইহাতে সে একটা অস্বস্তি বোধ করিত। শেষে একদিন স্ত্রীর অনুরোধে মাত্র ভদ্রতা রক্ষার জন্যই ধনী বন্ধুটিকে আহারের নিমন্ত্রণ করিল। কিন্তু বিশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও দরিদ্র স্বামী-স্ত্রী ধনী বন্ধুর সম্মুখে উপস্থিত করিবার মত উপযুক্ত খাদ্য-সামগ্রী সংগ্রহ করিতে পারিল না। ইহাতে ক্ষোভে দুঃখে অভিভূত হইয়া আসন্ন লজ্জার হাত হইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত তাহারা উভয়ে আত্মহত্যা করিয়া বসিল। সেই রাত্রিতে এক ডাকাত দারুণ শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে তাহাদের ঘরে জ্বলন্ত আখার ধারে আসিয়া আশ্রয় লইল। প্রভাতে চলিয়া যাইবার মুখে পার্শ্বে দুইটি মৃতদেহ দেখিয়া ধরা পড়িবার ভয়ে ডাকাতটিও নিজের প্রাণ নিজে বিসর্জন দিল। দুপুরে ধনী বন্ধু নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিয়া ব্যাপার কি সমস্ত জানিতে বুঝিতে পারিল। তখন ব্যথিত চিত্তে সে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিল,—'হে ভগবান, গরীব যাহারা, তাহারাও যাহাতে ভদ্রতা রক্ষা করিতে পারে, এমন একটা কিছু উপায় করিয়া দাও।' তাহার প্রার্থনায় অচিরেই সেই তিনটি মৃতদেহ হইতে তিনটি গাছ উৎপন্ন হইল, একটি পানের, একটি সুপারির ও একটি তামাকের। খাসীরা বলে, এই ঘটনা হইতেই সাধারণ ভদ্রতা রক্ষার ব্যাপারে পান-তামাকের প্রচলন হইয়াছে।[2]

অতিথি-অভ্যাগতকে পান দিয়া সমাদর করিবার দৃষ্টান্ত আমাদের মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে, পল্লীগীতিতে ভুরি ভুরি। শুধু আদর আপ্যায়নের ব্যাপারেই নহে, কোনও মাননীয় ব্যক্তি বা রাজামহারাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেও পান-সুপারি ভেট দিবার প্রথা সুপ্রচলিত ছিল।

হুঁকা বন্ধ করা (৮২ পৃঃ) কথাটির ভিতর দিয়া আমরা সেকালের সামাজিক বিচার-আচারের একটা আভাস পাই। কেহ কাহারো বাড়িতে উপস্থিত হইলে তাহাকে তামাক দিয়া সংবর্ধনা করাই ভদ্ররীতি হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল; তখন আগন্তুককে তামাক না দেওয়া মানেই তাহাকে অপমানিত করা। তখনকার সমাজপতিরা কোনও ব্যক্তিকে কোনও অপরাধের জন্য সমাজচ্যুত

2. Folktales of the Khasis by Mrs. K. U. Rafy.

করিতে চাহিলে তাহাকে হুঁকা দেওয়া বন্ধ করিয়া দিতেন ; শুধু তাহাই নহে, ধোপা নাপিতও তাহার কাজ করিত না। সমাজের সকলের কাছে যথারীতি সম্মান না পাওয়াই সমাজচ্যুত হওয়া।

হুঁকাবরদার (৮২ পৃঃ) কথাটির ভিতর দিয়া সেকালে অনেক অভিজাত পরিবারে তামাক খাওয়াটা যে কিরূপ বিলাস ও আড়ম্বরের ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছিল তাহারই আভাস পাওয়া যায়। নবাবী আমলে যখন কোনও ধনী অভিজাত ব্যক্তি ভ্রমণে বাহির হইতেন বা স্থানান্তরে যাইতেন, তাঁহার সঙ্গে অন্তত একজন হুঁকাবরদার থাকিত। সে বেশ একটা বড় কলকেতে তামাক সাজিয়া গুড়গুড়ি হাতে মনিবের অনুগমন করিত, আর প্রভু মধ্যে মধ্যে নলটি হাতে লইয়া হাঁটিতে হাঁটিতে তামাক টানিয়া যাইতেন। তাঁহাদের আলবোলা নাকি গোলাপজলে পূর্ণ করা হইত এবং তামাকও সাধারণ থাকিত না, উহার মিঠাকড়া গন্ধ বেশ একটা আমেজের সৃষ্টি করিত। কোন কোন বড়লোকের আমিরি এত ছিল যে তাঁহারা কলকে ঠাণ্ডা হওয়া বরদাস্ত করিতে পারিতেন না। এজন্য তাঁহাদের বাড়িতে গুড়গুড়িটি থাকিত ভৃত্য-মহলে, আর তৎসংলগ্ন নলের মুখটি থাকিত প্রভুর অন্তঃপুরে, বিশ্রামকক্ষে কিংবা শয়নাগারে। সেকালে অনেক উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মচারীও যে এদেশের বড়-ঘরের প্রভাবে পাইপ ছাড়িয়া গুড়গুড়ি টানিতে অভ্যস্ত হইয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ ত কত কত কথায় এবং প্রাচীন চিত্রে রহিয়া গিয়াছে। কালীকৃষ্ণ দাস-বিরচিত 'কামিনী কুমার' গ্রন্থে রামবল্লভের তামাক সাজার কথাটিও বেশ উপভোগ্য :—"রামবল্লভ তামাক সাজা কর্মে নিযুক্ত হইলেন, পরে ক্রমে ক্রমে তামাক সাজিতে রামবল্লভের তামাক সাজায় এমত অভ্যাস হইল যে, রামবল্লভ যদ্যপি ভোজনে কিম্বা শয়নে আছেন ও সেই সময়ে কামিনী যদি বলে, ওহে রামবল্লভ, কোথায় গেলে হে, রামবল্লভের উত্তর—'আজ্ঞা, তামাক সাজিতেছি।' (বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়)

দরবেশের সেবা (২৭৩ পৃঃ) অনুষ্ঠানটি হইতে আমরা জানিতে পারি যে, হুঁকাটানা প্রথা কেবল পুরুষদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, কোন কোন সম্প্রদায়ের বর্ষীয়সী মহিলারাও তামাক খাইতেন এবং এখনো অনেকে খাইয়া থাকেন,—'দরবেশের সেবা' একটা উপলক্ষ্য মাত্র।

অনেকে বলিয়া থাকেন, তামাকের ব্যবহার নাকি এই সেদিন পর্যন্তও অনেক দেশই জানিত না। আমেরিকার মেক্সিকোর অধিবাসীদের মধ্যে তামাকের চাষ ও ধূমপান প্রচলিত ছিল এবং সময়ে সময়ে তাহারা এই ব্যাপার লইয়া

উৎসবাদি করিত। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে দ্বিতীয় ফিলিপের সময় স্পেন-বাসীরা তামাক গাছের সহিত নাকি প্রথম পরিচিত হয় এবং ক্রমে সমগ্র ইউরোপ উহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। ১৭শ শতাব্দীর মধ্যেই পৃথিবীর সকল দেশ তামাকের গুণাগুণ ও বিবিধ ব্যবহার জানিয়া লয়। ভারতের লোক যে কবে হইতে হুঁকা খাইতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহা নিশ্চয় করিয়া কেহ বলিতে পারে না। তবে হুঁকা (হুঁকো, হুকা, হুক্কা, ঊকা), চিলম (চিলুম, ছিলুম, ছিলিম), আলবলা, হুঁকাবরদার প্রভৃতি শব্দ হইতে অনুমান করা যায় যে, বাংলা ভাষার ভাণ্ডারে আরবী ফারসী শব্দের প্রবেশের মুখেই বাংলা দেশে হুঁকা খাওয়ার প্রথা প্রবর্তিত হয়। ('সভ্যতায় পান তামাক' দ্র)।

গায়ে হলুদ—(২৪৫ পৃ) বিবাহের একটি প্রধান স্ত্রী-আচার। শুধু হিন্দু-সমাজেই নহে,—ওরাওঁ, বাঙ্গারা প্রভৃতি পার্বত্যজাতির মধ্যেও ইহা সুপ্রচলিত। বিবাহ-দিবসে অথবা তৎপূর্বে কোনও সময়ে বরের বাড়িতে বরকে এবং কন্যার বাড়িতে কন্যাকে হলুদবাটা প্রভৃতি মাখাইয়া স্নান করানো হয়। স্থান ও সমাজভেদে হলুদের সঙ্গে 'মুথা' নামক একপ্রকার ঘাসের মূল, গিলা, সরিষা, মাষকলাই ইত্যাদি দ্রব্যও বাটিয়া দেওয়া হয়।

মনে হয়, দেহশুদ্ধিই এই আচারটির মুখ্য উদ্দেশ্য। মন্ত্রপাঠে যেমন চিত্ত-শুদ্ধি হয়, ভেষজ দ্রব্য লেপনে তেমনই দেহশুদ্ধি ঘটিয়া থাকে। বিবাহের ভিতর দিয়া ভিন্ন আবেষ্টনীর মধ্যে পরিবর্ধিত, ভিন্ন গোত্রীয় দুইটি পুরুষ-নারীর দৈহিক মিলন সংঘটিত হয়। ইহার ফলে একের কোন দেহ-ব্যাধি অপরের দেহে অনায়াসেই সংক্রামিত হইতে পারে। অনেক রোগের জীবাণুই পরস্পরের সংস্পর্শ হইতে শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার সুযোগ পায়। এই সংক্রমণকে রোধ করিবার জন্য চর্মশুদ্ধির তথা দেহশুদ্ধির একান্ত প্রয়োজন। গায়ে হলুদ অনুষ্ঠান দ্বারা পরোক্ষভাবে তাহাই করা হয়। সেই আদি যুগে যখন সাবান, পাউডার, বিশোধক (অ্যান্টিসেপ্‌টিক) ঔষধাদি আবিষ্কৃত হয় নাই, তখন মানুষ রোগের চিকিৎসায় বা রোগ-প্রতিষেধে ভেষজ গুণসম্পন্ন লতাপাতা ফলমূল ইত্যাদি ব্যবহার করিত। কোন্ দ্রব্যের কি গুণ, কোন্ রোগে কি খাইতে হয়, কি মাখাইতে হয়, কোন রোগের কি প্রতিষেধক, অতি-সাধারণ লোকেও তখন জানিত। সেই যুগের কি আজও অবসান ঘটিয়াছে? ঘটে নাই। গ্রামে গ্রামে টোটকা চিকিৎসা এখনো বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার হাত ধরাধরি করিয়া চলিয়াছে। সর্বসাধারণের মধ্যে হলুদের ব্যবহার যেরূপ ব্যাপক,

তাহাতে মনে হয়, বিজ্ঞানপূর্ব যুগেই মানুষ হলুদের গুণাগুণ সম্বন্ধে সম্যক অবহিত হইয়াছিল। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে হরিদ্রা এবং উপরোক্ত দ্রব্যগুলির নানা ভেষজগুণের উল্লেখ করা হইয়াছে। হরিদ্রা যেমন নানা রোগের প্রতিষেধক, তেমনই নানা রোগের নিবৃত্তিকারকও বটে। বিশেষ করিয়া ইহা দেহকান্তি বর্ধিত করে। আমাদের ভাজা ব্যঞ্জন ডাল ইত্যাদি আহার্যে হলুদ ত অপরিহার্য। অনেকে প্রতি সকালে নিয়মিত হলুদ-গুড় খাইয়া থাকেন। অনেক সমাজে বর-কন্যাকে হলুদ মাখাইয়া শুধু একদিনই স্নান করানো হয় না, বিবাহের পূর্বে কয়েকদিন ধরিয়াই নাওয়ানো হয়। বিবাহ-উপলক্ষ্য ছাড়াও অন্য সময়ে গায়ে হলুদ মাখিয়া স্নান করিবার রীতি বহুস্থানে প্রচলিত আছে। বাংলার বহু অঞ্চলে শ্রীপঞ্চমী-দিবসে ছেলেমেয়েরা হলুদ এবং সরিষা বাটা গায়ে মাখিয়া স্নান করে এবং হলুদ-ছোপানো কাপড় পরে। মাদ্রাজেও কোন কোন সমাজে পৌষ-সংক্রান্তিতে হলুদ ও মাষকলাই বাটা মাখিয়া স্নান করিবার প্রথা আছে। শুধু অন্নপ্রাশনাদিতে নহে, অন্য সময়েও অনেক জননীকে তাহাদের শিশুকে তেলহলুদ মাখাইয়া স্নান করাইতে দেখা যায়। এই সকল হইতে অনুমান করা যায় 'গায়ে হলুদ' আচারটির উদ্ভবের মূলে আছে, হলুদের বিশোধক ও অঙ্গরাগবর্দ্ধক গুণ।

জলসহা—জলসাওয়া, জলসাধা (২৪৮ পৃ), সোহাগমাগা (২৬১ পৃঃ) —এইগুলি বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের মনোজ্ঞ স্ত্রী-আচার। পুত্র ও কন্যার বিবাহে পাড়া-প্রতিবেশী সকলের শুভেচ্ছা ও সন্তোষ এবং অনুমোদন কামনা করাই ইহাদের মূল উদ্দেশ্য। বিবাহ যে এককালে সামাজিক ব্যাপার ছিল, উহাতে সমাজের সকলের অনুমোদন লাভ করিতে হইত, উল্লিখিত আচারগুলির ভিতর তাহারই আভাস পাওয়া যায়। শুধু স্বসমাজ নয়,—গ্রামস্থ ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, সদ্গোপ, গন্ধবণিক, নাপিত, মালাকার, কামার, কুমার, সকল সম্প্রদায়ের বাড়ি হইতেই শুভেচ্ছাপূত জল সংগ্রহ করিয়া পুত্র-কন্যাকে বৈবাহিক স্নান করানো হইত। কন্যাকে পরগৃহে পরহস্তে সমর্পণ করিবার প্রাক্কালে 'সোহাগমাগার' ভিতর দিয়া স্নেহাতুরা জননীর মনের বিষম অবস্থাটিই প্রকাশ পায়। তিনি কৌলিন্যের অহঙ্কার, ধনৈশ্বর্যের অহঙ্কার,—সকল অহঙ্কার মুছিয়া ফেলিয়া গলায় কাপড় জড়াইয়া, মাথায় কুলা তুলিয়া খালি পায়ে প্রতিবেশিনীদের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়ান, তাহাদের সোহাগ সন্তোষ, তাহাদের অনুমোদন কামনা করেন। তিনি মুখে কিছু বলেন না বটে, কিন্তু তাঁহার

মন হয়ত কেবলই বলিতে থাকে, 'ওগো, আমার যে দুলালী এতদিন তোমাদের মধ্যে ছিল, কাজে-অকাজে তোমাদের অতিষ্ঠ করিয়া মারিত, আজ সে পরগৃহে যাইতেছে,—তোমরা অনুমোদন কর, তোমরা তাহাকে আশীর্বাদ কর, তোমাদের শুভেচ্ছা তাহার উপর বর্ষিত হউক, তাহার যাত্রাপথ শুভ হউক, তাহার জীবন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে ভরিয়া উঠুক।'[১]

সিঁদুর দান (২৬১ পৃঃ)। বিবাহে বর কর্তৃক বধূর সীমন্তে সিঁদুর দান এবং সধবাদের সিঁদুর ধারণের প্রথা বাঙালী হিন্দুর মধ্যে বহুপ্রচলিত। সাঁওতাল, মুণ্ডা, ওরাওঁ, বীরহোড়, নেওয়ার ইহারাও বিবাহে বধূর কপালে সিঁদুর দানের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করে। ইহাদের মধ্যে সিঁদুরদানই বিবাহের মুখ্য আচার, ইহা দ্বারাই বিবাহ পাকা হয়। বাঙালী হিন্দুদের অপেক্ষা ইহাদের সমাজে সিঁদুরের মর্যাদা অধিক।

অনেক নৃতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত বলেন, বাংলা এবং তৎসংলগ্ন অঞ্চলসমূহের হিন্দুরা প্রতিবেশী কোনও অনার্য বা আদিবাসী সমাজ হইতে বিবাহে বর কর্তৃক বধূকে সিঁদুর পরাইবার প্রথাটি গ্রহণ করিয়াছে। এইরূপ বলিবার আরও হেতু আছে। বৈদিক গৃহ্যসূত্রাদিতে বিবাহে বর কর্তৃক বধূকে সিঁদুর দানের কোনও নির্দেশ নাই। পরবর্তী কালে কোন কোন পদ্ধতিকার 'শিষ্ট-সমাচার' রূপে মাত্র উহা অনুমোদন করিয়াছেন। আর্য-সংস্কৃতিতে আদিবাসী উপকরণ যথেষ্ট রহিয়াছে এবং আমাদের সমাজে খাঁটি আর্যরক্ত বিরল,—নানা দিক্ দিয়া নানা তথ্যের আবিষ্কার দ্বারা ইহা একরূপ প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। কাজেই সিঁদুর দানের মধ্যে আর্যেতর সমাজের প্রভাব থাকা বিচিত্র নয়। আর্যধর্মের বিস্তার-কালে বাঙালী ও বিহারী আর্যদের মধ্যে সিঁদুর ব্যবহারকারী মানবগোষ্ঠীই হয়ত সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যায় অনুপ্রবিষ্ট হইয়া থাকিবে এবং তাহাদের সহিত আর্যসমাজের নিবিড় সংমিশ্রণের ফলে বাংলা দেশে এক স্বতন্ত্র ভাবধারা ও সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের হিন্দুসমাজে যে সিঁদুর দানের প্রথা নাই, পূর্বভারতে, তথা বাংলায় আছে, তাহার কারণ হয়ত এখান-কার আর্যসমাজে সিঁদুর ব্যবহারকারীদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা। তাহাদেরই প্রভাবের ফলে পশ্চিম দেশাগত সংখ্যালঘু আর্যরা এবং অপর অনেকে কালক্রমে

১। বিবাহে লোকাচার ও মেয়েলী সঙ্গীত, মাসিক বসুমতী, কার্তিক—ফাল্গুন, ১৩৫৯, শ্রীকামিনী কুমার রায় দ্র।

বিবাহে সিঁদুর ব্যবহার আরম্ভ করিয়াছে, এইরূপ অনুমান করা যায়। [১]

কন্যাদায় (২১১ পৃঃ)। আমাদের সমাজ-ব্যবস্থায় কন্যার বিবাহ বড়ই বেদনাদায়ক। সন্তান সে পুত্রই হউক, আর কন্যাই হউক, সুরূপই হউক, আর কুরূপই হউক, মাতাপিতার নিকট তাহার ন্যায় আনন্দদায়ক আর কিছুই নহে। কিন্তু এই নয়নানন্দ, হৃদয়ানন্দ, গৃহের আনন্দ সন্তান যদি কন্যা হয়, তবে আমরা তাহাকে দায়স্বরূপ মনে করি; কন্যাদায়ের মত দায় আর নাই। কন্যাকে পাত্রস্থ না করা পর্যন্ত পিতামাতার চিন্তা-চেষ্টার, দুর্ভাবনার অন্ত থাকে না। পাত্রস্থ করিয়াও কি তাঁহাদের স্বস্তি আছে? পাত্র যদি সুপাত্র না হয়, কন্যা যদি সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ভিতর না পড়ে, অন্তর্জ্বালায় তাঁহারা সকলে নীরবে অহর্নিশ জ্বলিয়া পুড়িয়া মরেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমরা কি দেখিতে পাই? কন্যাটি হয়ত সুন্দরী, সুশিক্ষিতা এবং গৃহকর্মে নিপুণা; কিন্তু তাহার ভাগ্যে মিলিয়াছে এক দরিদ্র অশিক্ষিত স্বামী, সে বৃদ্ধ, মৃতদার অথবা বহুদারও হইতে পারে। যোগ্যতার মধ্যে তাহার হয়ত আছে বল্লালী কৌলিন্যের গর্ব, আর একান্নবর্তী পরিবারে কাহারও উপর নির্লজ্জ নির্ভরশীলতা। কন্যা অপাত্রে বা দারিদ্র্যে পড়ুক, ইহা কোন মাতাপিতাই আকাঙ্ক্ষা করেন না। কিন্তু আমাদের সমাজে তেমন সুপাত্র আর কয়টি মিলে? নির্দিষ্ট বয়সে নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে মেয়েদের বিবাহ দিতে হয়; তাহার ব্যতিক্রম হইলেই চারিদিকে নিন্দাচর্চার সীমা থাকে না। ছেলের বিবাহে যেমন দেখিবার শুনিবার বুঝিবার পক্ষে অপেক্ষা করা যায়, মেয়ের বিবাহে তেমন দীর্ঘদিন অপেক্ষা করিবার শক্তি কোথায়? চারিদিকে যেরূপ তাণ্ডব-তাড়না তাহাতে মেয়েটিকে কোনওরূপে পাত্রস্থ করিতে পারিলেই বাঁচি। পাত্রপক্ষ কন্যাপক্ষের এই অসহায় অবস্থার কথা ভালরূপেই জানেন এবং সেই অবস্থার সুযোগে তাঁহাদের দাবি-দাওয়া আরও পীড়াদায়ক করিয়া তোলেন। অধিকাংশ স্থলেই কন্যার মাতাপিতা এই পীড়ন নীরবে সহ্য করিয়া সাশ্রুনেত্রে আপনাদের হৃদয়ানন্দকে পরের হাতে তুলিয়া দেন এবং আপাতত দায়মুক্ত হন।

গ্রামদর্শনী ও চুলাখোদানি (২৪৭ পৃঃ)। বর্তমানে বিবাহ-ভোজ যত সহজে ও নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়, পূর্বে তত হইত না; প্রায়ই গণ্ডগোল বাধিত। এক সময়ে কৌলিন্য-গৌরব অত্যন্ত প্রবল ছিল; কুলীনেরা পারতপক্ষে অকুলীনে সম্বন্ধ স্থাপন করিতে চাহিত না, পক্ষান্তরে মৌলিকেরা সর্বদাই কুলীনে বিবাহ

---

১ সিঁথির সিঁদুর, গল্পভারতী পূজাসংখ্যা—শ্রীকামিনী কুমার রায় দ্র

দিতে বা করাইতে চেষ্টা করিত। এজন্য তাহাদিগকে অনেক অর্থ ব্যয় করিতে এবং অন্য নানাভাবে বেগ পাইতে হইত। বর কুলীন এবং কন্যা মৌলিক হইলে কুলীনেরা 'বাঙ্গাল' গ্রামে প্রবেশ করিবার জন্য 'গ্রামদর্শনী' নামে একটা মোটা টাকা পাইত। মৌলিকের পকান্ন তাহারা খাইত না, তাহাদের নিকট হইতে 'সিধা' পাইত এবং নিজেদের লোকদ্বারা আখা তৈয়ার ও রান্না-বান্না করাইয়া খাইত। এই আখা তৈয়ারির জন্যও তাহাদিগকে 'চুলাখোদানি' নামে একটা 'বিদায়' দেওয়া হইত। অনেক গোঁড়া কুলীন নিজেদের চাকর দ্বারা থালা, বাটি, গ্লাস, পিঁড়ি পাঠাইয়া দিত, তাহারাই সব করিত, গৃহকর্তা শুধু লবণ, লেবু ও জল পরিবেশন করিতেন। বিবাহ-ভোজে মৌলিক ও কুলীনেরা পৃথক পৃথক বসিত। বিবাহের পর অভ্যাগত কুলীনেরা প্রত্যেকে মৌলিক কন্যাপক্ষ হইতে ৫, ১০, ১৫, ২০, ২৫, এইরূপ কি ততোধিক পরিমাণ টাকা 'বিদায়' লইত, তাহাদের সঙ্গীয় ব্রাহ্মণ, গোমস্তা, ধোপা, নাপিত—তাহারাও অল্পবিস্তর পাইত।

মনসা ও **চেঙ্গমুড়ি** (১৬৪ পৃঃ)। বাংলার মহামান্যা দেবী মনসার **মনসা** নামটির উৎপত্তি নির্ণয়ে এপর্যন্ত বহু গবেষণা হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, দক্ষিণ ভারত হইতেই কোনও সূত্রে বাংলায় মনসাপূজার প্রবর্তন হইয়াছে এবং সেখানকার সর্পদেবী 'মনে মাঞ্চী' বা 'মঞ্চাম্মা'ই এখানে আসিয়া মনসা বা মনসামাতা নামে পরিচিতা হইয়াছেন। আবার কোন কোন অর্বাচীন পুরাণের মতে, নাগপিতা কশ্যপ আপনার মন হইতে এই দেবীকে সৃষ্টি করিয়াছেন, সেজন্যই ইহার নাম মনসা (মনস্ + ষ্ণ, আপ)। আবার বিপ্রদাসের মনসা বিজয়ে (ডঃ সুকুমার সেন সম্পাদিত) 'মনসাকুমারী'কে ত্রিপুরারির মানসকন্যা বলা হইয়াছে। কাহারো কাহারো মতে মনস এবং মনসা নাম বহু পূর্ব হইতেই ভারতীয় আর্য-সাহিত্যে থাকায় বাংলার সর্পদেবতার মনসা নামটি সেই উৎস হইতেও আসিতে পারে।

বাংলা শব্দভাণ্ডারে 'মনসা' একটি বহু প্রচলিত দেশী শব্দ। সংস্কৃতে যে বৃক্ষটিকে স্নুহী বলা হয়, বাংলার সর্বত্র তাহা সিজ বা মনসাগাছ নামে পরিচিত। সিজের চেয়ে মনসাগাছ নামেরই ব্যাপ্তি বেশী। গ্রামে এমন হিন্দুবাড়ি (বিশেষ করিয়া অন্ত্যজদের) খুব কমই দেখা যায়, যে-বাড়িতে মনসাগাছ নাই বা বৎসরে একবারও মনসাতলায় পোচ পড়ে না। সাধারণের বিশ্বাস, মনসাগাছে মনসাদেবী বাস করেন, এজন্য এই গাছকে কেহ অমান্য করিতে সাহসী হয় না।

তাহাদের কাছে মনসার মূর্তির চেয়ে মনসাগাছের মূল্য কম নয়। অনেক গ্রামেই নির্দিষ্ট 'মনসাতলা' আছে এবং সেখানে মনসাদেবীর পূজাও হয়। দেখা যায়, ঘটে পটে মূর্তিতে সর্পফণাতে কি মাটির ঢিবিতে পূজা হইলেও সে পূজায় মনসাগাছের ডাল কিংবা পাতা অবশ্যই দিতে হয়, নতুবা পূজার অঙ্গহানি ঘটে। এই সকল হইতে অনুমান করা যায়, আদিতে সাধারণ লোক মনসাগাছেই (হয়ত উহার নানা গুণে আকৃষ্ট হইয়া) সর্পদেবতার পূজা করিত এবং কালক্রমে সেই গাছের নাম হইতেই তদধিষ্ঠিত দেবতার নাম 'মনসা' হইয়াছে।

বাংলাভাষায় অনেক দ্রাবিড়ী উপাদান আছে। আমাদের অনেক শব্দের বিশ্লেষণে সে উপাদান ধরা পড়ে। কাজেই মনসা নামটির উপর পূর্বোক্ত 'মঞ্চাম্মা'র ছায়া পড়া বিচিত্র নয়। কিন্তু আমরা জানি, দাক্ষিণাত্যে 'মঞ্চাম্মা'র পূজা বহুপ্রচলিত নহে এবং কয়েকটি নিম্ন বর্ণের মধ্যেই উহা সীমাবদ্ধ। কিন্তু মনসাপূজা বাংলার জাতীয় উৎসব, সকল বর্ণের লোকই ইহা করিয়া থাকে এবং মনসাগাছ বাংলার সর্বত্রই সুপরিচিত। এমতাবস্থায় স্বল্পখ্যাত 'মঞ্চাম্মা' বাংলায় আসিয়া মনসা নামে সর্বত্র জুড়িয়া বসিয়াছেন,—এই অনুমানের চেয়ে বাংলার বহুপ্রচলিত মনসাপূজাই কোনও কালে মনসাপূজক কোনও বাঙালী ঔপনিবেশিক মানবগোষ্ঠী দ্বারা দক্ষিণ ভারতে নীত হইয়া 'মঞ্চাম্মা' পূজায় রূপান্তরিত হইয়াছে—এইরূপ অনুমান করাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয়।

মনসার 'চেঙ্গমুড়ি কানি' বা 'চেঙ্গমুড়ি কানী' নামটি লইয়াও অনেক গবেষণা হইয়াছে। স্নুহীবৃক্ষকে (মনসাগাছ) তেলুগু ভাষায় 'চেংমুড়ু' বা 'জেমুড়ু' বলা হয় এবং কাহারো কাহারো মতে, মনসার চেঙ্গমুড়ি (-মুড়ী) বা চেংমুড়ি নাম এই চেংমুড়ু শব্দ হইতেই আসিয়াছে।

আমাদের 'চেঙ্গমুড়ি' বা 'চেঙ্গমুড়ি কানি'র উৎস সন্ধানে দক্ষিণ ভারতে যাইবার কোনও প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না। চেঙ্গ (চেং, চ্যাং) একটি দেশী লৌকিক শব্দ। ইহা বিভিন্নার্থক শব্দ হইলেও এক অতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর মাছ অর্থেই সাধারণ্যে বহুপ্রচলিত। বিষধর কোন কোন সাপের মাথার সহিত ইহাদের মাথার কতকটা সাদৃশ্য আছে (১৭৫ পৃ)। বাংলায় মুণ্ড বা মাথা অর্থে মুড়া, মুড়ি শব্দও বহুপ্রচলিত (মাছের মুড়া, মুড়িঘণ্ট)। যাহার এক চক্ষু নাই, পুরুষ হইলে তাহাকে কানা এবং স্ত্রীলোক হইলে কানি বা কানী বলা হয়। কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে শব্দটি গালি অর্থেই বেশী প্রযুক্ত হয়। কেবল এক চক্ষু না থাকিলেই যে কেহ কানা বা কানী হয়, তাহা নহে, যে ব্যক্তি

পক্ষপাতমূলক আচরণ করে, তাহাকেও সাধারণত কানা (পুরুষকে) বা কানী (স্ত্রীলোককে) বলিয়া গালি দেওয়া হয়। চণ্ডী মনসার এক চক্ষু কানা করিয়া দিয়াছিলেন বলিয়াও প্রসিদ্ধি আছে; কিন্তু আমাদের শিষ্টাচারে কানাকেও কানা বা কানী বলা গালিরই সমতুল্য। তাহা হইলে চেঙ্গমুড়ি কানির (চেঙ্গমুড়ী কানী) এক অর্থ (আক্ষরিক) দাঁড়ায়, 'যে একচক্ষু স্ত্রীলোকের মাথা চেঙ্গমাছের মাথার মত।' আর এক অর্থ দাঁড়ায়, নিছক গালি। আমাদের মতে, ইহা মনসার কোনও নাম নহে, তাহার প্রতি সর্বস্বান্ত চাঁদসদাগরের তীব্র কটূক্তিমাত্র। 'চেঙ্গমুড়ি কানী' কথাটি যে গালিবাচক, তদ্বিষয়ে ডঃ প্রদ্যোৎকুমার মাইতিও তাঁহার Historical Studies in the Cult of the Goddess Manasa গ্রন্থে আলোচনা করিয়াছেন।

রোগ চালনা। গ্রামে যখন কলেরা বা বসন্ত মহামারী রূপে দেখা দেয়, তখন কোথাও কোথাও ফকির ওঝাদের শরণাপন্ন হইতে দেখা যায়। তাহারা নানা প্রক্রিয়া দ্বারা এক গ্রাম হইতে অন্য গ্রামে রোগ চালনা করিয়া দিতে পারে, এইরূপ বিশ্বাস অনেকেরই আছে। কিন্তু ইহার মূলে ফকির-ওঝাদের যে কাণ্ড-কারখানা অনেক সময় ধরা পড়ে, তাহার তুলনা নাই। উহারা 'রোগচালনা'র নাম করিয়া গ্রামবাসীদের নিকট হইতে টাকা বা ধান-চাল গ্রহণ করে, এবং রাত্রির অন্ধকারে সকলের অগোচরে রোগীর কাপড়চোপড় অন্য গ্রামের পুকুরে বা হাটে-বাজারে ফেলিয়া আসে এবং তাহা হইতেই সেই গ্রামে অনায়াসে রোগ ছড়াইয়া পড়ে, আর ফকির-ওঝার কেরামত বাড়ে।

ভূমিকা আর দীর্ঘ করিব না। একক চেষ্টার ভুল-ত্রুটি অসঙ্গতি অসামঞ্জস্য অনেক কিছু ঘটিয়াছে, অপূর্ণতা ত রহিয়াই গিয়াছে। তৎসত্ত্বেও এই ভাবিয়া আমি নিঃসঙ্কোচ যে, মাতৃভাষার সেবায় সাধ্যমত কর্তব্য সম্পাদনে চেষ্টা ও পরিশ্রমের ত্রুটি করি নাই। এই সেবা আমাকে চির আনন্দ দিয়াছে। আশা করি, বংলাভাষাপ্রেমী প্রত্যেকের মধ্যেই আমার এই আনন্দ সঞ্চারিত হইবে।

১লা বৈশাখ, ১৩৮৪
'লোকভারতী'
৫/১ হরিদেবপুর রোড
কলিকাতা-৪১

শ্রীকামিনীকুমার রায়

প্রথম অধ্যায়

ঘরবাড়ি

অইল, অলতা-উব [স° বলীক, হি° ওলতী]—চালের নিম্নদিক যাহা ঘরের বেড়া বা দেওয়ালের বাহিরে থাকে, ছাঁচ।....অইলতলা—ছাঁচতলা।

অশুচঘর / অশুজঘর-পূব [<অশৌচগৃহ]—অশুদ্ধগৃহ, সূতিকাগার। শিশুর জন্মের পর ষেটেরা পর্যন্ত কোন কোন সম্প্রদায়ের লোক এই ঘরটিকে অশুচি মনে করে এবং ইহার সংস্পর্শে গেলে স্নান না করিয়া ঘর-সংসারের কিছু ছোঁয় না। তাই আঁতুড়ের এক নাম 'অশুচঘর।' অশজ, অশুজ, অশোজ, অশুচ, অশোচ, আশৌচ—অশৌচের বিভিন্ন অপভ্রংশ। সাধারণত পাড়াগাঁয় শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার কিছুদিন পূর্বে উঠানের এক কোণে (প্রায়ই স্থানটি স্যাঁতসেতে থাকে) অস্থায়ীভাবে এই ঘর বাঁধা হয়। আবার বাংলার বহু সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রসূতির জন্য কোনও পৃথক ঘর তৈয়ার করা হয় না। শয়ন-গৃহেরই এক কোণে কিংবা বারান্দার এক পার্শ্বে শিশু ভূমিষ্ঠ হয় (আঁতুড় দ্র)।

আউটা / আওটা-ম. ঢা. ত্রি. শ্রী. রা. বগু—বাড়ির প্রবেশ দ্বারের মুখের আবরু বেড়া, দেউড়ি ('ডোলায় তুল্যা দিয়্যা তুমি আউট্যা ধরিয়্যা দেখ গো'—কন্যাবিদায়ের গান—বলোসা)। ....আউটানো / আওটানো [√আওটা]—আবর্তিত করা, তরল পদার্থ জ্বাল দিয়া ঘন করা (দুধ—)।

আওতা [স° আতপত্র, আ° আহাতহ্]—ছায়ায় ঢাকা স্থান (আওতায় শাকসবজি তেমন বাড়ে না)। -উব—মাঠে শস্য পাহারা দিবার কুড়ে। আয়ত্তি (ইহা আমার আওতার মধ্যে নয়)।

আগচালা-পা, **আগচালি**—চালাঘরের সামনের দিক, বারান্দা।

আগড়-পব. হা. হু. বর্ধ, **আঁগুড়**-বাঁ. বী—পাঁচিল ইঃর বাঁশের দরজা, ঝাঁপ, টাটি।

আগদার / আগদুয়ার-পা. রা [<অগ্রদ্বার]—বাহির মহল। গোহাল।

আগনা / আগনে<আঙ্গিনা।

আগল-ক, **আগুল**-চট্ট [স° অর্গল]—দরজার হুড়কা, খিল।....আগলদার—রক্ষক।....আগলানো [√আগলা]—রক্ষা করা, পাহারা দেওয়া (ফসল আগলানো)।

আগাশি [অগ্র (প্রধান)+রশি]-উব—মোটা দড়ি, কাছি।

আঙ্গিনা / আঙিনা [সং অঙ্গন]—বাড়ির ভিতরের বা বাহিরের দিকের গৃহসংলগ্ন খোলা জায়গা, ইং court yard. তৎপর্যায়ঃ—আইন্‌না-কো, আগন্না / আগিনা-উব, আগনা/আগনে-হা. হু. বর্ধ. মে. বী. মু, এগন্না-বাঁ, এঘিনা / চাচর / চাতোর-জ. কো, উঠান/উঠন, খলট/খলাট-ফ. ব, বাকুল-রাঢ়. দচ (প্রাচীর বেষ্টিত উঠান)।....বাহির আঙ্গিনা—বারবাড়ি / বাইরবাড়ি ম, খুলি-উব, বাইরাগ / বাইড্ডাগ-ম [<বাড়ির অগ্রভাগ—সামনের দিক]।

আঁচঘর / আঁচিঘর [সং অর্চিগৃহ]-রা—আঁতুড়ঘর। এই ঘরের দরজায় সর্বক্ষণ আগুনের আঁচ রাখিতে দেখা যায়।

আঁচাইল-ম—ঘরের বাহিরে আঁচাইবার স্থান।....আঁচানো [√আঁচা]—উচ্ছিষ্ট হাতমুখ ধোয়া।

আছড়া-উব—মাটি ধরানো বাশের (প্রায় কঞ্চির) বেড়া। ছড়া, জলছড়া। ...ছড়া আছড়া, ছড়াঝাঁট-দচ—প্রতিদিন সকালে উঠান আঙিনা ঝাঁট দিয়া গোবর জলের ছড়া দেওয়া, দুপুরে স্নানান্তে এবং সন্ধ্যায় পবিত্র দেহে ঘর দুয়ারে গঙ্গাজলের বা তুলসীজলের ছিটা দেওয়া গ্রামবাংলার হিন্দু গৃহিণীদের নৈমিত্তিক কর্ম। এখনও কালেভদ্রে ফকিরদের মুখে লক্ষ্মীর পাঁচালী শুনা যায়: 'সকাল বেলা ছড়া দেয় মা সন্ধ্যা বেলায় বাতি। লক্ষ্মী বলে সেই ঘরেতে আমার বসতি ॥'

আজি / আঁজি—দুই ইটের জোড়ের ফাঁক। ডোরা, রেখা। আঁজিমারা—চুন সুরকি বা সিমেণ্ট বালি দিয়া দুই ইটের জোড়ের ফাঁক বন্ধ করা, খড়ামারা

আটচালা—আট চাল বিশিষ্ট ঘর; মূল ঘরের চার চাল এবং চারদিকের বারান্দার চার চাল—এই আটচাল। আর্চালা-ম—আটচালার উচ্চারণভেদ। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, শুধু আটচালের ঘরকেই নহে, চৌচালা, পাঁচচালা, ছ'চালা যে কোন বড় ঘরকেও অনেক সময় আটচালা / আর্চালা বলিতে শুনা যায়। বারোয়ারি অনুষ্ঠানের প্যাণ্ডাল বা মেরাপ (পূজার আটচালা)। নাটমন্দির।

আটন-ম. ত্রি. ফ. ব—খড়ো চালের উপরকার গোল বাখারি। ইহা চালের অপর দিকের চেপটা বাখারির সহিত শক্ত করিয়া বাঁধা থাকে; খড়ের ছাউনির প্রত্যেক পাটও (বাজাড় / বেজাড়) এই আটন দ্বারাই চাপিয়া বাঁধা হয়। তৎপর্যায়:—আটনি-চা, আটনকাঠি /ছানিকাঠি (ছাউনি)-ম. শ্রী, বেতর-কো।

আটন / আটোন-বাঁ. বী. মু—দেবতার পূজার বেদী (ঠাকুর আটোনে উঠেচে)।

আটাল [স° অট্টাল—ছাদের উপরকার ঘর]—কড়িতে ঝুলানো তাক।

আড়—ঘরামী এবং রাজমিস্ত্রীরা উঁচুতে কাজ করিবার সময় কতকগুলি খাড়া লম্বা খুঁটির সহিত আড়াআড়িভাবে আর কতকগুলি বাঁশ বা কাঠ বাঁধিয়া লয়। মিস্ত্রীসমাজে এই কাঠামোকে 'আড়' বা 'ভারা' (scaffolding) বলিতে শুনা যায় (আড় বাঁধা, ভারা বাঁধা)। দুইটি খুঁটির সহিত আড় করিয়া বাঁধা একটি বাঁশ বা কাঠকেও আড় বলা হয়। ঘরে ইহা আলনার কাজ দেয়, ধানকুটুনীরা ইহার উপর শরীরের ভর রাখিয়া ঢেঁকি চালায়, বাহিরে ইহাতে চাষীরা পাট, জেলেরা জাল এবং গৃহস্থেরা কাপড়চোপড় শুকায়।

আড়া, আড়ানি—ঘরের দুই দেওয়াল বা দুই পাড়কে সংযুক্ত করিয়া আড়াআড়িভাবে যে সকল শক্ত মোটা কাঠ বা বাঁশ দেওয়া হয় তাহাদের এক নাম আড়া। তৎপর্যায় :—আড়কাঠ (কাঠের হইলে), আড়বাঁশ (বাঁশের হইলে), এড়ো-হা. মে, ধরনা / ধন্না-উব. পূব, সাতির-মু. ঢা, ভুতৈর-নো, মুদিল-হু. হা। পাকাঘরের ছাদের নীচের এইরূপ মোটা কাঠ বা লোহাকে বলা হয় কড়ি।

আড়া—শস্য বা জমির পরিমাণ বিঃ (চাষ-আবাদ দ্র)।

আড়বাড়ি—দরজার হুড়কা, খিল।....বাড়ি—কাঠের বা বাঁশের দণ্ড বিঃ।

আঁতুড়, আঁতুড়ঘর—সূতিকাগার। তৎপর্যায় :—অশুচ্‌ঘর / অশুজঘর, আঁচঘর / আঁচিঘর-রা, আধোয়া ঘর / আধুয়া ঘর-ম, আশুদাঘর [অশুদ্ধগৃহ] -পা, কুড়্যাঘর-উব, ছুইত্যা ঘর / পোয়াতী ঘর-চট্ট।

আদাউন-শ্রী—আঁস্তাকুড়।

আদাড়—আবর্জনা ফেলিবার স্থান। ···আদাড় পাঁদাড়—বাড়ির পিছনের দিকের অপরিচ্ছন্ন স্থান।····আদাড়ে কচু—যে কচু বিনা যত্নে ঐরূপ জঙ্গুলে স্থানে আপনিই জন্মে।

আধঘরা [<অর্ধগৃহ]—এককালে কুমিল্লা জেলার (বাংলাদেশ) কোথাও কোথাও শয়নগৃহের অর্ধাংশ আবরু বেড়া দিয়া বৈঠকখানারূপে ব্যবহৃত হইত। হয়ত ইহা হইতেই তদঞ্চলে বৈঠকখানাকে 'আধঘরা' বলিতেও শুনা যায়।

আঁধারি-চ, **আন্ধারি**-উব. ঢা. ম [<অন্ধকারকারী]—ছাওয়ার পূর্বে খড়ো চালের কাঠামোর উপর দরমা কি কেশেখড় ইঃর একটা পাতলা আচ্ছাদন দেওয়া

হয়; ইহারই নাম 'আঁধারি'। ইহার ফলে ছাউনি খুব পরিপাটি হয় এবং খড়পাতা চালের খোপ দিয়া মেঝেতে পড়িতে পারে না।

আধোয়াঘর / আধুয়াঘর [< অধৌতগৃহ]-ম (মুস)—আঁতুড়ঘর। এই ঘরে প্রসূতি যতদিন অবস্থান করে, ততদিন উহা সাধারণত ধোয়ামোছা হয় না।

আন্ধনঘর-উব. দচ—রান্নাঘর [আন্ধন < রান্ধন]।

আন্ধাপুকুর / আন্ধ্যাপুকুর-পূব—এঁধোপুকুর-পব; ঝাড়ে জঙ্গলে ঘেরা, দলে দামে ঢাকা অপরিষ্কৃত জলের তথাকথিত পুকুর, যাহার উপর সূর্যের কিরণ বড় পড়ে না ('গাঁয়ের পাছে আন্ধ্যাপুখুর ঝাড় জঙ্গলে ঘেরা। চাইরদিকে কলাগাছ মান্দার গাছের বেড়া'-মৈগী)। পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্র, বিশেষ করিয়া চব্বিশপরগনা ও খুলনা জেলার গ্রামাঞ্চলে এইরূপ শত শত আন্ধ্যাপুকুর বা এঁধোপুকুর চোখে পড়ে। এইগুলিতে বাসনকোসন ধোয়া, কাপড়চোপড় কাচা, নাওয়া, ছোঁচানো, অনেক রকম কাজই চলে। কখনো বা রান্নাবান্নার জলও এই সকল পুকুর হইতে তোলা হয়। ইহাদের এত সংখ্যাধিক্যের কারণ সম্পর্কে বৃদ্ধেরা বলেন, আগুলাতাদি সহ এতদঞ্চলের অধিকাংশ বাস্তুভিটাই এককালের আচোট নাবাল জমি বা ধানের জমির উপর অবস্থিত। এই সকল জমি বাসোপযোগী করিবার প্রয়োজনে মাটি দিয়া ভরাট করিতে হইয়াছে। তৎকালে দূর হইতে মাটি আনার সুবিধা না থাকায় অনেকেই নিজ নিজ বাস্তুর নিকটে বিরাট বিরাট গর্ত খুঁড়িয়া সেই মাটি সংগ্রহ করিয়াছে। ফলে অসংখ্য এঁধোপুকুরের সৃষ্টি হইয়াছে।

আবাজ-ম—আবর্জনা, জঞ্জাল।

আল-উব—পাড় বসাইবার জন্য ঘরের খুঁটি বা খাম্বার মাথায় যে অর্ধচন্দ্রাকার খাঁজ কাটা হয়।....কাঠের আল—এক খণ্ড কাঠ আর এক খণ্ড কাঠের সঙ্গে জুড়িবার সময় যে খাঁজ কাটা হয়, tenon. আলি (ক্ষেতের আল)।

আলং—দুইচালবিশিষ্ট ঘর, দোচালা।

আলধুনা / আলুনদা-ম, **আন্দু**-রা. বগু. [< সং অলন্ধূম]—ঝুল।

আলিসা / আলসে, আইলসা-পূব—ছাদের প্রান্ত, ছাদের নাতি উচ্চ প্রাচীর, cornice। অলস।

আঁস্তাকুড়—আবর্জনাদি ফেলিবার স্থান। পল্লীগ্রামে ইহা সাধারণত বাড়ির পিছনের দিকে থাকে এবং বাড়ির লোকেরাই ইহা মধ্যে মধ্যে পরিষ্কার করিয়া ছিটাছড়া দেয়। তৎপর্যায়:—আইচ্ছাল-ত্রি, আইঠাল-টা, আইড্যাল / উচ্ছিটাল /

উশিট্টাল-ম, আইঠাশাল-ফ. ব, আইগুাল / আঁষট্যাশাল-পা, আঁষ্টল / আঁইষ্টল-মা, আঁষ্টাল / আঁইষ্টাল-রা. কো. রং, আদাউন-শ্রী, আঁচাইল-ম, আঁচানিশাল / ছিটাল-চা, এঁট্যাতল-মু, পচরাশাল-মে, পচরাগাদা-দচ, সারগাদা -মে. বর্ধ, সারকুড়-মু, আদাড় / পাঁদাড় / ক্যাঁদাল-পব. রাঢ়. হা. হু. বর্ধ।

ইঁদারা / ইন্দারা [< ইন্দ্রাগার]—পাকা কুয়া।

ইমারত / এমারত [আ°]—পাকাবাড়ি, অট্টালিকা।

উইস্কি-মা—চালের নিম্নপ্রান্ত, ছাঁচ।

উগর / উগার-ম. শ্রী [< উপগৃহ ?]—ঘরের ভিতর স্বল্প পরিমাণ ধানচাল কলাই সরিষা চিড়ামুড়ি হাঁড়িকুড়ি ইঃ রাখিবার নাতি উচ্চ মাচা বিঃ। পল্লীগ্রামে নিম্ন মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী গৃহস্থের ইহাই ভাঁড়ার। একটা আবরু বেড়া দিয়া ঘরের অপর অংশ হইতে এই অংশটি পৃথক করিয়া রাখা হয়। ইহার উপর গৃহিণীরই কর্তৃত্ব। তিনি ইহার পবিত্রতাও রক্ষা করেন। তৎপর্যায় :—উগৈর -ব. ত্রি. নো. উঘের / হাপার-ব, উয়াইর / উইর-চট্ট।

উচ্ছিষ্টাল / উশিট্টাল [উচ্ছিষ্ট+টাল (স্তূপ)]—উচ্ছিষ্ট, আবর্জনা ইঃ ফেলিবার স্থান (আঁস্তাকুড়)।

উঞ্জটা [স° উচ্চাট > উঞ্জট+আ] -বাঁ. বী—মূল অর্থ, যাহাতে হোঁচট খাইবার সম্ভাবনা আছে, গোবরাট (চৌকাঠ ও তলাঙ্কি দ্র)।

উঠান / উঠন, উডান-পূব. চট্ট—আঙ্গিনা, ঘরের সম্মুখবর্তী খোলা জায়গা। পল্লী বাংলার প্রায় সর্বত্রই উঠান থাকে বাড়ির মাঝখানে, ঘর থাকে উহার চারদিকে। তবে সম্পন্ন গৃহস্থের বাড়িতে ভিতর আঙ্গিনা এবং বাহির আঙ্গিনা দুই-ই দেখা যায়। বারবাড়ির উঠানে অনেককিছু কারবার-দরবার হয়।

উবি-পূব—কপাট জানালা ইঃর ফ্রেমের দুই পাশের খাড়া কাঠ।

উয়ারি [স° উপকারিকা > উঅআরিয়া]—বাড়ির বহির্ভাগ ('তেঁতুল চালিতা বোয়ে ভরিয়া উয়ারি'-বংশীদাস)।

উলুটি / উলোটি-হা. বী—মৃৎপ্রলেপ। **উলটি, উলতি** [হি ওলতী] —ছাঁচ, ওলতি।

উশারা, ওশারা [< উপশালা ?]—বারান্দা, দাওয়া।

এগন্না, এগিনা—আঙ্গিনার রূপভেদ।

এড়ো—ঘরের আড়া। আড়ভাবে টানা রেখা (এড়ো দেওয়া)।

এঁধোপুকুর [এঁধো < আঁধুয়া < আন্ধুয়া (ছায়ায় ঢাকা)]—আন্ধাপুকুর দ্র।

ঐশান [< ঈশান]—ঘরের ঈশান কোণের খুঁটি যাহা গৃহারম্ভের দিন প্রথম পোঁতা হয়।....ঐশানগাড়া, ঐশানতোলা—ভিত দ্র।

ওঁচলা-ক [<উঞ্ছন ?]—জঞ্জাল, আবর্জনা। বাংলায় 'ওঁচা' নীচাশয় ব্যক্তি বা নিকৃষ্ট বস্তুর প্রতি প্রযুক্ত হয় (লোকটা বড় ওঁচা। ওঁচা মাল)।

ওটা / ওডা-ফ. ব. য—পইঠা, ঘরে উঠিবার সিঁড়ির ধাপ।....ওটাচালা—ওটার উপরিস্থ চালবিশিষ্ট বেড়াশূন্য ছোট বারান্দা।

ওঁতাল-বী—আবর্জনা। **ওরসা / ওসসা**-ফ. ব—শয়নঘর সংলগ্ন বারান্দা যাহা রান্নাঘররূপে ব্যবহৃত হয়।

কচড়া-য.ফ. শ্রী—পাটের মোটা দড়ি। নিকৃষ্ট (কচড়া পাট)।

কড়ি—পাকা ঘরের ছাদ ধারণোপযোগী শক্ত মোটা কাঠ, লোহা ইঃ। সামুদ্রিক জীব বিঃ। ঐ জীবের খোলা, কৌড়ি (কড়ি খেলা)। কপর্দক। ধন, টাকাপয়সা ('ফেল কড়ি, মাখ তেল'। 'ঘর বাঁধতে দড়ি, বিয়ে করতে কড়ি')। কর্ণাভরণ বিঃ ('কানে ফটিকের কড়ি মাথাতে জালের দড়ি'-কবিক)।

কপাট, কবাট—দরজার পাল্লা; দ্বার আচ্ছাদক (কপাট ভেজাও)। তৎপর্যায় :-কাওড়-রা, কেওড়-মু (মুস), কেওয়াড়-ম. ত্রি. শ্রী, কেয়াড়-নো, কোয়াড়/কোয়াইড়-উব, দরজা।

কপালি—কপাট বা জানালার ফ্রেমের মাথার কাঠ। -ম—বিবাহের সময় কনের মাথায় পরাইবার শোলার মুকুট। খেজুর গাছের মাথা বা কাঁধ যাহা রসের জন্য চাঁছা হয়। ....কপালী—শিব। সম্প্রদায় বিঃ।

কবজা [আ° কব জহ্]—জানালা, কপাট, বাক্সের ডালা ইঃ আটকাইবার লোহার কল বিঃ, hinges. কবজা, কবজি—মণিবন্ধ, wrist (কবজায় চোট লেগেছে)।....কবজা করা—আয়ত্তে আনা, বশবর্তী করা (কালোবাজারীদের কবজা করা সহজ নয়)।

কলি ধরানো, কলিফেরানো—দেওয়াল ইঃতে চুনকাম করা, ই° white wash....কলিচুন, বাখারি চুন—শামুক ঝিনুক ও জোংড়ার খোলা পোড়াইয়া যে চুন তৈয়ার করা হয় [কলি<আ°/ হি° কলী<Al-qualiy, ই° Alkali. বাখারি<স° বল্কল (শক্ত খোলস বা আবরণ)]। এক সময়ে সমগ্র বাংলায়

চুনকাম করার কাজে যে কলিচুনের ব্যবহার হইত, গ্রামবাংলার 'কলিধরানো', 'কলিফেরানো' কথাগুলিই তাহার প্রমাণ। বর্তমানে কলিচুনের দুর্মূল্যতা ও দুষ্প্রাপ্যতা হেতু উক্ত কাজে পাথুরে চুনই অধিক ব্যবহৃত হয়; তবু কলিচুন উহার সঙ্গে কিছু পরিমাণ মিশাইতে হয়, নতুবা কাজের নাকি সুফল পাওয়া যায় না।

কাইম-ঢা.ফ.ত্রি. নো—সরু বাখারি বিঃ।

কাইম/কায়েম [আ° কায়িম]—পাকা, স্থায়ী (কায়েমি বন্দোবস্ত)।

কাউরি-স্ত্রী—হালর-চ, দেওয়াল ও ছাদের সংযোগস্থল।

কাঙ্গুরা [ফা°]—চিলে কোঠা।

কাঁচাগাঁথুনি—কাদা মাটির গাঁথুনি। সেকালে অনেক পাকাঘরের দেওয়ালও মাটি দিয়া গাঁথা হইত; অবশ্য সেইরূপ স্থলে দেওয়াল ২-৩ ফুট পর্যন্ত চওড়া করা হইত। বাংলার স্থানে স্থানে এখনও এইরূপ বহু বাড়ি চোখে পড়ে।

কাঁচাঘর—যে ঘরের দেওয়াল মাটির এবং চাল খড় খোলা টালি ইঃর।··· কাঁচাবাড়ি —মেটে বাড়ি, যে বাড়ির ঘরের দেওয়াল মাটির বা মাটি ধরানো এবং চাল খড় খোলা ইঃ দ্বারা ছাওয়া।

কাচা-ম. পা.—থেঁতো বাঁশ (কাচার বেড়া)। ধুতির প্রান্ত, যাহা মাতা-পিতার মৃত্যুতে পুত্রগণ গলায় ধারণ করে। [√কাচ্] ধৌত করা (কাপড় কাচা)।

কাচি-দচ—খড়ো চালের রুয়া বা কুরো। -মু—চাষের খণ্ডভূমি (এক কাচি জমি)। -ম. শ্রী—কাস্তে।

কাছারিঘর [স° কৃত্যগৃহ]-ম. শ্রী—বৈঠকখানা, দরবার-গৃহ (কাছারিঘরে বসতে দাও); ····কাছারি—আদালত। জমিদারের সেরেস্তা।

কাছি—পাটের মোটা দড়ি।

কাঁড়ি—তালগাছের ফালি (ঘরের আড়া, কড়ি, পাড় ইঃ রূপে ব্যবহৃত হয়)। স্তূপ (ধানের কাঁড়ি)

কাঁথ, কাঁথি—মাটির দেওয়াল বা পাঁচিল (ঘরের কাঁথ)। বাংলার বহু অঞ্চলে চালাঘরের কাঁথ বা দেওয়াল মাটি দিয়া তৈয়ার করা হয়। কাঁথ শক্ত ও মজবুত করিবার উদ্দেশ্যে কখনো কখনো মাটির সঙ্গে তুষ, গোবর, কুচি কুচি করিয়া কাটা উলুখড় এবং সহজলভ্য হইলে পাথরের টুকরা মিশানো হয়। মাটির দেওয়াল বিশেষ প্রণালীতে অতি পরিশ্রম করিয়া উঠাইতে হয়। উহা

এক নাগাড়ে তৈয়ার করা যায় না। এক একবারে এক ফুট কি দেড় ফুট তুলিয়া কয়েকদিন ফেলিয়া রাখিতে হয়। তারপর আবার উহার উপরে এক ফুট কি দেড় ফুট তোলা হয়। এইরূপে কাজ চলিতে থাকে। দেওয়ালের এইরূপ এক একটি স্তরকে 'পাট' 'ছোপ' 'রদ্দ' ইঃ নামে অভিহিত করা হয়।

কাঁথরা--মু. বী—ভাঙাঘর (কাঁথরার মাটি)।

কাঁদাল / কঁ্যাদাল-হা. হু. বর্ধ. মে—ঘরের পিছনের দিকের অপরিচ্ছন্ন স্থান। তৎপর্যায় :—আনাচ-কানাচ, পিছকাণ্ডা / কানটা-মু, পিছেড়-বী।

কানচা-চ, **কানতা**-ম. ত্রি. নো. ঢা. য. ফ—খাম্বার মাথায় পাড় বসাইবার জন্য অর্ধবৃত্তাকার যে খাঁজ কাটা হয়। তৎপর্যায় :—আল, কানতাই, গাব্বো।

কানাচ / কানাত [আ°]—ছাঁচ, চালের নিম্নপ্রান্ত। ঘরের পিছনের অপরিচ্ছন্ন স্থান (আনাচ-কানাচ)।

কাবারি-য. মু. উব—বাঁশের লম্বা চেপটা ফালি, বাখারি। বরিশালে কাবারি এবং বাখারিতে কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে : কাবারি সুপারিগাছের এবং বাখারি বাঁশের ফালি। **কাবারি**—বাঁশ ও পাতার তৈয়ারি ছাতা বিঃ। ....কাবাড়ী [<কর্বট ?]—হাটুরে, শাকসবজি ফলমূল ইঃ বিক্রেতা ('কুজুড়া কাবাড়ী হৈয়া নানা দ্রব্য আনে বৈয়া, বেচে লৈয়া নগর ভিতর।' —দ্বিজ-হরিরাম)। মৎস্য বিক্রেতা সম্প্রদায় বিঃ ('মৎস্য বেচিয়া নাম ধরাইল কাবাড়ী—কবিক)।

কামটুঙ্গি—জলাশয়ের উপর নির্মিত সেকালের ধনীদের সুরম্য বিহার-গৃহ ('বসন্তকালেতে যেন কামটুঙ্গি ঘর।'—মৈগী)।

কামড়া-মে—চালের বরগা।

কামরা [পো° camara]—কোঠা (দুই কামরার ঘর)।

কামলা—পূর্ববঙ্গে 'কামলা' বলিতে ঘরামী এবং অপর নানা শ্রেণীর শ্রমিক ও শিল্পীকে বুঝায় : ঘরামী ('কামলার কাম বিনোদ তাও ভালা জানে। ভালা কইরা বান্ধে বাড়ী সুত্যা নদীর কানে'-মৈগী)। রাজমিস্ত্রী (রাজকমলা)। ক্ষেতমজুর (ধানকাটার কামলা, বছরের কামলা)। দিনমজুর, জন। মাটিকাটা মজুর ('কামলা ডাকিয়া বিনোদ পুষ্কুনি কাটায়'—মৈগী)। গৃহকর্মে নিপুণ (রামবাবুর পুত্রের বউ ভারি কামলা)। কামলা-রোগ, jaundice.

কামিলা, কাম্মিলা-রাঢ়—কারুশিল্পী ; স্বর্ণকার ('কেমন করিয়া কৈল কামিলার বেটা। শঙ্খের উপর এত নির্মাণের ঘটা।।'-রারচ)। বিশ্বকর্মা ('কামিল্লা বিদায় হয়ে গেল নিজপুরী'—কেক্ষেমা)।

কার-নো. ফ. ব. য—উঁচুতে জিনিসপত্র রাখিবার বাঁশের মাচান। বিপদ ('কারে পড়িলে আল্লার নাম'-প্র)।

কুঠি—বাংলো, ই° bungalow (জজসাহেবের কুঠি)। পণ্যশালা (নীলকুঠি)। কাঁচা মাটির শস্যাধার বিঃ।

কুড়ে, কুঁড়ে [<কুড়িয়া, কুঁড়িয়া]—কুটীর, খড় পাতা দিয়া ছাওয়া ছোট ঘর, hut. ('ভাঙ্গা কুড়্যা ঘরখানি পত্রের ছাওনী'-কবিক)। কুড়্যা-মে. বাঁ. মু, কুড়্যে-বর্ধ, কুইড়্যা-ম. ঢা, কুড়া-ত্রি—কুড়িয়া / কুঁড়িয়ার রূপভেদ। উত্তরবঙ্গের বহু অঞ্চলে কুঁড়্যাঘর বলিতে আঁতুড়ঘর বুঝায়।··· কুড়ে, কুঁড়ে, কুর্গ্যা-চট্ট—অলস (এমন কুঁড়ে লোক দেখিনি)।

কুমা-বাঁ—কুঁড়ে ঘর বিঃ। 'কুমা' এবং মুর্শিদাবাদের উত্তরাঞ্চলের 'কুঁড়্যা'র চাল গোরুর গাড়ি বা নৌকার ছইয়ের ধরন।

কুরুই / কুড়ুই-দচ—ছোট মরাই বিঃ। **কুরো**-ম—চালের বরগা।

কুলঙ্গি / কুলুঙ্গি, কোলঙ্গা—জিনিসপত্র রাখিবার দেওয়ালের খুপরি।

কেওড়, কেওয়াড় [স° কপাট, হি° কিবার]—কাঠের দরজা।

কেচা-ঢা. নো—ফাঁপা বাঁশ কাটাইয়া থেঁতো করিয়া (বেড়ার জন্য) যে আবরণ তৈয়ার করা হয়, ছেঁচা-পব (কেচার বেড়া)।

কেচা—পিষ্ট করা, থেঁতো করা, ছেঁচা।····কেচা কেচা করা—কথার আঁচে সর্বদা জ্বালাযন্ত্রণা দেওয়া। ····কেঁচা—মাছ মারার অস্ত্র বিঃ।

কোঠা [স° কোষ্ঠ, হি° কামরা]—কক্ষ, ঘর, ই° room। কলিকাতা অঞ্চলে পাকাঘরকে কোঠা বা কোঠাঘর এবং পাকাবাড়িকে কোঠাবাড়ি বলিতে শুনা যায়। রাঢ় ও মুর্শিদাবাদের কোথাও কোথাও খড়ের দোতলা ঘরকেও কোঠা বলা হয়। যেমন, মাটকোঠা-মু, মাটকঠা-বাঁ, বাদামে কোঠা, পাখা পেড়ে কোঠা। এই সমস্ত কোঠার চালে ধানের খড়, উলুখড়, গোলপাতা, হোগলাপাতা, তালপাতা ইঃ ব্যবহৃত হয়। অনেকে টালি খোলাও ব্যবহার করে। ৯-১০ ফুট কাঁথের উপর আড়কাঠ বসাইয়া তাহার উপর তক্তা, শরকাঠি, চেটাই, মাদুর ইঃ পাতিয়া দুই এক স্তর মাটি পিটাইয়া ছাদ তৈয়ার করা হয়। দোতলার ক্ষেত্রে, মাটির এই ছাদ বা পাটাতন হইতে চারিদিকের কাঁথ চাল পর্যন্ত আরও ৫-৬ ফুট উঠাইয়া দিতে হয়। পাকা ঘরের দোতলার মতই ইহাতে শয়ন ভোজন করা এবং জিনিসপত্র রাখা যায়।····চিলেকোঠা—ছাদের উপরকার সিঁড়ির পাশের ঘর।····চিলে ছাদ—চিলা ঘরের ছাদ।

কোপা—ছাদ পিট্‌নে, ছাদপেটা মুগুর।

কোবলা—কপাট ও জানালা বসাইবার জন্য দেওয়ালের স্থানে স্থানে রাখা খোলা জায়গার পার্শ্বদেশ যাহা (কপাট ও জানালার) ফ্রেমের বাহিরে থাকে। (তলাঞ্চি দ্র)

কেয়াড় / কোয়াইড—কপাট। বাঁশের দরজা, ঝাঁপ।

কোর-বাঁ. বী. বর্ধ—চালের বাঁক। তৎপর্যায়ঃ—রাগ,জুইত-পুব। কোর দেওয়া চাল (curvilinear roof) বীরভূম এবং মেদিনীপুরেই বেশি দেখা যায়। ময়মনসিংহ এবং ঢাকা অঞ্চলে অত্যধিক কোর দেওয়া দোচালা ঘরকে 'জুইতের ঘর' বলা হয়।

খড়খড়ি—জানালার বিশেষ ধরনের পাল্লা; বন্ধ থাকিলেও ইহার ভিতর দিয়া হাওয়াবাতাস খেলিতে পারে।

খড়া—ইটপাথরের জোড়ের মুখ, আঁজি।....খড়ামারা—আঁজিমারা দ্র।... খড়াকাটা—দাগকাটা।

খরোটি-মু—মাটির দেওয়াল লেপন। ....খরোটি করা—লেপিয়া মসৃণ করা।

খলট / খলাট-ফ. য—বাহির আঙ্গিনা; যেখানে ধান ঝাড়াই মাড়াই হয়।

খলপা—দরমা, চাঁচ, টাট। হাত পায়ের জোড়, গাঁট ('খলপা ছেড়ে গেল রোজ রোজ হাজিরি দিতে এসে'—বাংলার চালচিত্র)।

খাটাল / খাডাল-ফ. ব, **খাড়াল**-নো—ঘরের মেঝে।

খাটাল-পু—ঘর, কামরা। দুই থাম্বার ব্যবধান। যেখানে বহু সংখ্যক গোমহিষাদি রাখা হয় (খাটাল থেকে দুধ আনা)।

খাড়িয়া-মা—প্রস্রাব করিবার স্থান।

খানকা / খানগা-উব (মুস)—বৈঠকখানা, সদরঘর।

খানাবাড়ি—বসতবাড়ি। জমিদার বা বড় জোতদারদের বসতবাড়ি সংলগ্ন বাড়ি ও জমি (খানাবাড়ির প্রজা)।....**খানা** [ফা°]—স্থান (ডাক্তার—, গোসল—)। গৃহ, বাড়ি (খানাতল্লাস)। [পো° cana]—খাত, ডোবা (খানাখন্দ)। [হি°]—রন্ধিত খাদ্যবস্তু (খানা প্রস্তুত)। [< খণ্ড] সংখ্যা, বস্তু বা বিষয় নির্দেশক (পাঁচখান, মুখখানা, কাণ্ডখানা)।

খাপ, খাপাসি, খাবাসি—বাখারি (বেড়ার—)। খাপ [ফা°] আধার, case (চশমার—); কোষ, sheath (তরোয়ালের—)।....খাপখাওয়া—

মানান-সই হওয়া।....খাপছাড়া [ফা°]—অসম্বদ্ধ, বেমানান।....খাপপাতা—আক্রমণের জন্য (পশ্বাদি সম্পর্কে) ওত পাতিয়া থাকা।

খাপরা [সং খর্পর]—খোলা (খাপরার চাল)। ভাঙ্গা হাঁড়ি কলসীর টুকরা, খোলামকুচি। মাটির খুরি, প্রদীপ।....খাপরি / খাপুরি—মাথার খুলি।

খাপরেল—খোলা। খোলার ঘর।

খাম, খাম্বা—ঘরের খুঁটি ('ভেরেণ্ডার খাম তার আছে মধ্য ঘরে'—কবিক)।

খাম [ফা°]—লেফাফা envelope (খামের চিঠি)।

খিড়কি [সং খড়ক্কিকা]—বাড়ির পিছনের দরজা (খিড়কি দরজা)। জানালা। পূর্ববঙ্গে জানালা অর্থেই খিড়কি বা খেড়কির প্রয়োগ অধিক শুনা যায়।

খিল [সং কীল]—অর্গল, হুড়কা (দরজার খিল)। গোঁজ, কীলক। অনাবাদী, পতিত (খিলজমি)। অঙ্গের সঙ্কোচন (খিলধরা)।

খুঁচি দেওয়া-য—বৃষ্টির জলপড়া বন্ধ করিবার জন্য পুরাতন খড়ো চালে (যেখানে আবশ্যক) নূতন খড় গুঁজিয়া দেওয়া। তৎপর্যায় :-গুঁজা দেওয়া / ছিটে দেওয়া-চ. ন. মু, খোসা দেওয়া-উব।

খুঁটা / খোঁটা, খুঁটি-পব—বাঁশ কাঠ ইঃর থাম, post (ঘরের খুঁটি)। গোঁজ, peg.

খুলি-উব—বাড়ির আঙ্গিনা ('বাড়ির গোরু খুলির ঘাস খায় না'-প্র)।

খোয়া—ইট পাথরের ভাঙা টুকরা।....খোয়া ভাঙা—ইট পাথর ভাঙিয়া টুকরা টুকরা করা। বনিয়াদ গড়িতে এই খোয়ার প্রয়োজন হয়।

খোলা / খলা-ম—শস্যাদি ঝাড়াই মাড়াই করিবার স্থান (ধানের খলা)। খণ্ডভূমি (ইটখোলা) (চাষ-আবাদ দ্র)।

খোলা-ফ. ব—লৌকিক দেবতার পূজার স্থান (শীতলা খোলা)।

খোলা—খাপরা (খোলার চাল)। খোসা, ছাল, আবরণ। কলার পেটো। মুড়ি চিড়া ভাজিবার পাত্র।

গচি-ঢা—বেড়ার খুঁটি। -বী. রং.—পাঁকাল মাছ।

গজ-ম. শ্রী—ঘরের পাশের দিক (গজের বেড়া)। ষাঁড়ের ঝুঁটি। -নো—ছিঁচকা। [ফা°] দুই হাত বা ৩৬ ইঞ্চি। গজ মাপিবার কাঠি বিঃ, গজকাঠি। [সং] হস্তী। **গজাড়**-য, **গজাল**-ম—বড় পেরেক। শাল মাছ।

গড়াথান-মে—গোয়ালের বাহিরে গোরুকে জাব দিবার নির্দিষ্ট জায়গা (ঢাকা অথবা খোলা)।

গড়িয়া-পূব, **গড়ৈয়া**-নো, **গড়াং**-চট্ট—উগার বা মাচার আড়া।

গড়ের ঘাট-বর্ধ, **গেড়িয়া ঘাট**-মে—ডোবা পুকুর ইঃর ঘাট।

গড়েলা-চ—করিডর, corridor। **গরাদে** [পো° grade] জানালার কাঠের বা লোহার শলা। **গাতাঘর**-পু—ভাঁড়ার, store house

গাবহারা-চ—ঘরের চারদিকের খুঁটির সঙ্গে আড়াআড়িভাবে চারটি বাঁশ বাঁধিয়া দিলে খুঁটিগুলির তথা ঘরের খুব জোর হয়। এইরূপ বাঁশ বাঁধাকে 'গাবহারা দেওয়া' বলে।

গাব্বোকাটা-দচ—খুঁটির মাথায় পাড় বসাইবার জন্য খাঁজ কাটা।

গারা-মু—ইষ্টকাদি গাঁথিবার কাদামাটি, জাওন।

গিরজা / গির্জা [পো° igreja]—খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বীদের উপাসনা মন্দির।

গিরটিঘর-ফ—শয়ন ঘর, bed room. **গোচ**-উব—হুড়কা বিঃ।

গোচালা—ইহার আক্ষরিক অর্থ গোরু থাকিবার ঘর, গোশালা ; কিন্তু পূর্ব ময়মনসিংহের বহুস্থানে 'গোচালা'র ব্যবহারিক অর্থ—গোরুর খাইবার খড়-নাড়া যে ঘরে রাখা হয়। **গোঁজা**-বী.মু—আবর্জনা।

গোবরাট [স° গর্ভকাষ্ঠ]—দরজা জানালা ইঃর ফ্রেমের নীচের কাঠ।

গোয়াল, গোহাল [<গোশাল]—গোরু থাকিবার ঘর। তৎপর্যায়ঃ- গোহিল-মু, গোহালি-জ. কো. রং, গোয়াইল-ম. ঢা. শ্রী. ত্রি, গু'য়্যাল-বাঁ. বী, গুওল-চ. ন. ব. হা, গইলি/গো'ল-খু, ভাওর-ফ. ব, আগদার-পা। পূর্ববঙ্গের গোয়াল সাধারণত দোচালা ঘর এবং উহার প্রধান দরজা ও বারান্দা আড়ের দিকে থাকে। সেই দরজার মুখেই প্রতি সন্ধ্যায় সাঁজাল (তুষঘসির ধোঁয়া) দেওয়া হয়। বহু অঞ্চলে আবার পৃথক গোয়াল বড় দেখা যায় না। বারান্দায়, ছাঁচতলায়, খোলা উঠানে গোরুগুলি বাঁধা থাকে। কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি অঞ্চলে বাছুরগুলিকে প্রায়ই একটি পৃথক ঘরে রাখা হয়, এবং বাঘের ভয়ে উহা বেশ সুরক্ষিতই করা হয়। এই ঘরের নাম **খপরা**।

গোরোট-মু—ভিত্তি।

গোলা, গোলাঘর—শস্যাগার, যে ঘরে শস্যাদি (বিশেষ করিয়া ধান) রাখা হয়। তৎপর্যায় ঃ—আউড়ি-ব. খু, কুড়ুই / ঠিকরি-দচ, বাখার-মু. বী. বর্ধ. মে, মরাই -পব. রাঢ়, মাচা-মে. উব, মুরকি-জ. কো. রং, হামার-বাঁ.মে।

বাংলাদেশের বহু অঞ্চলে আয়ত বা চতুরস্র আসনবিশিষ্ট কোনও চালাঘর গোলারূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পশ্চিমবঙ্গের রাঢ় ও গাঙ্গেয় অঞ্চলে

(মু. ন. চ. হা. হু. বর্ধ. মে. বাঁ. বী. পু....) গোলার আসন বৃত্তাকার এবং চালের গড়ন বরের টোপরের ন্যায় অনেকটা ছুঁচালো। (ক) **বর্ধমান ও বাঁকুড়ার মরাইয়ে** সাধারণত কোনও কাঠ বা বাঁশের খুঁটি পোঁতা হয় না। খড়ের আঁটি এবং খড়ের দড়ি ইহার প্রধান উপকরণ। বৃত্তাকার একটা শক্ত মাচার উপর গদির মত করিয়া কতকগুলি খড়ের আঁটি, চাটাই, তালাই পাতিয়া দেওয়া হয়; আর কতকগুলি আঁটি বৃত্তাকারে খাড়া রাখা হয়। একদিকে উহাতে ধান তোলা হইতে থাকে, আর একদিকে খড়ের মোটা দড়ি (বড়্) বাখারির মত ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া মরাইয়ের বেড়া তৈয়ারির কাজ চলিতে থাকে। ধান তোলা সম্পূর্ণ হইলে আধারটির উপরিভাগ খড়ের বহু আঁটি দিয়া ঢাকিয়া দেওয়া হয়। এই ঢাকনিই মরাইয়ের চাল,—টোপরের মত ক্রমশ সূক্ষ্ম হইয়া উপর দিকে উঠে; ছাঁচা, আসন, বেড়া সবই বৃত্তাকার। ধান বাহির করিবার সময় খড় এবং বড়্ উপর হইতে আস্তে আস্তে খসাইয়া লইতে হয় এবং মরাইটির ক্রমে লয়প্রাপ্তি ঘটে; আবার নূতন ধান গৃহগত হইলে সে পুনর্জন্ম লাভ করে। (খ) **চব্বিশপরগনা এবং নদীয়ার মরাই** বর্ধমানের উক্ত মরাইয়ের ন্যায় এত অস্থায়ী নহে; একবার নির্মিত হইলে বেশ কয়েক বৎসর চলিয়া যায়। ইহা কাঠের গুঁড়ির শক্ত মাচার উপর বাঁশের শলা (ফাড়া বাঁশ) বৃত্তাকারে খাড়া করিয়া তাহাদের সহিত বাখারি বুনিয়া তৈয়ার করা হয়। ৭-৮ ফুট উঁচু ড্রামের ধরন ঐ ধান্যাধারের উপরে বরের টোপরের আকার চাল বসে। চালের ছুঁচালো মাথাটি একটি গামলা বা নাদা দিয়া ঢাকিয়া দেওয়া হয়। (গ) **মেদিনীপুর এবং বাঁকুড়া অঞ্চলে** মরাইয়ের বেষ্টনীতে মাটির ঘন প্রলেপ দেওয়া হয়। এইরূপ মাটি ধরানো মরাইকে **'হামার'** বলিতেও শুনা যায়।

ঘর [সং গৃহ]—গৃহ, কক্ষ, room (ঘরে যাও)। ২ বাড়ি (তোমার ঘর কোথায়)। ৩ রেখাবেষ্টিত স্থান ('ষোলঘরে ষোল বর্তী, তার এক ঘরে আমি বর্তী'—সেঁজুতি ব্রতের ছড়া)। ৪ গর্ত, বাসা (সাপের ঘর)। ৫ খোপ (দাবার ঘর কাটা ছক)। ৬ স্থান (বোতামের ঘর। তার স্ত্রীর ঘরে শূন্য)। ৭ বংশ (ঘরবর দেখা)। ৮ পরিবার (পাঁচঘর ব্রাহ্মণ)। ৯ সংসার (ঘর ভাঙানো। তার ঘর সংসার সবই মিছে)। ১০ দল (পীতালের ঘর 'নিমাই সন্ন্যাস' গাইবে)। ১১ প্রতিদিন ('মারিয়া বনের হাথি যার ঘর ভক্ষ'—রামম)। ....**ঘর করা**—স্ত্রী কিংবা স্বামী লইয়া বাস করা।....**ঘর তোলা/ঘর বাঁধা**—গৃহ নির্মাণ করা।....**ঘরকন্না**—গৃহের কাজকর্ম, গৃহস্থালি।....**ঘর উল্‌লানো**—নূতন

করিয়া ছাওয়ার জন্য চালের পুরাতন ছাউনি ফেলিয়া দেওয়া।....ঘর ভাঙানো ....কুমন্ত্রণা দিয়া গৃহবিচ্ছেদ ঘটানো।....ঘরজোড়া—যাহা দ্বারা ঘর সুশোভন হয় (ঘর জোড়া বউ)।....ঘরমুখো—গৃহগত প্রাণ, যে কেবলই গৃহের দিকে ছুটে।....ঘরসন্ধানী—যে গৃহের গোপন খবর রাখে (ঘরসন্ধানী বিভীষণ)।... ঘরপোড়া—যে ঘর পোড়ায় বা পুড়াইয়াছে (ঘরপোড়া হনুমান)। যার ঘর পুড়িয়াছে (ঘরপোড়া গোরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ভয় পায়-প্র)।....ঘরজামাই —যে জামাই শ্বশুর বাড়িতে থাকে।..ঘরপাতা—ঘরে নিজের তত্ত্বাবধানে তৈয়ারি (ঘরপাতা দই)।....ঘরপোষা—গৃহপালিত (ঘরপোষা ময়না)।

ঘর/গর—বাংলার কোথাও ষষ্ঠী বিভক্তির, কোথাও বা দ্বিতীয়া বিভক্তির চিহ্ন রূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন, আমারঘর-দচ. ছ—আমাদিগকে ('মারিয়া আমারঘর খেদাড়ে দিলেক।'—রায়ম)। আমাগর-ঢা—আমাদের। তোমাগর-ঢা—তোমাদের। উত্তরবঙ্গে আবার রাজবংশীদের কথিত ভাষায় ঘর/ঘেরে শব্দযোগে একবচনান্ত পদ বহুবচন হইয়া যায়। যেমন, তোমারঘর—তোমরা। যামারঘর —যাহারা। তামারঘরের—তাহাদের। হিন্দুঘেরে—হিন্দুদের।

ঘরামী/-মি [সং গৃহকর্মী] -চ. ন. মু. বর্ধ. মে—যে কাঁচা ঘর দুয়ারের কাজ করে অর্থাৎ খড়ো ঘর ইঃ তৈয়ার করে। তৎপর্যায় :—কামলা-পূব, ছাপরবন-পূব. উব. শ্রী, ছৈয়াল-ঢা. নো, পাইট -দি. মা, বাড়ই / বাড়ুই-বর্ধ. বাঁ. বী. পু।

ঘাট [সং ঘট্ট, সংঘট্ট]—জলাশয়াদিতে নামিবার নির্দিষ্ট স্থান। পাকা ধাপযুক্ত ঐরূপ স্থানকে 'ঘাটলা' বলিতেও শুনা যায়। ঘাটে জল আনা, বাসনকোসন মাজা, কাপড়চোপড় কাচা, নাওয়া ইঃ নানা কাজে গ্রাম বাংলায় বহুলোকের সমাগম হয়, নানা রকম আলাপআলোচনা চলে, গল্প গুজবের সৃষ্টি হয়। বহু পল্লীগীতি ও গীতিকায়, মানবিক প্রেমসঙ্গীতে, বৈষ্ণব পদাবলীতে, গল্প উপন্যাসে জলের ঘাট একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছে।....খেয়াঘাট—নৌকাদি যোগে নদী পার হইবার স্থান।....কুতঘাট—নৌ-শুল্কাদি আদায়ের স্থান।

ঘাট—অন্যায়, ত্রুটি (ঘাট হওয়া)। পর্বত মধ্যস্থ সঙ্কীর্ণ পথ, pass। ঘাটকাম, মৃতাশৌচের শেষদিনে ঘাটে বসিয়া ক্ষৌরকর্ম, মস্তক মুণ্ডন, স্নান, নববস্ত্র পরিধান ইঃ কৃত্য (ঘাট কবে?)।....ঘাটে যাওয়া—মলত্যাগ করিতে যাওয়া।

ঘাঁটা-উব, **ঘাঁডা**-চট্ট—পথ, গ্রাম্য পথ (ঘাঁটায় ঘাঁটায় মালের ফুল। মার

বাড়ি ব্যান কতদূর'—বলোসা)। কড়া (আঙ্গুলে ঘাঁটা পড়া)। আলোড়ন করা।....ঘাঁটায় যাওয়া—মূত্র ত্যাগ করিতে যাওয়া।

চটা-বাঁ. বী. মু. ম. ঢা—বাঁশ ফাটাইয়া থেঁতো করিয়া ঘরের বেড়ার জন্য যে আয়ত উপকরণ তৈয়ার করা হয় (চটার বেড়া)। এই 'চটা'কে গাঙ্গেয় অঞ্চলে 'ছেঁচা' বলিতে শুনা যায়। আবার বহু অঞ্চলে (ফ. ব. য. খু) '**চটা**' বলিতে বুঝায়—সাধারণ বাখারি। **চটা**—বাঁশ কাঠ ইঃ র উপরের পাতলা স্তর, চাকলা (চটা উঠা)। **চটা** [√চট্]—রাগ করা (চটে ওঠা)।

চটি-ম. শ্রী. ঢা.—ছোট বাখারি। -বাঁ. মু. বর্ধ—তালপাতার আসন। পাতলা (চটি বই)। সরাই inn। জুতা বিঃ (বিদ্যাসাগরের চটি)।

চণ্ডীমণ্ডপ-পব—যে মন্দিরে ঠাকুরদেবতার পূজা, বিশেষ করিয়া দুর্গাপূজা হয়। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণেরা এককালে এই ঘরে বসিয়া নিত্য চণ্ডীপাঠ করিতেন এবং এখনও কেহ কেহ করিয়া থাকেন। চণ্ডীমণ্ডপ সেকালে পাঠশালারূপেও ব্যবহৃত হইত। এই সম্পর্কে শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন, গুরুগণ "কোনও ভদ্রগৃহস্থের গৃহে বাহিরের চণ্ডীমণ্ডপে পাঠশালা খুলিতেন। প্রাতে ও অপরাহ্নে পাঠশালা বসিত। একমাত্র শিক্ষক গুরুমহাশয় বেত্রহস্তে মধ্যস্থলে একটি খুঁটি ঠেসান দিয়া বসিয়া থাকিতেন। সর্দার পড়ুয়ারা অর্থাৎ উচ্চশ্রেণীর বালকেরা সময়ে সময়ে শিক্ষকতা কার্যে তাঁহার সহায়তা করিত। বালকেরা স্বীয় স্বীয় মাদুর পাতিয়া বসিয়া লিখিত।... তৎকালে পাঠ্যগ্রন্থ বা পড়িবার রীতি ছিল না।....বালকেরা প্রথমে মাটিতে খড়ি দিয়া বর্ণ পরিচয় করিত, তৎপরে তালপত্রে স্বরবর্ণ, ব্যঞ্জনবর্ণ, যুক্তবর্ণ, শটিকা, কড়াকিয়া, বুড়িকিয়া প্রভৃতি লিখিত; তৎপর তালপত্র হইতে কদলীপত্রে উন্নীত হইত; তখন তেরিজ, জমাখরচ, শুভঙ্করী, কাঠাকালী, বিঘাকালী প্রভৃতি শিখিত; সর্বশেষে কাগজে উন্নীত হইয়া চিঠিপত্র লিখিতে শিখিত।" ...

শুধু পাঠশালা নয়, চণ্ডীমণ্ডপে তখন গ্রামের বড়দেরও মজলিশ বসিত; সামাজিক, বৈষয়িক এবং ধর্মীয় বহু জটিল সমস্যার এখানেই সমাধান হইত। মণ্ডপ, পূজামণ্ডপ, মাণ্ডোবঘর-পা, ঠাকুরদালান, মেঢ়, মেলা—চণ্ডীমণ্ডপের বিবিধ সমনাম।

চণ্ডীশাল-হিজ—রান্নাঘর। এককালে নিম্ন মধ্যবিত্ত সমাজে বিবাহের পাত্রী নির্বাচনে ভাল রান্না করিতে জানা পাত্রীর একটি প্রধান গুণরূপে বিবেচিত হইত। মুকুন্দরাম পাত্রপক্ষের কাছে ফুল্লরার গুণের পরিচয় দিতে লিখিয়াছেন,

'রন্ধন করিতে ভাল এই কন্যা জানে। যত বন্ধু আইসে তারা কন্যাকে বাখানে॥' কোন কোন কুমারী ব্রতে কুমারীরা আজও প্রার্থনা করে, 'মরিয়া মনুষ্য হব, দ্রৌপদীর মত রাঁধুনি হব।'—দশ-পুত্তলি ব্রত। শিব-ঘরণী চণ্ডীও যে একজন পাকা রাঁধুনি ছিলেন, শৈবগীতিতে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। অনেক বৃদ্ধার মুখে শুনা যায়, চণ্ডী রন্ধনশালার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা; তাঁহার সুদৃষ্টির উপরই রন্ধনের উৎকর্ষ নির্ভর করে। রান্নাঘরকে তাঁহারা চণ্ডীশালের মতই পবিত্র মনে করেন এবং কোনও সামাজিক ব্যাপারে রন্ধনকার্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে সেখানে চণ্ডীর ঘট বসাইয়া পূজা দিয়া থাকেন।

চবুতারা [সং চত্বর > চবুতারা] -শ্রী—চাতাল, খোলা বারান্দা।

চাং, চাঙ্-ম. শ্রী. ত্রি. চা—ঘরের ভিতর উঁচুতে জিনিসপত্র তুলিয়া রাখিবার মাচা বিঃ, চেঙ্-দচ (চেঙে থেকে কইচে)। -কো. রং—মাঠে শস্যাদি পাহারা দিবার উচ্চ মাচা বা মাচার উপর নির্মিত কুঁড়ে।

চাঙ্গি-শ্রী—পুথিপুস্তক তুলিয়া রাখিবার স্বল্প পরিসর মাচা বিঃ। -মা—মড়া বহনের বাঁশের মাচা বিঃ। **চাংরা**—মাচা দ্র।

চাঁচ—চাটাই, দরমা, মাদুর, নলঘাসের আস্তরণ-ব।

চাটি-জ. কো. রং—চাটাই দরমা ইঃর বেড়া। তৎপর্যায়ঃ—আগড়, টাট, টাটি। **চাটি, চাঁটি**—করতল দ্বারা আঘাত, চড় (তবলায়—, মাথায়—)।

চাতাল [সং চত্বাল]—পাকাঘরের অনাবৃত বারান্দা, রোয়াক। উঠান, পাকা উঠান (ধানকলের—)। উত্তরবঙ্গে (জ. কো. ত.) এক একজন জোতদার এবং তাহার আধিয়ারদের একত্র বিন্যস্ত বাড়িঘর চাতাল, চাতর, টারি ইঃ নামে অভিহিত হয়। সেদিকে এইরূপ কয়েকটি চাতাল মিলিয়া এক একটি গ্রামের পত্তন হইয়াছে।

চান্দরা-চা,**চান্দসা**-টা, **চান্দারি**-ম—দোচালা ঘরের আড়ের দিকের বেড়ার উপরকার ত্রিকোণাকার (অনেকটা অর্ধচন্দ্রের গড়ন) আচ্ছাদক বা ঝাঁপ। তৎপর্যায়ঃ—চাঁদার/মুরলি-দচ, চান্দার-ব.ফ.ম, চান্দুয়ারি/চাঁওয়ারি-উব, ঝাঁপ, ভেলকি-পুব। পূর্ববঙ্গে ঝাঁপ এবং ভেলকি বলিতে ঘরের দৈর্ঘ্যের দিকের বেড়া ও কপালির উপরকার আচ্ছাদককেও বুঝায়; কোচবিহার এবং রংপুরে ইহার চানকা, চানয়া নামও শুনা যায়।

চাল—গৃহাদির উপরকার আচ্ছাদন। খড়ো বা কাঁচাঘরের আচ্ছাদন সম্পর্কেই

'চাল' কথাটি প্রযুক্ত হয় (খড়ের চাল, খোলার চাল)। পাকাঘরের সিমেন্ট ঢালাই খোয়া ইঃর আচ্ছাদনকে বলে ছাদ, roof.

পাকাবাড়ির সমতল ছাদের কথা ছাড়িয়া দিলে সমগ্র বাংলা (পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশ) ও ত্রিপুরায় আয়ত আসনবিশিষ্ট ঢালু চালযুক্ত ঘরই বেশি চোখে পড়ে। অত্যধিক বৃষ্টিপাত হয় বলিয়া এই সব অঞ্চলে কাঁচা মাটির বা খড়পাতার সমতল (অঢালু) ছাদ বা চাল অচল। তবে সম্পন্ন গৃহস্থের বাড়িতে, লৌকিক দেবতার পূজার থানে টিন খোলা বা এসবেস্টসের ছাওয়া সমতল চালের ঘরও (একচালা) দেখা যায়। রাঢ়, ঝাড়খণ্ড ও গাঙ্গের অঞ্চলে গোলা বা মরাইয়ের আসন এবং চালের ছাঁচ বৃত্তাকার ; চাল বরের টোপরের মত ক্রমশ সূক্ষ্ম হইয়া উপর দিকে উঠে। সেই ছুঁচালো মাথাটি নাদা বা গামলা দিয়া ঢাকিয়া দেওয়া হয়। নৌকা বা গরুর গাড়ির ছইয়ের ধরন চালবিশিষ্ট ঘরও চোখে পড়ে। তবে সেগুলি প্রায়ই যাযাবর গোষ্ঠী লোকেদের এবং শস্যক্ষেত্রাদি পাহারা দিবার চাষীদের অস্থায়ী কুড়ে। (কোর দ্র)।....চালচুলা —বাসস্থান এবং আহারের সংস্থান (তার চালচুলো কিছুই নেই)।

চাল—প্রতিমার পিছনের পট (চালচিত্র)। চাউল। আচারব্যবহার (বড়লোকী—)। ঐশ্বর্যজ্ঞাপক উক্তি বা আচরণ (চালমারা)।....চালচলন —আচারব্যবহার, রীতিনীতি।

চালা, চালাঘর—খড় খোলা ইঃর আচ্ছাদনবিশিষ্ট ঘর। একচালা, দোচালা চৌচালা, আটচালা, সবই চালাঘরের অন্তর্গত। উল্লেখযোগ্য যে, বাংলাদেশের বহু অঞ্চলে কোনও সংখ্যার উল্লেখ না করিয়া শুধু 'চালা' বলিলে টিন বা এসবেসটসের ছাওয়া একচালবিশিষ্ট ঘরকেই বুঝায়। তৎপর্যায়ঃ—চালি/চায়লা -ম, ছায়লা-ফ, ছাপরা-পূব।

চালা-ন—ইঁদুরের গর্ত। চালুনি (খইচালা)।

চালা [√চাল্]—চালুনি দ্বারা শস্যাদি হইতে তুষকনা কাঁকর মাটি ইঃ পৃথক করা। মন্ত্রদ্বারা চালিত করা (বাটি চালা)। সরানো, একস্থান হইতে অন্যস্থানে নেওয়া (দাবার ঘুঁটি চালা)। নাড়ানো (হাত পা চালা)।

চালি-ম—এক চালবিশিষ্ট ঘর (প্রায় টিনের)। প্রতিমার পিছনের পট, চাল। -টা. উব—বারান্দা। -ম. ফ—নৌকার বসিবার বাঁশের মাচা। -চ —ধান ঝাড়ার বাঁশের মাচা। -টা. মু—কাঠের চালি। বড় বড় নদীতে বহু সংখ্যক শালকাঠ ভেলার মত সাজাইয়া নৌকার সহিত বাঁধিয়া টানিয়া নিয়ে

দেখা যায়। কাঠের এইরূপ ভেলাকার সারিকেও 'চালি' বা 'কাঠের চালি' বলিতে শুনা যায়।

চিক [তু°]—বাঁশের সরু কাঠির পর্দা বিঃ, screen. গলার অলঙ্কার বিঃ।

চিপা/চিপে-য—বাখারি। -রা—কৃপণ। -ম—সঙ্কীর্ণ স্থান। চিপা [√চিপ্] —নিংড়ানো (ভিজা কাপড় চিপা)।

চেকার/চেগার [সং চক্র]-পূব. উব—চেকওয়ার-রং, বাড়ির চারদিকের বাঁশের আবরু বেড়া (চেগার ঘেরা বাড়ি)। ইট পাথরের এইরূপ পাকা বেষ্টনীকে বলা হয় দেওয়াল, সারদেওয়াল-পূব, পাঁচিল<প্রাচীর। বাংলার দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলের অধিকাংশ ঘরবাড়িরই দেওয়াল মাটির।

চেঁচাড়ি, চেয়াড়ি [চঞ্চালী-চর্যাপদ]—বাঁশের পাত বা পাতলা কাঠি যাহা দ্বারা চেটাই, ঝাঁপ, দরমা, ডালা, কুলা ইঃ তৈয়ার করা হয়। পূর্ববঙ্গে বাঁশের এইরূপ পাতকে বাঁশের বেত বা বেতি বলা হয়। চাল বেড়া ইঃ বাঁধাছাঁদার কাজে ব্যবহৃত অপুষ্ট কাঁচাবাঁশের পাত তদঞ্চলে তোয়াল/তুয়াল নামে পরিচিত।

চিয়াড় (-ড়ি) / **চেয়াড** (-ড়ি)—বাঁশের ধারাল ছাল, ছিলকা-ম।

চৌকাঠ—দরজা জানালা ইঃর ফ্রেমের চৌপল কাঠ। উপরের কাঠটিকে বলা হয় কপালি, নীচেরটিকে গোবরাট, উঞ্জটা, ডেওয়া, দুইপাশের দুইটিকে বাজু, উবি।

চৌচালা—চার চালবিশিষ্ট ঘর। তৎপর্যায়ঃ—চৌকারি-ম.শ্রী, চৌয়ারি-উব.ফ. ব.নো.চট্ট, চৌরি-ন, নিমের চালা-ব। বড় চৌচালাকে আটচালা/আটচালা বলিতেও শুনা যায়। **চৌবড়**-মা, **ছনদার**-জ.কো—বহির্বাটি।

ছপ্পর, ছাপ্পর—আচ্ছাদন, চাল (প্রায় খোলার)।

ছাউনি [<ছাদনী]—আচ্ছাদন (খড়ের ছাউনি)। চাঁদোয়া ('ছাউনি নাড়ার সময় হ'ল এয়োরা দাঁড়াও' -গৌরবচন-চ)। সেনানিবাস।

ছাওয়া [√ছাহ<ছদ্]—আচ্ছাদিত করা (ঘরের চাল—), ছাহা -মু, ছাওন-পূব। আচ্ছাদিত (আকাশ মেঘে ছাওয়া)। ছাওয়া—ছায়ার আঞ্চলিক রূপভেদ (ছাওয়ায় যাও)।

ছাঁচ—চালের নিম্নদিক যাহা ঘরের বেড়া বা দেওয়ালের বাহিরে থাকে, চালের যেস্থানহইতে বৃষ্টির জল গড়াইয়া মাটিতে পড়ে। তৎপর্যায় :—অইল, অলতা-রা. দি, উইস্কি-মা, উলটি / উলডি-ম, উলতি / ওলতি-টা. ত্রি, ওলথিয়া-জ. কো, ছকা-টা. নো, ছাঁইচ / ছেঁইচ-শ্রী. ত্রি. ফ. ব, ছাইকা-টা, ছাকা-উব, ছাঁচা-মে.

বর্ধ. বাঁ. বী. পু. মু. ছেঁচে / ছ্যাঁচ-য. খু, হাঁইচ-চট্ট, কানাচ, ই° eaves।....

ছাঁচতলা—বর্ষায় ছাঁচের জল যেখানে গড়াইয়া পড়ে। উত্তরবঙ্গের কোথাও কোথাও গায়েহলুদ উপলক্ষে কনেকে ছাঞ্চাতলায় বসাইয়া নাওয়ানো হয়। ওঝারা কোন কোন ক্ষেত্রে রোগীকে ছাঁচতলায় দাঁড় করাইয়া, ছাঁচের তিনগাছা খড় হাতে লইয়া ঝাড়ফুঁক করে।

ছাঁচ [< সঞ্চ]—যাহাতে ঢালিয়া বা চাপিয়া নির্দিষ্ট আকারে কোনও বস্তু তৈয়ার করা যায় (ছাঁচের প্রতিমা, নাড়ুর ছাঁচ)। চিনির খেলনা। প্রতিকৃতি, সাদৃশ্য। ঠাট, ছন্দ ('মিছেঁ ছাঁচে কাহ্নাঞিঁ ভাণ্ডাআঁ যাই ঘরে'—শ্রীকৃ)।

ছাঁচকুড়—পিছেড়, ঘরের পিছনের দিকের অপরিচ্ছন্ন স্থান।

ছাঁটন / ছাটনি-য—চালের বাখারি। ছাটনি-ম—পাঁজরের হার।

ছানি-পুব—চালের ছাউনি (বর্ষা এসে গেল, চালে ছানি নাই)। চোখের ছানি cataract (চোখে ছানি পড়া)। গোরুর জাব, কাটা খড় ইঃ। ইঙ্গিত [< শানী] (হাতছানি দিয়ে ডাকা)। কোনও মোকদ্দমার (রায় বাহির হওয়ার পর) পুনর্বিচারের প্রার্থনা [< আ° সানী]।

ছানিকাটি-ম—খড়ো চাল ছাওয়ার কাজে ব্যবহৃত বাখারি বিঃ।

ছাপরবন-পুব. শ্রী. ত্রি—ছাপর (ছপ্পর) বানায় যে, ঘরামী, বাড়ুই ('ছাপর বনের টুই উদাম'-প্র)।

ছাপরা-পুব—ছোট ঘর, একচালবিশিষ্ট ঘর। তৎপর্যায় :—ছাপটা-শ্রী, ছায়লা-য, চায়লা / চালা-ম।

ছিটকন-জ. কো—চালের ফ্রেম বা কাঠামো।

ছিটকিনি-পব, **ছিটকারি**-য—দরজা জানালা বন্ধ করিবার কীলক বিঃ, door fastener.

ছিটাল-ঢা. টা.—উচ্ছিষ্টাদি আবর্জনা ফেলিবার স্থান।

ছিটেবেড়া-পব. রাঢ়—কঞ্চি বা ডালপালার মাটি ধরানো বেড়া (বেড়া দ্র)।

ছুত্যাঘর / ছুতিয়াঘর [ছুত (অপবিত্র)+ইয়া+ঘর]—অপবিত্র ঘর, সূতিকাগার (অশুচঘর দ্র)।

ছুতার [সূত্রধর (সূত্র+ধর)—সূত্র (méasuring tape) ধরিয়া যাহারা গৃহাদির মাপজোঁখ করে]—বাংলায় ছুতার বলিতে প্রধানত বুঝায় কাঠের মিস্ত্রী, ই° carpenter. ইহারা গৃহাদি নির্মাণ (cottage architecture), কাঠ খোদাইয়ের কাজ, কৃষি ও গৃহস্থালির নানারূপ সরঞ্জাম তৈয়ারি, নৌকাগঠন ইঃ

করিয়া থাকে। আদমসুমারির বিবরণীতে (1951) সূত্রধরদের কাঠের কাজ ছাড়াও আরও নানা ধরনের কাজের উল্লেখ আছে। যেমন, হাতীর দাঁতের এবং মহিষ ও হরিণের শিঙ্গার কাজ, পোড়ামাটি ও পাথরের কাজ, চিত্রাঙ্কণ ইঃ।

কাঠের মিস্ত্রীদের কয়েকটি যন্ত্রপাতির নাম ঃ

আগর [ইং auger]—বেধন যন্ত্র বিঃ।

উখা / উখো, রেত / রেতি—অস্ত্রাদিতে ধার তুলিবার বা ধাতুদ্রব্যাদি ঘষিয়া পালিশ করিবার খরগাত্র যন্ত্র বিঃ, ইং file. করাত [করপত্র]—কাঠ চিরিবার দাঁতওয়ালা অস্ত্র বিঃ, saw। করাত দুই প্রকার : (১) আরি বা হাত করাত (একজনে চালায়)। (২) বৃক্ষাদি (timber) চিরিবার বড় করাত (একাধিক ব্যক্তির প্রয়োজন হয়)। কুড়াল / কুড়ালি / কুড়ুল—কুঠার, axe. গজ, গজকাঠি [ফাং গজ]—৩৬ ইঞ্চির মাপকাঠি বিঃ, yard-wand.

ঘিস্‌ক্যাপ—বড় রাঁদা (চালাইতে দুইজনের প্রয়োজন হয়)। তুরপুন [ফাং তুরফান]—কাষ্ঠাদিতে ছিদ্র করিবার যন্ত্র বিঃ। তৎপর্যায় :—বর্মা, ভোমর, সরকালি, ইং drill. বাইস, বাস [<বাসী]—কাঠ চাঁছিবার বা কোপাইবার হাত কোদালের ধরন অস্ত্র বিঃ, ইং adze. বাটাল / বাটালি—কাঠ কাটিবার বা খোদাই করিবার যন্ত্র বিঃ। নানা ধরনের কাজে নানা প্রকার বাটাল ব্যবহৃত হয়। বীট [ইং bit]—বেধন যন্ত্র বিঃ। রাঁদা / রেঁদা, রান্দা / রেন্দা [ফাং রন্দ]—কাষ্ঠাদি চাঁছিয়া সমতল করিবার যন্ত্র বিঃ, ইং plane. হাতুড়ি—বাটালি পেরেক কাঠ ইঃ ঠুকিবার যন্ত্র বিঃ, hammer.

ছেঁচা-চ. ন. মু. বর্ধ. মে—পিষ্ট বা থেঁতলানো বাঁশ যাহা দ্বারা সাধারণত ঘরের বেড়া দেওয়া হয় (ছেঁচার বেড়া)। তৎপর্যায় :—কেচা, চটা।

ছেঁচা [√ছেঁচ্]—পেষণ করা, কোটা (হলুদ-)। সেচন করা (জল ছেঁচা)।

ছৈয়াল—ঘরামী।

ছোপ-ম—মাটির দেওয়ালের এক একটি স্তর (কাঁথ দ্র)।

জগমোহন [জগৎ+মোহন]—মন্দির ও নাটমন্দিরের মধ্যবর্তী স্থান বা চাতাল, যেখানে দাঁড়াইয়া বা বসিয়া ভক্তেরা ঠাকুরদেবতা দর্শন করে ('জগমোহনতে বৈসে একে একে সবি।')।

জলটুঙ্গি / -টুঙি—জলাশয়ের উপর নির্মিত ধনীদের সুরম্য বিহার-গৃহ ('বাপের বাড়িতে আছে গো জলটুঙ্গির ঘর'-মৈগী)। পল্লীগীতিতে 'কামটুঙ্গি' কথাটিও পাওয়া যায় ('বসন্ত কালেতে যেন কামটুঙ্গি ঘর'—মৈগী)।

জলুই—বড় পেরেক। **জাওন**—ইষ্টকাদি গাঁথিবার কাদামাটি।

জাংলা, জানালা / জানলা [<পো° janella]—বাতায়ন, খিড়কি / খেড়কি -পূব। জানালা নানা প্রকারের :—খড়খড়ি, ঝড়কা, ঝড়কি, ঝিলিমিলি, বারজালা। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, কোন কোন আদিবাসী সম্প্রদায়ের ঘরের কোনও জানালা থাকে না।

জাফরি [আ° জফরী]—জালের মত ফাঁক ফাঁক করিয়া বোনা বেড়া।

জিনারি, জিনালি—ছোট পেরেক।

জুইতের ঘর-পূব—অর্ধবৃত্তাকার চালবিশিষ্ট দোচালা ঘর। এই শ্রেণীর ঘরের চালে এত বাঁক (কোর) দেওয়া হয় যে, চালের নিম্নদিকের কোণগুলি ভিতের একেবারে কাছে আসিয়া যায়, মড়কঁচা বহু উর্ধ্বে থাকে ('নয়া বাড়ি লইয়ারে বাইন্ধা বানলো জুইতের ঘর' -মৈগী)।···জুইত—চালের বাঁক, কোর, রাগ।

জুম্মাঘর— [জুম্মা (আ° জুম্‌য়া)—শুক্রবার] মূল অর্থ যে ঘরে মুসলমানেরা জুম্মার অর্থাৎ শুক্রবারের নমাজ পড়ে। কিন্তু প্রচলিত অর্থে জুম্মাঘর বা জুম্মামসজিদ বলিতে বুঝায় মসজিদ, মুসলমানদের উপাসনামন্দির। জুম্মাবার—শুক্রবার।

ঝনকাঠ / ঝানকাঠ—কপাটের উপরকার শক্ত মোটা কাঠ, যাহা দেওয়ালের ভার ধারণ করিতে পারে।

ঝলি-চট্ট—বাড়ির চারপাশের কিংবা উঠানের আবরু বেড়া।

ঝাঁজিয়া-উব—শালের খুঁটি। **ঝাঁটি-জ. কো**—ঘরের নক্শা

ঝাঁপ / ঝাপ [হি°]—বাঁশের বেত (বেত দ্র) বাখারি ইঃর তৈয়ারি কপাটের মত আচ্ছাদক, আগড়, টাটি। বাংলাদেশের ময়মনসিংহ, ঢাকা প্রভৃতি অঞ্চলে ঝাপের (ঝাঁপ) আরও একটি বিশেষ অর্থ আছে ; সেদিককার ঘরের বেড়া সাধারণত দুই ভাগে বিভক্ত—একটি ভাগ থাকে গোবরাট বা নীচের চৌকাঠ হইতে কপালি পর্যন্ত ; আর একটি অংশ থাকে কপালি (উপরের চৌকাঠ) হইতে চালের নীচেকার পাড় পর্যন্ত। এই শেষোক্ত নাতিপ্রশস্ত অংশটিকে বলা হয় ঝাপ (ঝাঁপের উচ্চারণ ভেদ) বা ভেলকি। এক সময়ে নিপুণ ঘরামীরা (ছাপরবন) এই সকল ঝাঁপে বা ভেলকিতে শিল্পনৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইত এবং তাহা দেখিয়া দূর দূরান্ত হইতে আগত দর্শকদের বাস্তবিকই ভেলকি লাগিয়া যাইত ('ঝাঁপে ঝুপে করে বিনোদ কামলার কাম। দেখিতে সুন্দর বাড়ি চান্দের সমান'-মৈগী)।

ধার বা মুড়ি স্তুতলি দ্বারা আঁটাইয়া বাঁধা হয়। ইহাতে স্বল্প পরিমাণ ধান কলাই ইঃ রৌদ্রে শুকান যায়, গরীবেরা ইহা পাতনি বা মাদুররূপেও ব্যবহার করে। উত্তরবঙ্গে ইহার **ধারা** নামও শুনা যায়।

নয়ানজুলি—জল নিকাশের পথ, নরদমা।

নাকারি-কো. রং, **লাকারি**-শ্রী—চৌচালা। বৈঠকখানা।

নাগর ছাউনি-মু—চালের পুরাতন খড় পাতা না ফেলিয়া তাহার উপর আবার ছাওয়া।

নাছ, নাছদুয়ার, লাছদুয়ার [রথ্যাদ্বার(র=ল=ন)]—বাড়ির প্রধান প্রবেশ দ্বার ও তৎসংলগ্ন আঙ্গিনা। মাঠের ধান কাটা হইলে ধান্যলক্ষ্মীকে আনুষ্ঠানিক-ভাবে এখানেই প্রথম বরণ করিয়া লওয়া হয়। এক সময়ে হয়ত লক্ষ্মীর এই পাদপীঠেই সুখী বাঙ্গালীরা নাচগানের, যাত্রাপাঁচালীর আসর জমাইত ('নাছে বাটে হাটে ঘাটে লোক হুড়াহুড়ি'—চৈতন্যমঙ্গল)।

পই/পোই-উব, **পায়ুই**-বগু—ঘরের খুঁটি। মূলী পোই, মুখা পোই, কোণ-পোই—ঘরের বিভিন্ন স্থানের খুঁটির নাম।

পইঠা/পৈঠা—ঘরের সিঁড়ির ধাপ, step. তৎপর্যায়ঃ-**পাঁউটি**-বী, **পাঁছটি**-মু, পিঁড়া/পিঁড়ে, পিঁড্যা-বাঁ। হাঁড়ি কলসী রাখিবার মাটির বেদী বিঃ।

পগার-ন.হা.হু.মে—বাড়ির বা বাগানের চতুঃপার্শ্বস্থ নালা। সীমানির্দেশক উঁচু বাঁধ।....পগার পার করে দেওয়া—সীমানার বাইরে তাড়িয়ে দেওয়া।

পাগার-পূব [<পঙ্কাগার]—ডোবা, খানা। ইহাতে সাধারণত পাট পচান হয়।

পরচালা—দরজা জানালার উপরকার(রৌদ্রের তেজ এবং বৃষ্টির ছাট নিবারক) অপ্রশস্ত চাল, sunshade. **পাইট**—ঘরামী।

পাঁচির-হা. হু. বর্ধ, **পাঁচিল**-পব<প্রাচীর, দেওয়াল।

পাছদুয়ার [পক্ষদ্বার]—খিড়কি দরজা।

পাট-রাঢ়—মাটির দেওয়ালের এক একটি স্তর ('প্রথমে প্রাচীর বিশাই কৈল চারি পাট'-কবিক)। এসম্পর্কে কাঁথ, কাঁথি দ্রষ্টব্য।....চাল ছাইবার সময় খড় পাতা ইঃ সারি সারি সাজাইয়া যাইতে হয়; এই এক একটি সারিরও আঞ্চলিক নাম 'পাট' ('চারি হালা খড়ে ছাইল চারি পাট' -কবিক)। পাটের অন্যান্য অর্থ 'উদ্ভিদ' এবং 'বিবিধশব্দ' অধ্যায়ে দেওয়া হইয়াছে।

পাড়, পাইড়—ঘরের খুঁটির এবং ভীরের মাথায় অথবা কাঁধের উপর স্তম্ভ

চালের ভারবহ কাঠ বা বাঁশ। ময়মনসিংহ এবং উত্তরবঙ্গের কোথাও কোথাও ইহার 'মারুল', 'মারোল' এবং মেদিনীপুরে 'দাঁত্যা' নামও শুনা যায়।

পাড় [স° পাটক]—নদী পুকুর ইঃর উঁচু কিনারা (পুকুরের পাড়)। প্রান্ত [স° পট্টিকা] (কাপড়ের পাড়)। পাতকুয়ার পোড়ামাটির বেষ্টনী।

পাঁদাড়—বাড়ির পিছনের আবর্জনাপূর্ণ স্থান, আদাড়।

পায়খানা, পাইখানা [ফা° পয়খানহ্]—মলত্যাগের স্থান। তৎপর্যায়ঃ-সেংখানা, টাট্টি। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, বাংলার বহু অঞ্চলেই গ্রামে নির্দিষ্ট কোনও পায়খানা নাই ; প্রায়ই ঝোপেজঙ্গলে, মাঠে, জলাশয়ের ধারে মলত্যাগ করিতে দেখা যায়। মলত্যাগ করিতে যাওয়া অর্থে—ঘাটে যাওয়া-বর্ধ. ত্রি. বগু, ঘাটকে য'-বী, ময়দান ফিরা-য, ময়দানে যাওয়া-ব, মাঠের তোরে যাওয়া-ফ, গাছে যাওয়া-ঢা—কথাগুলি বহুপ্রচলিত।

পালা-ন. শ্রী. নো—ঘরেরখুঁটি (স্বপ্নে দেখি মধুমালা, হাতাইয়া দেখি বাঁশের পালা-প্র)। [<পল্লব] সরু ডাল (ডালপালা)। [পালি] পর্যায়, turn (এবার তোমার পালা)। [<পল্ল] খড়ের গাদা। [<প্রালেয়] তুষার (ষাঁড়কে পালা খাওয়ানো)। অভিনয়াদির বিষয় (রাবণ বধ পালা)। [√পাল্] পালন করা।

পালান-ম. ঢা—বসতবাড়ি সংলগ্ন উর্বরা ভূমিখণ্ড ; ইহাতে সাধারণত শাকসবজি উৎপাদন করা হয়। [<পল্যয়ন] ঘোড়ার পিঠের গদি। গাভীর স্তন (গোরু দ্র)।

পায়ুই-বগু—ঘরের খুঁটি ('খোদার ঘর ভেল্লার পায়ুই'-প্র)।

পিছকাণ্ডা, পিছেড়—ঘরের পিছনের অপরিচ্ছন্ন স্থান।

পিঁড়া / পিঁড়ে-বর্ধ. বী. ন. য. বগু, **পিঁড্যা**-মু. পা. বাঁ—বারান্দা, দাওয়া। ঘরের পইঠা (গৃহ-সামগ্রী দ্র)।

পুকুর—পুষ্করিণী। তৎপর্যায় :—পুষ্কুনি (পুষ্করিণীর অপভ্রংশ), পৈকর-বগু ('বাবাকেরে পৈকরের পাড়ে নানান ফুলের গাছ'-বলোসা), পোইর / ফোইর-চট্ট, পুহৈর-ব, পোখুর-বী, পুখুর, পথৈর / গাড়িয়া-মে, দীঘি (বড় পুকুর)। খনার বচনে আছে : পূবে হাঁস, পশ্চিমে বাঁশ।—বাড়ির পূব দিকে পুকুর কাটিবে। লোকবিশ্বাস, পুকুর কাটা, পুকুর উৎসর্গ করা পুণ্য কাজ। গৃহীর পাপকার্যের ফলে পুকুরে জল না উঠা সম্পর্কে অনেক কথা-কাহিনী, কিংবদন্তী শুনা যায়। সঙ্কটত্রাণীর ব্রতকথায় আছে, পুকুরে জল না উঠায় দেবীর

আদেশে গৃহস্বামীর শিশুপুত্রকে বলি দিতে হয় এবং দেবীর কৃপায় তাহার পুনরায় প্রাণপ্রাপ্তি ঘটে ও পুকুর জলে পূর্ণ হয়।

পুলি-শ্রী. কা—ঘরের কোঠা। -উব—গাছের চারা (বাঁশের—)।

পুস্তন-য, **পুস্ত্যা**-চ. ন. মু, **পোস্তা** [ফা°]—মাটির ঘরের কাঁথ বা দেওয়াল মজবুত করিবার জন্য উহার ভিত্তি মূল প্রশস্ত করিয়া বাঁধানো হয় ; বাহিরের দিকের সেই প্রশস্ততর অংশকে পুস্তন, পুস্ত্যা, পোস্তা বলা হয়, ই° buttress.

পেরেক [পো° prego]—লোহার কাঁটা বিঃ ; ইহার এক মাথা ছুঁচালো। পেরাগ-ম—পেরেকের রূপভেদ। পেরেক নানা প্রকারের : গজাল-পূব, জিনারি / জিনালি, খেরি গজার-ফ. ব, তারকাঁটা, ডামিশ-ব, জলুই-রাঢ়।

পেলা / প্যালা-উব—ঠেকনা। ২ গানের আসরে শ্রোতারা খুশি হইয়া গায়ক গায়িকাকে যে পুরস্কার দেয়। গ্রামে কাহারো বাড়িতে রামায়ণ গান, কথকতা কি কীর্তন হইলে গৃহস্বামীকে নামমাত্রই খরচ করিতে হয় ; গায়ক গায়িকারা শ্রোতাদের নিকট হইতে 'পেলা' পাইয়াই সন্তুষ্ট থাকে।

পোঁতা, পোতা—গৃহ-ভিত্তি, ভিত, বনিয়াদ / বনেদ, গোরোট-মু. বী, ই° foundation (নীচের সমতল ভূমি হইতে ইহা উঁচু থাকে)।····পোতার পার্শ্বদেশ—ধারি, ডোয়া।····পোতার উপরিভাগ—মেঝে / মেজে, মাজ্যা, floor. পোঁতা [√পুঁত্ < প্রোথ্]—প্রোথিত করা।

বড়্-চ. ন. মু. বর্ধ. বাঁ. বী—খড়ের মোটা দড়ি। সাধারণত খড় বিচালির বড় বড় বোঝা বাঁধিতে এবং মরাই তৈয়ার করিতে ইহা ব্যবহৃত হয় ('বসন খসায় যেন মরাইর বড়্'-কবিক)। তৎপর্যায় :—বড়িয়া-ম, ভড়কা-মু, বজনা -হিজ।····খড়ের সরু দড়ি— **ছোটা**।

বনিয়াদ, বুনিয়াদ, বনেদ [ফা° বুনিয়াদ]—ভিত, গৃহভিত্তি, পোঁতা, ই° foundation··· বনেদপূজা, ভিতপূজা, ভিত গাড়া—যে ভূমির উপর বাস্তু নির্মিত হইবে, সেই ভূমির সংস্কারার্থে বাস্তু দেবতাদির পূজা অর্চনা এবং ভিত্তিপ্রস্তর (foundation stone) স্থাপন বা প্রথম খুঁটি (চালাঘরের ক্ষেত্রে) পোঁতা। এই খুঁটিকে পূর্ববঙ্গের কোথাও কোথাও (ম. শ্রী) 'ঐশান' এবং খুঁটি পোঁতাকে 'ঐশানগাড়া', 'ঐশান তোলা' বলা হয়। বনেদপূজার শাস্ত্রীয় নাম 'গৃহারম্ভ।' সাধারণত গৃহভিত্তির ঈশান কোণে মতান্তরে ঈশান কোণ হইতে সূত্র ধরিয়া অগ্নিকোণে ভিত্তিপ্রস্তর বা খুঁটি স্থাপন করা হয়। কুদৃষ্টির আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য বহু ক্ষেত্রেই

খুঁটির মাথায় ঝাঁটা, ছেঁড়াজুতা, চুনকালি মাখা হাঁড়ি ইঃ টানাইয়া রাখা হয়। অনেকে গৃহ-নির্মাণ-ভূমি চাষ করাইয়া লয়। তাঁহাদের বিশ্বাস, লাঙ্গলের ফলার আঘাতে সমস্ত অকল্যাণ, অপবিত্রতা বিনষ্ট হয়। বাস্তুভূমি হইতে শল্যোদ্ধারেরও (মৃত জীবজন্তুর অস্থি উত্তোলন) বিধি আছে। এক সময়ে গুনীন্‌রা নাকি গণিয়া বলিয়া দিতে পারিত—ঠিক কোন্ স্থানে ঐরূপ অস্থি আছে।

বন্দ্, ঘরের বন্দ্—ঘরের দৈর্ঘ্য প্রস্থের মাপ। কোনও ঘরের দৈর্ঘ্য যদি ১২ হাত এবং প্রস্থ ৮ হাত হয়, তবে সেই ঘরকে বলা হইবে ২০ বন্দের ঘর। লোকবিশ্বাস, এক এক বন্দের ঘর গৃহীকে এক এক রূপ ফল প্রদান করে। ঘরের বন্দ্ সম্পর্কে বাংলাদেশের ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত কুমরাসনের (অধুনা বেহালা নিবাসী) শ্রীসুধীর কুমার হোম চৌধুরী হইতে সংগৃহীত একটি বচন এখানে উদ্ধৃত হইল : 'দৈর্ঘ প্রস্থ যত হাত, গ্রহ মিলায়ে তাত, বসু দিয়া হর তারে। একে লড়েচরে, দুইয়ে সম্পদ বাড়ে। তিনে পুড়ে ঘর, চাইরে সম্পদ বিস্তর। পাঁচে হারাধন পায়, ছয়ে মরা জিয়ায়। সাতে সীতা বনবাস, আটে সর্বনাশ।' —ঘরের দৈর্ঘ্য প্রস্থ যোগ করিয়া যত হাত দাঁড়াইবে, তাহার সহিত ৯ (নবগ্রহ) যোগ দিয়া যোগফলকে ৮ (অষ্টবসু) দ্বারা ভাগ করিলে যত অবশিষ্ট থাকিবে, বচন অনুযায়ী সেইরূপ ফল পাওয়া যাইবে।

বন্দ [ফা° বন্দ্]—মাঠ ; ফসলের খণ্ড ভূমি (চার বন্দে দুই বিঘা)।

বরগা [পো° verga, ই° rafter]—পাকা ছাদের নীচে কড়ির উপর যে কাঠ দেওয়া হয় (ছাদের কড়ি বরগা)। খড়ো চালের ক্ষেত্রে সরু সরু বংশদণ্ডের উপরে খোপ খোপ করিয়া বাখারি বাঁধিয়া চালের কাঠামো তৈয়ার করা হয়। টালির বা টিনের চালের ক্ষেত্রে শালবাতি বা চৌপল কাঠের উপর পেরেক মারিয়া বাটাম আঁটকাইয়া দেওয়া হয়। চালের এই সকল বংশদণ্ড বা কাঠ যাহার উপর বাখারি বা বাটাম বসে তাহাদেরও লোকপ্রসিদ্ধ নাম বরগা। আঞ্চলিক নাম : রুয়া / রুয়ো-চ. ন. ফ. ষ. ব, রুইও-বাঁ. বী. মু, রুয়া / উয়া-জ. কো. রং, কুয়'-ম, কাচি / কাইচি-দচ, কামড়া-মে, রলা (শালের সরু গুঁড়ি যাহা সাধারণত বরগারূপে ব্যবহৃত হয়)।

বর্গা, বরগা—বরগাচাষ, ভাগে অপরের জমি চাষআবাদের প্রথা (চাষ-আবাদ দ্র)।

বাইরাগ / বাইভাগ-ম [বাড়ির আগ]—বাহির মহল, বাহির আঙ্গিনা।

বাওটাটি-কো. রং—অন্দর এবং বাহির মহলের মধ্যবর্তী আবরু বেড়া।
বাওনা-উব / **বাওনে**-ম—তীরের মাথার ছোট পাড় বা সাঙ্গা বিঃ (তীর দ্র)।
বাংলা, বাংলাঘর—চারচালবিশিষ্ট ঘর, bungalow। বৈঠকখানা।
বাকুল—চকমিলান বাড়ির উঠান বা চারিদিক ঘেরা উঠান (বাকুলে সেঁধতেই সে থমকে দাঁড়াল, এত লোকজন কেন!) **বাখার**—বড় মরাই।
বাখারি—বাঁশের লম্বা ফালি। বাখারি নানা প্রকার: সরু, চওড়া, গোল, লম্বা, খাটো। ইহাদের বিভিন্ন নাম শুনা যায়: আটন / আটনি / ছানি কাঠি-পূব (বাঁশের লম্বা গোল বাখারি), খাপ / খাপাসি / খাবাসি-ম. ঢা / চটা-ব. ফ. খু / বেচাইর-টা (সাধারণ বাখারি), বাতা-পূব / বাতি / বাত্তি / বাত্তা-উব (চওড়া বাখারি), চটি-পূব / চিপে-ম / কাইম-ফ. ত্রি / চেরা-ব / লাইম-ঢা. ম (সরু এবং ছোট বাখারি)।....বাটাম / সাঁড়োক / বাঘা (কাঠের লম্বা ফালি), কাবারি-ব (সুপারির ফালি), ডাসা (সুপারির বা কাঠের ফালি)।—ইহারা বাখারি পদবাচ্য না হইলেও ইহাদের গড়ন চওড়া বাখারির মত।
বাখারি, বাখারি চুন—শামুক ঝিনুক ইঃ র খোলস পুড়াইয়া প্রস্তুত চুন।
বাচুরি-ম—হাটের ছোট ছোট অস্থায়ী ঘর।
বাজাড়-ন. ম, **বাদাড়**-উব, **বেজার**-ম—খড়ের ছাউনির এক এক পাট বা সারি ('পাকের ঘর মিরগা ছায়, তিনই বাদাড়ে টুই পায়।'-প্র. বলোসা—গরীবের কাজে বড়লোকেরা তেমন যত্ন নেয় না)।
বাজু [ফা°]-পব—কপাটের ফ্রেমের দুই পাশের খাড়া কাঠ। খাটের দুই পাশের লম্বালম্বি কাঠ ('কুন্দনন্দিনী খাটের বাজুতে মাথা রাখিয়া ভূতলে বসিয়াছিল'-বিষবৃক্ষ)। বাহুর অলংকার বিঃ।
বাটাম—কাঠের লম্বা ফালি বিঃ। কপাটের বাজুতে ঝুলানো হুড়কা বিঃ।
বাড়ই, বাড়ুই [বর্ধকী]—ছুতার, যে ঘর দুয়ার তৈয়ার করে (ঘরামী দ্র)।
বাড়ি-উব. রাঢ়. দচ—ফসলের খণ্ডভূমি; বাস্তুসংলগ্ন বাগিচা (আদাবাড়ি, পানবাড়ি, ধানবাড়ি) (চাষ-আবাদ দ্র)।
বাড়ি, বাড়ী [স° বাটী]—আবাস, সাকিন, দেশ। বসতবাড়ি, বাস্তু, বাস্তুভিটা, ভদ্রাসন, ভিটা। শহুরেবাড়ি এবং বাংলার গ্রামেরবাড়িতে অল্পবিস্তর পার্থক্য আছে। শহুরেবাড়ি প্রায় গৃহ-প্রধান, গৃহগুলিও আবার ঘনসংবদ্ধ, অনেক ক্ষেত্রে সারাটা বাড়িই একই ছাদের তলে অবস্থিত। বিস্তৃত উঠান, ফলফুলের বাগান সেখানে অতি অল্পসংখ্যক বাড়িতেই দেখা যায়। শহরের

বাড়ি মুখ্যত বসতবাটী, মাথাগুঁজিবার স্থান, বাসা। কিন্তু গ্রামের অধিকাংশ বাড়িতেই চারদিকে চার ভিটে অন্তত চারটি ঘর থাকে। কোণগুলিতেও ছোট খাটো ঘর দেখা যায়। যেমন, রান্নাঘর, ঢেঁকিঘর, হাঁসমুরগীর ঘর ইঃ। একটি কোণ অবশ্য প্রবেশ ও নির্গমন পথ রূপে ব্যবহৃত হয়; সেই পথের আড়ে থাকে অন্দরের আবরু রক্ষার্থে একটি বেড়া। মাঝখানে উদার মুক্ত আলো বাতাস খেলিবার উঠান; উঠানমুখি বারান্দা গৃহস্থ-পরিবারকে স্বাচ্ছন্দ্য দান করে। সঙ্গতিপন্নদের বারবাড়িতে থাকে ঠাকুরদালান, গোলা, গোশালা, বৈঠকখানা, খোলাখামার। গ্রামের বাড়ি বলিতে এই সকল ছাড়া আরও অনেক কিছু বুঝায়: পুকুর, বাগান, চালে চালে লাউ কুমড়ার বাহান, পূজা পার্বণ কত কি! সর্বোপরি উহা সুখে দুঃখে বিপদে সম্পদে আত্মীয় বান্ধব পাড়াপ্রতিবেশীর বাধ্যবাধকতাহীন অবাধ সমাগম স্থান। গ্রামের বাড়ির এক নাম 'দেশ' (আপনার দেশ কোথায় ছিল?—পশ্চিমবঙ্গে সাম্প্রতিক কালের বহুশ্রুত জিজ্ঞাসা)।

(১) **চকবন্দী বাড়ি, চকমিলান বাড়ি**—যে বাড়ির মাঝখানে আয়ত প্রাঙ্গণ এবং চারদিকে সারিবদ্ধ গৃহ। দস্যু-তস্করাদির আক্রমণ প্রতিহত করিতে এককালে এইরূপ বাড়িই উপযুক্ত মনে হইত। বাংলার দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে মাটির দেওয়ালযুক্ত বহু চকমিলান বাড়ি এখনও দৃষ্টিগোচর হয়। এই সকল বাড়িতে শুধু যে এক পরিবারের লোকই বাস করে, তাহা নহে, কোন কোনটিতে বহু পরিবারের লোককেও সম্মিলিতভাবে একই উঠানের চারদিকে নিজ নিজ গৃহে বাস করিতে দেখা যায়। (২) **বাগান বাড়ি**—বাগানবাড়ির বাড়িটা গৌণ, বাগানটাই মুখ্য। বিত্তবান সৌখীন ব্যক্তিরা অনেক সময় স্থায়ী বসতবাটী থাকা সত্ত্বেও গ্রামাঞ্চলে বেশি পরিমাণ জমি রাখিয়া প্রায়ই উহার চারদিকে পাঁচিল দেয়, ফলফুল শাকসবজির চাষ করে, পুকুর কাটে, মাছ ছাড়ে, ছিপ ফেলে, ছোটখাটো কুঠিও নির্মাণ করে। সাধারণত মালীরাই সেখানে বসবাস করে, তাহাদের হেপাজতেই সব থাকে। মালিক খেয়াল খুশিমত মধ্যে মধ্যে আসে, ইয়ার গোছের লোকও ২।৪ জন সঙ্গে থাকে। সহসা ঘুমন্ত পুরী যেন জাগিয়া উঠে। বেশ কয়েক ঘণ্টা ডাকহাঁক আমোদ স্ফূর্তি চলে, গাড়ির ভেঁপু বাজে। তারপর আবার সব নীরব হইয়া যায়। বাগানবাড়ির ইহাই প্রধান বৈশিষ্ট্য। (৩) **বাসা, বাসাবাড়ি**—অস্থায়ী বাসস্থান, হাবেলি, হাউলি। ভাড়াটে বাড়ি।....**বাসাড়ি**—অস্থায়ী বাসিন্দা।

মুড়ি—ঘরের জল নিকাশের নালী বিঃ। ধার, কিনারা (মুড়ি সেলাই)। মুড়া (মুড়িঘণ্ট)। খাদ্য বিঃ ('ধানেতে তৈয়ার হয় মুড়ি চিড়া খই'।) ....মুড়ি দেওয়া—বস্ত্রাদি দ্বারা আবৃত করা (লেপ মুড়ি দেওয়া)

মুদন / মুদনি / মুঠুনি-রাঢ়—চালের মাথা, মাথার শক্ত মোটা কাঠ বা বাঁশ।

মুদা—চাল ছাওয়ার খড়ের আঁটি। মুদা [√মুদ্]—বোজা, বন্ধকরা (চোখ—)। **মুরলি**—চান্দরা দ্র।

মেক / মেকা-মে—ঘরের খুঁটি ।

মেজে, মেঝে—মাঝিয়া-উব, গৃহতল, ভিতের উপরিভাগ, floor.

মেরাপ [আ° মিহরাব্]—দরমা চাটাই ইঃর অস্থায়ী মণ্ডপ। তোরণ, arch.

মেলা-বাঁ—পূজার মণ্ডপ (দুর্গামেলা)। মিলিবার স্থান, বৈঠকখানা। উৎসবাদি উপলক্ষে দর্শক ও ক্রেতা বিক্রেতার সমাগম (রথের মেলা)। একাধিক ভক্ত সমাগমে গানবাজনা ও গঞ্জিকাদি সেবনের ভিতর দিয়া ত্রিনাথের যে পূজা অর্চনা করা হয়, তাহারও এক নাম 'মেলা' (ত্রিনাথের মেলা)। অনেক (মেলা জিনিস)। মিলন (ভক্তের মেলা)। মিলিত হওয়া। বিস্তৃত করা, খোলা (কাপড়—, চোখ—)।....মেলা দেওয়া, মেলা করা—যাত্রা করা।....মেলানি —বিদায় (মেলানি মাগে)।

মেস্তরি-পূব. চট্ট. ত্রি. শ্রী—মিস্ত্রী, কাঠের মিস্ত্রী।

মোখা-জ. কো—দরজার উপরকার নাতি প্রশস্ত ঝাঁপ বিঃ, চালকা।

যোগালে—রাজমিস্ত্রীর সাহায্যকারী, কাজ করিবার সময় রাজমিস্ত্রীদের হাতে যাহারা ইটমশলাদি যোগান দেয়, রাজমজুর।

রক [তু°], **রোয়াক** [আ° রওআক]—ঘরের সুমুখের খোলা বারান্দা (পাকা), চাতাল।....রকবাজি—রকে বসিয়া ছেলেদের বাক্‌বিতণ্ডা।

রদা, রদ্দা—মাটির দেওয়ালের এক একটি পাট বা স্তর।

রাগ—খড়ো চালের বাঁক। তৎপর্যায় :—কোর-রাঢ়, জুইত -পূব।

রাজ [ফা°], **রাজমিস্ত্রী, রাজকামলা**-পূব—যে মিস্ত্রী পাকা বাড়িঘর ইঃ তৈয়ার করে, mason. অট্টালিকাদি নির্মাণ করানো এক সময়ে রাজা-রাজড়াদেরই ব্যাপার ছিল ; সেই ব্যাপারে রাজা কর্তৃক নিযুক্ত ও সম্মানিত মিস্ত্রীই হয়ত 'রাজমিস্ত্রী' অভিধা প্রাপ্ত হইত। যেমন, রাজকবি, রাজকর্মচারী, রাজদূত। আবার বাংলায় রাজ শব্দ আভিজাত্য, প্রাধান্য বা শ্রেষ্ঠত্ব বোধক। যেমন, রাজহাঁস, রাজসাপ, রাজপথ, রাজভোগ। যাহারা প্রাসাদাদি নির্মাণ

করে, মিস্ত্রীসমাজে নিশ্চয়ই তাহারা প্রধান এবং এই প্রাধান্য হইতেও তাহাদের নাম 'রাজমিস্ত্রী' হইয়া থাকিবে।

রাজমজুর—রাজমিস্ত্রীর যোগালে।

রাজমিস্ত্রীদের ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ঃ

উশা—পলস্তারা মসৃণ করিবার কাঠের বা লোহার ফলক বিঃ।

ওলন [সং অবলম্ব]—দেওয়াল ইঃর সরল উন্নতি পরীক্ষা করিবার ভারখণ্ড সম্বলিত সূত্র বা সূত্রলম্বিত ভারখণ্ড বিঃ, plumb line, plumb.

কর্নিক—ইষ্টকাদিতে মশলা (চুন-সুরকি, সিমেণ্ট-বালি) লাগাইবার খুরপির ধরন যন্ত্র বিঃ, trowel.   কোপা—ছাদ পিট্‌নে।

ছেনি—ইটপাথর বা ধাতু ইঃ কাটিবার ঈষৎসরুমুখ বাটালি বিঃ, cold chisel.

পচড়া—পলস্তারা মসৃণ করিবার সময় দেওয়ালের গায়ে জল ছিটাইয়া দিবার ঝাড়ুর ধরন সামগ্রী বিঃ।

পাটা [পট্ট]—সমপৃষ্ঠ কাষ্ঠদণ্ড বিঃ ; পলস্তারা মসৃণ করিতে ইহার প্রয়োজন হয়।

বাস্‌লা, বাসুলি—ইট পাথর কাটিবার ধারাল মুখ হাতুড়ি বিঃ।

বরুস, ব্রুস [ইং brush]—নারিকেলের সরু দড়ি দিয়া প্রস্তুত মার্জনী বিঃ।

মাটাম—সমকোণ নির্ণয়ের যন্ত্র বিঃ, try square.

লেভেল—সমপৃষ্ঠ পরীক্ষা করিবার যন্ত্র বিঃ, level.

দুরমুজ, দুরমুশ—ভিতের মাটি, ইটপাথর ইঃ পিটিয়া শক্ত ও সমান করিবার মুষল বিঃ।

রানা—বাঁধা ঘাটের চাতাল ('ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ঘাটের রাণায় বসিয়া শাস্ত্রীয় বিচার করিতেছেন'—ইন্দিরা)।

রান্নাঘর—যে ঘরে রান্না করা হয়, রন্ধনশালা। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে ইহার নানা প্রতিরূপ ও প্রতিশব্দ প্রচলিত আছে ঃ রান্ধাঘর / পাকঘর -ম. শ্রী. ত্রি, রান্ধনঘর, আন্ধন ঘর / আন্ন্‌নঘর -উব, রান্ন্‌নঘর-পা, রাধুনঘর-ঢা, চুলোশাল-মু. বী, চণ্ডীশাল-হিজ,ওরসা-ফ. ব, বাইন্দ্যুয়ার [আং বায়নদ্দার]-চট্ট (মুস), রসুইঘর-মুস, হেঁশেল-ক. মু, হেঁস্তাল-বাঁ. বী, হাঁড়শাল-য, হানশেল-খু, হাইনশাল-ফ. ব, হাঁস্তাল-পা, হাঁইশাল / আংশাল-জ. কো. রং, ভানশা-রা।

....নিরামিষ ঘর—হবিষ্যঘর, যে ঘরে কেবল নিরামিষ রান্না হয়।

....আমিষঘর—যে ঘরে আমিষ নিরামিষ দুই-ই রান্না হয়। সাধারণত দেখা

যায়, রান্নাঘরকে এমন একটি স্থান দেওয়া হয় যেখানে আলো বাতাসের অবাধ প্রবেশাধিকার নাই। আবার যেমন পরিবেশ, তেমনই উহার পরিসর। অথচ ইহারই মধ্যে নিম্ন ও মধ্যবিত্ত ঘরের বধূ ও গৃহিণীদের দিনমানের প্রায় তিন চতুর্থাংশ সময়ই কাটাইতে হয়। ছেলেমেয়েরাও এখানে আসিয়া মায়ের চারিদিকে ভিড় করে, প্রতিবেশীরাও এখানে আসিয়াই দাঁড়ায়, বসে, সুখ দুঃখের কথা বলে, শুনে। কোন কোন বাড়িতে আবার পৃথক রান্নাঘরই নাই, শয়নঘরেরই বারান্দায় রান্নাবান্নার কাজ চলে।

রেজা / র‍্যাজা [ফা°]—স্ত্রী রাজমজুর। নিকৃষ্ট (রেজা মাল)।

লেপা [√লেপ্]—লেপন করা, নিকানো ('ঘর লেপিয়া দুয়ারে কাদা'-প্র)।

শাশি, সাসি—দরজা জানালা ইঃর কাচের আবরণ বা পাল্লা ('ধীরে ধীরে একটি গবাক্ষের সাসী খুলিল'-বিষবৃক্ষ)।

শিক [ফা° শীথ]—লৌহ শলাকা। গরাদে। ছিঁচ্‌কা।

শিগনো-য—খুঁটি গর্তে পুঁতিয়া চারদিকে মাটি গাদিয়া দেওয়া।

সত্তা-য—পাটের হাতে পাকানো মোটা দড়ি। বিগুমানতা, অস্তিত্ব। সাধুতা।

সরদল, সরদুল—দরজা জানালার উপরকার লম্বালম্বি শক্ত কাঠ বা বাঁশ, ঋনকাঠ। পাকাঘরের ক্ষেত্রে ইংরেজীতে ইহাকে lintel বলে।

সাজা / সাঙা—বংশদণ্ড বিঃ। আড়। আলনা।

সাঁড়ক / সাঁড়োক—কাঠের মোটা ফালি, বাটাম।

সাতির-মু. ঢা—কড়িকাঠ। **সা দরজা**-ঢা—সদর দরজা, নাছদুয়ার।

সারকুড়, সারগাড়ি, সারগাদা—আঁস্তাকুড়, আবর্জনাদি ফেলিবার গর্ত বিঃ।

সার দেওয়াল—বাড়ির চারদিকের দেওয়াল, boundary wall.

সাপাত্তি-ম, **সামাজি**-পা, **সামাত্তি**-ঢা, **সুমাজি**-ফ. য—বাঁশের ফুঁড়নি বা ছুঁচ-কাঠি বিঃ। খড়ো চাল ছাওয়ার সময় ঘরামী উপরে থাকে এবং সহকারী নীচে থাকিয়া একটি চেপটা ছুঁচালো কাঠি দ্বারা তাহাকে বাঁধন-দড়ির যোগান দেয়; কাঠিটির মাথার দিকে একটি ছিদ্র থাকে, উহারই ভিতর দিয়া দড়িটি গলাইয়া দেওয়া হয়। কাঠির ছুঁচালো অগ্রভাগ লোহারও হইতে পারে।

সুরকি [ফা° সুর্খ্]—ইটচূর্ণ, ইটের গুঁড়া।

সেত্‌খানা [আ° স্বিহ্‌হৎ+ফা° খানহ্]—পাইখানা।

হাওয়াঠেস—দরজা বা জানালার পাল্লা যাহাতে হাওয়ায় বন্ধ হইয়া না যায়,

তজ্জন্য উহাদের দুই বাজুর মাঝখানে দুই টুকরা কাঠ কবজা দ্বারা আঁটকাইয়া দেওয়া হয়। ইহারা পাল্লা দুইটিকে হাওয়ার বিরুদ্ধে ঠেলিয়া রাখে।

হাড়ফোঁড়া-বী—জীর্ণ চালাঘর মেরামত। **হাতিনা / হাতনে**—বারান্দা।

হাবেলি / হাউলি -মুস—বাসাবাড়ি। রাজকর্মচারীদের অস্থায়ী বাসস্থান। Govt. Quarters.

হালর—দুই দেওয়ালের অথবা দেওয়াল ও ছাদের লম্বালম্বি সংযোগস্থল।

হাসকল—কবাট ইঃ ঝুলাইবার কবজা বিঃ।

হুড়কা / হুড়কো [সং হুড়ুক, হুড্ডুক]—দরজা আঁটকাইবার দণ্ড বা কীলক বিঃ। তৎপর্যায় :—আগল, আগুল-চট্ট, আড়কাঠি, আড়বাড়ি, খিল, গোচ-জং কো, ঠেঙা / ঠ্যাঙা-ফ. ব, ডাসা-টা. চা, বেন্দা-ম। ....বাটাম—কপাটের বাজুতে ঝুলন্ত হুড়কা। ....হুড়কাপালা-ম—বাঁশের দরজা বা ঝাঁপ আঁটকাইবার জন্য উহার দুই পাশে ভিতরের দিকে যে দুইটি খুঁটি পোঁতা থাকে।

হুড়কা / হুড়কো—যে মেয়ে স্বামীর ঘরে যাইতে ভয় পায় (হুড়কো মেয়ে)

হেঁশেল, হেঁশ্যাল [<হাঁড়িশাল]—রান্নাঘর।

দ্বিতীয় অধ্যায়

গৃহ-সামগ্রী

অম্বৃত্তি / অমিত্তি—পিকদানি ('ছ'বুড়ির ফলে অমিত্তি হারানো'-প্র)। কুণ্ডলীর আকার মিষ্টান্ন বিঃ।

অড়গলি, অর্গলি-মে—হাড়িকাঠ। ইহার খাঁজের ভিতর পশুর গলা পুরিয়া অর্গল বন্ধ করিয়া বলি দেওয়া হয়।

আইঙ্গা [<আঙ্গিয়া]—বিশেষ ধরনের হুক (hook) (উক্কার আইঙ্গা-ম)। ইহা দ্বারা খেলো হুঁকা ইঃ বেড়ায় ঝুলাইয়া রাখা হয়।

আইট্‌না-হিজ. শ্রী—ধোয়া বাসনকোসন রাখিবার বেদী বা মাচা বিঃ।

আংটা—আগুন রাখার পাত্র বিঃ। কড়া, বালার ন্যায় হাতল (দরজার আংটা)।

আঁকশলি—ঢেঁকির কোমরশলাকা (ঢেঁকি দ্র)।

আঁকশি [<অঙ্কুশ], **আঁকুষি / আকর্ষী** [<আকর্ষণী]—গাছ হইতে ফলাদি টানিয়া পাড়িবার লম্বা দণ্ড বিঃ। ইহার মাথাটি সাধারণত অঙ্কুশ, বঁড়শি বা ক-এর আঁকড়ির মত বাঁকানো থাকে। তৎপর্যায়ঃ—অলফা-ন, আংশি-ন, আংশো-খু, আঁকুড়ি (কবিক), আঁকড়া / আঁকড়ি-চ. ন, আঁকুড়া-য. খু. উব, কড়ুয়া-ন, কোটা-পা. ম. ঢা. য. খু, টোডা-নো, কৌটকা-ফ, লগা, লগি, হলকা (বড় আঁকশি)-ন. য। **আকা, আখা, আখাল**—উনন দ্র।

আগালা-য, **আগুল**-শ্রী, **আগৈল**-পূব. নো—ধামা। ঝোড়া।

আজনাস [আ°]—জিনিসপত্র (আজনাসপাতি)।

আড়—দুইটি খাড়া খুঁটির সহিত আড়াআড়ি ভাবে বঁধা বাঁশ বা গাছের সরু গুঁড়ি। বাঁশ ইঃ র আলনা। (ঘরবাড়ি দ্র)। আড়াল (আড়ে যাও)। উঁচু পাড় (পুকুর আড়ের জমি)। প্রস্থের দিক (আড়ে পাঁচ হাত, দৈর্ঘ্যে দশ হাত) বাঁকা (আড় চোখে)। জড়তা আড় ভাঙা)। ....আড়বাঁশী—যে বাঁশী আড় ভাবে বাজানো হয়। ব্রজগোপালের বাঁশী। **আড়ানি**—আরাংগি দ্র।

আড়ি, আঢ়ি [স° আঢ়ক]—ধান্যাদি মাপিবার বাঁশ বেত ইঃ র পাত্র বিঃ ('ধান্য ধারি দুই আড়ি'-কবিক। 'ধান্য পাল্য আড়ী দুই'—কেক্ষেমা)। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে 'আড়ি'র আকৃতি ও পরিমাণ বিভিন্ন। নদীয়ার কোন কোন অঞ্চলে এক আড়ি ধান বলিতে প্রায় দুই মণ, এবং ময়মনসিংহের কোথাও পাঁচ সের বুঝায়। বর্ধমানে বড় ধামাকেও 'আড়ি' বলিতে শুনা যায়।

আড়ি—ক্ষেতের আল। পাশাখেলার পণ। বন্ধুত্বের ছেদ (তোমার সঙ্গে আড়ি)।··আড়িপাতা—লুকাইয়া শুনা।

আতলা-মু. ম, **আতাইল**-ঢা, **আতালি**-দচ—বিস্তৃতমুখ মাটির পাত্র বিঃ (চাউলের আতলা, জলের আতালি)।

আধলা-ব. য—শস্যাদি মাপিবার বেতের পাত্র বিঃ। তৎপর্যায়-ঃ—বটুয়া / বট্যুয়া (কাঠি দ্র)। ইটের অর্ধভাগ। অর্ধভাগ। আধপয়সা (বর্তমানে অপ্রচলিত)।

আপখুরা / আবখুরা [ফা° আবখুরহ]-পূব—জলখাইবার পাত্র বিঃ। ইহার গলা সরু, পেট মোটা, কানা বাহিরের দিকে হেলানো এবং তলদেশে খুরা (বলয়াকার) থাকে। তৎপর্যায় ঃ—চুমকি / চুমকি ঘটি-পব, পালি-ম. ঢা. ত্রি, পাউলি-উব, চাকিয়া-মু, ফেরুয়া / ফেরো-ব. ফ।

আয়না, আইনা [ফা° আঈনহ]—দর্পণ, আরশি, looking-glass. কাচ।

আরশি [আদর্শিকা]—দর্পণ।

আরাম কেদারা [ই° arm+ পো° cadeira]—বাহুযুক্ত যে চেয়ারে আরামে বসা যায়।····কেদারা [আ°]—চেয়ার।

আরাংগি-ঢা—বাঁশের শলি ও চেঁচাড়ির চক্রাকার ফ্রেম, প্রান্তভাগ ঈষৎ হেলানো, সোজা দণ্ডাকার বাঁট, তালপাতার (প্রায়) ছাউনি—এই ধরনের বৃহৎ ছাতাকে আরাংগি বলা হয়। 'আরাংগি'র অপর অর্থ ফাউড়া, পাবড়া, বাঁশ বা কাঠের নাতিদীর্ঘ খণ্ড ; সাধারণত ছেলেপিলেরা ইহা ছুঁড়িয়া গাছ হইতে আম, কুল ইঃ পাড়ে।····আড়ানি—শোভাযাত্রাদিতে ব্যবহৃত কাপড়ের বৃহৎ রঙিন ছাতা। খড়ের চালের নীচে আড়াআড়িভাবে ব্যবহৃত কাঠ বা বাঁশ।

আরি [ফা°]—হাত করাত।

আলকচি-ফ, **আলগছি**-ম, **আলগুছি**-টা—ইংরেজি L-এর ধরন কাঠের দীপাধার বিঃ, ঠকা-উব। ইহা হুকের সাহায্যে ঘরের বেড়ায় আলগোচে ঝুলাইয়া রাখা হয়।

আলনা—ঘরে কাপড়চোপড় গুছাইয়া ঝুলাইয়া রাখিবার আসবাব বিঃ (কাঠের —, বাঁশের—, দড়ির—)। তৎপর্যায়ঃ—আলগনি-ঢা, আলগিনি-মু, আলগুনি -মু. শ্রী।

আলবাটি [লালা > লাল > আল]—লালা ফেলিবার পাত্র বিঃ, পিকদানি।

আলবোলা [ফা° আলবোলহ]—গুড়গুড়ি, ফরসি হুঁকা।····সটকা—আলবোলার নল।

আলিয়া / আইল্যা / আইলা-ম. শ্রী. পা. বগু. রং—আগুনের মালসা-পব. রাঢ়, আগুনের হাঁড়ি / সাঁজালের হাঁড়ি-মু. ন, আগুনের পাতিল-পুব, আলিসা / আইলসা-টা. ঢা, আংটা, জাগা-জ. কো, তাওয়া-ফ. ব, বরশি-মে. চট্ট। পল্লীগ্রামে সাধারণত চাষী গৃহস্থের বাড়িতে একটি পাত্রে প্রায় সর্বক্ষণের জন্য তুষঘসির আগুন রাখা হয়। এই আগুনে তামাক খাওয়া, জলকাদা হইতে উঠিয়া আসিয়া হাতপা সেকা, শীতের দিনে শীতনিবারণ করা, শিশুদের দুধবার্লি গরম করা ইঃ অনেক কাজ চলে। এককালে দেশে যখন দেশলাইয়ের প্রচলন ছিল না, তখন অনেকে এইরূপে অগ্নিরক্ষা করিয়া প্রয়োজন মিটাইত। ইহা এখনও গরীবদের দেশলাই-খরচ বাঁচায়।

আলিসা / আইলসা-টা. ঢা.—আগুনের মালসা। -ম—গাছপিঁড়ি, গাছের সরু গুঁড়ি বা মোটা ডাল এবড়ো খেবড়ো করিয়া কোপাইয়া প্রস্তুত পিঁড়ির ধরন আসন বিঃ।

আশগাড়ু—বালিশ দ্র।

আসবাব [আ°]—খাট, চৌকি, আলনা, আলমারি ইঃ জিনিসপত্র।

উখল, উখলি [স° উদূখল, হি° ওখলী]—উদ্‌খোল, উখুল, উখৈল, হাতে মুষল চালাইয়া ধান ইঃ ভানিবার কাঠের সরঞ্জাম বিঃ। ইহার মুখটি থাকে জামবাটির মত গভীর এবং মধ্যদেশ থাকে ডমরুর ন্যায় সরু। ভারতের নানা অংশে নানা রকম উদূখল দেখা যায়। পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশে ডমরুর আকৃতিবিশিষ্ট উদূখলের প্রচলনই বেশি। কোথাও ইহার ক্ষীণ অংশ মধ্যস্থলে, কোথাও বা নীচের দিকে থাকে। (দ্র 'ভারতের গ্রাম জীবন', অধ্যাপক নির্মল কুমার বসু)। বাঙালীদের মধ্যে ইহার ব্যবহার ক্রমশ উঠিয়া যাইতেছে। তৎপর্যায় :—কাহাল / কাহাইল / কাহিল / কাইল-ঢা. ত্রি, গাইল-ম. ত্রি, হাতগাইল-শ্রী, গামাইল-টা, ছাম / উরোন-উব, ওখোল-মু. বী, ছ্যাওয়া-মু. রা। ....উদূখলের মুষল—ছেঁয়া-মে (উখুল-ছেঁয়া), ছিয়া-ঢা (কাহাল-ছিয়া), ছেকাট / ছেকাইট-ম. শ্রী. ত্রি (গাইল-ছেকাট), গাইন-উব (ছাম-গাইন), বারছা-শ্রী, শামাট-মু।

উড়কিমালা-দচ—ওড়ং, শুকনা নারিকেল মালার হাতা।

উড়ি-ম. ঢা. শ্রী—বাঁশের সমকোণী চতুর্ভুজাকার চাটাইর এক মাথা দুমড়াইয়া দুই কোণ একত্র করিয়া প্রস্তুত বিশেষ ধরনের ঝুড়ি, টুকরি। ওড়ং। শিম।

উড়ুলি-বর্ধ—ন্যাকড়া, কানি।

উনন / উনান / উনুন-পব [স° উদধ্মান]—রন্ধনচুল্লী। তৎপর্যায়:—আখা

/আকা (প্রায় সর্বত্র), আথাল / আহাল-ব, আইয়াল / আলা-পা, চুলা /চুলো, চুলী, চৌকা-ম. ঢা. পা. বগু, টি`ইরি / টি`য়রি-চট্ট, টিকরি-ম, তিউড়ি / তিয়ড়ি /তেউড়ি-বাঁ. বী, তীঁর-চট্ট, উথা, পাথা-দচ. বর্ধ, পাথাল-শ্রী.ত্রি।....দুআথি-ঢা. ফ, দোপাথা-হা. হু. বর্ধ—এক মুখ বিশিষ্ট জোড়া উনুন। ইহাতে এক সঙ্গে দুইটি হাঁড়ি বসাইয়া রান্না করা যায়।....ঝিঁক-পব, পিড়া-শ্রী—উনুনের উচ্চ মৃৎপিণ্ড যাহার উপর হাঁড়ি কড়া বসানো হয়। (জাঁতা দ্র)।

উঁপুল-বী—ঘুঁটে। ওঁচা-চট্ট, ওছা-টা—ঢেঁকির মুষল।

ওড়, ওড়ুং / ওড়োং [সং উদঙ্ক]—নারিকেল-মালার হাতা বিঃ। সাধারণত আখ ও তালখেজুরের রস, দুধ ইঃ জ্বাল দিয়া ঘন করিবার সময় এইরূপ হাতা দ্বারা তোলাফেলা করা হয়। তৎপর্যায়ঃ—উড়কিমালা-দচ, উড়ি-ব, উড়ুম / ডাবুর-ম, উড়ুন-মু, ওড় / আড়োং-য, চরা-শ্রী।

কটরা / কটোরা, কটুয়া / কট্যুয়া-পুব—কৌটা, ঢাকনিযুক্ত ছোট পাত্র বিঃ (সোনার কটুআ দুটি মানিকে পুরা আঁ-শ্রীকৃ)।

কড়া, কড়াই [সং কটাহ, হিং কড়াহা]—আংটাযুক্ত চিতড়ে মুখ রন্ধন-পাত্র বিঃ। তৎপর্যায়ঃ—কানতাই / চচলা-উব, কান্তি-মু, লোহারা / লোয়ারা-পুব কড়ুই-চ—ছোট মরাই, ধান্যাধার। কড়ুয়া-ব—আঁকুষি। ঝালব্যঞ্জন বিঃ।

কপট্যা / কোপট্যা-মু. রা—মাটির ছোট সরা, মুচি, crucible.

কলমতরাস—কলমকাটা ছুরি। যাহা কলমের (তরাস < ত্রাস) ত্রাস জন্মায়, ছুরি, pen-knife.

কলস /-শ, কলসী-শী—কুম্ভ, কানাযুক্ত স্ফীতোদর জলপাত্র বিঃ। কলসের আকার, ইহার গড়নপিটন এক এক অঞ্চলে এক এক রূপ। ঢাকার কলসের ডৌল, আর দক্ষিণ চব্বিশপরগনার (যেমন ডাঙ্গারিয়া গ্রামের) ডৌল এক নহে। আবার মেদিনীপুরের বেলিয়া গ্রামের কলসের সঙ্গেও বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের প্রভূত পার্থক্য লক্ষিত হয়। আকার প্রকার অনুসারে কলস নানা নামে অভিহিত হয়। কলা-ত্রি. চট্ট, কারফা-চ, কোঁপা-মে, গাগরা, গাগরি, ঘইলা / ঘয়লা, ঘড়া, ঘট, চুকা-মে, চুকাই-জ. কো. দি, ঠিলি-ন. মু. মে. সাঁ, ঠেল্যা-চট্ট, ডাবরা-হিজ, ডাবরি-ন. দচ. য, নাগরি-দচ. উব, পোইলা, ভাঁড়-পুব (ছোট কলসী)। ইহাদের সকলই যে জলপাত্র হিসাবে ব্যবহৃত হয়, তাহা নহে। যেমন, জলের কারফা, গুড়ের নাগরি বা ডাবরি, পূজার ঘট বা ডাবরা, তেলের ভাঁড়।

কলিকা / কল্‌কে—কল্‌কে ফুলের আকৃতি বিশিষ্ট মাটির পাত্র, যাহা হুঁকার মাথায় বসে এবং যাহাতে তামাক সাজিয়া দেওয়া হয়। তৎপর্যায় :—কইল্‌কা-পূব, কোলগ্যা-মু. পা, কলকি-ম. শ্রী. ত্রি. নো, চিলুম-বী. মু, ছিলিম-ন. দি. মা, ছিলুম-পূব, tobacco-bowl।....কল্‌কে পাওয়া—সমাজে সম্মান পাওয়া। কলিকার ছিদ্রপথে মাটির একটি চাকতি বা গোল টুকরা রাখিয়া তাহার উপর তামাক সাজিতে হয়। এই টুকরা বা চাকতিকে বলা হয়—ঠিকরা / ঠিকরি / ঠিকরে-পব. রাঢ়, গুটি-মে, ত' / তোয়া / টোয়া-পূব।....গুল—তামাক পোড়া কয়লা বা ছাই ; ইহা দ্বারা কেহ কেহ দাঁত মাজে।....মেরু-মা—গাঁজার সরু কল্‌কে।

কাঁকই, কাঁকুই [<কঙ্কতিকা]—চিরুনি। তৎপর্যায় :—কাঁই-ত্রি. শ্রী, কাঙ্গই / পনিয়া-হিজ, পানহিয়া-মে, চিরুন-মু, হনি / অনি-নো. চট্ট, বিদা-জ. কো. রং (বাঁশের মোটা চিরুনি)।

কাগমলা / -মল্লা-ম—মন্থনীর ন্যায় বিস্তৃত মুখ বংশদণ্ড বিঃ। ইহার দণ্ডাকার নিম্নদিক মাটিতে পুঁতিয়া ফাঁদালো মুখে রান্নার হাঁড়িকড়া তুলিয়া রাখা হয়। মুণ্ডা, সাঁওতাল প্রভৃতির মধ্যে এই জিনিসটির ব্যবহার বেশি দেখা যায়। তৎপর্যায় :—খুল্লা-ম, গুচকি-নো, ঝক / ঝোক-উব, টংগ-শ্রী, হুপা-ন. ত্রি।

কাচন-শ্রী—ছোট বাটি।

কাচলা / কাছলা-ম. শ্রী—মাটির চেপটা ধরনের হাঁড়ি বিঃ ('কাছলা ভরা সাচ্চা দই পাতিল ভরা সর'-মৈগী)।

কাঁচি [তু° কাইঞ্চী হি° কাঁইচী, স্পা কাপচি]—চুলছাঁটা, কাপড় কাটা ইঃ কাজে ব্যবহৃত দোফলা অস্ত্র বিঃ, কাঞ্চি / কেঞ্চি / কেঁচি-পূব, scissors. ছাদের ভার বহনোপযোগী লোহার কাঠামো, truss. [<কাঞ্চী] কুঁচফল। নির্দিষ্ট ওজনের চেয়ে কম ওজনের (কাঁচি সের)।

কাছারি-উব—ঝাঁকা বিঃ। (ঘরবাড়ি দ্র)।

কাজললতা [কাজল <কজ্জল]—কাজল করিবার ঢাকনি এবং সরু বাঁটযুক্ত ধাতুপাত্র বিঃ। বাংলার কোন কোন অঞ্চলে অধিবাস হইতে বৈবাহিক অন্যান্য অনুষ্ঠান শেষ হওয়া পর্যন্ত কনেকে 'কাজললতা' এবং বরকে 'জাঁতি' ধারণ করিতে দেখা যায়।

কাটারি, কাটাইল-শ্রী [স° কর্তরী]—কর্তনাস্ত্র, দা, billhook (ধুতুরা কাটাইল-শ্রী)।

কাঠকো / কেঠকো [কাঠ +কুয়া]—কাঠের গামলা বা বাটি বিঃ।

কাঠগড়া-পুব—হাড়িকাঠ, যূপকাষ্ঠ। কাঠের বেড়াদেওয়া মঞ্চ বিঃ, কাঠড়া; আদালতে কাঠের যে মঞ্চের উপর দাঁড়াইয়া সাক্ষীরা জবানবন্দি দেয়, আসামী ফরিয়াদী তাহাদের বক্তব্য রাখে।

কাঠা—শস্যাদি মাপিবার পাত্র বিঃ। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে কাঠার আকার এবং মাপ নানারূপ। চব্বিশপরগনার 'কাঠা' কুনকে জাতীয় ছোট পাত্র, ২০০ কি ২৫০ গ্রাম মুড়ি চিড়া ধরে। নদীয়াতে (আলাইপুর) এক কাঠা শস্যের পরিমাণ দুই কিলো, জলপাইগুড়ি এবং কোচবিহার অঞ্চলে ১-৫ কিলো (অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আড়াই কিলো), পাবনায় পৌনে চার সের, ময়মনসিংহে ১০, ১২$\frac{১}{২}$ কি ১৫ সের। মেদিনীপুরে কাঠাজাতীয় পাত্রের ধামা, মান, বাগি কোঁচা ইঃ নানা নাম শুনা যায়। কাঠা—জমির পরিমাণ বিঃ (চাষ-আবাদ 'কাঠা' দ্র)।

কাঠি-মে, **ছোড়ান কাঠি**-বর্ধ. বী. মু—চাবি। (চাবি দ্র)।

কাঠি-দচ. শ্রী. ব—শস্যাদি মাপিবার পাত্র বিঃ। শস্যমান। বরিশালের কোথাও কোথাও এক কাঠি ধান বলিতে বুঝায় আটাশ সের, কিন্তু এক কাঠি চালের পরিমাণ বত্রিশ সের। সেখানে আধলা ও বটুয়া কাঠির অর্ধেক। দক্ষিণবঙ্গে এক কাঠির পরিমাণ প্রায় দশ কিলো।

কাঠি / কাটি [<কাষ্ঠিকা]—শলি, কাঠ বাঁশ ইঃর সরু লম্বা টুকরা। (ঝাঁটার—, দেশলাইয়ের—)। ডালের কাটি, ডালঘুটুনি ('রোহিণী রূপসী ঠন্ ঠন্ করিয়া দালের হাঁড়িতে কাটি দিতেছিল'—কৃষ্ণকান্তের উইল)। ....কাঠিকাটামহল—বনজঙ্গল কাটিয়া যেখানে বসতি স্থাপন করা হইয়াছে।

কাড়না-কো. রং—মন্থনী। **কাণ্ডাল**-উব—স্তূপ, কাঁড়ি (কাপড়ের—)।

কাতরা—ছোট হাঁড়ি বিঃ (দইয়ের—)।

কাতলা-ম. পা—হাড়িকাঠ। -ব—ঢেঁকির পুয়া। পাজামা। মৎস্য বিঃ। দস্যুর শিকার (কাতলা পড়া—দস্যুর শিকার হওয়া)।

কাতা-পুব—খড়্গা, বড় দা। নারিকেল ছোবড়ার দড়ি। কর্তা / কত্তা (ধাতা কাতা বিধাতা)। ভাঁড়, নাপিতের খুর কাঁচি নরুন ইঃ রাখিবার আধার ('নাপিত বইসে তথা কক্ষ তলে করি কাতা'—কবিক)।

কাতান, কাতনা [পো° catana]—কাটারি, দা।

কাতারি, কাতুরি [স° কর্তরী, হি° কতরনী]—ধাতুর পাত ইঃ কাটিবার কাঁচি বিঃ, ই° shears, snips.

কাতারি-মু. পা. মা—মাটির ছোট হাঁড়ি, কাতরা, পাতিল।....বোকাকাতারি—যে হাঁড়ি চাটি দিলে বাজে না।

কাত্তি [আ° কাত্তি]—তীক্ষ্ণধার ছোট দা বিঃ, হেঁসো (সাধারণত রসের জন্য খেজুর গাছ বা তালগাছ কাটিতে ব্যবহৃত হয়)। -ঢা—টিনের বৈয়াম (মুড়ির কাতি)। -উব—কার্তিকের অপভ্রংশ (কাতিমাস, কাতিপূজা)।

কাঁথা [স° কন্থা]—একাধিক বস্ত্রখণ্ড (প্রায় পুরাতন) উপরি উপরি বিছাইয়া সেলাই করিয়া প্রস্তুত শয্যাস্তরণ বা গাত্রাবরণ। পল্লীগ্রামে গরীবদের ইহা বিছানার চাদর এবং লেপ উভয়েরই কাজ দেয়। শুধু তাহাই নহে, তাহারা ইহা গায়ের শীতনিবারক চাদর তথা আলোয়ান রূপেও ব্যবহার করে। এক সময়ে বাংলার কাঁথা-শিল্প (নক্‌সি কাঁথা) ভারতবিখ্যাত ছিল; বিবিধ লতাপাতা, জীবজন্তু, ঠাকুরদেবতা, মন্দির, মসজিদ, এমন কি পৌরাণিক কাহিনীও নিপুণাদের সূচি-কর্মের ভিতর দিয়া কাঁথার গায় মূর্ত হইয়া উঠিত। কেঁথা, ক্যাথা, খেতা-পূব, গাঁথা-হিজ—কাঁথার বিভিন্ন আঞ্চলিক রূপ।....ছেঁড়া কাঁথা—ধোকড়, ধোকড়া, ধুকড়ি।

কানা [<কর্ণ]—হাঁড়ি কলসীর প্রান্তভাগ ('মেরেছ কলসীর কানা, তাই বলে কি প্রেম দেব না')। কিনারা (পুকুর কানায় কানায় ভরতি)।....কানা [<কাণ]—একচক্ষুহীন। অন্ধ অর্থেও কানা ব্যবহৃত হয়।....স্ত্রী. কানী ('চেঙ্গমুড়ি কানী')। ...কানামাছি—ছোট ছেলেমেয়েদের খেলা বিঃ।

কানি-মে. রাঢ়. মু. ন. চ. য—ন্যাকড়া, ছিন্ন বস্ত্রখণ্ড। কানি সংসারের নানা কাজে লাগে :—ঘর নিকানোর কানি, হাঁড়িকড়া পোঁছার কানি, ছাঁকিবার কানি, পট্টির কানি, গরীব শিশুদের পরিবার কানি। মৃত্যুর পর শ্মশানে ধ্বজা উত্তোলনের যে প্রথা আছে, তাহাতেও কানির প্রয়োজন হয় ('শ্মশানের কানি সাধু লাজে গিয়া পরে'-কেক্ষেমা)। তৎপর্যায় :—উড়ুলি-বর্ধ, কানা-মে, ছাঁইচ-দি. মা, তেনা / ত্যানা-পূব. পা. মু. খু, নেকড়া / ন্যাকড়া, নেতা / ন্যাতা, নাথা, নেথানি-উব, পোঁচ-ব. ফ. য, পোতনা-মা, ভাঙা-খু, লাতা-বী।

কানি-ম—কিনারা, প্রান্ত। জমির পরিমাণ বিঃ (দুই কানি জমি)।

কানেস্তারা [পো° canastra, ই° canister]—টিনের চতুষ্কোণ পাত্র বিঃ, টিন-ম. ত্রি, গিলান-পা।

কাপা-পব—এক পাত্র হইতে অন্য পাত্রে তরল পদার্থ ঢালিবার ফাঁদালমুখ নল বিঃ, funnel. তৎপর্যায় :—করপা-পা, টিপ / টিপনি-ম, চুঙি-নো, চঙ্-মে।

কাপা-উব.—পল্লীরমণীদের বক্ষাবরণ (বুক হইতে হাঁটু পর্যন্ত)। -ঢা—নারিকেলের মালা। -চট্ট—গোরুর মুখের ঢাকনি বিঃ (চাষের সময় ছেলে গোরুকে পরানো হয়)।

কাপি-ম—হাড়িকাঠ। **কাবটি**-মে—পাঁকাটি।

কামটা-বর্ধ. মু, **কামান**—ধনু।....কামান—আগ্নেয়াস্ত্র।

কারফা—জলের কলসী। ইহার গলা মোটা, মধ্যভাগ স্ফীত, নিম্নাংশ সঙ্কীর্ণ (অর্ধ ডিম্বাকার)।

কালি-ম—ঢেঁকির মুষল ইঃ র মুখের লৌহবলয়, শামা-রাঢ়, গুলো-চ। জমির পরিমাণ ফল, area (বিঘাকালি)। লিখিবার কালি।

কাঁসি-পব—কাঁসার কানা উঁচু ছোট থালা, বেলি-পূব. শ্রী. পা. য। কাঁসর, gong. **কিরিচ** [পো cris]—বাঁকা তরবারি বিঃ।

কিলা-চট্ট. নো. ত্রি—ঢেঁকির খুঁটি, পুয়া।

কুঁচি [স কূর্চ] শূকরের কর্কশ লোমে তৈয়ারি বুরুস; ইহা দ্বারা মহিলারা শাঁখা গহনা ইঃ পরিষ্কার করেন।

কুঁচি [স কুঞ্চিকা]—কুঁজি, চাবি।

কুঁচি/কুচি পূব—বাঁশ বা নারিকেলের কাঠিরগুচ্ছ; খই চিড়া মুড়ি ইঃ ভাজিবার সময় হাঁড়ি কড়াতে কুঁচি চালনা করা হয়। তৎপর্যায় :—ভাজুনিশলা-ম. খু, খোলাকাঠি-ম, চেলো / ছেলো / ছিপা / লাড়ন-জ. কো।

কুজা, কুঁজা/কুঁজো [ফা কূজ্‌হ] ক্ষীণকণ্ঠ স্ফীতোদর জলপাত্র বিঃ। ইহার গায়ে এক একটি কুমার-পরিবারের নিপুণ হস্তের শিল্প-কর্ম—ফুল, লতা-পাতা ইঃ শোভা পায়।

কুঁজি, কুঞ্জি—চাবি। **কুটি**-উব—মাটির গোলাকার হাঁড়ি বিঃ।

কুড়াল, কুড়ুল, কুড়ালি, কুড্যাল-রা. পা—কুঠার, পরশু।....ছোট কুড়াল—টাঙি, থাপরি / ফাঁপড়ি-ম।....তবল [ফা তবর]—মিস্ত্রীদের বড় ভারি কুড়াল।....তবলদার—করাতী, যাহারা তবল (ভারি কুড়াল) ব্যবহার করে।

কুণ্ডলি-ম. খু—মাটির ছোট বেদী; ইহার উপর ভাতের হাঁড়ি রাখিয়া ফেন গালা হয়। তৎপর্যায় :—ঠনা-ম, পৈঠা-ব, পৈথনা-ফ, বৈঠানি-ঢা।

কুনিকা / কুনকে-পব—চাল ইঃ মাপিবার বাঁশের বা বেতের ছোট পাত্র বিঃ।

শস্যমান বিঃ। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে স্বল্প পরিমাণ শস্যাদি মাপিবার ক্ষেত্রে পাল্লাবাটখারার পরিবর্তে কুনকে জাতীয় নানা নামের পাত্র ব্যবহৃত হয়। যেমন, কাঠা-দচ, কুনি-ব, কোঁচা-মে, কোনা-বর্ধ, খুঁচি (প্রায় সর্বত্র), খুবি-মে, ঠিকে-মু, দন-চ, দোন-রং, পাই-মে. বাঁ, পালি-দচ. খু. য, পুরা-শ্রী. ত্রি. নো, পোয়া-বাঁ. য, বেত্তি, রেক-চ, সের-পূব. পা. মে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে একই নামের ওজনপাত্র বহুস্থানে প্রচলিত থাকিলেও উহাদের মান যে সর্বত্রই এক তাহা নহে। যেমন, বীরভূমের কোথাও কোথাও এক খুঁচির পরিমাণ দুই ছটাক, খুলনায় পাঁচ ছটাক, দক্ষিণ চব্বিশপরগনায় দশ ছটাক, মনমনসিংহে সোয়া সের, আড়াই সের নানা রকম। চব্বিশ পরগনায় এক পালি চাল আড়াই সের (বর্তমানে কিলো), খুলনায় পাঁচ সের।

কুপনা—মাছের চুপড়ি (খালই দ্র)।

কুপা / কুপো [স° কূপক]—পেটমোটা সরুগলা মাটির বা চামড়ার পাত্র বিঃ (তেলের—)। স্ফীতোদর ব্যক্তিকেও অনেক সময় বিদ্রূপ করিয়া 'কুপো' বলা হয়।

কুপি [স° কূপিকা, মালয়ালী কুপ্পি]—কেরোসিনের আলোর পেটমোটা সরু গলা ডিবা বিঃ। লম্প দ্র। **কুম্মো**-য—তেলের বড় আধার।

কুরনি / কুরুনি–নারিকেল ইঃ কুরিবার দাঁতওয়ালা অস্ত্র বিঃ, কুরইন, কুয়ানি, কোরন।

কুর্সি [আ°]—চেয়ার। -মু—ঘরের খুঁটির আসন বা গর্ত।

কুলা / কুলো [স° কুল্য]—সূর্প, শস্যাদি ঝাড়িয়া পাছড়াইয়া ধুলামাটি, চিটাকুটা, কাঁকর ইঃ পৃথক করিবার চেপটা ধরনের বাঁশের পাত্র বিঃ, winnowing basket. তৎপর্যায়—দপলা / দবলা-ম. শ্রী. ফ. ব. চট্ট, ধাপড়া-পা. রা. বগু, সুপ-মে. পু।····কুলো দেওয়া—কুলার বাতাসে ধান্যাদি হইতে খড়-কুটা পৃথক করা।····ঝাড়াপচা-ম, পাছড়ানো-চ. ন, পাছুড়া-মু. পাছুড়ি-মে—কুলা দিয়া শস্যাদি ঝাড়া।····কুলো নামানো, ঘটওলানো—শীতলার ঘট কুলায় তুলিয়া মাথায় করিয়া বাড়ি বাড়ি যাওয়া এবং কুলা নামাইয়া চালপয়সা মাগিয়া আনা ; মানত আদায় করা।····কুলোপিটানো—(আচার-অনুষ্ঠান 'অলক্ষ্মী বিদায়' দ্র)।····বরণকুলা—প্রধানত বর-কনেকে বরণ করিবার বিবিধ মাঙ্গলিক দ্রব্য-পূর্ণ সুচিত্রিত কুলা ; ইহার অপর নাম বরণডালা।

কুলুপ [আ° কুফল]—তালা, lock.

কুশি—পূজার ডোঙাকৃতি তাম্রপাত্র বিঃ (কোশাকুশি)। -বী. মু—শিশুদের দুধবার্লি খাওয়াইবার কুশির ধরন পাত্র বিঃ।....কোশা—বড় কুশি।

কেট্‌লি, কেত্‌লি [ই° kettle]—জল গরম করিবার নল হাতল ও ঢাকনিযুক্ত পাত্র বিঃ (চায়ের—)।

কেঠকো, কেঠো, কেটো—কাঠের বাটি বা কাঠের ছোট গামলা বিঃ। তৎপর্যায় :—কাঠকো, কাঠো-য, কাঠুরা-মু, কাঠুরি-পা। কেঠো, কেটো—কচ্ছপভেদ।

কেঁড়ে, কাঁড়িয়া—দোহনপাত্র বিঃ (দোহনপাত্র দ্র)। বাঁশের পাব হইতে তৈয়ারি তেলের আধার, কাঁইড়া-ঢা, কাঁড়া-য।

কোঁচা-মে—কুনকে জাতীয় পাত্র (ধানের—)। পরিধেয় ধুতির সুমুখের কোঁচানো অংশ ('লম্বা কোঁচা কাছা টান, তবে জানবে বর্ধমান'-প্র)।

কোটা / কুটা / কুডা—আঁকশি, ফলাদি পাড়িবার লম্বা সরু বাঁশ। [√কুট্‌] —ছেঁচা, পিষ্ট করা (হলুদ—)। টুকরা করা, মাছ তরকারি ইঃ কাটিয়া রান্নার উপযোগী করা (আনাজ—)।

কোটা [<কোট্ট]—অংশ, অধিকার (তোমার কোটায় কিছুই পড়ে নি)। খণ্ডভূমি (এক কোটা জমি)।

কোনা—কুন্‌কে বিঃ ('আঁচলে বান্ধিল রামা চাল অর্ধ কোনা'-কবিক)।

কোঁপা-হিজ—ছোট কলসী। **কোপা**—ছাদ পিটনে মুগুর বিঃ।

কোল (কবিক)—হাঁড়ির ঢাকনা। ক্রোড়। মাছের পেটের দিক, পেটি। ভারতের আদিম জাতি বিঃ।

কোলা-মে. পুব. নো. পা—মাটির বৃহৎ জালা বিঃ, কৈলা-শ্রী, মটকি, মটকা। মাঠ, শস্যক্ষেত্র।....কোলা ব্যাং—শস্যক্ষেত্রের গর্তে বাসকারী বড় ব্যাং বিঃ।

কোস্তা-চ. য. খু—ফুলঝাড়ু, উলুখড় ঝাউ পাতা ইঃ দ্বারা তৈয়ারি ঝাঁটা।

খঞ্চা, খাঞ্চা, খুঞ্চি [ফা° খঞ্চহ্‌, হি° খাঞ্চা]—কাঠের থালা, বারকোশ, tray।....খুঞ্চিপোষ—খুঞ্চি ঢাকিবার সুদৃশ্য বস্ত্রখণ্ড।

খঞ্জনি, খঞ্জরি / খুঞ্জুরি-পুব—এক মুখ চামড়া দিয়া ছাওয়া, আর এক মুখ খোলা, ভিতর ফাঁপা বাতাবি লেবুর ধরন বাদ্যযন্ত্র বিঃ, tambourine. ইহার কানায় প্রায়ই ঘুঙুর যুক্ত থাকে।

খড়ম—কাষ্ঠপাদুকা, পাউড়ি (কবিক)।....খড়মের ঘুঁটি—জুতিয়া / জুত্যা-শ্রী. চট্ট, পাখড়া-রং. কো, বউলা-ম. চা।

খড়া-দচ—বেতের ঠাসবোনা ঝোড়া বিঃ।

খড়ি-পুব. উব. ন. ম—জ্বালানী কাঠ বাঁশ ইঃ ('উল্টায়ে চড়ায়ে হাঁড়ি, উনুনে দেয় ভিজে খড়ি'।-রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পল্লীগীতি)।....খড়িয়া / খ'ড়ে—যে জ্বালানি (খড়ি) বিক্রি করে।

খড়ি / খড়িগাছ-মে—খাগড়া জাতীয় একরূপ শক্ত গুচ্ছতৃণ (উদ্ভিদ দ্র)।

খড়ি—খড়িমাটি, chalk।....হাতে খড়ি—সংস্কার বিঃ, বিদ্যারম্ভ।

খড়ি-মা—ছোট লাঠি। **খড়েল**-ম—মন্থনী।

খতি / খুতি—টকাপয়সা রাখিবার থলি বিঃ। সাধারণত ছোট ছোট ব্যাপারীরা হাটে বাজারে এই 'খতি' ব্যবহার করে।

খন্তা / খোন্তা, খন্তি [স° খনিত্র]—মাটি খুঁড়িবার লম্বা বাঁটযুক্ত অস্ত্র বিঃ।

খন্তি, খুন্তি—রাঁধিবার সময় ভাজাবড়া তরকারি ইঃ উল্টাইবার একমাথা চেপটা (খোন্তার ফলকের ন্যায়) লোহা ইঃর কাঠি বিঃ। তৎপর্যায়ঃ—হলনা-রা. বগু, ছেনা-ম, ছেনি-ঢা. শ্রী, নরাজ-মে, ভাজাকাঠি, লাফনা-ম।

খাংরা / খেংরা / খ্যাংরা—ঝাঁটা।

খাঁচা—পশুপক্ষী আবদ্ধ করিয়া রাখিবার ঘর বিঃ, পিঁজরা। তবে পাখির খাঁচা ও বাঘের খাঁচার উপকরণ এবং গড়ন এক নহে।

খাঁচা-ম. উব—বাঁশের বেত ফাঁক ফাঁক করিয়া বুনিয়া তৈয়ারি ঝাঁকা বা ঝুড়ি বিঃ। ইহা সাধারণত হালকা জিনিস (কাটা খড়, ঘাস ইঃ) বহন করিবার কাজে লাগে। ময়মনসিংহের খাঁচার গড়ন খাড়া, জলপাইগুড়ির চিত্‌ড়ে। জলপাইগুড়ি এবং কোচবিহার অঞ্চলে এই খাঁচা 'কাছারি'. এবং 'চেঙারি' নামেও অভিহিত হয়।

খাট [স° খট্বা]—অধিক মূল্যের শয্যাধার, পালঙ্ক (বিয়ের খাট)। তৎপর্যায়ঃ—ছাপ্পোর / ছাপরখাট-মুস। এখানে উল্লেখযোগ্য যে উত্তরবঙ্গে (প্রায় রাজবংশীদের মধ্যে) বাঁশের তৈয়ারি শয্যাধারকে খাট এবং কাঠের তৈয়ারি হইলে চৌকি বলে।

খাটিয়া—অল্পমূল্যের সাধারণ খাট; দড়ির খাট। মুগুর।

খাঁড়া, খাণ্ডা—খড়্গ, পশুবলির অস্ত্র (কালীর হাতের খাঁড়া। ('এহিত আমার খাণ্ডা অতি খরশাণ। এক কুবেতে তোমার লইবাম প্রাণ'।।-মৈষী)।

খাদা—পাথরের বাটি। তৎপর্যায়ঃ—খোরা, পাথরের খোরা, পাথুরি-বাঁ. বী. মু। -পুব—মাটির যে পাত্রে গোরুকে জাব দেওয়া হয়। বড় ধামা (ক্ষুদ্রার্থে খাদি)।

-ম. পা—জমির পরিমাণ বিঃ (তিন খাদা জমি। কোথাও ১৬ বিঘায় ১ খাদা)।

খাপরি-মে, **খাপুরি**-বী—মাটির হাঁড়িবিঃ(ডাল ঝোল রাঁধিতে, মুড়ি ভাজিতে ব্যবহৃত হয়)। মাথার খুলি। -উব—অরণ্য মধ্যবর্তী খোলা জায়গা, খাপি।

খাবরা-ফ, **খাবরে**-ন, **খাবলা**-রা—মাটির সরা জাতীয় পাত্র।…খাবলা —হাতের কোষ বা থাবার পরিমাণ (এক খাবলা ভাত। বাঘের খাবলা)।

খারাং-চট্ট—ঝুড়ি, টুকরি।

খারি, খাউরি-পুব—আনাজতরকারি, চাল ইঃ ধুইবার বাঁশের সরু কাঠির তৈয়ারি ধুচুনি বিঃ ('খাউরি বিউনি করে যতেক ডোমের নারী' -মৈগী)। তৎপর্যায় :—চাঙারি / চেঙারি-ক, ঠাকা-মে, পেচে-ন।

খালই / খালুই, খারই [< ক্ষারক]—বাঁশের পাতের তৈয়ারি মাছের চুপড়ি বিঃ। তৎপর্যায় :—খলই-জ.কো. নো,খলাই-রং,খলি-রা. বগু, খেলই-য, কুপনা, চুকরা / চুপরা [< চুপড়ি]-ম, ডোলা-ম. ঢা. ত্রি. নো, পাথি / পাথ্যা / পেথ্যা / পেথে-রাঢ়, পেচে-ন।

খুঙি—ছোট ঝাঁপি বিঃ, যাহাতে সেকালে লিখিবার সরঞ্জাম রাখা হইত।

খুঁচি [সং খুঞ্চিকা]—কুনকে জাতীয় পাত্র।

খুঁটকাঠি-মে—চাবি ('খুঁটেতে খুঁটকাঠি দোলে, কানে দোলে দুল')।

খুটি-উব. টা. ঢা—শিশুদের খেলার মাটির ঘটিবাটি।

খুরি—মাটির বা ধাতুর তৈয়ারি ছোট বাটি (মধুপর্কের খুরি। সিন্দুরের খুরি) মাটির গেলাস।

খুলি-দচ—রস জাল দিবার হাঁড়ি বিঃ। -উব—বহিরঙ্গন। করোটি। দা কুড়াল ইঃর মুখের ভাঙা টুকরা

খুল্লা—কাগমলা দ্র।

খোরা—পাথরের বা কাঁসার (চক্রাকার খুরাযুক্ত) বড় বাটি, চাকাই বাটি।

খোল—নারিকেলের বা লাউয়ের শুকনা খোলা (হুঁকার খোল, সেতারের খোল)। বাদ্যযন্ত্র বিঃ, মৃদঙ্গ (শ্রীখোল)। ওয়াড় (বালিশের—)। খোলা, বাকলা। কোটর (চোখের—)। খইল, oilcake.

খোলা—খই চিড়ামুড়ি ইঃ ভাজিবার পাত্র বিঃ। তৎপর্যায় :—খোলাপাতিল-ম, খোলাহাঁড়ি, ভাজনাখোলা।…পিঠেখোলা—আসকে এবং এই ধরনের সেকা পিঠা তৈয়ারির বিশেষ ধরনের খোলা।…খোলাকাঠি,খোলাকুঁচি—ভাজুনিশলা।

খোসলা / খসলা-উব—খড়ের মাদুর।

গইঠা-পুব [< গোবিষ্ঠা]—শুষ্ক গোবরখণ্ড (গইঠার আগুন)। সাধারণত পল্লীগ্রামে ইহা মাঠ হইতে কুড়াইয়া আনা হয়।

গড়—ঢেঁকির গড়, লোট, নোট, যাহাতে ঢেঁকির মুষলের ঘা পড়ে (ঢেঁকি দ্র)। গড়—দুর্গ, পরিখা (গড়ের মাঠ। গড় মান্দারণ, কর্ণগড়, পানাগড়)। -পুব—জঙ্গল, বাগান (সুপারি গড়, বাঁশগড়, কচুগড়, ভাওয়ালের গজারি গড়)। প্রণাম (গড় করা)। মোটামুটি (গড়ে পাঁচ টাকা)। ভাঙাভরতি, in round numbers.

গাছা-উব. পুব. য—পিলসুজ, দেরখো, দেলখো। -দচ—জেলেদের মাছের ঝুড়ি বিঃ (মাছের গাছা)।

গাছা—টা, টি, খণ্ড (এক গাছা দড়ি, বেতগাছা)। গ্রামের নামসূচক প্রত্যয় বিঃ (মুড়াগাছা, মুক্তাগাছা, ইন্দ্রগাছা, ঝিকরগাছা)।

গাঞ্জিয়া / গাইঞ্জা-ম—জালের মত করিয়া বোনা দড়ির চতুষ্কোণ মাচা বিঃ। ইহা ঘরের চালের কিছুটা নীচে ঝুলানো অবস্থায় থাকে এবং ইহাতে গরীবদের কাঁথাবালিশ, পোঁটলাপুঁটলি স্থান পায়। গাঞ্জিয়া [ফা°]—গেঁজে, bag.

গাড়ু [স° গড্ডুক]—নলযুক্ত ঘটি বিঃ।·· **গাড়ুগামছা**—অতিথি অভ্যাগতকে এককালে গৃহস্বামী জলভরতি গাড়ু, গামছা, খড়ম ও জলচৌকি দিয়া আচমনাদি করিবার জন্য সাদর আহ্বান জানাইতেন।

গাড়ুয়া-মে—বালিশ। **গাঁথা**-হিজ—কাঁথা।

গামলা [পো° gamella]—বলয়াকার বিস্তৃতমুখ, তলদেশ অর্ধবৃত্তাকার কিংবা চেপটা বৃহৎ পাত্র বিঃ। ইহা মাটি, ধাতু বা কাঠ দ্বারা তৈয়ারি হয়। তৎপর্যায়ঃ—গাভলা / হিমা-নো, চরিয়া / চইর‍্যা / তাগাড়ি-ম (পিতলের, তলদেশ চেপটা), টব (কাঠের বা টিনের), চাড়ি-উব. ম. ত্রি. শ্রী. য, টাট-হিজ, ডাবা-ন. হা. টা, ভাড়-মে, ভামারি-নো, দোনা-বী. মু, নাদা-রাঢ়, পাতনা-চ. মু. বী, পাদনা-বর্ধ, পোহ্‌না-জ. কো. রং, মেচলা / মাজলা-চ. মে। নানা নামের এবং আকারের ও উপাদানের গামলাজাতীয় এই সব পাত্র গৃহস্থের নানা প্রয়োজন মেটায়। গোরুকে জাব দেওয়া, ধান ভিজানো, কাপড়ে কলপ লাগানো, অন্নব্যঞ্জনাদি রাখা ও পরিবেশন করা, মরাইয়ের মাথা ঢাকা—অনেক কাজই গামলা-গোষ্ঠী দ্বারা নিষ্পন্ন হয়। রাজসাহী, পাবনা এবং ময়মনসিংহের ভাটি অঞ্চলে প্রায়ই দেখা যায়, কেহ মাটির বৃহদাকার চাড়িতে চড়িয়া নদীনালা পার হইতেছে, কেহ বা বিলেঝিলে হাওরে ছিপে মাছ ধরিতেছে। হাতের মত ছোট একটি দাঁড় ঘুরাইয়া

ঘুরাইয়া 'চাড়ি'টি চালানো হয়। উহা দুঃসাহসিক কর্ম বটে; সে দৃশ্য যুগপৎ আনন্দ ও আতঙ্ক জন্মায়। চাড়ি এবং মাঙ্গলার গড়ন এক; ইহাদের তলদেশ অর্ধবৃত্তাকার এবং প্রান্ত (rim) বলয়াকার ও বেশ পুরু।

গারাশি-ম—গোরুর খড়কাটা বঁটি বিঃ; ইহার মুখে কাস্তের মত দাঁত থাকে। উত্তরবঙ্গের **'গরশি'** খড়কাটা দা (বঁটি নহে)।

গনা-মে—ছোট বাটি (নুনের—)।

গির্দা, গিন্দা, গেন্দা [< ফা° গির্দাহ]—তাকিয়া, গোল বালিশ ('খাট পালঙ্গ নেপ দোলঙ্গ, গির্দে আশেপাশে। রূপ-যৌবন সদাই সুখী স্বামী ভালবাসে' —সেঁজুতি ব্রতের ছড়া)।

গিলাস-পা—কানেস্তারা। **গিলাফ** [আ°] -মুস—গাত্রাবরণ।

গুদুড়ি [হি° গুদড়]-বী—ছিন্নকন্থা। ছিন্ন বস্ত্রখণ্ড।

গুল—কয়লার গুঁড়ার গুলি (জ্বালানি)। [ফা°]—ফুল। গোলাপ। তামাক পোড়া ছাই। **গুলা / গুলো**—শামা (ঢেঁকি দ্র)।

গেঁজে [ফা° গাঞ্জিয়া]—গাঁজলে / গাঁজল্যা-মু. পা, গাঁইজা-টা, মোটা সুতার লম্বা থলি। গ্রামের সাবধানী লোক এইরূপ থলিতে টাকা পয়সা রাখিয়া কোমরে কাপড়ের নীচে বাঁধিয়া চলাফেরা করে।

গেলাস, গেলেস, গিলাস [অস° গিলাচ, ই° glass]—পানপাত্র বিঃ।

গাচৈ-ফ. ব—চাল ইঃ ধুইবার বাঁশের সচ্ছিদ্র পাত্র বিঃ, ধুচুনি।

গোঠা-রা, **গোড়া**-মা—গোবর ধরানো কাঠি (জ্বালানি রূপে ব্যবহৃত হয়)।

গোড়া-মে, **গোঁদল**-মে. হা. হু. বর্ধ **গঁদল**-বাঁ—শিশুদের দুধবার্লি খাওয়াইবার ঝিনুক বা ঝিনুকের গড়ন ধাতুপাত্র বিঃ, কুশি।

গোরা-মু. বী—স্ফীতোদর সঙ্কীর্ণমুখ বৃহৎ জালা বিঃ; ইহাতে চাল গুড় ইঃ রাখা হয়।

গোলাহাঁড়ি—যে হাঁড়িতে গোবরমাটি গুলিয়া ঘরদুয়ার নিকানো হয়।

ঘট—সংস্কৃতে ঘট অর্থ কলস এবং ঘটী ক্ষুদ্রঘট। কিন্তু বাংলায় ঘট—প্রমাণ সাইজ কলসের চেয়ে ছোট জলপাত্র, যাহা সাধারণত দেবতার পূজায় বা অপর কোনও উৎসব-অনুষ্ঠানে স্থাপন করা হয়, libation jar. কোন কোন লৌকিক দেবতার পূজা অনেক ক্ষেত্রে ঘটেই সম্পন্ন হয়; এমনকি দুর্গাপূজা এবং কালীর নিত্যপূজাও কেহ কেহ শুধু ঘটেই করিয়া থাকেন। আশ্বিনের শুক্লা অষ্টমীতে ঘটে শ্রীদুর্গার পূজা 'ঘটপূজা' নামে প্রসিদ্ধ। জলপূর্ণ ঘট শান্তি,

সচ্ছলতা ও পরিপূর্ণতার প্রতীক ; দেবতা সুখসমৃদ্ধি ও শান্তি দাতা ; তাই হয়ত এই প্রতীকে দেবতার অধিষ্ঠান কল্পনা করিয়া তাঁহার পূজা করা হয়।

স্থান ও অনুষ্ঠানভেদে ঘটের নাম ও আকৃতি বিভিন্ন :

(১) দ্বারঘট-চ—কোনও শুভানুষ্ঠানে ঘরের বাহিরে দ্বারের দুই পার্শ্বে আম্রপল্লব ও সশীর্ষডাব শোভিত যে জলঘট স্থাপন করা হয়। সাধারণত পাতিভাঁড় দ্বার-ঘটরূপে ব্যবহৃত হয়। (২) দেবীঘট-চ—যে ঘট পূজার বেদীতে বা দেবতার মূর্তির সম্মুখে স্থাপন করা হয়। তৎপর্যায়—চরু-মু.বর্ধ, চুকা-মে, চুকাই-উব, জলঘট-পূব, ডাবরা-হিজ। (৩) মঙ্গলঘট, মঙ্গলকলস—বিবিধ মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে স্থাপিত সুচিত্রিত ঘট। (৪) বারা, বারি—রাঢ় অঞ্চলে মনসার ঘটের লোকপ্রসিদ্ধ নাম 'বারা', 'বারি' ('গৃহমাঝে বসাইল রত্ন সিংহাসন। তথি মধ্যে স্বর্ণবারি কৈল আরোহণ'—বিপ্রদাস)। মনসার ঘটের গায়ে অতি নিপুণভাবে কয়েকটি সর্পফণা গড়িয়া তোলা হয়। কোন কোন ঘটে সর্পফণার সহিত হংসবাহনা একটি নারীমূর্তিও দেখা যায়। শুধু মনসার নয়, অন্য দেবতার পূজার ঘটকেও বারি, বারা বলিতে শুনা যায় ('স্থাপিয়া আমার বারি করিও পূজন। নিযুক্ত করিও তাহে উত্তম ব্রাহ্মণ।'—কবিক। এখানে চণ্ডীর ঘটকে বারি বলা হইয়াছে)। রায়মঙ্গলে দক্ষিণরায়ের এবং কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে গণেশের ঘটকেও 'বারা' রূপে উল্লেখ করা হইয়াছে (দক্ষিণরায়ের বারা দেখিলেক কূলে। হরবর পুত্র জানি পূজে গন্ধফুলে॥')। (৫) বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলে মনসার ঘটকে 'নাগঘট', কোথাও বা 'ভরক' বলা হয় ('ভরক' ভাঙ্গিল মোর দুষ্ট দুরাচার'—মৈগী)। নাগঘটগুলিতে সর্প সংখ্যা বংশের প্রথানুযায়ী ১, ৪, ৫, ৮ ৯, ১৬, ৪২, নানারূপ থাকে এবং সেগুলি প্রায়ই দীর্ঘাকার হয়। (৬) কোন কোন পরিবারে মনসাপূজায় 'কৈতরি ঘট' নামে এক টিস্বতন্ত্র ঘটও স্থাপন করা হয়। উহা বাঁশের চোঙার মত একটু লম্বা ধরনের এবং উহার গা বাহিয়া দুই পার্শ্বে দুইটি সর্পমূর্তি থাকে। (৭) চট্টগ্রামের নাগঘটও চোঙাকৃতি, কিন্তু উহার গায়ে সর্পফণা থাকে না। এই সকল ঘট ছাড়াও অনুষ্ঠানভেদে আরও নানারূপ ঘটের নাম শুনা যায় : (৮) ইতুঘট, (৯) ধর্মের ঘট, (১০) কার্তিকের ঘট। পূর্ববঙ্গে কার্তিকের ঘটের গায়ে নানা রকম রঙিন চিত্র শোভা পায় ; উহার ভিতর জল না দিয়া অন্তত একজনের খাওয়ার উপযোগী আতপচাল, তরকারি, কলার মাজপাতা ইঃ দেওয়া হয়। মুখে তীরধনুক ও প্রদীপ থাকে। ধর্মের ঘটে সূর্যের আলপনা আঁকা হয়। কোথাও কোথাও এই ঘট কার্তিক

পূজার পূর্বদিন পূজাস্থানে স্থাপন করা হয় (ধর্ম এখানে সূর্য, ধর্মঠাকুর নন)। (১১) রাঢ়ে ধর্মঠাকুরের ঘটকে বলে, 'কামিনীকুণ্ড' এবং (১২) ধর্মভক্ত্যাদের বাহিত ঘট বা ভাঁড়কে বলে, 'ভাঁড়াল' (রাঢ়ের সংস্কৃতি ও ধর্মঠাকুর দ্র)।

ঘটী—সর্বদা ব্যবহারের ছোট জলপাত্র বিঃ। তৎপর্যায়—লোটা / নোটা। জলপাইগুড়ি অঞ্চলে দোহনপাত্রকেও 'ঘটি' বলা হয়।

ঘড়া, ঘড়লা—কলস, ধাতুনির্মিত কলস।

ঘরবরা-হিজ—খড়পাতার ঝাঁটা।

ঘসি—শুষ্ক গোবর খণ্ড বা গোবরের শুকনা চাকতি ('তুষ ঘষি করি জড় শংকর জ্বালে খড়'-রারচ। 'এঁকে দহ দহ ঘসির আগুন আরে কে না জ্বালে ফুকে'-শ্রীকৃ)।

ঘুটনি-(প্রায় সর্বত্র)—ফুটন্ত ডাল ইঃ ঘুঁটিবার কাঠি বিঃ। ইহার একটি মাথা ×ঢেরা চিহ্নের মত থাকে। তৎপর্যায় :-ডাল ঘুটনি, ডালের কাঁটা, কাটি/ডালের কাটি, ডালঘুরনি / হীরাকাটি-মে, ডাইল ঘোঁটা খড়ি-মা, ডোই-মা. দি, তালাশি-চট্ট, নাকরি / নাকারি-জ. কো. রং।

ঘুঁটিয়া/ঘুঁটে—গোবরের শুকনা চাকতি। কাঁচা গোবর ঘাঁটিয়া (প্রায়ই উহার সহিত কাঠের গুঁড়া, তুষকুটা ইঃ মিশাইয়া) এক এক খাবলা হাতে লইয়া পাঁচ আঙুলের চাপে ও ছাপে এই চাকতি তৈয়ার করা হয়। কখনো বা কাঁচা গোবর তত না ঘাঁটিয়া মুঠি মুঠি করিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লওয়া হয়। সাধারণত কয়লার উনন ধরাইতে ইহার প্রয়োজন হয়। তৎপর্যায় :—ঘসি, ঘুঁট্যা-বাঁ. বী. মে, ঘুইটা/ঘুইট্যা-পূব, উপুল-বী, চিপড়ি-মা, পাথার-জ. কো, গুমইট-শ্রী।

ঘেট-জ. কো—মউনি। ঘোনা-ফ—মশারি।

ঘোরাচি, ঘোরাঞ্চি—উঁচুতে কাজ করিবার কাঠের মই বা সিঁড়ি বিঃ।

চক্কি-ফ—ছোট ঘটী। চটি-বাঁ. বী—তালপাতার আসন (ঘরবাড়ি দ্র)।

চরকা [ফা° চর্খাহ্]—সুতা কাটিবার কাঠের যন্ত্র বিঃ।

চাক-মে, চাকি-পূব [স° চক্র, হি° চক্কী, ও° চকী]—জাঁতা, শস্যাদি পেষিবার চক্রাকার জোড়া পাথরের যন্ত্র বিঃ।... ঝিঁক-রা. বগু—জাঁতার ছিদ্র যাহাতে মুষ্টি মুষ্টি করিয়া শস্যাদি দেওয়া হয়।....জাঠ—জাঁতার মধ্যস্থলের কাঠের ছোট খিল।

চাকি [স° চক্র]—গোল পিঁড়ি যাহার উপর লুচি ইঃ বেলা হয়। তৎপর্যায় :— চাকতা-ন, চাকতি-মু, পিঁড়ে।....যে গোলালো কাষ্ঠদণ্ড দ্বারা লেচি বেলে

তাহাকে বলে,—বেলন, বেলনা, বেলুন, বেলাইন, বেলৈন [স° বেল্লন] (বেলন-চাকি, পিঁড়ে-বেলন)।

চাকিয়া—চুমকি ঘটী বিঃ (আপখুরা দ্র)।

চাঙারি, চেঙারি—বাঁশের ছোট ঝুড়ি বিঃ (খারি দ্র)। -জ. কো—বিস্তৃতমুখ ঝাঁকা।

চাটাই, চেটাই—বাঁশের বেত (পাত), নলঘাস, খেজুরপাতা, তালপাতা ইঃর আস্তরণ। শোয়া-বসা, শস্যাদি রৌদ্রে শুকানো, ঝাঁপ বেড়া তৈয়ারি ইঃ অনেক কিছুতে ইহা ব্যবহৃত হয়।

চাটু [স° চটু]—রুটি সেঁকিবার অগভীর পাত্র, তাওয়া, তই। তোষামোদ (চাটুবাক্য)।····চাটুকার—তোষামুদে, তোষামোদকারী।

চাটুহাঁড়ি—ডাল ঝোল রাঁধিবার চেপটা ধরনের হাঁড়ি, তিজেল।

চাড়ি—গামলা দ্র। **চাপড়ি**-ন—কাঁচা ঘুঁটে।

চাবি [পো° chave]—তালা খুলিবার ও বন্ধ করিবার কাঠি বিঃ, key। তৎপর্যায় :—চাভি-মু, চাবিকাঠি-বাঁ. বর্ধ, কাঠি/খুঁটকাঠি-মে, কুঁচি, কুঁজি, কুঞ্জি, ছোড়ান-মু. বী, ছোড়াইন-য, ছোড়ানি-মুস। ঘড়ির চাবি, ঘড়িতে দম দিবার ছোট্ট হাতল বিঃ।

চামচ / চামচে [স° চমস (যজ্ঞপাত্রভেদ), ফা° চম্‌চহ্‌]—খাদ্য পানীয় পরিবেশন করিবার বা মুখে তুলিয়া দিবার হাতা জাতীয় ছোট ধাতুপাত্র বিঃ, spoon.

চারপায়া [হি° চারপাই]—খাটিয়া, দড়ির খাট বিঃ।

চালনি / চালুনি [চালনী]—শস্যাদি চালিয়া পরিষ্কার করিবার ছিদ্রবহুল পাত্র। তৎপর্যায় :—চালা/ চালুন-ম. টা. ঢা. ব, চালৈন-ফ. শ্রী. ত্রি, চালোন-য। নানা কাজে নানাপ্রকার চালুনি ব্যবহৃত হয়। খই চালুনি, আটা চালুনি, আর রাজমিস্ত্রীদের বালি চালুনি এক নহে। খই চিড়া ইঃর চালুনি সাধারণত বাঁশের বেত দিয়া তৈয়ারি হয়; ময়দা চালা বালিচালার চালুনির ক্ষেত্রে ধাতুর তার ব্যবহৃত হয়।

চিরুনি [চীর্ণ]—কাঁকুই। **চুকা**-মে—ঘট। -ম—অম্লস্বাদযুক্ত।

চুকাই-মু—শিশুদের মাটির খেলনা হাঁড়ি। ঘট।

চুনতি, চুনাতি, চুনালু—পানের বাটায় চুন রাখিবার কাঁসার খুরি বিঃ।

চুনিয়া-শ্রী. ব. খু—শস্যাদি মাপিবার পাত্র বিঃ। যে চুন বিক্রয় করে।

চুপড়ি, চুবড়ি—বাঁশের বেত, সরু কাঠি ইঃ দ্বারা তৈয়ারি ছোট ঝুড়ি বিঃ। চুপড়ির কাজ অনেক, গড়নও নানা প্রকার : মাছের—,শাকসবজি ধুইবার—, বাজারে আলু পটোল ইঃ বাছিবার—, ঘরে আনাজ তরকারি রাখিবার—। এতদ্ব্যতীত সিঁদুর চুপড়ি, দধির চুপড়িও আছে ('পাছে গোআলিনী নৈল দধির চুপড়ী'-শ্রীকৃ)। **চুমকি, চুমকিঘটী**—আপখুরা দ্র।

চুলা / চুলো, চুলি [< চুল্লী]—রন্ধনচুল্লী (চুলো ধরাও)। শ্মশান চুল্লী (চুলোয় যা)। রস জ্বাল দিবার, ধান সিদ্ধ করিবার বড় বড় আখাকেও চুলা বলিতে শুনা যায়।

চেরাগ [ফা° চিরাগ] -মুস—প্রদীপ ; আলো।....চেরাগদান—দীপাধার, পিলসুজ।

চেলাং-মে—ডাল ঝোল রাঁধিবার চেপটা ধরনের হাঁড়ি (তিজেল দ্র)।

চোং, চোঙা—নল বিঃ। একদিকে গাঁট রাখিয়া তৈয়ারি ফাঁপা বাঁশের পাত্র বিঃ। এইরূপ পাত্রে চাষীরা মাথা-তামাক ও ফলফুলের বীজ রাখে, কলুরা তেল মাপে। সরু বাঁশের দুই গাঁটের মাঝের ফাঁপা অংশ হইতে তৈয়ারী ফুঁকনিকেও চোঙা বলা হয়। সাধারণত নিবন্ত আগুন ফুঁ দিয়া জ্বালাইবার কাজে ইহা ব্যবহৃত হয়। **চৌকান, চৌকনা**-মা—ঝোড়া বিঃ।

চৌকা-ম. ঢা. বগু—উনন। চৌকা / চৌকো—চতুষ্কোণ বিশিষ্ট।

চৌকি—চকি, তক্তাপোষ। **ছলনা**—খুন্তি, ভাজাকাঠি।

ছানতা—সচ্ছিদ্র চিতড়ে হাতা বিঃ। তৎপর্যায় :—ঝাঁজরা /-রি, ছান্না-মু।

ছাকনা—তরল পদার্থ ছাঁকিবার অতি সূক্ষ্ম ছিদ্রবিশিষ্ট পাত্র (দুধের—)।

ছাপনা / ছাবনা-ফ. ব. পা, **ছাবনি**-ঢা—মুড়ি ভাজার কাজে ব্যবহৃত মাটির সচ্ছিদ্র হাঁড়ি বিঃ, ঝাঁজর / ঝাঞ্জর-ম।

ছালা—বস্তা, বোরা, পাটের সুতলি দিয়া তৈয়ারি বড় থলে (ধানের ছালা)।

ছিঁচকা / ছিচকে [হি° সীখচা]—হুঁকার নলিচা পরিষ্কার করিবার লোহার সরু কাঠিবিঃ। তৎপর্যায় :—গজ-নো, ছিলুমের কাঁটা / হুঁকার কাঁটা-ফ. ব, শিক-মে. বর্ধ. ম. ঢা।....ছিঁচকাচোর—যে ছিঁচকার ন্যায় অতি সামান্য জিনিসও চুরি করে। **ছিপি**-মু—ছোট থালা। কাক / কাগ, cork.

ছিলিম-চ. মু. ন. দি. মা, **ছিলুম**-পূব, **চিলুম**-বী [ফা° চিলম]—হুঁকার কলিকা, কলকে (আর পার না তার হুঁকার ছিলিমটায় ফুঁ দিতে-ইন্দিরা)।

ছেঁচকি, ছেনা, ছেনি—ভাজাকাটি (খুন্তি দ্র)।

ছেঁয়া-মে—উদূখলের মুষল, pestle। তৎপর্যায় :—গাইন-উব, ছিয়া-ঢা. ত্রি. শ্রী, ছেকাট / ছেকাইট-ম. শ্রী. ত্রি, বারছা-শ্রী, সামাট-মু।

ছোঁচ-বর্ধ. বাঁ. বী. মু—ন্যাকড়া, ঘরদুয়ার নিকানোর ছিন্ন বস্ত্রখণ্ড।...**ছোঁচ দেওয়া**—প্রাতঃকালে ঘুম হইতে উঠিয়াই হিন্দুগৃহিণীদের ঘরের দুয়ারে জলছিটা দিয়া নিকানো, বাসি দোষ দূর করা-ম।

জলকাঁথি-মু—জলের কলস রাখিবার মাটির বেদী। এইরূপ কাঠের আধারকে বলা হয় **জলপিঁড়ি**-ঢা।

জলচৌকি / -চকি—বসিবার এবং স্নানাদি করিবার ছোট চৌকি বা কাষ্ঠাসন। গ্রামে সাধারণ গৃহস্থের ঘরে জলচৌকি চেয়ারেরও কাজ দেয়। চেয়ার সোফা না থাকিলে সম্ভ্রান্ত অতিথি অভ্যাগতকে এই আসনেই বসিতে দেওয়া হয়। শ্রাদ্ধাদিতে গুরুপূজার দানদ্রব্যের মধ্যেও জলচৌকি, খড়ম ইঃ স্থান পায়।

জাগা [ফা° জায়গা]-কো. জ—আগুনের মালসা। জায়গা, স্থান।

জাঠ, জাঠি—বাঁশ কাঠ বা লোহার দণ্ড বিঃ। বড় লাঠি।

জাঁতা, যাঁতা [স° যন্ত্র]—শস্যাদি গুঁড়া করিবার জোড়া পাথরের বৃত্তাকার যন্ত্র বিঃ। (চাক, চাকি দ্র)। ভস্ত্রা, bellows.

জাঁতি, যাঁতি [যন্ত্রী]—সুপারি কাটার যন্ত্র বিঃ, জাঁইতি-য, ছরতা/সরতা-পূব. উব। স্থান ও সম্প্রদায়ভেদে বরকে বিবাহের সময় হাতে জাঁতি রাখিতে দেখা যায়।

জাম-মে—পিতলের দোহনপাত্র বিঃ। ফল বিঃ (কালো-)। [ই° jam] ভিড়ের চাপ। [আ° জম্] জং, মরিচা rust (জাম ধরা)। বড় (জাম বাটি)।

জামখোরা-মা, **জামবাটি**—কাঁসার বড় বাটি।

জালহাঁড়ি-চ.ন, **জালই**-রা, **জালা/জালো**-য—আখ ও খেজুরের রস জ্বাল দিবার বিশেষ ধরনের হাঁড়ি।

জালা [আ°জারাহ]—জাড়ি (কবিক), অলিঞ্জর, মাটির বৃহৎ জলপাত্র বিঃ। ইহা কলসীর ন্যায় তত স্ফীতোদর নহে, দীর্ঘাকার (egg-shaped), কানা বাহিরের দিকে হেলানো। ইহা দ্বারা জল বহন করা হয় না, ইহাতে জল সঞ্চিত করিয়া রাখা হয়। -য—রস জ্বাল দেওয়ার হাঁড়ি বিঃ।

জুলুজা-ম—পাখির খাঁচা, পিঁজরা ('হাতেতে খাগড়ের শর জুলুজা লইয়া। পালা চুপি সঙ্গে নাগর আইসে পন্থ দিয়া ॥"-মৈমসী)।

ঝক/ঝোক-উব—কাগমলা দ্র।

ঝগ [ইং jug]—হাতলযুক্ত ধাতুনির্মিত জলপাত্র বিঃ।

ঝাইল-ঢা. রা—বেতের বাক্স বা পেটরা। -মা—জিনিসপত্র রাখিবার বৃহৎ থলে বিঃ। -ন—ঝালা, পান, solder.

ঝাঁকা-দচ—কৃষিপণ্যাদি বহন করিবার বাঁশের বিস্তৃতমুখ অগভীর পাত্র বিঃ (চাষ-আবাদ দ্র)। —মাছের সচ্ছিদ্র চুপড়ি। —খই চালুনি। —মাছের গাড়ি।

ঝাঁজ-ম, **ঝাঁজর** [<ঝর্ঝর]—কাঁসর।

ঝাঁজ—আঁচ, তাপ (আগুনের—,রোদের—)। উগ্রতা (ফোড়নের—)। ....ঝাঁজালো—ঝাঁজযুক্ত।

ঝাঁজর, ঝাঁজইর, ঝাঞ্জর [<জর্জ্জর]—ঝাঁজরিহাঁড়ি-ন. বর্ধ, ছাবনা, বহুছিদ্রযুক্ত বিস্তৃতমুখ হাঁড়ি বিঃ। বিশেষ এক প্রণালীতে মুড়ি ভাজিবার সময় ইহার কাজ লাগে।

ঝাঁজরা, ঝাঁজরি—সচ্ছিদ্র হাতা, ছানতা। গাছে জল দিবার নলযুক্ত ছিদ্রবহুল পাত্র। নর্দমার মুখের লোহার শিকের জাল বিঃ।

ঝাঁটা, ঝেঁটা, ঝ্যাঁটা, ঝিটা-খু—ঝাড়ু, সম্মার্জনী, broom. সাধারণত বাঁশের সরু কাঠি বা নারিকেল পাতার মধ্যশিরা (কাঠি) দিয়া ঝাঁটা তৈয়ার করা হয়। তৎপর্যায় :—আইটা-ফ, খাংরা / খেংরা, পিছা / শলাপিছা-ঢা. টা. ফ. ব. নো, খয়রা / বাদিনি / সামটা / বাইন / বোরনি / সাহার-মা, খরকা-মে, হরকা। ....মুড়াঝাঁটা / মুড়োঝাঁটা—অধিক ব্যবহারের ফলে যে ঝাঁটার অগ্রভাগ ক্ষয়প্রাপ্ত ও শক্ত হইয়া গিয়াছে।....ঝাঁট দেওয়া, ঝাঁটপড়া, ঝাঁটানো—ঝাঁটা দিয়া আবর্জনাদি পরিষ্কার করা।....ঝাঁটামারা—ঝাঁটা দিয়া আঘাত করা। উপরোক্ত বাঁশের বা নারিকেলের কাঠির ঝাঁটা ছাড়াও উলুখড়, খেজুরপাতা, ঝাউপাতা ইঃর তৈয়ারি নানারকম ঝাঁটা আছে। বিভিন্ন অঞ্চলে ইহাদেরও বিভিন্ন নাম শুনা যায় : কোস্তা-চ. ম. খু, বাড়ুন / বাড়োন-ন. মু. বর্ধ. হা.হু. ঢা.টা. উব, ঘরবরা-হিজ, পালাঝাঁটা / ফুলঝাড়ু-চ, পিছা-ঢা. ফ. ব. নো. ত্রি, ফিচে-চট্ট, সাচুন/হাচুন-ম. ঢা. ত্রি, ফুরইন্/হুরইন-ম. শ্রী।

ঝাড়, বেলোয়ারি ঝাড়—এক সঙ্গে বহু আলো জ্বালাইবার কাচনির্মিত দীপাধার, chandelier.

ঝাড়—ঝোপ (বাঁশের—)। ঝাড়া, মন্ত্র দ্বারা রোগ ভূত ইঃ তাড়ানো (ঝাড়ফুঁক)।

ঝাড়ন [√ঝাড়্ + অন]—বিছানা টেবিল চেয়ার ইঃর ধুলা ঝাড়িবার বস্ত্রখণ্ড বা এইরূপ অন্যকোনও জিনিস। ঝাড়া, পরিষ্কার করা।

ঝান্না-মু—সচ্ছিদ্র চিত্‌ড়ে হাতা বিঃ।

ঝাঁপি—বেত্রাদি নির্মিত পেটিকা। -উব—পেখা, চাষীদের পাতার ছাতা বিঃ।

ঝারি—নলযুক্ত জলপাত্র বিঃ। গাড়ু ('হাতেতে সোনার ঝারি বর্ষা আসে নামি'—মৈগী)।

ঝিঁক-পব—উননের শৃঙ্গত্রয় যাহার উপর হাঁড়ি কড়া বসানো হয়। -য়া· বগু—জাঁতার গর্ত যাহার মধ্যে মুষ্টি মুষ্টি করিয়া শস্যাদি দেওয়া হয়।

ঝিটা-খু—ঝাঁটা। বাঁড়ের ঝুঁটি।

ঝিনুক—শুক্তি, oyster. শিশুদের দুধ খাওয়াইবার ঝিনুক বা ঝিনুকের মত পাত্র; গেঁাদল।

ঝুড়ি—বাঁশের পাতলা কাঠি, কঞ্চি, বেত ইঃ দ্বারা তৈয়ারি অমসৃণ অর্ধবৃত্তাকার পাত্র বিঃ। নানা কাজে নানা আকারের নানা নামের ঝুড়ি ব্যবহৃত হয়। আগৈল-ব, উড়ি/ওড়া-পুব. গাছা-দচ, চৌকনা-ব, টুকরি, পাজা-মু, পোয়াল-খু, বাজরা-ন.চ—ইহারা সকলই ঝুড়ি পর্যায়ভুক্ত হইলেও সকলে এক কাজ করে না এবং সকলের গড়নও একরূপ নহে। 'বাজরা' দ্বারা সাধারণত চাষীরা বাজারে ফলমূল বহন করিয়া লইয়া যায়, উহার গড়ন অনেকটা ধামার মতো। বরিশালের কোথাও মাটিকাটার কাজে ব্যবহৃত ঝুড়িকে 'আগৈল' এবং ময়মনসিংহে 'টুকরি' বলে। তদঞ্চলে আবার গোহালকাড়া ঝুড়ির নাম উড়ি/ওড়া। দক্ষিণ চব্বিশপরগনায় জেলেরা যে বৃহৎ ঝুড়িতে মাছ বহন করে তাহার এক নাম চাকুন এবং ঐ কাজে ব্যবহৃত মাঝারি ঝুড়ি—'গাছা।'····ঝোড়া, ঝড়া-রাঢ়—বড় ঝুড়ি (প্রায় গোটা বেতের)।

ঝুনক্যা-মু—ছোট হাঁড়ি।

ঝুলি—থলি, যাহা সাধারণত কাঁধে ঝুলাইয়া নেওয়া হয় (ভিক্ষার—)।····ঝোলা—বড় ঝুলি। ঝোলের মত তরল (ঝোলাগুড়)।

ঝেড্‌লা / ঝ্যাড্‌লা-চ—পাতিঘাসের চেটাই বা মাদুর বিঃ। ইহাতে শোয়াবসা, ধান ইঃ রৌদ্রে শুকানো নানা কাজ হয়।

টউ-ম· ঢা· ফ—রান্নার খাড়া ধরনের পিতলের হাঁড়ি বিঃ।

টঙ / টং—খুল্না, রান্নার হাঁড়ি কড়া তুলিয়া রাখিবার মঞ্চনীব ধরন বাঁশের আধার বিঃ। খনতা ('টঙ্গ টাঙ্গি কেহ হানে কেহ করবাল'—কবিক)।

টব [ই° tub]—গামলা বিঃ (প্রায় কড়াযুক্ত)। কেটো।

টাইল-ম. শ্রী. ঢা—ধান্যাদি রাখিবার বাঁশের বেতের বৃহৎ আধার। তৎপর্যায় :—আউড়ি-দচ. খু, কুড়ুই-দচ, টোলা-মে, ডেলি-জ. কো. ত।

টাকু, টেকো [তর্ক্]—তকলি, তুলা হইতে সুতা কাটিবার ও জড়াইবার চাকতিযুক্ত শলাকা বিঃ, টাকুয়া/টাউক্যা-পূব।

টাকুর-পূব. উব. খু. য—পাট শণ ইঃ হইতে সুতলি কাটিবার ও জড়াইবার কাষ্ঠ ফলক যুক্ত বড় শলাকা বিঃ। তৎপর্যায়ঃ—টাকরাশ/টাকরুশ/টাকরাশি-উব, ঢেরা-চ.বর্ধ, ধেরা-জ. কো। একই কাজে ব্যবহৃত হইলেও ইহাদের সকলের গড়ন এক নহে।

টাট-হিজ—মাটির গামলা। তামার ছোট থালা (পূজায় ব্যবহৃত হয়)। মহাজনের গদি। টাটি, বাঁশ ইঃর বেড়া।

টাটুই-বর্ধ, **টাঠি** -খু—মাটির খুরি, কটোরা। **টানাকাটি**-বর্ধ—দেশলাই।

টানাপাখা—ঘরের আড়ার সহিত ঝোলানো কাশ খসখস ইঃর তৈয়ারি ঝালরযুক্ত আয়তাকার পাখা যাহা দড়ি সংযোগে দোলানো হয়। বৈদ্যুতিক পাখা প্রচলিত হওয়ার পূর্বে আপিস আদালতে, বড়লোকের বাড়িতে ইহা ব্যবহৃত হইত। বর্তমানে কোথাও কচিৎ দেখা যায়।

টিউকল—নলকূপ, tube well. **টিপবাতি**—টর্চ, torch.

টিপনি, টিপুনি—কুপা দ্র। গোপন সঙ্কেত।

টুকনা-মে, **টুকনি** -ন. পা. নো—বিশেষ ধরনের ঘটী ; ময়মনসিংহে ইহার 'টুকের ঘটি' নামও শুনা যায়। টুকনি—ভিক্ষাপাত্র।

টুকরি-বর্ধ—চিড়া মুড়ি খাইবার বেতের ছোট পাত্র বিঃ। তৎপর্যায় :—টুরি-ম. ঢা. পা. য. ত্রি. নো।

টুকরি [হি' টোকরী)-ম—মাটি কাটার ঝুড়ি বিঃ। ছোট ঝুড়ি।

টুকি-বাঁ, **টুকুই/টুকোই**-বধ. বী—চাল ধোয়ার ধুচুনি বিঃ।....বড় ধুচুনি—টকা -বাঁ. মে, টোকা-মু।

টুল [<ই° stool]—একজন বসিবার উপযোগী উচ্চ কাষ্ঠাসন। ইহাতে চেয়ারের মত হেলান দেওয়া যায় না এবং ইহার ছাউনিটি প্রায় গোলাকার থাকে বলিয়া ইহাকে 'গোলটুল' বলিতেও শুনা যায়। পা রাখিবার ছোট চৌকি।

টে-মা—ভাঁড় হইতে তেল তোলার হাতা বিঃ, পলা।

টেনা-বর্ধ—ছোট কাপড় ('মাথায় নাহিক চুল পরিধান টেনা'-কেক্ষেমা)।

টেমি/টমি-চ. ব. খু—কেরোসিনের ডিবা (লম্প দ্র)।

টোকনা—ধাতুনির্মিত রন্ধনপাত্র বিঃ। ঠোকনা, ঠোনা ('ঘরে গেলাম শাশুড়ী মারলে টোকনা-খু. ছড়া। 'বউটি ভাল বটে, টোকনা খেয়ে বাটনা বাটে।'-প্র)।

টোকা-মু. টকা-বাঁ. মে—চাল ধোয়ার বাঁশের ধুচুনি বিঃ, ইহার মুখ চক্রাকার, তলা চতুষ্কোণ। আঙুলের আঘাত (টোকা মারা।

টোকা [পো° touca]-হা. হু. বর্ধ. ন—বাঁশের ও পাতার তৈয়ারি টুপির ধরন ছাতা বিঃ (চাষ-আবাদ দ্র)।

টোপা/টুপা-ম, টোফা-ব—ঘটীর ধরন মাটির ছোট পাত্র (তুঃ পাঁতিভাঁড়-দচ) প্র. 'টুপায় করিয়া জল কমলা আনিল।'—মৈগী। গোলাকার (টোপা কুল)।

টোল/টোলা-মে—টাইল দ্র। টোলা—পাড়া, পল্লী (কলুটোলা, টোলায় টোলায় বেড়ানো)।

ঠমা—কুণ্ডলি দ্র। -শ্রী—পিনসুঞ্জ। ঈষের মাথার দিকের খাঁজ।

ঠাকা/ঠেকা-মে—শাকসবজি ইঃ ধুইবার ঝুড়ি বিঃ (খারি দ্র)।

ঠাটা-পুব—ইঁদুর মারিবার বাঁশের কল বিঃ। বজ্র (ঠাটা পড়া)।

ঠিলি [স°]-ন. মু. বী. বর্ধ. মে, ঠিলা-পুব, ঠেল্যা-চট্ট—মাটির বা পিতলের কলসী বিঃ।

ঠুলি—বাটির ধরন মাটির ছোট পাত্র। গোরু ঘোড়ার চোখের ঢাকনি।···· ঠোলা (বৃহদর্থে)। ঠেকি-হিজ—মাঝারি হাঁড়ি।

ডখি/ডুখি-পুব—তোলো, রান্নার বড় হাঁড়ি (মাটির)।

ডাবর—কানা ভিতরের দিকে হেলানো বড় বাটি বিঃ (পানের—)। তৎপর্যায় : —ডাবুর-ম, ডাবোর/ডাবুরি-মু. বী।

ডাবরা-হিজ—পূজার ঘট।

ডাবরি-ন. চ. মু—লম্বাটে ছোট কলসী (গুড়ের ডাবরি)।

ডাবলা-ম—পুরাতন কাপড়ের বড় টুকরা, যাহা দিয়া সাধারণত পোঁটলা-পুঁটলি বাঁধা হয়। তৎপর্যায় :—ডাবুয়া-মে, ডুবা-ম।

ডাবা—খেলো হুঁকা, ডাওয়া-চট্ট।

ডাবু-বী, ডাবুর-ম [স° দর্বি]—হাতা। নারিকেল মালার হাতা।

ডালা [স° ডল্লক]—বাঁশের চেঁচাড়ি ইঃর তৈয়ারি ঈষৎ গভীর থালার আকার পাত্র বিঃ। জেলেদের টিনের পাতের তৈয়ারি কানাউঁচু চক্রাকার পাত্র বিঃ।

বাক্সের ঢাকনি (বাক্সের ডালা)।। নৈবেদ্যপূর্ণ পাত্র, ডালি (মায়ের বাড়ি ডালা দেওয়া)।...ডালি—ভেট, উপঢৌকন। আধার (রূপের ডালি)।

ডালিয়া / ডাইল্যা-ম—ছোট ধামা (এক ডালিয়া ধান)।

ডিবা / ডিবে [হি° ডিব্বা]—কৌটা (নস্যের)। বাটা (পানের)। লম্প, কুপি (কেরোসিনের)।

ডিয়ারি-উব—মাটির প্রদীপ, মুচি, crucible. **ডুকনা**-ম. পা—বালতি।

ডুলি—বাঁশের চেঁচাড়ির তৈয়ারি ড্রামের ধরন শস্যাধার বিঃ ('মারিয়া পালের ষাঁড় পিঠে লইয়া তুলি। মানুষের শিরে যেন তুলা ভরা ডুলি।'-রাময়)। [স° দোলা]—পালকি জাতীয় যান বিঃ, দোলা।

ডেক / ডেগ [ফা° দেঘ]—দেগ, ধাতুর তৈয়ারি বৃহৎ রন্ধন পাত্র বিঃ (তলদেশ অর্ধবৃত্তাকার, উর্ধ্বাংশ অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ, কানা প্রশস্ত এবং বাহিরের দিকে হেলানো)।...**ডেকচি**—ছোট ডেক।

ডেক্স / ডেস্ক-পূব—কাঠের বড় বাক্স বা সিন্দুক বিঃ। ইহার বৃহৎ আয়তাকার ডালার উপর অনেক গৃহস্থকে বিছানা পাতিয়া শয়ন করিতে দেখা যায়।

ডেলি—শস্যাধার বিঃ (টাইল দ্র)। **ডেলুই**-বী—প্রদীপ (পিদিম)।

ডোই-মা—ডালের কাঁটা।

ডোল [স° কণ্ডোল]-পূব. উব—বড় ডুলি, শস্যাদি মজুত রাখার বাঁশের বৃহৎ আধার। -রাঢ়. দি. মা—দোহনপাত্র রূপে ব্যবহৃত বালতি। কুয়া হইতে জল তুলিবার তলাগোল পাত্র বিঃ। ডৌল, গড়ন (মুখের ডোল)।

ডোলা-পূব—মাছের চুবড়ি বিঃ ('কোমরে বান্ধিয়া ডোলা হাতে লইয়া জাল'-মৈগী)। দোলা, পালকি বিঃ। বড় ডুলি, ডোল।

ঢাকন-মা—হাঁড়ি কলসী ইঃ ঢাকিবার পাত্র বিঃ, সরা।...ঢাকনমুখা—কদাকার।

ঢাকি-উব. ম. ঢা [হি° ঢাকা / ঢাকী]—ধামা জাতীয় পাত্র। সাধারণত ইহার উভয় দিক গোবরের লেপ দিয়া মজবুত করা হয়। উল্লেখযোগ্য যে, মুর্শিদাবাদের 'ঢাকি' ধামা নয় ; সেখানে ঢাকি বলিতে বুঝায় এক ধরনের বড় লম্বাটে ঝুড়ি যাহাতে কুমারের দোকানে মাটির গেলাস, সরা ইঃ হালকা জিনিস রাখিতে দেখা যায়।...**ঢাকী**—যে ঢাক বাজায়। বাঙালীর পদবী বিঃ।

ঢেঁকি [হি° ঢেঁকী / ঢেঁকা ও° ঢেঙ্কি]—ঢেঁই-চট্ট, ঢেকি-পূব, ঢিঁকি-মু, ধানভানা চিড়াকোটা প্রভৃতি কাজে বহুব্যবহৃত কাঠের পদচালিত যন্ত্র বিঃ। বাংলার বাহিরে মধ্যপ্রদেশ, ওড়িশা, বিহার এবং আসামের বহুস্থানে, চীনদেশে

ইহার প্রচলন আছে। এককালে 'ঢেঁকি পূজা' এবং ঢেঁকিতে নান্দীমুখের বারা ভানা বিবাহাদি সংস্কারের একটি প্রধান অঙ্গ ছিল। ঢেঁকি নারদের বাহন বলিয়া কথিত হয় ('ঘরবাড়ি' অধ্যায়ে ঢেঁকিশাল দ্র)। ঢেঁকি (তুচ্ছার্থে)—অলস, অকর্মা, যে পরের তাড়নাছাড়া নিজের বুদ্ধিতে কিছু করিতে পারে না (বুদ্ধির ঢেঁকি। গাবের ঢেঁকি-'তোর মত গাবের ঢেঁকি আর দেখি নি'-পথের পাঁচালী)।

ঢেঁকির বিভিন্ন অংশ ও তাহাদের আঞ্চলিক প্রতিশব্দ :—

ঢেঁকির মুষল [হিং মুসর / মুসরা, ইং pestle] :

—ঢেঁকির অগ্রভাগসংলগ্ন মুদ্গর, 'গড়ে' যাহার ঘা পড়ে এবং যাহার আঘাতে ধানভানা চিড়াকোটা ইঃ কার্য নিষ্পন্ন হয়। তৎপর্যায়ঃ—আগশালাই-রং, ওঁচা-চট্ট, ওছা-টা, চুরুন-ম. ঢা, চুকম-পা, ছিয়া-ন, ঢুসলি / মুসুণ্ডা-মে, ছে / মুগুর-ষ. খু, মউলা / মোল-নো, মনই-পা, মনাই / মুষাল-ঢা. ফ. ব. ত্রি, মুকইর-শ্রী, মুড়শালাই -মু, মোনা-চ. ন. বাঁ. বী. মে, মোহনা-রা।

ঢেঁকির মুষলের অগ্রভাগের (মুখের) লৌহবলয় বা বেষ্টনী :

—শামা [সং শম্ব]-রাঢ়. মু, শামা / ছামা-উব, শামি / হামি-ম. ত্রি. নো, গুলা (গুলই, গুলে, গুলো)-চ. ন. মু. য. খু. নো. ঢা. শ্রী. ঢা. পা, বেড়ুয়া-ব। ময়মনসিংহ এবং শ্রীহট্টে 'ঢঁকির কালি' কথাটিও শুনা যায়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে চিড়াকোটার মুষলে 'শামা' থাকে না।

ঢেঁকির গড়-রাঢ়. চ. ন. মু. রা :

—কাঠের বা মাটির (মাটির ক্ষেত্রে তলায় একখণ্ড তক্তা বা চেপটা পাথর থাকে) বাটির ধরন যে গর্তে ঢেঁকির মুষলের ঘা পড়ে। সাধারণত মাটির গড়ে ধানভানা হয়; কাঠের গড়ে চিড়া বারা দুই-ই হয়। তৎপর্যায় :—লোট / নোট-চ. ন. য. খু. ম. ঢা. ফ. ব. নো. ত্রি. পা. রা. বগু, পয়ল-চট্ট, পারন-পা, গাইল-শ্রী ।... লোটকাঠ / নোটকাঠ—যে কাঠে লোট তৈয়ার করা হয়, গইড়া-ঢা।....কায়াল / কাইওল-ব—ধান ভানিবার সময় লোট হইতে যাহাতে ধানগুলি এদিক ওদিক ছড়াইতে না পারে তদুদ্দেশ্যে কোথাও কোথাও উহার চারদিকে মাটির একটা বেষ্টনী দেওয়া হয়। ইহার আঞ্চলিক নাম কায়াল / কাইওল-ব, উগেলি / উগৈল-ক. ব, এলোনি-ব।

ঢেঁকির আঁকশলি [সং অক্ষশলাকা] :

—আড়াআড়িভাবে বিদ্ধ ঢেঁকির কোমরশলাকা যাহা দুইটি শক্ত খুঁটির উপর

থাকিয়া ঢেঁকি (beam) চালনায় সাহায্য করে। পর্যায়শব্দ :—আঁকশলাই-বাঁ. বী, তশলা, আঁকশোলোয়া / তশলি-মে, আড়শালাই / তশলি-মু, আড়শলি-উব, আড়মলে-য, আঁরাল-চট্ট, তশিল-ন. চ, তড়শাল-খু, সাওকা / সাওকাবাড়ি-ব, নাচুনি-ব, নাচনাকাঠি-ম. নো, কোমরিয়াকাঠি-ম।

ঢেঁকিরপুয়া / পোয়া-ন. মু. য. রাঢ়. রা. বগু. রং :
—ঢেঁকির (কটির দিকের) দুই পার্শ্বের দুইটি খাঁজকাটা খুঁটি (pillars) যাহাদের উপর আঁকশলি বসে। তৎপর্যায় :—কাতলা-পা. ব, কিলা-চট্ট. নে', কেতরা-শ্রী, পই-চ. খু. রং, পাবা-মে, ঢেঁকির খুঁটি ('আঁকশলি পুয়া মোনা গড়ে মেকামেকি'-অন্নদামঙ্গল)।

ঢেঁকির পাছুণ্ডা-মু :—ঢেঁকির লেজ বা পিছনের চেপটা অংশ যাহার উপর ধানভানুনীরা পা চাপাইয়া পাড় দেয়। তৎপর্যায়:—পাছা-চ. য. খু, পিছাই-চট্ট, ঢেঁকির লেজ-মে।....ন্যাজাগাড়ি-মু—ঢেঁকির লেজে পা চাপাইলে উহা নীচু হইয়া যে গর্তে গিয়া ঠেকে।

ঢেঁকির টিপি / টিবি-চ, পৈঠা-ব, পোঠে-ন. মু. খু :
—মাটির যে বেদীর উপর দাঁড়াইয়া ধানকুটুনীরা ঢেঁকিতে পাড় দেয়।

ঢেঁকির আড়-ম. খু. ব. ফ :
—ঢেঁকির কটির ফুট তিনেক উপরে দুইটি খুঁটির মাথায় বা গায় আড়াআড়ি ভাবে স্থাপিত বংশদণ্ড যাহার উপর ভর করিয়া ধানভানুনীরা ঢেঁকি চালায়।

ঢেঁকির ঘাসনা / গায়না / বগুলা-ম :
—ঢেঁকি চালাইবার সময় যাহাতে উহার মাথাটি এদিক ওদিক হেলিতে দুলিতে না পারে, তদুদ্দেশ্যে কোথাও কোথাও গড়ের কাছাকাছি ঢেঁকির (beam) গা ঘেঁসিয়া দুই পার্শ্বে দুইটি লম্বা খুঁটি পুঁতিয়া দেওয়া হয় ; ইহাদেরই নাম ঘাসনা, গায়না, বগুলা। গাঙ্গেয় অঞ্চলে এইরূপ খুঁটি কদাচিৎ দেখা যায় ; এতদঞ্চলে বারানীরা ঢেঁকিতে পাড় দিবার সময় প্রায়ই ঢেঁকির মাথায় একটি দড়ি বাঁধিয়া উহা টানিয়া ধরে এবং ছাড়ে।

ঢেকি চালানো সংক্রান্ত অন্যান্য কথা :
—ভানা [√ ভান্ < ভগ্ন]—ধান ইঃ শস্যের তুষ বা আবরণ পৃথক করা, to husk (ধানভানা), ধানকোটা-মে, ধানভানা-ক, ধানভুকা-কো. জ, ধানবাহান-রা. বগু. রং, বারাবানা-পুব, বারাবাঁধা / বারাবান্দা-চট্ট—ঢেঁকিতে ধান ভানিয়া চাল তৈয়ার করা। ধানকলে চাল তৈয়ারির ক্ষেত্রে 'ধানভাঙা', কথাটিও শুনা

যায়।....ঢেঁকিছাঁটা ছাল—ঢেঁকির সাহায্যে যে চাল তৈয়ার করা হয়।
ঢেঁকি ঠেঙানো-দচ, ঢেঁকিতে পাড় দেওয়া—ঢেঁকি চালানো।
ভাচা দেওয়া-হু—গড়ে ধান ভানিতে দেওয়া।
ধানকুট্‌নী-মু. মে, ধানভানুনী-মে. ম. খু—যে সকল স্ত্রীলোক পারিশ্রমিক লইয়া ঢেঁকিতে বা উখলিতে ধান ভানে বা চাল তৈয়ার করে। তৎপর্যায় :—ভানাড়ী-বী, ভারানী-চ. ন, বারানী-পুব, বানুনী-ব, বারাবাঁধুনী / বারাবান্দনী-চট্ট. বাঁই চেবাড়ী-বী। বোদ-মু—ধান ভানার খরচা বা পারিশ্রমিক।
সেঁকতদিয়নী :
—ধানভানার সময় যে স্ত্রীলোক গড় বা লোটের কাছে বসিয়া এদিকে ওদিকে ছড়াইয়া পড়া ধানগুলি হাত দিয়া আবার গড়ে ফেলিয়া দেয় কিংবা চিড়া কুটিবার সময় পিষ্ট ধানগুলি লোটে হাত দিয়া আলাইয়া দেয়। এইরূপ কাজকে বলা হয়—সেঁকে দেওয়া -চ. ন. মু. মে, সেঁকেত দেওয়া-বাঁ. বী, চালিয়ে দেওয়া-মে, আলাইয়া দেওয়া-ম. ত্রি নো. ব. পা, আইলাইয়া দেওয়া-ঢা, এলিয়ে দেওয়া -ন. ম. খু।
ঢেঁকিতে চাল প্রস্তুত করিবার সময় কয়েকটি কার্যক্রম অনুসরণ করিতে হয়: প্রথম দুই এক স্তরে সব ধান হইতে তুষ পৃথক হয় না, চালের সঙ্গে কতক আভাঙা ও কতক আধাভাঙা ধান থাকিয়া যায়। এইরূপ তুষ ও ধানমিশ্রিত লাল চালকে বলে আউড়িয়া চাল-মে, বাখুরিয়া চাল-পূব। এইগুলি কুলায় তুলিয়া ঝাড়িয়া আবার গড়ে ফেলিয়া পাড় দেওয়াকে বলে, 'পালটাদেওয়া'।
কাঁড়া, ছাঁটা / চালছাঁটা—চাল প্রায় সম্পূর্ণ তুষমুক্ত করিয়া আবার ঢেঁকিতে পাড় দিয়া অবশিষ্ট কণাকুঁড়া পৃথক করা ('ভিক্ষার চাল কাঁড়া আর আকাঁড়া।'-প্র)।
পাছড়ানো-চ, পাছুড়া-উব, পাছুড়ি-মে, ঝাড়াপচা-ম—কুলার সাহায্যে চাল হইতে তুষকণা ইঃ পৃথক করা।

ঢেরা / ঢ্যারা—সুতলি পাকাইবার ও জড়াইবার × চিহ্নের মত যন্ত্র বিঃ। × চিহ্ন।....ঢেরাসহি / -সই—ঢেরা কাটিয়া সহি (বিবিধ শব্দ দ্র)।

ঢোকা-বী—গোঁদল। **তকলি** [<তকু]—টাকু, spindle.

তকি, তক্যা / তৈক্যা [ফা° তাকী]-চট্ট. শ্রী—টুপি বিঃ, মাথার আবরণ (মাথাত্ তৈক্যা দিও)।

তক্তপোষ, তক্তাপোষ [ফা°]—চৌকি, শয্যাধার।

তবল [আ°]—বাদ্যযন্ত্র বিঃ।…তবলচি—যে তবল বাজায়।

তরবার / -রি, তরাল / -লি [হি° তল্‌বার]—তরোয়ার, তরোয়াল, তলোয়ার, তল্লার-চট্ট, অসি, ই° sword

তশলা—আঁকশলি। -বর্ধ. মু—হাড়িকাঠ। হুড়কা। [হি°]—পিতলের রন্ধন-পাত্র বিঃ।

তশলি-মে, **তশিল**-চ. ন—আঁকশলি।…তশিল [আ° তহ্‌সিল]—তহশিল, পাওনাগণ্ডা, খাজনা ইঃ আদায়।

তাওয়া [ফা° তাবা]-হা. হু.বর্ধ.মে. পা—রুটি সেঁকিবার লোহার অগভীর পাত্র, চাটু, তই। -ম—পিতলের অর্ধচন্দ্রাকার হাঁড়ি বা মালসা বিঃ। -ফ. ব. পা—আগুনের হাঁড়ি বিঃ। -মু—মাটির চিতড়ে খোলা (মুড়ি ভাজিতে প্রয়োজন হয়)।

তাকিয়া [ফা°] —গির্দা, হেলান দিয়া বসিবার বড় বালিশ।

তাগাড়ি [তু° তঘার]-ম—পিতলের গামলা বিঃ, চরিয়া / চইর‍্যা-ম।

তাটিয়া-মে—বাটি।

তাড়-মে—গামলা বিঃ। বাহুর অলংকার বিঃ।

তাড়া-হিজ—চাল ইঃ রাখিবার মাটির পাত্র (চালের তাড়া)। বাণ্ডিল, গোছা (এক তাড়া নোট)। ব্যস্ততা (যাইবার তাড়া)। ধমক (তাড়া খাওয়া)। …তাড়া করা—আক্রমণ করা, মারিবার জন্য ছুটিয়া যাওয়া।…তাড়ানো—তাড়াইয়া দেওয়া, দূর করা।

তাড়ু [<তদ্‌]-ন—ভিয়ান করিবার কাঠের হাতা বিঃ।

তামারি-নো—গামলা বিঃ। **তাম্বস**-মুস—চামচে হাতা।

তারি-মুস—তেল ঘি ইঃ মাপিবার মাটির এক ছটাকী পাত্র (এক তারি তেল)।

তালাই—তালপাতা ইঃর আস্তরণ (চাটাই দ্র)।

তিউরি / তিয়রি / তেউরি-বাঁ. বী. ধ—উনন ('তিন নারিকেল দিয়া সাজাইল তিয়রি' -কেক্ষেমা। 'বার রাজপুত তের তেউরি' -প্র)।

তিজেল [পো° tigela]—ডাল ঝোল তরকারি ইঃ রাঁধিবার চেপটা ধরনের হাঁড়ি। তৎপর্যায়—আগৈল-চট, কাতরা / কাতারি-মু. পা. মা, থাপরি / থাবরি -মে. চা, চাটুহাঁড়ি-বর্ধ, তাই-মু. রা. দি, তালানি-মে, তেইলা-শ্রী, তেলানি, থেলানি-বী, পাতিল-পূব, যেননে হাঁড়ি-দচ।

তেনা / ত্যানা-পূব [<নেতা / ন্যাতা]—নেকড়া, কানি।

তেপায়া—সেপায়া, তিন পা বিশিষ্ট টেবিল বিঃ। **তেলানি**—তিজেল।

তোড়া [আ° তরবাহ্]—থলে (টাকার—)। গোছা (নোটের—)। স্তবক (ফুলের—)

তোরঙ্গ [ই° trunk]—ধাতুর তৈয়ারি বাক্স বিঃ।

তোলো, তোলোহাঁড়ি [পো° talha, হি° তন্দুল]-ন. মু. ম. খু—ভাত রাঁধার বড় হাঁড়ি। তৎপর্যায়ঃ—ডখি / ডুখি-পূব, তেওলো-বর্ধ, তৈলা-মা, তোলো-বী, রাইন / রাইঙ-পূব।

থলি, থলিয়া, থলে—চট কাপড় চামড়া ইঃর তৈয়ারি আধার। নানা কাজে নানা রকম থলি ব্যবহৃত হয়। বাজার করার বা রেশন আনার থলি অর্থে বর্তমানে ব্যাগ (bag) শব্দটির প্রয়োগ খুব বেশী।....কাঁধে ঝোলানো থলি—ঝুলি, ঝোলা।....টাকার থলি—খতি, গেঁজে, তোড়া, পোক, বটুয়া, money-bag।....মোটা কাপড়ের থলি—ধোকড়, ধুকড়ি ('কুন্দলের ধুকড়ি আলাইয়া দিল মুনি'-রারচ)।....চটের বড় থলি—থলে, থয়লা, ছালা, বস্তা, বোরা।

থাল, থালা [স° স্থাল, হি° থালী, সাঁ° থারি]—প্রধানত ভোজনপাত্র। প্রায়ই ইহা চক্রাকার, সমতল এবং সামান্য কানাযুক্ত হইয়া থাকে। মাটি পাথর কাঠ এবং বিবিধ ধাতু দিয়া নানা রকম থালা তৈয়ার করা হয়। কাঁসার বগি, কাঞ্চন ও গয়েশ্বরী থালা বিখ্যাত। এককালে খাগড়াই (পশ্চিমবঙ্গ) ও ইসলামপুরী (বাংলাদেশ) থালা বাসনের খুব নাম ছিল।

....**থালি**—ছোট থালা। কোন কোন সমাজে সাধারণ থালা (ছোট কি বড়) অর্থেও 'থালি' শব্দ প্রয়োগ করা হয়। ... **থালিয়া**-মা—থালা।

থুতকুড়ি-চ—পিকদানি ('থুতকুড়ি থুতকুড়ি, সতীন বেটি আঁটকুড়ি।' সেঁজুতি ব্রতের ছড়া)।

দপলা / দবলা—কুলা।

দয়েহাঁড়ি-চ. খু—যেরূপ হাঁড়িতে সাধারণত দই পাতা হয়। তৎপর্যায়ঃ—দইয়ের পাতিল, দইয়ের ভাঁড়, কাছলা, কাতারি, ডুভি-বগু (ছোট ভাঁড়)।

দা, দাও-পূব. উব [স° দাত্র]—প্রসিদ্ধ কর্তনাস্ত্র। দা নানা প্রকারের : (১) সাধারণ দা—দা / দাও, কাটারি-পব, কাতনা / কাতান, কাতি-রাঢ়. মু. মা. দি, ডাব ছোলা-চা, দাওলি, দাউলি-মে. মু, শোঁদা-বী, হাত দাও-জ. কো। (২) ঘাস কাটার দা—ঘাসুড়্যা -বী, ঘাসুয়া দাও-জ. কো। (৩) পাটকাটার দা—হাঁসু, বেঁকি। (৪) ধানকাটার দা—কাস্তে / কাস্তে দা-মে, কাচি, কাচি দাও-উব। (৫) খড়কাটার দা—গরসি-উব, গারাসি-ম. চা। (৬) মাছ আনাজ তরকারি ইঃ কুটিবার দা—বঁটি, বঁটিদা। (৭) রসের জন্য খেজুর গাছ ইঃর মাথা চাঁচিবার দা

—গাছ কাটা দা, হাঁসুয়া / হেঁসো, ছেনি-নো। (৮) কাঠ, বাঁশ ইঃ কাটিবার বড় ভারী দা—কাঠ-দা। (৯) পশুবলির দা—খড়্গ, খাঁড়া, খাণ্ডা, কাতা। (১০) শক্রকে আক্রমণ করিতে কিংবা শক্রর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার্থে ব্যবহৃত দা —রামদা / রামদাও, কিরিস, কুরকি, ভোজালি। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, কাটারি বলিতে কোথাও (ম, টা. চা) বঁটিদাকে এবং কোথাও (পব. মে) সাধারণ দাকে বুঝায়। মেদিনীপুরে আবার ধানকাটার দা 'কান্তে দা' নামে পরিচিত।

দাউলি / দাওলি-মু. মে—কাটারি, সাধারণ দা।

দাওড়া-মে—বাঁশের বড় ঝুড়ি।

দিউলি-ন, **দিয়ার / দিয়াইর**-উব, **দিলোই**-মু—মুচি (মুষা) বা ঠোঁটওয়ালা খুরি যাহাতে তেল ঘি দিয়া সলিতা সিক্ত করিয়া আলো জ্বালে। তৎপর্যায়ঃ— চাটা -শ্রী, চেরাগ-মুস, টাঠি / খুলি-খু, ডিয়ারি-উব, ডেলুই-বী, দিলদিলি-মু, প্রদীপ (পিদিম/পিদ্দিম), মুচি / মুছি (বাতির—)-পুব, মল্লিকা ম. চা. পা.।

দেরকো / -খো [<দারু (কাষ্ঠ)+কুয়া]—কাঠের পিলসুজ।

দেরাজ—টেবিল আলমারি ইঃর ভিতরকার বাক্স বিঃ যাহা টানিয়া বাহির করিতে ও ঠেলিয়া বন্ধ করিতে হয়, ই drawer।

দেলকো—'দেরকো'র আঞ্চলিক রূপভেদ।

দেশলাই / দিয়াশলাই [<দীপশলাকা]—শলাই-ম, দিয়াবাতি-পুব, দে-কাটি -দচ, টানাকাঠি-বধ, মেচবাতি, আগুনের ভাণ্ডি, থ'য়ের বাক্স-বী।

দোন / দন-চ. উব—শস্যমান। শস্যাদি মাপিবার পাত্র বিঃ। রংপুরে এক দোনের পরিমাণ তিন সের, জলপাইগুড়িতে আট সের হইতে পনরো সের, চব্বিশপরগনায় অনধিক এক সের। -ব—নদীর স্রোতের প্রবল আবর্তন স্থান।

দোনা-ম. চা. পা—মাটির দোহনপাত্র (কেঁড়ে দ্র)। পাতার ঠোঙা (পানের দোনা)। -মু. বী—গোরুকে জাব দিবার মাটির প্রশস্তমুখ পাত্র বিঃ।

দোয়াত [আ° দবাৎ]—মস্যাধার, inkpot।....দোয়াতপূজা—সরস্বতীপূজা। এককালে এবং এখনও কোন কোন পরিবারে মূর্তির পরিবর্তে শুধু দোয়াতকলমে (খাগের কলম) পূজা হইত এবং হইয়া থাকে। মূর্তিতে পূজা হইলেও দুধ ভরতি দোয়াত এবং খাগের কলম পূজার বেদীতে অবশ্যই স্থাপন করিতে হয়। ....ময়মনসিংহে কেরোসিনের ডিবাকেও দোয়াত / দোয়াইত বলিতে শুনা যায়।

দোশুন / দাশুন-মু, **দোশন**-মা—ভাঁড় হইতে তেল তোলার লোহার পলা।

দোহনপাত্র—দুধ দোহাইবার পাত্র। ইহা মাটির বাঁশের বা বিভিন্ন ধাতুর হইতে পারে। বিভিন্ন অঞ্চলে ইহার বিভিন্ন নাম শুনা যায় : কেঁড়ে (বাঁশের চোঙার বা পিতলের), ঘটি-উব, জাম-মে (পিতলের), ডোঁবটি-মু (বালতি), ডোল-রাঢ়. মা. দি (বালতি), দুইনি-নো / দোনা-ম. চা. পা / দোয়নি-শ্রী. ত্রি (প্রায় মাটির), পালি / পেলে -মু, বালতি, বাসইল-ফ, বেসালি-ম. খু, হাতন / হাতুন / হাতুয়া-ম. ফ. ব. খু, হাত্যা / হাতো-চট্ট, milkpail.

....দোয়াল—যে দোহন করে।

ধামা [সং ধামক]—শস্যাদি বহন করিবার বা রাখিবার বেতের অর্ধবৃত্তাকার ঠাসবোনা পাত্র বিঃ। ছোট ধামা মাপের পাত্র রূপেও ব্যবহৃত হয়। তৎপর্যায়ঃ—আগুল-ফ. শ্রী, আগৈল-ম. টা. ব. নো, খড়া-চ, খাদা / খাদি-ম (মুস), ঠাকা-মে, ঢাকি-ম. ঢা. উব, বেতি-মে।....ধামাধরা—তোষামুদে। তোষামুদ করা।

ধারা-উব, ধারি-ম—বিশেষ ধরনের শক্ত মজবুত চেটাই বিঃ (ঘরবাড়ি দ্র)।

ধুচন, ধুচনি, ধুচুনি—চাল ইঃ ধুইবার সচ্ছিদ্র পাত্র বিঃ! তৎপর্যায়ঃ—গোচৈ-ফ. ব, টুকি-বাঁ, টুকুই / টুকোই-বধ´. বী, টকা-মে. বাঁ, টোকা-মু।

ধুনাচি/ধুনুচি—ধূপধুনা জ্বালাইবার মাটির বা ধাতুর হাতলযুক্ত পাত্র বিঃ। তৎপর্যায় :—ধুনাতি/ধুপতি-পুব. উব, ধূপচি-মু, ধূপদানি, পাজাল-ব, incense burner.

নগা, লগা, নগি, লগি—আঁকশি। নৌকা ঠেলিবার লম্বা সরু বাঁশ, বাইশ, চইড়/চোড়।

নরাজ-মে—খুন্তি।

নাকরি/নাকারি-কো—ডালের কাটি।

নাগরি—মাটির বিশেষ ধরনের কলসী (গুড়ের—)।

নাদা—তলা গোল বিস্তৃতমুখ মাটির বৃহৎ পাত্র, নাইন্দা-নো, মেচলা-চ, চাড়ি-পুব. উব (গামলা দ্র)।....নাদাপেটা—যাহার পেট নাদার মতো গোল এবং বড়।

নুচনি/লুচনি—রান্নার হাঁড়ি কড়া মুছিবার নেকড়া বা ঐ ধরনের জিনিস।

নেকড়া/ন্যাকড়া, নেতা/ন্যাতা, নাথা, [নক্তক]—ছিন্ন বস্ত্রখণ্ড (কানি দ্র)।

নোট, লোট—ঢেঁকির গড় (ঢেঁকি দ্র)।

নোড়া—মশলাদি পেষিবার বা ছেঁচিবার গোলালো পাথর (শিলনোড়া। 'যার শিল তারই নোড়া, তারই ভাঙি দাঁতের গোড়া'-প্র]।

নোড়া, লোড়া—খড়বিচালি বা নেকড়ার পুঁটুলি।

নোদা/নোনদা-উব—গোবর ধরানো কাঠি (জ্বালানি রূপে ব্যবহৃত হয়)।

পটিট্টশ—বর্শা বা খড়্গা জাতীয় অস্ত্র বিঃ।

পতিলা-মে. মু—তামার কলাইকরা ডেগ জাতীয় বৃহৎ পাত্র।

পনিক-মে—বঁটি দা। **পনিয়া/পানছিয়া**-মে—চিরুনি।

পরাত [পো° prato, হি° পরাত]—বারকশের ধরন পিতলের কানা উঁচু বড় থালা।

পলা—ভাঁড় হইতে তেল তুলিবার হাতলযুক্ত বাটি বা হাতা বিঃ ('তেলের ভাঁড়ে তেল নেইকো পলায় মারে ঘা'-মেছড়া)। কুচি কুচি করা (ডাঁসা আম পলা)।

পলারি-চ. ন. মু. হা. হু—পলোয়ারি, কানা উঁচু ছোট থালা, কাঁসি।

পলিতা/পলতে [ফা° ফতী লাহ]—সলিতা, wick.

পসুরি [পঞ্চসেরী] —পাঁচ সের পরিমাণ শস্যাদি মাপিবার পাত্র বিঃ (এক পসুরি ধান)। তৎপর্যায় :—পুসোর-বী, পুরুসা-মে, পাসারি-ঢা. টা, পাইয়া /পাইরি-ম।

পাই-বাঁ-মে—মানপাত্র। শস্যের পরিমাণ বিঃ (এক পাই চাল=প্রায় এক সের চাল)। গৃহপাট, নির্দিষ্টকাজ (পাইসারা)। পাওনা গণ্ডা (পাই গোছানো— —প্রাপ্য টাকার সুব্যবস্থা করা)।-মু. দচ—ক্ষেতমজুরদের পালা করিয়া কাটিয়া ও বিছাইয়া যাওয়া ধানগাছের সারি। -চ. ন—পানের সংখ্যা বিঃ [১২শ (১৬×১২) পানে এক পাই]। আগেকার পয়সার ⅓ অংশ, pie.

পাখা—যাহা দ্বারা বাতাস করা হয়, ব্যজনী। তৎপর্যায় :—পাঙ্খা, বিচইন, বিচনি, বিচুন, বিচুনি, বিউনি, বিয়নি, বেনা। এই সকল নাম হাতপাখা সম্পর্কেই প্রযুক্ত হয়। পাখা<পক্ষ—ডানা (পাখা ওঠা)। পালক ('উলুর পাখা হয় পুড়ে মরতে'-প্র)।

পাখা, পাখাল—উনন। **পা-গাড়ি**—সাইকেল, bicycle.

পাঁচঠুলি—একত্র সংবদ্ধ ছোট বাটির ধরন পাঁচটি পাত্র ; ঝুলাইয়া রাখিবার জন্য ইহাদের দুই বিপরীত প্রান্ত সংযুক্ত করিয়া একটি অর্ধবৃত্তাকার হাতলও থাকে, hanging bowls.

পাছিয়া / পাইছা / পাইচা-ম. টা. ঢা. প:—বাঁশের শলা এবং বাখারি খোপ খোপ করিয়া বাঁধিয়া তৈয়ারী অর্ধবৃত্তাকার সুগভীর পাত্র। কাঁসারীদের থালাবাসন, কুমারদের হাঁড়ি কলসী, ঝাঁকামুটেদের মোট সাধারণত এইরূপ পাত্রেই বহন করে (কুমারের পাইছা)। মুটেদের এই পাইছা 'ঝাঁকা' নামে

প্রসিদ্ধ। উল্লেখযোগ্য যে এই ঝাঁকা এবং ২৪ পরগনার চাষীদের ঝাঁকা এক জিনিস নয় (চাষ-আবাদ 'ঝাঁকা' দ্র)।

পাছিয়া-হিজ—চুবড়ি বিঃ (পেছে দ্র)। **পাজা**-মু—ঝুড়ি বিঃ।

পাজাল-ব—ধুনচি। কোদাল (কবিক)।

পাট—মাটির গোলাকার পাত্র বিঃ ('পাইয়া টাকার পাট চলে বীর গোলাহাট' —কবিক)। **পাটা, পাটাপুতা**—শিলনোড়া দ্র।

পাতনা, পাদনা—গোরুকে জাব দেওয়া, ধান ভিজানো ইঃ কাজে ব্যবহৃত মাটির গামলা বিঃ।

পাতনি, পাতুলি—আস্তরণ, বিছানার চাদর।

পাতিল-পূব [সং পাতিলী]—ডাল ঝোল রাঁধিবার চেপটা ধরনের মাটির পাত্র, তিজেল। ইহাতে আরও অনেক কাজ হয় : চালচিড়া ভাজে (খোলা পাতিল), তুষঘুঁটের আগুন রাখে (আগুনের পাতিল), দই পাতে (দইয়ের পাতিল), হবিষ্য রাঁধে (হবিষ্যের পাতিল)। ....পাতিল ফেলা—মৃতাশৌচে রান্নার মাটির হাঁড়ি পাতিল ফেলিয়া দেওয়া।

পাথর, পাথরা-বী, **পাথুরি, পাথৈর**-শ্রী. ত্রি—পাথরের থালা। সাধারণ থালা অর্থেও পাথরা শব্দের ব্যবহার আছে ('মাটির পাথরা'—মাটির থালা)।

পাথি-রাঢ়, **পাথ্যা / পেথ্যা, পেথে / পেতে**—পণ্যদ্রব্য সাজাইবার ঝুড়ি বিঃ, পণ্যদ্রব্যের আধার, পসরা ('চলে রামা পূর্ণ করি পাথি'-কবিক)। মাছের চুবড়ি ('মহামায়া মায়া কর‍্যা মৎস্য ধরে ক্ষেতে। পাথ্যা ধর‍্যা পশুপতি ফিরে সাথে সাথে।'-রারচ)। ঠাসবোনা চুপড়ি বিঃ, ডালা ('পাথি কর‍্যা থৈ কলা দধি আগ্যাছি'—কেক্ষেমা)। -মু—পাতার ঈষৎ গভীর ডালা বিঃ।

পানই [সং উপানহ্]—জুতা (চপ্পল জাতীয়।

পাপোশ [ফাং পাপুশ]—পাঁউইশ-চট্ট, পায়ের ধুলা মুছিবার নারিকেলের ছোবড়া ইঃর পুরু আস্তরণ বিঃ।

পালি [সং পারী]—পেলে-মু, দোহনপাত্র। চুমকি গ্লাস। মানপাত্র (কুনিকা দ্র)। শস্যাদির পরিমাণ বিঃ। পালি ভাষা।

পিকদান, পিকদানি—পিক বা থুতু ফেলিবার পাত্র, spitoon।.. পিক, পিচ —চিবানো পানের রস। থুতু।

পিছা-চা. ক—ঝাঁটা (পিছার বাড়ি), ফিচা-চট্ট। বড় মাছের লেজ।

পিঁড়া / পিঁড়ে—[হিং পীড়হী] পিঁড়ি, কাঠের কলা হইতে তৈয়ারি নীচু

আসন বিঃ। লুচি বেলিবার কাঠের চাকতি (পিঁড়ে-বেলুন)। উননের মাটির শৃঙ্গত্রয়, ঝিঁক। (ঘরবাড়ি দ্র)।

পিঁড়ি [সং পীঠ]—পিঁড়া, পিঁড্যা, কাষ্ঠাসন বিঃ (পিঁড়া দ্র)। -বগু—বংশের পর্যায়, generation ('তিন পিঁড়ি হজম করা'-বলোসা)।

পিড়াল-ব—মাটির বেদী যাহার উপর রান্নার হাঁড়িকড়া বসানো হয়।

পিলসুজ [ফাং পীতল্‌সোজ]—প্রদীপ ইঃ রাখিবার খাড়া ধরনের আধার। ইহা কাঠ, মাটি বা পিতলাদি ধাতু দিয়া তৈয়ার করা হয়। তৎপর্যায়:—গাছা-পুব. উব. শ্রী. মু, গাইছা-ত্রি, দীপগাছা-বী, দিয়ারা-চট্ট, দিলকো-খু, দেউরকা-ফ. ব. নো, দেরকো / দেরখো-চ. হা. হু. বর্ধ. বাঁ. বী. মে, দেলকো / দেলখো-ন. মু. য, ঠনা-শ্রী, চেরাগদান-মুস, lamp stand.

পুড়া-রাঢ়—শস্যাধার (গোলাকার)।....বিছনপুড়া—বীজ ধানের গোলা।

পুতা, পুতাইল, পুত্যা—নোড়া (শিলনোড়া দ্র)। **পুয়া**—ঢেঁকি দ্র।

পুরা -ত্রি. নো—কুনকে জাতীয় পাত্র বিঃ (এক পুরা চাল)। -ম—জমির পরিমাণ বিঃ (এক পুরা জমি)। পূর্ণ (পুরা তিন রোজ)। প্রাচীন (পুরা কাহিনী)। -ফ—ঠোঙা (পানের পুরা)। [√পুর] পূর্ণ হওয়া, পূর্ণ করা, ঢোকানো (মুখে পুরা)।

পেচে-ন, **পেছে**-মু. বর্ধ, **পেছ্যা**-বাঁ. বী—চুবড়ি বিঃ, পাছিয়া-হিজ। নদীয়াতে মাছের চুবড়িকেও 'পেচে' বলিতে শুনা যায়।

পেটরা—ধাতুর বা বেতের তৈয়ারী বাক্স বিঃ। সেকালে গৃহিণীরা বাক্স, পেটরা, ঝাইল, ঝাঁপিতে তাঁহাদের যথাসর্বস্ব রাখিয়া দিতেন। এইগুলিতে যেমন থাকিত প্রসাধন সামগ্রী, কাপড়চোপড়, তেমনই থাকিত গহনাপত্র, টাকামোহর। পূর্ববঙ্গের বহু অঞ্চলে ধাতুর তৈয়ারী (প্রায় পিতলের) যে জিনিসটিকে পেটরা / পেটেরা বলা হয়, তাহার গড়ন সাধারণ বাক্সের মত নয় ঢাকনিযুক্ত বেতের ঝাঁপির মত। ইহাতে কব্জার সাহায্যে তালা লাগানো যায়। এই পেটরায় কাপড়চোপড় রাখিবার স্থান নাই, আশীর্বাদী টাকামোহর, গয়না গাঁটিই ইহাতে থাকিত।

পেড়া < পেটক—কাপড়চোপড় রাখিবার বাঁশের বা বেতের বাক্স বিঃ।...**পেড়ি**—ছোট পেটরা।

পেতে / পেথে—ছোট চুবড়ি বিঃ (পাখি দ্র) **পেলে**—দোহনপাত্র।

পোঁচ-ব. ফ. ব, **পোতলা**-রা—ঘর নিকানোর ন্যাতা।

প্রদীপ—মাটির বা ধাতুর ঠোঁটওয়ালা খুরি যাহাতে তেল-ঘিয়ে পলিতা সিক্ত করিয়া আলো জ্বালা হয় (প্রদীপের আলো)। পয়দীপ, পিরদীপ, পিদিম, পিদ্দিম—প্রদীপের অর্ধতৎসম বিভিন্ন রূপ। দীপ, আলো।

ফুঁকনি—নিবন্ত আগুন ফুঁ দিয়া জ্বালাইবার সরু বাঁশের পাব হইতে তৈয়ারী চোঙা বা নল।

বগুনা / বউগনা-ম [হি॰ বরগুনা]—মালসা বা গোলার্ধ ধরনের পিতলের রন্ধনপাত্র বিঃ। তৎপর্যায়—বোকনা -টা. ঢা. ফ. ব, বোগন্ঠা-মু. পা. রা, বোগনো / বোগনোহাঁড়ি-ন. চ. হা. হু. বর্ধ. মে।

বঁটি, বঁটিদা [ওরাঁও বৈঁঠি, সাঁ। বিন্ঠি]—মাছ তরকারি ইঃ কুটিবার (কাঠের পাটায় ঈষৎ হেলাইয়া বসানো) খড়্গাকার অস্ত্র বিঃ।

বটুয়া / বট্যুয়া-পুব—কাপড়ের ছোট থলি ; ইহাতে সাধারণত পান ও পানের মশলাদি রাখা হয়। -ব—শস্যমান। শস্যাদি মাপিবার পাত্র বিঃ (এক বটুয়া ধান বলিতে কোথাও ১৪ সের বুঝায়)।

বড়ে-ব—গোবর ধরানো কাঠি।

বদনা-মুস—বিশেষ ধরনের নলযুক্ত জলপাত্র বিঃ।

বলছিলা-ম, **বলিচ্ছেদ**-শ্রী—পশুবলির খড়্গ, খাঁড়া, কাতা।

বস্তা [ফা॰]—চটের থলে (ছালা দ্র)। **বাউলি / বাওলি**—বেড়ি দ্র।

বাক্স, বাস্ক [ইঃ box]—বিবিধ জিনিস, টাকাকড়ি, কাগজপত্র ইঃ রাখিবার ঢাকনিযুক্ত আধার বিঃ (প্রায় চতুষ্কোণ)।....হাতবাক্স, ক্যাসবাক্স।

বাঁটলই / বাঁটলো—গোলাকার বড় ঘটি, ইহাতে ভাত ডাল রান্না করা যায়।

বাটা, পানের বাটা—সাজা পান রাখিবার বা পরিবেশন করিবার পাত্র। ইহার আকার নানা প্রকার। তবে কানা উঁচু ছোট থালার মত এবং ঢাকনি যুক্ত ছোট বাটির মত বাটারই প্রচলন অধিক। সম্প্রদায়ভেদে ইহার ‘পানথাল’ এবং ‘বিড়িদান’ নামও শুনা যায়।

বাটা—ষষ্ঠীর বাটা ; জামাইষষ্ঠীর দ্রব্য যাহা জামাতাকে দেওয়া হয়। বাটা [বাট্টা]—ন্যায্য মূল্য হইতে যাহা বাদ (discount) দেওয়া হয়। [√বাট্] পেষণ করা (মশলা বাটা)।

বাটি—প্রধানত তরল আহার্যাদি রাখিবার খাইবার এবং পরিবেশন করিবার চক্রাকার মুখ, ঈষৎ গভীর পাত্র বিঃ। বাঙালীর সংসারে নানা নামের নানা শ্রেণীর বাটি ব্যবহৃত হয় : জামবাটি, জামখোরা—কাঁসার বড় বাটি। খোরা,

চাকাইবাটি—খুরাযুক্ত বাটি। খাদা—পাথরের বাটি।....কাঠো, কেঠকো কেঠো, কাঠুরি, কাঠুরা—কাঠের বাটি।....কাপ, পিয়ালা / পেয়ালা, কাচন, কুটুরি, খুরি, গিনা—নানা উপাদানে নির্মিত নানা কাজে ব্যবহৃত ছোট বাটি। যেমন, চায়ের কাপ, চায়ের পেয়ালা, নুনের গিনা, সিঁদুরের খুরি।

বাটিয়া / বাট্যা—কাপড়ের পাড় হইতে তোলা সুতা।

বাড়ন, বাড়ূন [<বর্ধনী, হিং বঢ়নী]—সম্মার্জনী, খড় পাতার ঝাঁটা, বার্হন-মা।

বাত্তি [সং বর্তিকা]—বাতি শব্দের মূল অর্থ পলিতা, কিন্তু বাংলায় 'বাত্তি' বলিতে বুঝায় আলো, দীপ (বাতি জ্বাল, বাতি দাও)।....সন্ধ্যাবাতি—সন্ধ্যায় তুলসীমঞ্চে, গৃহে, গৃহ-দেবতার স্থানে তেল বা ঘিতে পলিতা সিক্ত করিয়া মাটির বা ধাতুর খুরিতে যে আলো জ্বালা হয়।....কেরোসিনের বাতি—লণ্ঠনে বা লম্পে কেরোসিনের যে আলো জ্বলে।....বিজলিবাতি—বৈদ্যুতিক আলো।....মোমবাতি —মোমের আলো।....বাতিদান—পিলসুজ।

বাত্তি—গাছের সরু গুঁড়ি যাহা সাধারণত ঘরের খুঁটিরূপে ব্যবহৃত হয় (শালের বাতি)।

বাদিয়া-মু—কাঁসার মাঝারি বাটি। বেদে, সম্প্রদায় বিঃ।

বারকশ / বারকোশ-[ফাং]—কাঠের বড় থালা। সাধারণত এইরূপ থালায় বৈবাহিক তত্ত্বাদি পাঠানো হয়, ময়রারা ছানা ময়দা ডলে। তৎপর্যায়ঃ— থঞ্চা / থাঞ্চা / খুঞ্চি, পাটা-ন, বাটা-নো।

বারা, বারি—(ঘট দ্র)। **বার্হন**—ঝাঁটা। **বালতি** <পোং balde.

বালিশ [ফাং]—উপাধান, pillow.....মাথার বালিশ—শিথানের বা শিয়রের বালিশ।....পাশে রাখিবার বালিশ—পাশ বালিশ, কোল বালিশ, আশগড়ি / আশগাড়ু-কবিক।....হেলান দিবার বালিশ—তাকিয়া, গির্দা / গিদ্দা / গেদ্দা।

বাসইল-ফ, **বেসালি**-য. খু [পোং vasilha]—দোহনপাত্র বা দুধের বড় পাত্র বিঃ।

বিড়িদান [বিড়ি < সং বীটি (সুসজ্জিত পান)+ফাং দান (আধার)]— পানের বাটা।

বুড়িয়া-মে—ছোট কুড়াল, টাঙি। বুড়িয়া / বুড্যা-পূব—বৃদ্ধ (তুচ্ছার্থে)।

বেড়ি—রান্নার হাঁড়ি ডেকচি বগুনা ইঃ র কানা বেষ্টন করিয়া ধরিবার যন্ত্র বিঃ। তৎপর্যায়ঃ—অলতিয়া-রং, চোটো / বাউনি-জ. কো. ত, বাউলি / বাওলি-পূব. ত্রি. পা, বেড়ুয়া-ব। **বেনা**-বী. মু—হাতপাখা (উদ্ভিদ দ্র)।

বেলি-পূব—কাঁসি, কানা উঁচু ছোট থালা। বেলফুল।

বৈঠক—হুঁকা রাখিবার আধার। মজলিস (বৈঠক বসেছে)। ব্যায়াম বিঃ (ডনবৈঠক)।

বৈয়াম, বৈয়ম [পো° boiao]—ঘি চিনি আচার ইঃ রাখিবার ঢাকনিযুক্ত পাত্র বিঃ, cruet (আচারের—)।

বোঁচকা [তু° বুগ্‌চাহ্‌]—পোঁটলা (কাপড়ের—)।.... (ক্ষুদ্রার্থে) বুঁচকি।.... বোঁচকাবুঁচকি—পোঁটলাপুঁটলি।

ভরকা-মে—হুঁকার প্রকারভেদ। **ভাউড়ি**—ঝুড়ি বিঃ। **ভাঙা**-খু—নেকড়া।

ভাঁড় [স° ভাণ্ড]—মাটির ছোট কলসী। বাটির ধরন মাটির পাত্র (ভাঁড়ে চা খাওয়া,—জলখাওয়া, দইয়ের ভাঁড়)। নাপিত যে আধারে করিয়া ক্ষুর কাঁচি ইঃ বহন করে। [ভণ্ড] বিদূষক, clown (গোপাল ভাঁড়)।....ভাঁড়কুঁড় —শিশুদের খেলার ঘটিবাটি। **ভাতোয়া**-মা—ভাতের হাঁড়ি।

ভুর্তি-শ্রী—মাঝারি ধামা। **ভেটুয়া / ভেট্যুয়া**-ম—মাটির ছোট হাঁড়ি।

মউনি [স° মন্থনী, মথনিকা]—মন্থনদণ্ড, দুধ তথা দধি মন্থন করিয়া মাখন তুলিবার ফাঁদাল মুখ দণ্ড বিঃ, ই° churning rod. তৎপর্যায়ঃ—কাড়না-কো, খড়েন-য, ঘেট-জ. কো, চড়কি-ব, ছাঁচুনি, মথৈন-টা. ঢা, ময়াকাটি-খু, মাথনকুড়া-ম. শ্রী, মাথানি-বাঁ, মোথুনি-মে. বী. মু।

মস্তুরা—বাঁধানো লাঠি।

মটকা, মটকি—ইহারা উভয়েই মাটির বৃহৎ জালা; কিন্তু, ইহাদের গড়নে কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে। মটকা বাতাবি লেবুর মত গোলাকার, কানা সামান্য হেলানো, ইহার রং মেটে। কিন্তু মটকির গড়ন দীর্ঘাকার (oval), কানা খাড়া, দেখিতে কবন্ধের মত। এই গুলিতে চাল, কলাই, গুড়, ঘি ইঃ রাখা হয় ('চন্দ্রকোণার মটকি ঘি, খেলিনা তো খেলি কি-' প্র)। পর্যায়শব্দঃ—মেটে-চ মাঠি-ফ. য. ব, মাটকি-মা, মাইট-পূব, পেয়ে-ন, বোড়া-মু, কৈলা-শ্রী, কোলা-মে. টা. ঢা. ফ. নো. পা, বাইন / গাছ বাইন-বাঁ।

মটকা [<মট্টক]—ঘরের চালের মাথা (ঘরবাড়ি দ্র)। রেশমী কাপড় বিঃ।

মল্লিকা—মুচি (মুষা), মাটির প্রদীপ। পুষ্পভেদ।

মলুয়া / মল্যুয়া-ম—খেজুর পাতার পাতনি।

মশারি—মশা নিবারক শয্যাবরণ, ঘোনা-ফ। মশরি-চট্ট, মশৈর-ব, মুশারি-টা. রং, মুশুইর-ম, মুশৈর-ঢা—মশারির বিভিন্ন আঞ্চলিক রূপ।

মাইট-ম—মটকা, মেটে।····মাইট পাওয়া—গুপ্তধন পাওয়া (এক সময়ে চোর-ডাকাতের ভয়ে অনেকে ধনরত্ন হাঁড়ি মটকি ইঃতে করিয়া মাটিতে পুঁতিয়া রাখিত। মৃত্যুর পূর্বে পুত্রকন্যাকে তাহা বলিয়া যাইতে না পারিলে সেই ধনরত্ন অনেক ক্ষেত্রে পরহস্তগত হইত। ইহারই এক আঞ্চলিক নাম 'মাইটা পাওয়া')।

মাচিয়া / মাইচ্যা / মাইচা—চেয়ার, chair।

মাচিলা—দড়ির বোনা জলচৌকির মত আসন।

মাজলা, মেচলা—চাড়ি, বৃহৎ ঝুড়ির আকার মাটির পাত্র বিঃ(গামলা দ্র)।

মাজাইর-ত্রি—মাঝারি হাঁড়ি। তৎপর্যায়ঃ—আনতি-চট্ট, বাটথারা তাই-দচ।

মাজুর, মাদুর—তৃণাদি বুনিয়া তৈয়ারি আস্তরণ বা পাতনি।····মছলন্দ, মসলন্দ—[ফা°—সূক্ষ্ম বোনা ও কাজ করা মাদুর বিঃ। মেদনীপুরে উৎকৃষ্ট মছলন্দ তৈয়ারি করা হয়।

মাল [আ°]—জিনিস, দ্রব্য, goods (তাহার সঙ্গে অনেক মাল)। পণ্যদ্রব্য (মালগাড়ি, goodstrain। মালগুদাম, warehouse)। মালের বহুবচনে মালপত্র, মালপাতি, মালবেসাত, মালমাত্তা, মালামাল—বহু প্রচলিত। ····মাল-মশলা—উপকরণ, ingredients.

মাল—মদ্য (লোকটা মাল খেয়েছে)। রাজস্ব, খাজনা (মালখানা, মালগুজার)।

মাল—মল্ল, বীর,পালোয়ান(মালগিরি)। সম্প্রদায় বিঃ এবং সম্প্রদায় বিশেষের পদবী (যুধিষ্ঠির মাল)—এই দুই অর্থে মালের উচ্চারণ হসন্তান্ত্য নহে।

মাল্-ম—উচ্চস্থান, উঁচু জমি (মাল জমিতে ফসল উৎপাদন করিতে হইলে সেচের ব্যবস্থা থাকা চাই। মেদিনীপুরে 'মাল' প্রত্যয় যোগে স্থানের নামও আছে (কেওড়ামাল-পরগনা, কেলোমাল)। শ্রী সুহৃদকুমার ভৌমিক উঁচু জায়গা অর্থে মাল শব্দটিকে দ্রাবিড় শব্দ বলিয়াছেন (মূল 'মাল্লাইয়া')।

মালসা—মাটির অর্ধ বর্তুলাকার ছোট পাত্র বিঃ (আগুনের—)।

মালা—নারিকেলের খোলা বা কঠিন আবরণ। ইহারই ভিতর শাঁস ও জল থাকে। বঙ্কিমচন্দ্র কমলাকান্তের জবানিতে বলিয়াছিলেন, 'নারিকেলের মালা বড় কাজে লাগে না।' কিন্তু হুঁকার খোল, ওড়ং ইঃ ছাড়াও বর্তমানে অনেক কুটির-শিল্প-প্রতিষ্ঠানে ইহা দ্বারা অনেক সুন্দর সুন্দর জিনিস তৈয়ার করা হইতেছে। তৎপর্যায়ঃ—আচা-খু, আচি / আইচা-টা. ঢা. ফ. ব, আচ্চি-পা. নো, আরচি-ম, আঁইদা-চট্ট।····মালা—মাল্য।

মুচি-পব, মুচ্ছি-পুব—মুবা, চক্রাকার মুখ ঈষৎ গভীর মাটির ছোট পাত্র, ই°

crucible. ইহাতে ধাতু গলায়, তেল বা ঘিতে পলিতা সিক্ত করিয়া আলো জ্বালায়, ইহা কলসী ইঃর ঢাকনিরূপেও ব্যবহৃত হয়।

মুঠিয়া মুইঠ্যা-ঢা—গোবর ধরানো কাঠি বিঃ (জ্বালানি)।

মুসল্লা [আ°]-মুস—যে গালিচার উপর বসিয়া নমাজ পড়া হয়। নমাজের স্থান।

মেজ [ফা°]—টেবিল।

মেরু-মা—গাঁজার সরু কল্‌কে।

মৈথা-মা—থলে।

মোনা, মোনাই—ঢেঁকির মুষল (ঢেঁকি দ্র)।

রংগাই-য, **রাইঙ্‌/রাইন**-য. শ্রী. ত্রি—মাটির বড় হাঁড়ি।

রাজি/রাঙি—সূক্ষ্ম ছিদ্র বিশিষ্ট মাটির ধুচুনি বিঃ (চাল ধোয়ার রাঙি)।

রামদা, রামদাও—তরবারির মত লম্বা, মাথা ঈষৎ বাঁকা বৃহৎ কাটারি বিঃ (দা দ্র)।

রাশ-ম—বড় কলসী (দুধের-)। [আ°] লাগাম। [<রাশি] স্তূপ। জন্মরাশি।

রিয়াল/রিহাল, রেয়াল/রেহাল [আ° রহল]—× চিহ্নের মত কাঠের আধার যাহার উপর কোরানশরীফ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি বৃহদাকার গ্রন্থ রাখিয়া পাঠ করা হয়।

রেক-চ—চাল ইঃ মাপিবার বেতের সোয়াসেরী পাত্র।

রেকাব, রিকাব [আ° রেকাবী]—ধাতুর নক্সাকাটা ছোট থালা বিঃ। ইহাতে ফলার থাওয়া এবং পূজার ভোগ নৈবেদ্যাদি দেওয়া হয়।

রেচা-পু—যূপকাষ্ঠ।

লচি/ল্যাচা/ন্যাচা-মু—ফুলঝাড়ু, কোস্তা।

লণ্ঠন [হি° সাঁ। লালটেন, ই° lantern]—ল্যানটেন-দচ, হাওয়াবাতাস হইতে প্রদীপাদির আলো রক্ষা করিবার কাঁচাবরিত আধার (case) বিঃ। বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরী লণ্ঠনবিশেষ প্রসিদ্ধ।....ঝাড়লণ্ঠন, ঝাড়বাতি—ঝাড়ের আকারে বিন্যস্ত বিশেষ ধরনের লণ্ঠন, যাহাতে একসঙ্গে বহু আলো জ্বালাইয়া আলোর ঝাড় সৃষ্টি করা যায়। সেকালে ধনী জমিদারদের প্রাসাদাদি উৎসব-অনুষ্ঠানে বেলোয়ারি ঝাড়ের আলোতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত।

লম্প [ই° lamp]-চ. ন. মু. বর্ধ. মে. য. খু—পেটমোটা সরুগলা কেরোসিনের ডিবা বা চিমনিহীন ল্যাম্প বিঃ। কুপি/কেরোসিনের কুপি-পুব. পা. নো. ত্রি. শ্রী, ডিবা/ডিবে, টমি/টেমি-চ. য. খু। ময়মনসিংহের কোথাও কোথাও 'দোয়াইত/কেরোসিনের দোয়াইত' শুনা যায়।

লাই-নো—বড় ধামা; ইহাতে প্রায় আধ কুইণ্টাল ধান ধরে। লাই-চট্ট. ত্রি—বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী অর্ধ বৃত্তাকার হাতলযুক্ত ঝুড়ি বিঃ। লাই<রাই—সরিষার প্রকারভেদ।

লাফনা-য. খু—খুন্তি, ভাজাকাঠি। **লালুয়া / লাল্যুয়**-ম—মন্থনঘটী।

লুছনি-ম—হাঁড়ি কড়াই মোছার ন্যাতা বা পাটের পুঁটুলি, লুতা-মা।

লুড়ি-ম. নো—ঘর লেপিবার নেকড়া বা পাটের পুঁটলি।

লোটা [হিং]—ঘটী। **লোয়ারা**-ম<লোহারা—লোহার কড়াই।

শতরঞ্চি [ফা°]—মোটা সুতার আস্তরণ বিঃ, দরি। **শতরঞ্চ, শতরঞ্জ** [ফা]—দাবা খেলা, chess.

শরা, সরা [স° শরাব / সরাব]—চক্রাকার চিতড়ে মুখ ঈষৎ গভীর মাটির পাত্র বিঃ। এইরূপ শরায় কানা পর্যন্ত পূর্ণ করিয়া যখন দেবতার উদ্দেশে ফলমূলাদি উপকরণসহ আমাদের নৈবেদ্য দেওয়া হয়, তখন তাহাকে বলা হয় 'পূর্ণপাত্র।' এখানে উল্লেখযোগ্য যে পূর্ববঙ্গের বহু অঞ্চলে শরার তলদেশে গোলাকার খুরা থাকে এবং সেগুলি হাঁড়ি কলসীর ঢাকনি রূপেই বেশী ব্যবহৃত হয়।....আমশরা / আমাশরা-রাঢ়, আওয়াশরা-পূব—কাঁচামাটির শরা ('নৃত্য করে সুন্দরী আওয়াসরাতে ভর দিয়া')।....লক্ষ্মীশরা—লক্ষ্মীমূর্ত্যাদি অঙ্কিত বহুখ্যাত শরা। বাংলাদেশের বহু অঞ্চলে এই শরাতে লক্ষ্মীর অধিষ্ঠান কল্পনা করিয়া কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা করা হয়।

শলকা / শলকাই, শলাই [<দীপশলাকা, হিং সলাই]—দেশলাই।

শলা / শলাপিছা—বাঁশের বা নারিকেল পাতার কাঠির ঝাঁটা।

শলি, শলা [<শলাকা]—সরুকাঠি। শলি-ফ—শস্যের পরিমাণ বিঃ (এক শলি ধান)। **শলৈ**-য—দেশলাই। -পূব—নেংটি ইঁদুর।

শাবল [স° শর্বলা]—লোহার দণ্ডাকার খোন্তা।

শামা, শামি, শাঁপি [স° শম্ব]—লাঠি, অস্ত্রাদির বাঁট, ঢেঁকির মুষল ইঃর মুখের লৌহবেষ্টনী।

শামা [আ° শময়া]—আলো, বাতি।....শামাদান—দীপাধার।....শামাপোকা—আলোর পোকা, আলো দেখিয়া যে পোকা বেশী মত্ত হয়। শরতের শেষে হেমন্তের প্রারম্ভে আবহাওয়া শুষ্ক হওয়ার মুখে ইহাদের প্রাদুর্ভাব ঘটে; ইহারা স্বল্পায়ু।

শামাট-মু—উদূখলের মুষল। ইহার মুখে 'শামা' আঁটা থাকে বলিয়া হয়ত এইরূপ নাম।

শামিয়ানা [ফা°]—ক্যাম্বিসের চাঁদোয়া, awning.

শিক [ফা° শীখ]—লোহার সরু কাঠি, ছিঁচকা (হুঁকার—)। লোহার মোটা শলা,

গরাদে (জানালার—)। ছটরাবন্দুক—যে বন্দুকের নলের মধ্যে শিক দ্বারা গুলিবারুদ ঠাসা হয়।....শিকদার—শিকবন্দুকধারী সৈন্য। উপাধি বিঃ (রাধানাথ শিকদার)।....শিককাবাব—শিকে গাঁথা দগ্ধমাংস।

শিকা / শিকে [সং শিক্য]—ছিকা, ছিক্যা, ছিকিয়া; শিশিবোতল হাঁড়ি-পাতিল ইঃ ঝুলাইয়া রাখিবার বা বহন করিবার দড়ির আধার বিঃ। হাতের আঙুলে টিপিয়া পাট কিংবা সুতার দড়ি পাকাইয়া নানা রকম শিকা তৈয়ার করা হয়। কাঁথাশিল্পের ন্যায় শিকাশিল্পও একসময়ে বাংলার পল্লী রমণীদের শিল্পনৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইত।

শিলনোড়া-ক—মশলাদি পেষিবার পাথরের সরঞ্জাম :—দুইখণ্ড পাথর, একখণ্ড আয়তাকার চেপটা, আর একখণ্ড মুষলাকার গোলালো। তৎপর্যায় ঃ—শিলপাটা -ম. ত্রি. জ. কো. দি, পাটাপুতা-টা. ঢা. পা. ফ. ব. নো, পাটাপুতাইল-শ্রী। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, যে চেপটা পাথরের উপর মশলাদি কোটা বা পেষণ করা হয়, তাহাকে রাঢ় ও গাঙ্গেয় অঞ্চলে 'শিল' (stone slab) এবং যে মুষলবৎ গোলালো পাথর দিয়া পেষণ করে, তাহাকে 'নোড়া' বলে। কিন্তু বাংলাদেশের বহু অঞ্চলে এই নোড়াকে বলা হয় 'শিল' 'পুতা' 'পুতাইল' এবং শিলকে বলে 'পাটা'। নোড়ার 'পুতা' নামটি হিজলি অঞ্চলেও শুনা যায়।

শিশি [ফাং]—কাচের ছোট বোতল।

শেজ, শেজা, শেইজ [< শয্যা]—বিছানা।....শেজতুলনি—বৈবাহিক স্ত্রী আচার বিঃ। **শেজ**—লণ্ঠন বিঃ। লণ্ঠনের আলো।

শোঁদা-বী. মু—কাটারি।

সন্, সন্না—ছোট চিমটা বিঃ।

সরতা, ছরতা [হিং সরোঁতা]—জাঁতি, nut cracker.

সাচুন / হাচুন-ম—কোস্তা।

সাঁজালের হাঁড়ি-ন. মু—তুষঘসি ইঃ সংযোগে আগুন রাখিবার হাঁড়ি বিঃ (আলিয়া দ্র)।....সাঁজাল—ধোঁয়া, অগ্নিকুণ্ড (তুষের সাঁজাল)।...সাঁজাল দেওয়া—মশকাদি তাড়াইবার জন্য তুষঘসি খড়কুটা ইঃ সংযোগে সন্ধ্যাকালে গোয়ালে ধোঁয়া ও আগুনের সৃষ্টি করা।

সানকি [আং সহ্‌নক্]—পোড়া মাটি বা চীনা মাটির ছোট থালা।

সাপুড়া / -ড়ি—হাতবাক্স। কৌটা।

সামটা-জ. কো, **সাহার**-মা—শলির শক্ত ঝাঁটা (ইহা দ্বারা উঠান, আনাচ-কানাচ, গোয়াল ইঃ পরিষ্কার করা হয়)।

সুপ, সুপলি [< শূর্প]—ছোট কুলা। **সুপ**—ঝোল, soup.

সেপায়া [সে (ফা° সিহ্ তিন) পায়া]—তিন পাযুক্ত গোল টুল বিঃ, তেপায়া।

সের—শস্যাদি মাপিবার ছোট পাত্র বিঃ। ওজন বিঃ (এক কেজির কিছুটা কম)।

সোঁটা—লাঠি (লাঠিসোঁটা, আসাসোঁটা)।

সোফা [ই° sofa]—গদিযুক্ত চেয়ার বিঃ।

হড়পি—ঝাঁপি, বেত্রাদিনির্মিত পেটিকা বিঃ (সাপুড়ের হড়পি)।

হরই-চট্ট—বাসন। -শ্রী—দাঁড় বাঁধার দড়ি। **হরকা**—ঝাঁটা।

হলকা-য. ন—বড় আঁকশি। ঘোড়ার গলার চামড়ার বেষ্টনী। তাপপ্রবাহ (আগুনের—)।

হাঁড়ি [স° হণ্ডী, হণ্ডিকা, হি° হঁড়া]—হাঁড়ি বলিতে সাধারণত বুঝায় নানাবিধ পাকপাত্র। ইহাদের গড়ন এবং নামের অন্ত নাই ; ইহারা মাটি এবং ধাতু দুইয়েরই হইতে পারে। রন্ধনকার্য ছাড়াও অন্য বহুবিধ কাজ হাঁড়ি দ্বারা সম্পন্ন হয়। ডেগ, ডেকচি, টউ, পতিলা, বগুনা (বগনো), তোলো, তিজেল, পাতিল, ডথি, রাইন, আতলা, মালসা, জালই—সকলই হাঁড়ি পর্যায়ভুক্ত।....হাঁড়া—বড়হাঁড়ি, ('ভীম বলে জানবি যখন ভাঙ্গ্যা দিব হাঁড়া'—রারচ)।....হাঁড়িকুড়ি—মাটির বাসনপত্র ('আমরা তাঁদের রান্নাঘরে গেলে হাঁড়িকুড়ি ফেলিয়া দেন'—ইন্দিরা)।....ছুঁতহাঁড়ি, কালিহাঁড়ি (কবিক)—অপবিত্র হাঁড়ি।

হাড়ি / হাড়িকাঠ / হাড়কাঠ—যূপকাষ্ঠ, খাঁজকাটা কাঠের খুঁটি, যাহার ভিতর ছাগমহিষাদির গলা পুরিয়া অর্গল বদ্ধ করিয়া কাটা হয়। তৎপর্যায় :—অড়গলি / অর্গলি-মে, আড়গড়া-ঢা, কাঠগড়া-ম. শ্রী. ত্রি, কাতলা-টা. পা. ষ, কাপি-ম, তশলা-মু, যন্ত্র-নো, রেচা-পু।....চবাল—হাড়িকাঠের খিল।....বলি—হাড়িকাঠে ফেলিয়া দেবতার পূজায় নিবেদ্যপশুর গলাকাটা।....বলিকর, ছাওয়াল—যে বলির পশু বধ করে।

হাতা [হাত+আ]—দর্বী, হাতের ধরন লম্বা বাঁটযুক্ত পাত্র বিঃ, ই° ladle হাতা নানা প্রকারের : সাধারণ হাতা—লম্বা বাঁটযুক্ত বাটি বিঃ। চামচে হাতা—বড় চামচের ধরন হাতা। তাড়ু—ভিয়ান করিবার কাঠের হাতা (এক মাথা চেপটা কাষ্ঠদণ্ড বিঃ)। ছানতা, ছান্না, ঝাঁজরি—সচ্ছিদ্র চিতড়ে হাতা। ওড়ং—নারিকেল মালার হাতা। বেলাইন, পলা—তেল ইঃ তুলিবার শামুকের খোলা, তালের আঁটি ইঃর হাতা।

হামান দিস্তা [ফা° হাওন দস্তা]

লোহা ই:র কানা উচু খাড়া খল ও মুষল, mortar and pestle.

হাতন, হাতুন, হাতুয়া—দোহনপাত্র।

হারকিন, হারিকেন, হারিকেল [ই° hurricane]—লণ্ঠন বিঃ।

হারমনি, হারমনিয়ম [ই° harmonium]—সুপ্রসিদ্ধ বাদ্যযন্ত্র।

হাঁসুয়া / হেঁসো—কাস্তের মত বাঁকা তীক্ষ্ণধার কাটারি বিঃ।

হিমা-লো—গামলা বিঃ।

হুঁকা / হুঁকো [আ° হুক্কা]—তামাকখাইবার নারিকেলের খোল (খোলা) ও নলিচা যোগে তৈয়ারি যন্ত্র বিঃ, ই° hubble bubble তৎপর্যায় :—হুকা/হুক / উকা-পূব শ্রী. ত্রি, ভরকা-হিজ, ডাবা (খেলো হুকা)। খোলে জল ভরিয়া নলিচার মাথায় সাজা তামাকের ছিলুম বসাইয়া, খোলের ছিদ্রপথে মুখ লাগাইয়া কিংবা নল পুরিয়া হুঁকা খাওয়া হয়। সাধারণ হুঁকা হাতে উঠাইয়া লইতে হয়। এই সম্পর্কে পূর্ববঙ্গে একটি ধাঁধা প্রচলিত আছে : 'অতটুকু পুষ্কুনি থান কই-এ উর উর (হুড় হুড়) করে, রাজা আইয়ে বাদশা আইয়েতুল্যা সেলাম করে।' সৌখীন লোকদের ফরসি / ফুরসি, গুড়গুড়ি, গড়গড়া, আলবোলা ই° নামের হুঁকাগুলি হাতে উঠাইতে হয় না, মাটিতে বসানো থাকে। ইহাদের খোলের (প্রায় ধাতুনির্মিত) সহিত লম্বা নল বা পাইপ লাগানো হয় ; নল নইচা খোল সবই নানারূপ কারুকার্য মণ্ডিত থাকে, অনেক ক্ষেত্রেই পিতলের ঝাঁপি পরানো কলিকা দেখা যায়। কোন কোনটির গঠন নৈপুণ্য এমনই যে মজলিসে বসিয়া একটি দ্বারাই একসঙ্গে ২-৩ জনে তামাক খাইতে পারে। চা-সিগারেট সর্বগামী হইলেও দূর পল্লীঅঞ্চলে এখনও ভদ্রতা রক্ষায়, অতিথি অভ্যাগতদের আদর আপ্যায়নে পান-তামাক পরিবেশিত হয়।...হুঁকা খাওয়া—হুঁকার সাহায্যে ধূমপান করা।....হুঁকাবন্ধকরা—সমাজচ্যুতকরা (ভূমিকা দ্র)।....হুঁকাবরদার—বড়লোকদের হুঁকাবাহক, তামাকসাজাইবার ভৃত্য(বর্তমানে বড় দেখা যায় না)। **নলিচা / নলচে**—হুঁকার কাঠের নল যাহার মাথায় কলিকা বসে এবং নিম্নদিক খোলের ভিতর ঢোকানো থাকে। নইলচা, নইচা, নইচে—নলিচার রূপভেদ। (কলিকা ও ছিঁচকা দ্র)।....কাঁই—হুঁকার নল ও নলিচার মুখে এবং কলিকার ভিতরে আঠার মত যে ময়লা জমে।

হুপা—কাগমলা। **হোলা**-ঝাড়—মালসা বিঃ ('পান্ত খাবার হোলা গেল একি মনস্তাপ'—কবিক)।

তৃতীয় অধ্যায়

চাষ-আবাদ

অকশু-য—শস্যক্ষেত্রের আগাছা উৎপাটনের যন্ত্র বিঃ, নিড়ানি।

অদু-ফ. ব—মাছের খাত। কার্তিক অগ্রহায়ণ মাসে বর্ষার জল যখন কমিতে থাকে, তখন এই সকল খাতে (যাহা চাষীরা জমিতে পূর্বেই কাটিয়া রাখে) প্রচুর মাছ আটকা পড়ে। নিকটবর্তী কোন জিনিস নির্দেশ করিতে 'ঐযে' অর্থেও পূর্ববঙ্গে প্রায়ই 'অদু' কথাটি শুনা যায়। সেখানে অদুর উচ্চারণে অ-এর উপর জোর পড়ে।

অনাবাদী—যে জমি অকর্ষিত অবস্থায় পড়িয়া আছে (—জমি)। তৎপর্যায়ঃ—পতিত, পড়া-ম, পোড়ো-ক, পড়িয়া-মে, আকাড়া, আচোট, খিল, বাচড়া-ন। ....আবাদী—যে জমিতে ফসল উৎপাদন করা হয়। (আবাদ দ্র)

আইখান যাত্রা-মে—মাঘ মাসের প্রথম দিনে জমিতে প্রথম লাঙ্গল দেওয়া। মাহাতো সম্প্রদায়ের মধ্যে ইহা উৎসবের আকার ধারণ করে।

আইড়-রা—খড়। আড়ি, ক্ষেতের আল। মৎস্য বিঃ।

আইতান / -ত্যান-ম—আশ্বিনের প্রবল ঝড় বৃষ্টি ; ইহা অনেক সময় ফসলের ক্ষতি করে।

আইদারী, আইদোর, আইধর - বর্গাদার, ভাগচাষী।

আইল—আলি দ্র। অকারান্ত উচ্চারণে 'আইল' মানে আসিল।

আইলচা-ঢা—ধানের ছোট আঁটি (চাষীরা ধান কাটিয়া আইলচা বাঁধে)।

আইলা-ব—পাচনবাড়ি। -ম—আলিয়া, আগুনের মালসা।

আইসা-নো—খড়কুটা। 'আসিয়া' ক্রিয়াপদের উচ্চারণভেদ।

আউওল, আওয়াল, আওল—উর্বরা, যে জমিতে অল্প পরিশ্রমে ষোল আনা ফসল জন্মে। তৎপর্যায়ঃ—জোরাল / মেদে-মু, জোরাট-মে, জুরী-চ, লাল-ন. রাঢ়, লালী-ফ, সারুকভুঁই-জ. কো।....আওল শোল-বাঁ. বী—আমন ধানের উর্বরা জমি।

আউড়-মু. রা. দি, **আউড়ি**-বী—খড়কুটা।

আউড়ি-পা. দি—জোয়ালের মধ্যভাগ। য. খু—ডোলা জাতীয় বৃহৎ ধান্যাধার, ছোট গোলা।

আউরজ / আওরজ-পূব—লাঙ্গলের রেখাবেষ্টিত স্থান (এক আউরজ জমি), আঁতর।

আওতা-উব—শস্য রক্ষার্থে মাঠে থাকিবার কুঁড়ে বা ঝোপড়ি (ঘরবাড়ি দ্র)।

আঁওদ—আঁদদড়ি।

আওরা / -বেড়া-চা—কচুরিপানা, জলজঘাস ই:র অনুপ্রবেশ হইতে জোল জমির ধান রক্ষার্থে যে বেড়া দেওয়া হয়।

আঁকড়া / **আঁকড়ো**-চ. মু—আঙড়া,অঙ্কুশাকার বংশদণ্ড বি:। চাষ করিবার সময় এই দণ্ডের সাহায্যে লাঙ্গলটি জোয়ালের সহিত টানিয়া বাঁধা হয়।....

আঁকড়া দড়ি-চ. ন—যে দড়ি দিয়া আঁকড়'টি টানিয়া বাঁধা হয়। তৎপর্যায়:—কোড়া-ব, নাঙলাদড়ি-মু, আঙড়াদড়ি।

আঁকড়া—বক্রাগ্র লৌহখণ্ড বি:, hook. আঁকশি। আংটা, বলয়াকার হাতল। (উদ্ভিদ 'বেত' দ্র)।

আঁকড়া ভাঙা-চ, আকর / আখর-উব—প্রথম বারের চাষ (চাষ দ্র)।

আখুয়াল-কো. রং, **আখৈলা**-রা—রাখুয়াল, রাখাল।

আগড়-চ—বাঁশের তৈয়ারি ধান ঝাড়ার মাচা বা চালি (ঘরবাড়ি দ্র)।

আগত্রা-মে—বর্গাপ্রথা বি:। এই প্রথানুসারে জমির মালিক এক বৎসরের সম্পূর্ণ ফসল দেওয়ার সর্তে চাষীর নিকট হইতে অগ্রিম টাকা লইয়া থাকে।

আগত্রা, আগাড়ি—অগ্রিম, advance (আগত্রা টাকা)।

আগ্‌নে পলানো-বী—আগনে 'অঙ্গন' এর আঞ্চলিক রূপভেদ। ধান কাটিয়া বাড়ি আনিবার পূর্বে গৃহস্থেরা উঠান আঙিনা খামার কোপাইয়া পিটাইয়া গোবরজলে মার্জিত করিয়া লয়। এই কাজের নাম 'আগনে পলানো'।

আগবাড়ানি, আগলওয়া-পূব—কোন শুভদিনে শাস্ত্রীয় বা লোকাচারবিহিত অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়া প্রথম ধান্যচ্ছেদন। চব্বিশপরগনার কোথাও কোথাও এই অনুষ্ঠানকে বলে '**হেলাধরা**', উত্তরবঙ্গে রাজবংশীরা বলে '**ধানকাটা পূজা**', রাঢ় অঞ্চলে '**মুঠপূজা**'।

আগল / **আগোল**—ফসলের খণ্ডজমি।....আগোলদার—জমির ফসল রক্ষণাবেক্ষণের কাজে সাময়িকভাবে নিযুক্ত বেতনভোগী লোক।

আগলানো [√ আগ্‌লা]—রক্ষণাবেক্ষণ করা (ফসল আগলানো)।

আগো ভাঙা-দচ—এক চাষ, প্রথমবারের চাষ (চাষ দ্র)।

আগোল বাঁধ করা-মু, আগোল বাঁধা-বাঁ. বী—খণ্ড খণ্ড জমির ফসল রক্ষণা-বেক্ষণের ব্যবস্থা। দুষ্ট প্রকৃতির মানুষ এবং পশুপাখির অত্যাচার উপদ্রব হইতে ফসল রক্ষা করিবার জন্য সম্পন্ন কৃষকেরা নানারূপ ব্যবস্থা করিয়া থাকে; এই সকল

ব্যবস্থার মধ্যে ফসল পাকিয়া উঠিবার মুখে জমি পাহারার জন্য পয়সা দিয়া লোক নিযুক্ত করা অন্যতম। **আওড়া**—আঁকড়া দ্র।

আওরা-পা, আওরে হাল—বাঁটায় চাষ করার পদ্ধতি বিঃ।

আঁচড়া-চ. খু. য—ডাঙ্গা জমির ঘাস ইঃ আঁচড়াইয়া উৎপাটন করিবার চিরুনির মত দাঁতওয়ালা যন্ত্র বিঃ। তৎপর্যায়ঃ—বিঁদা / বিঁদে-ন. মু, বিন্ধা-ম, ব্যাধা-জ. কো, নাওইলা-টা, লাওলা-উব। চার পাঁচ ফুট লম্বা একটি পুরু কাষ্ঠখণ্ডে (beam) দুই তিন ইঞ্চি অন্তর অন্তর কতকগুলি গোঁজ সারিবদ্ধভাবে বিঁধাইয়া ইহা তৈয়ার করা হয়। গোঁজগুলি কাষ্ঠখণ্ডের নীচের দিকে চিরুনির দাঁতের মত পাঁচ ছয় ইঞ্চি বাহির করা থাকে। উহাদের মুখগুলি চোখা করিয়া দেওয়া হয়। লাঙ্গলের ঈষ এবং মুঠার ন্যায় ইহারও ঈষ এবং মুঠা থাকে।

মুঠা ছাড়া শুধু ঈষযুক্ত লোহার ছোট আঁচড়াও (হাতব্যাধা) ব্যবহৃত হয় এবং গোরুর পরিবর্তে উহা মানুষে টানে।

আঁচড়াপড়া—জমিতে প্রথম লাঙ্গল দেওয়া (চাষ দ্র)।

আচাভুয়া—(কাকতাড়ুয়া দ্র)। অত্যদ্ভুত।

আচোট /আকাড়া-চ—অকর্ষিত, যে জমিতে লাঙ্গলের চোট (ঘা) পড়ে নাই (—জমি)। ····আচোট গোরু—যে গোরুকে হালে জোতা হয় নাই।

আঁচোল-মু—আঁতর, আউয়জ।

আটি, আঁটি—আঁট করিয়া বাঁধা তৃণাদির গুচ্ছ (ধানের—, খড়ের—, শাকের—)। স্থান এবং বস্তুভেদে আটির নানা আঞ্চলিক নাম শুনা যায় :— বিড়া-মে, বিঁড়্যা-বাঁ. বী—জোল জমির ধান জলের উপরে কাটিয়া বড় বড় করিয়া বাঁধা আটি। দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ২ মুঠায় ১ হালা এবং ২ হালায় ১ আটি ; মেদিনীপুরে ২ কি ৩ হালায় ১ বিড়া। ময়মনসিংহের পূর্বাঞ্চলে ধানের আটিকে বলে ধানের 'মুড়ি' এবং নাড়ার আটিকে বলে 'গল্লা'। তদঞ্চলের ১ গল্লা ২৪ পরগনার খড়ের প্রায় ২০ আটির বা ১ তরপার সমান। পাটের ছোট বড় নানা রকম আটিরও নানা নাম শুনা যায় :—ডুপলি, বিচকা, বুঙ্গা, মোড়া, লাছি। সংখ্যা ভেদে পানের ছোট ছোট আটিও গোছ, বিড়া, পণ ইঃ নানা নামে অভিহিত হয় (উদ্ভিদ অধ্যায় 'পান' দ্র)।

আঁটি, আঁঠি [< অস্থি, অষ্ঠি]—কঠিন খোলাযুক্ত বড় জাতের বীজ (আমের—)।

আড়চাল-রাঢ়. চ. ন. মু. য. খু—লাঙ্গল-দেহের (ধড়) ছিদ্রপথে ঈষকে আড় ভাবে আটকাইবার খিল বা গোঁজ, আটচাল-চ, পাটাস-জ. কো, ই° peg.

আড়া, আঢ়া—ভূমির পরিমাণ বিঃ (এক আড়া জমি)।

মূল অর্থ আড়ি [স° আঢ়ক] পরিমাণ বীজ যতটা জমিতে বোনা যায়। শস্যাদির পরিমাণ বিশেষকেও বহুস্থানে 'আড়া' বলিয়া উল্লেখ করা হয় (এক আড়া ধান)।....আড়ি— শস্যাদি মাপিবার পাত্র বিঃ। এই আড়ির পরিমাণ সর্বত্র সমান নয় (গৃহ-সামগ্রী দ্র)। সেই হেতু আড়ার পরিমাণও অঞ্চলভেদে বিভিন্ন : মেদিনীপুরের পশ্চিম সীমান্তে ১ আড়া ধানের পরিমাণ ৩ মণ ৮ সের, ময়মনসিংহের কোথাও ৪ মণ। কোথাও ১ আড়া জমি বলিতে বুঝায় প্রায় ৫ বিঘা, আবার কোথাও প্রায় ৫০ বিঘা।

আড়া-হা. মে—পুকুরের উঁচু পাড় (পুকুর আড়া জমি)। আড়াল ('মেঘ আড়া রোদের বড় জ্বালা')। পাখি বসিবার দাঁড়। -চট্ট—বাড়ির চারদিকের উঁচু বাঁধ। -উব—জঙ্গল (বাঁশ আড়া)। ঘরের আড়া, আড়কাঠ / -বাঁশ (ঘরবাড়ি দ্র)। -বাঁ—মাছ ধরার ফাঁদ।

আড়ি—ক্ষেতের আল ('আড়ি তুল্যা ধারে ধারে ধরাইল ধান'—রারচ)।

আঁতর / আঁতোর [<অন্তর=ব্যবধান]—লাঙ্গলের রেখাবেষ্টিত স্থান, চাষ করিবার সময় লাঙ্গলের এক এক চক্করে যতটা স্থান বেষ্টিত হয় (এক আঁতর জমি নিয়ে এত ঝগড়া কেন ?)। তৎপর্যায় :—আউয়জ / আওয়জ-পূব, আঁচোল-মু।

আঁতর বাড়—চাষের পদ্ধতি বিঃ। এক আঁতর জমির চাষ প্রায় শেষ হইয়া আসিলে লাঙ্গলের রেখা বাহিরের দিকে টানিয়া আবার নূতন আঁতরের সৃষ্টি করা হয়।

আতাল-ফ—মরিচ বেগুন ইঃর চারা উৎপাদনের স্থান। তৎপর্যায়:—আপর-পা, মাদা-চ। -য—লাউ কুমড়ার মাচা। -ঢা—মুরগী থাকার ঘর। -ম—মাছের বাসা ; কোন কোন মাছ (ফলি, শুজি) জলের নীচে মাটিতে গর্ত করিয়া বাসা বাঁধে (মাছের আতাইল-ম)।

আঁদ, আঁদদড়ি-চ. মে—জোয়ালের সহিত ঈষ বাঁধার দড়ি। তৎপর্যায় :— আউত-য, আউন-ম. ঢা, আঁওদ-ন. মু. বাঁ. বী, নেংড়া-জ. কো. রং, নেংড়ো-চ. খু।

আধখানা চাষ-দচ—বিকাল বেলার চাষ।

আধহালা-পূব—এক বলদের চাষ (বাঁটায় চাষ দ্র)।

আধাভাগো, আধি, আধিবর্গা, আধিভাগ—উৎপাদিত ফসলের অর্ধেক জমির মালিক এবং অর্ধেক ভাগচাষী পাইবে,—এইরূপ সর্তে চাষ আবাদের প্রথা।

আধিদার, আধিভাগী, আধিয়ার-উব—বর্গাদারের বিভিন্ন আঞ্চলিক নাম (বর্গাদার দ্র)।

আপাই-বী—দৈবদুর্বিপাকে শস্যহানি ঘটা।

আফর [মুণ্ডারী]—ধানের চারা।....আফরা [ফা°]—ধানের বাড়ন্ত চারাগাছের অনিষ্টকারী পোকা।

আবাদ [ফা°]—চাষ, নূতন চাষ ('এমন মানব জমিন রইল পতিত আবাদ করলে ফলতো সোনা')। ফসলের কর্ষিত জমি। ঝাড় জঙ্গল কাটিয়া স্থাপিত জনপদ (সুন্দরবনের আবাদ)। ...আবাদী—কর্ষিত। কর্ষণের যোগ্য। ....অনাবাদী—অকর্ষিত।....চাষ-আবাদ—কৃষিকার্য। যৌগিক শব্দে (in compounds) আবাদ শহর অর্থেও প্রযুক্ত হয়। যেমন মুর্শিদাবাদ, এলাহাবাদ, সৈয়দাবাদ / সৈদাবাদ।

আমরা / আমেরা-জ. কো. রং—ঈষের মাথার দিকের খাঁজ, ঠনা-ম।

আমীন [আ°]—জমির পরিমাপক, surveyor.

আয়াম / আইয়াম [আ°]—মরসুম, season, time .

আলি / আইল / আল—জমিতে জল আটকাইবার বা জমির সীমানা নির্দেশ করিবার অনুচ্চ বাঁধ ('আগে বেঁধে দিবে আলি। তাতে রুইয়ে দিবে শালি'-খব) তৎপর্যায় :—আড়, আড়ি-রাঢ়, বাতর-ম। আল নানা প্রকার :—

(১) **হাত আল**-পব, **পেটি আইল**-ম—অপ্রশস্ত সরু আল।

(২) **গুণ আল, রাজ আল**-পব—প্রশস্ত আল যাহার উপর দিয়া সহজে যাতায়াত করা যায়। গ্রামের মেঠোপথ অধিকাংশই এইরূপ আল বা রাজ আল।

(৩) **ঝোড় আল**—চাষ করিবার সময় কোদাল দিয়া আলের দুই ধারের ধসিয়া পড়া মাটি ঘাস ইঃ কাটিয়া দেওয়া হয়। এইরূপ কাটা আলের নাম 'ঝোড় আল'-পব।

(৪) **জাঙ্গাল, জঙ্গাল**—অত্যুচ্চ প্রশস্ত বাঁধ। embankment.... **আইল কাটা**-ম. শ্রী. ত্রি—সীমানা উল্লঙ্ঘন করা। দুই শরিকের জমির মধ্যবর্তী সীমানানির্দেশক আলের এক দিক যদি এক শরিকে কাটিয়া সেই স্থান নিজের

জমিভুক্ত করিয়া লয়, তবে এই গর্হিত কাজকে 'আইল কাটা' বলে। ইহার জন্ত প্রায়ই শরিকে শরিকে মামলা হয়।

আশি-ম—শস্যাদির দিগন্ত বিস্তৃত মাঠ। তৎপর্যায়ঃ—বন্দ-চ. পুব, থল-ম, *কোলা-ব, কান্দর-ব, বাকুড় / কিয়ার-মু।* **আশি-শী**—৮০ সংখ্যা, অশীতি।

আষাঢ়ী-ম—আউশ কিংবা পাটের চাষ না করিয়া কোন জমি আমনের চাষের জন্য রাখিয়া দিলে তাহাকে বলা হয় 'আষাঢ়ী জমি।' এই সকল জমিতে সাধারণত আষাঢ় মাসে লাঙ্গল দেওয়া হয়।

ইটা [ইট+আ]—কর্ষিত জমির শুকনা ঢেলা।

ঈশ, ঈষ [স° ঈশা, ঈষা]—লাঙ্গলদণ্ড (লাঙ্গল দ্র)।

উকা-উব—পাটকাটির দৃঢ়বদ্ধ সরু আটি। সাধারণত চাষীরা বিড়ি তামাক খাইবার এবং মশামাছি তাড়াইবার উদ্দেশ্যে উকা জ্বালাইয়া দীর্ঘসময় আগুন ধরিয়া রাখে। তৎপর্যায়ঃ—(পাটখড়ির) বুন্দা-ম, বুদা-ম (বোলেন দ্র)।

উকুনবাড়ি, উকুনে, উখুন—উৎক্ষেপণ দণ্ড। তৎপর্যায়ঃ—কাড়াল / কাড়ালি / কাড়াইল-উব. টা, কাঁদল / কান্দোল-ম.ন, কাঁদুলি-খু, দাঁড়িয়া / দাইড়্যা-ম, দাঁউড়া-ঢা। যে সব অঞ্চলে গোরু দ্বারা ধান্যাদি মাড়াইবার রীতি আছে, সেইসব অঞ্চলেই এই সকল দণ্ড ব্যবহৃত হয়। একটি বংশদণ্ডের মাথায় বক্রাগ্র একখণ্ড লোহা বাঁধিয়া ইহা তৈয়ার করা হয়। কোথাও কোথাও পৃথক ভাবে এইরূপ লোহা না বাঁধিয়া দণ্ডটিরই মাথায় কঞ্চির কিছুটা অংশ রাখিয়া উহা আঁকড়ির মত বাঁকাইয়া দেওয়া হয়। এই বক্রাগ্র দণ্ডটির সাহায্যে গোরু দ্বারা মর্দিত ধান্যাদির খড়কুটা অতি সহজেই উৎক্ষেপণ ও পৃথক করা যায়।

উগাল-রাঢ়—প্রথম চাষ।....উগালা—জমিতে প্রথম চাষ দেওয়া।

উটবন্দী, ওটবন্দী-পব—চাষবাসের জন্য চাষীর সঙ্গে জমির মালিকের এক-বৎসরের মেয়াদী বন্দোবস্ত। এই বন্দোবস্ত অনুসারে কোনও চাষী (ওটবন্দী চাষী) এক নাগাড়ে দীর্ঘদিন কোন জমি চাষ করিবার অধিকার পায় না। নির্দিষ্ট মেয়াদ অন্তে তাহাকে জমি ছাড়িয়া দিতে হয়।

উধারি-ম—নজর-ঢা. ফ. ব। বর্গাদারের শৈথিল্যে ফসলের ক্ষতি হইলে তাহা পূরণের জন্য জোতদার অনেক সময় বর্গাচাষীর নিকট হইতে কিছু টাকা অগ্রিম লয়; ফসল নষ্ট না করিলেও এই টাকা প্রায়ই ফেরত দেওয়া হয় না।....উধার—ধার।

উরুলি-মু—গোরু মাড়ানো খড় (খড় দ্র)। অস° উলুধ্বনি।

উলিয়া-মে—ধানের ছোট আটি।

এক খন্দা, এক ফসলা /-লী, এক হারি—:যে জমিতে একটি মাত্র ফসল হয়।

একখানা হাল—সকাল বেলার চাষ (দুপুর পর্যন্ত)। তুঃ আধখানা হাল—বিকালের চাষ।

এগো চাষ—প্রথমবারের চাষ (চাষ দ্র)।

এঁটোনো-দচ—খড় বা ধানের আঁটি বাঁধা।

ওয়াকফ [আ° ওকফ]—ইসলাম ধর্মের নামে প্রদত্ত সম্পত্তি (ওয়াকফ সম্পত্তি)।....ওয়াকফ নামা—ঐরূপ সম্পত্তির লিখিত দানপত্র, written deed of endowment.

ওলা-মু. বী—বাঁধ এবং নদীর মধ্যবর্তী দোফসলী উর্বরা জমি (ওলার মাঠ)।

কচড়া-য—পাটের মোটা দড়ি, কাড়া-ম। এই দড়ি দিয়া সাধারণত জোয়ালের সঙ্গে মই জোতা হয়।

কবালা [আ°]—**কাওলা**-পূব, বিক্রয়ের দলিল, a deed of sale.....কট কবালা—সর্তাধীন বিক্রয়পত্র, a conditional deed of sale.....খুশ কবালা—নিঃসর্ত বা সাফ বিক্রয়পত্র, an unconditional deed of sale.

কবুলত / কবুলীয়ৎ [আ°]—স্বীকৃতি পত্র, a deed of agreement.

কয়ার-কো. রং—লাঙ্গলের মুখ বা মুড়া।

কাইভান / -ত্যান-ম—কার্তিক মাসের প্রবল ঝড়বৃষ্টি। তুঃ আইতান/-ত্যান। দুই-ই ধানের পক্ষে ক্ষতিকর। ইহাতে ধানগাছগুলি ধানপাকার মুখে জলে কাদায় শুইয়া পড়ে এবং ফসলের সমূহ ক্ষতি হয়।

কাকতাড়ুয়া [ই° scarecrow]-ন. চ. য. খু—গ্রামে পথ চলিতে প্রায়ই দেখা যায়, ফসলের জমিতে উঁচু বংশদণ্ডের মাথায় মানবাকৃতির একটি অত্যদ্ভুত কুশপুত্তলিকা চুনকালি মাখানো হাঁড়ি, ছেঁড়া কাপড়, জামা-জুতা, মুড়া ঝাঁটা ইঃ পরাইয়া দাঁড় করাইয়া রাখা হইয়াছে। ইহার উদ্দেশ্য বিষয়ে বলা হয়:— (১) সহসা এইরূপ একটি আচাভূয়া মূর্তি দেখিয়া, উহাকে জীবন্ত মানুষ মনে করিয়া পশুপক্ষী ভীত হইয়া ফলন্ত শস্যের ক্ষতি না করিয়া পলাইয়া যাইবে। (২) দ্বিতীয়ত এমন অনেক কুদৃষ্টি সম্পন্ন (নজুরে) লোক আছে (দেবতাদের মধ্যে যেমন শনি), যাহাদের দৃষ্টি সোজাসুজি কোনও সুন্দর জিনিসের উপর, বিশেষ করিয়া খন্দ ভুঁইয়ের উপর পড়িলে উহার বিকৃতি ঘটে। কিন্তু ঐ নজুরে লোকের বদ নজর যদি প্রথমেই অন্য কোনও বস্তুর দিকে আকৃষ্ট হইয়া পড়ে,

তবে উহার অনিষ্টকারিতা হইতে আসল বস্তু রক্ষা পায়। প্রতারণা পূর্বক ভীতি উৎপাদন করিয়া ফসলের অনিষ্টকারী পশুপক্ষীকে তাড়াইবার এবং নজুরে লোকের কুনজর প্রতিরোধ করিবার উদ্দেশ্যে ফলন্ত শস্যক্ষেত্রে দাঁড় করানো ঐরূপ বিদ্ঘুটে মূর্তির বাংলার নানা স্থানে নানা নাম শুনা যায়ঃ—যেমন, **কাকতাড়ুয়া**, **অরগা**-ফ, **আচাভুয়া**-রং, **কেউয়াখেদা**-বাঁ, **ঠিকুন**-মু, **ভুতি / নজরকাটা**-উব, **ভোগা / ভগগা / ভগা**-ব, **ধুক্কা / ধোক্কা**-চট্ট, **ভুতিয়া / ভুত্যা / ভুলা**-ম। **কাঁচাবাদা**-চ—অনাবাদী জলাভূমি।

কাচি-মু—চাষের ৩/৪ বিঘা পরিমাণ খণ্ডভূমি। -চ—ঘরের চালের বরগা। -পূব—কাস্তে। **কাচি, কাচিদাও**—কাস্তে।

কাটাউল—ক্ষেতমজুর (যাহারা ধানকাটার কাজ করে)।

কাটাজমি—বনজঙ্গল কাটিয়া যে জমি ফসল উৎপাদনের উপযোগী করা হয়।

কাঠলা-মু—লাঙ্গল তৈয়ারির কাঠ। ধড়ের কাঠটি বেশ মজবুত ও স্থূলকোণী ধরনের হওয়া চাই (লাঙ্গল দ্র)।

কাঠা—জমির পরিমাণ বিঃ। শহরে বন্দরে সরকারী খাতাপত্রে এক কাঠার পরিমাণ বিঘার $\frac{1}{20}$ অংশ বা ৭২০ বর্গফুট হইলেও পল্লীবাংলার বিভিন্ন স্থানের কাঠার স্থানীয় মাপ এক নহে। কোথাও (বাংলাদেশের নশিরুজিয়াল ও হুসেনসাহী পরগনায়) ১৮০০ বর্গহাতে বা ৯½ সাড়ে নয় শতাংশে, আবার কোথাও (বাংলাদেশের আলাপসিং ও রনভাওয়াল পরগনায়) ৬½ সাড়ে ছয় শতাংশে এক কাঠা। গ্রামাঞ্চলে দলিলপত্রাদিতে সরকারী ষ্ট্যাণ্ডার্ড মাপ লিখিয়া তাহার পাশে স্থানীয় মাপও লিখিয়া দিবার রীতি আছে।····**কাঠা**—শস্যাদি মাপিবার পাত্র বিঃ। স্থানভেদে ইহার পরিমাণও বিভিন্ন। গৃহ-সামগ্রী দ্র।

কাঠিকাটা মহল [কাঠ + সম্বন্ধ অর্থে ই = কাঠি]—নলখাগড়া কাঠ বাঁশ ইঃ কাটিয়া যেখানে বসতি স্থাপন করা হইয়াছে।

কাঁড়, কাঁড়ি—স্তূপ, রাশি heap (ধানের কাঁড়ি)।····**কাঁড়**—ধনুক ('পূর্বেতে উঠিল কাঁড়। ডাঙ্গা ডোবা একাকার।।'-খব)।····**কাঁড়ি**—তালগাছের সারাংশ।

কাড়া-ম—মোটা দড়ি।····**মইয়া কাড়া**—জোয়ালের সহিত মই জুতিবার মোটা দড়ি বিঃ।

কাড়া—পরিষ্কার করা (গোহাল কাড়া)।····**গোহাল কাড়া ঝুড়ি**—গোয়াল পরিষ্কার করিবার ঝুড়ি বিঃ। টানিয়া বাহির করা (খড়ের গাদা হইতে খড় কাড়া)। ছিনাইয়া লওয়া। **রা-কাড়া**—শব্দ করা।

কাড়ান—ধান জমির ঘাস আগাছা ইঃ উপড়াইয়া ফেলা এবং ঘন ধানগাছ পাতলা করিয়া দেওয়া। অতিবৃষ্টি ('আষাঢ়ে কাড়ান নামকে, শ্রাবণে কাড়ান ধানকে, ভাদরে কাড়ান শীষকে, আশ্বিনে কাড়ান কিসকে'-খবচন)।

কাড়াল, কাড়ালি, কাড়াইল—উকুনবাড়ি দ্র।

কাতিমারা—কার্তিক মাসে অত্যধিক খরার ফলে শস্যহানি ঘটা, কেতেরা।··· কাতি< কার্তিক। **কাঁদর, কান্দর**-ষ—মাঠ। বদ্ধ জলাভূমি।

কাদানো—আমন ধানের জমির (রোয়া জমির) চতুর্থ চাষ (চাষ দ্র)।

কাঁদাল, কাঁদুলি—উকুনবাড়ি।

কানালী-মে—মাঝারি ধরনের জমি (ডাঙ্গাও নয় নাবালও নয়)।

কান্দা-পূব—ডাঙ্গা, ডাঙ্গাজমি। হাঁড়িকলসীর কানা। -ম—কলা ইঃর ছড়া (কলার কান্দা)। কাঁদা, রোদন করা। জলাশয়ের তীরবর্তী ঢালু জমি।

কাপাই / কাপারি / কাপাল-পূব—ছেলে গোরুর মুখবন্ধনী।

কাপান-য—নদীর ভাঙন।

কামলা-পূব. উব—ক্ষেত মজুর (ধান কাটার কামলা)। অন্যান্য অর্থ 'ঘরবাড়ি' অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

কামিন-মে—কৃষিকার্যে নিযুক্ত নারী শ্রমিক। চাকরানী, ঝি।

কাস্তে-ক [হি° হসিয়া / হসুআ, ই° sickle]—ধানকাটা ইঃ কাজে ব্যবহৃত শুক্লা দ্বিতীয়ার চাঁদের ন্যায় বাঁকা দাঁতওয়ালা অস্ত্র বিঃ। তৎপর্যায় :—কাইচা-রং, কাইচিয়া-হিজ, কাচি-পূব. চট্ট. য, কাচিদাও-জ. কো, কাদা-রা. বগু, কৈদা / কৈদাও-উব, কেদে-বী, কেদ্যা-মু. পা, কেস্ত্যা-বাঁ, দা / কাস্তেদা-মে।

কিত্তা / কিত্তে [আ° কিতা]—চাষের খণ্ডভূমি (এক কিত্তে জমি)। তৎপর্যায় :—কাচি, খটৈ, খোটু।

কিয়ার-মু—চাষের বৃহদায়তন ভূমি।

কিয়ারি/কেয়ারি [স° কেদার]—গাছের গোড়ায় জল আটকাইবার সুবিধার্থে উহার চারদিকে মাটির যে বেড় দেওয়া হয়। শাকসবজির আলঘেরা খণ্ডভূমি।

কিয়ারি—চিকিৎসা বিঃ ('হেল্যায় কিয়ারি করি কৃমি কৈল দূর'.-রারচ)।···· **কিয়ারি করা**—সভ্যভব্য করা।

কিরান-ব—ক্ষেত মজুর। **কিসান**—কৃষাণের রূপভেদ, চাষী। হিন্দীতেও 'কিসান' বহু প্রচলিত ('জয় কিসান জয় জোয়ান')।

কীড়া-[হি°]—শস্যের অনিষ্টকারী কীট বিঃ।

কুটা-ব. ফ—গোরু মাড়ানো খড় (কুটার মেই=খড়ের গাদা)। কুচি (চোখে কুটা পড়া)। কুটা / কোটা—মাছ তরকারি ইঃ টুকরা টুকরা করা। থেঁতো করা (চিড়া—)।

কুড় [সং কুট]—রাশি, স্তূপ, খড়ের গাদা ('পোয়াল কুড় সমান হনুমান তোলে ঢেলা'—কবিক)। আবর্জনাদি ফেলিবার স্থান (আঁস্তাকুড়, পাঁশকুড়, সারকুড়)। কুষ্ঠব্যাধি। গাছ বিঃ (ইহার মূল ঔষধে ব্যবহৃত হয়)।

কুঁড়, কুড় [কুণ্ড]-ম—জলকুণ্ড ; ভূমিকম্পাদির ফলে কোনও স্থান বসিয়া গিয়া সৃষ্ট গভীর জলাধার !

কুণ্ডি-চট্ট—লাঙ্গলের মুঠা।

কুন / কুন্দ-ম. শ্রী—গাছের গুঁড়ি দিয়া তৈয়ারি লম্বা ধরনের জলসেচনী।

কুমোর-য—মাছের খাত বিঃ। চাষীরা নাবাল জমিতে খাত কাটিয়া মাছ আটকাইবার জন্য ডালপালা ফেলিয়া রাখে এবং সময় সময় তাহা সেঁচিয়া মাছ ধরে।

কুঁয়েলাগা-চ—পোকায় ধরা।

কুরশি, কুরুশ-উব—কর্ষিত ভূমির ঢেলা ভাঙ্গিবার লম্বা হাতলযুক্ত মুগুর বিঃ।

কুলি-রাঢ়—অপ্রশস্ত পথ, গলি। সরু নালা ('শোণিতের খালি-জুলি পুরিয়া বহে কুলি'-কবিক)।

কুলো দেওয়া-মু. মে—কুলার হাওয়ায় ধান হইতে কুটাচিটা ইঃ পৃথক করা। তৎপর্যায়ঃ—ধান সারানা-দচ. বাঁ. বী, হুক দেওয়া-জ. কো. রং, ধানবোলানি-ফ, ধান বাও দেওয়া-ম।

কৃষক—কৃষিজীবী, যে প্রধানত কৃষিকার্য দ্বারা জীবিকানির্বাহ করে (চাষী দ্র)।

কেড়কি-ম. শ্রী. ত্রি. য—কাঠের আখমারা কল।

কেড়িয়া-.ম—চাষীদের বীজ ইঃ রাখিবার বাঁশের চোঙা বিঃ।

কোদাল, কুদাল [সং কুদ্দাল, হিং কুদালী, সাঁং কুড়ি]—মাটি কাটার অস্ত্র বিঃ, ইং spade.....হাত কোদাল—এক হাতে কাজ করা যায় এইরূপ ছোট কোদাল। ....দাঁড় কোদাল—কাউড়া, লম্বা বাঁটের কোদাল যাহা দিয়া কাজ করিতে বেশী নীচু হইতে হয় না।

কোয়া-পব. রাঢ়. ব. ফ [ও° কঁয়া]—যে সব কীলক দ্বারা মইয়ের লম্বা বাঁশ দুইটি (কোথাও তিনটি) সংযুক্ত করা হয় (মই দ্র)।

কোয়া—কোষ (কাঁঠালের—, রেশমের—)।

কোরফা প্রজা—জোতদারদের অধীন প্রজা যাহার জমিতে কোনও স্থায়ী স্বত্ব

নাই।....কোরফা [ফা°]। জমিদারি উচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গে এইরূপ প্রজার অস্তিত্বও বিলুপ্ত হইয়াছে।

কোলা-ব—ফসলের মাঠ (গৃহ-সামগ্রী দ্র)।

ক্রোক [তু° কুর্ক]—কোরক, আইনের বলে সম্পত্তি আটক, attachment.

খন আবাদ-উব—শীতকালের শাকসবজির চাষ।....খনভুঁই-উব—যে জমিতে শীতকালের শাকসবজির চাষ করা হয়।

খড়—শুষ্ক তৃণ। ফসল পৃথক করিয়া লওয়া ধান গম যব ইঃর গাছ। বাংলার কোন কোন অঞ্চলে, বিশেষ করিয়া গাঙ্গেয় অঞ্চলে ধানগাছের গোড়ায় কাটিয়া ছোট ছোট আটি বাঁধিয়া সেগুলি আগড়ে কিংবা পাটায় ঝাড়িয়া শস্য পৃথক করা হয় এবং এই শস্যহীন গোটা ধানগাছগুলিকে খড় বলা হয়। আবার বহু অঞ্চলে, বিশেষ করিয়া পূর্ব ও উত্তরবঙ্গে ধানগাছের গোড়ায় না কাটিয়া অনেকখানি উপরে মাথার দিকে কাটা হয় এবং সেগুলি খামারে আনিয়া গোরু দিয়া মাড়াইয়া ধান পৃথক করা হয়। সেসব অঞ্চলে খড় (যাহার প্রাদেশিক উচ্চারণ খেড় / খের, খ্যাড় / খ্যার) বলিতে গোরু-মাড়ানো ফসল ছাড়ানো ধানগাছের মাথার দিকের ঐ খণ্ডিত অংশমাত্রকে বুঝায়; আর মাথাকাটা নিম্নাংশ যাহা ক্ষেতে পড়িয়া থাকে, তাহাকে বলে নাড়া, লাড়া, কোথাও বা ডেঙ্গা। ঘর ছাওয়ার এবং গোরুর খাওয়ার জন্য ধানগাছের এই নিম্নাংশগুলি পরে গোড়ায় কাটিয়া আনা হয়। প্রয়োজন না থাকিলে অনেকেই সেগুলি ক্ষেতে পুড়াইয়া দেয়; জোলজমির নাড়া জলে পচিয়া যায়; উভয়ক্ষেত্রেই জমি উর্বরা হয়। জোল জমির নাড়া কুড়াইয়া আনিয়া আখের বা খেজুরের রস জ্বাল দিতেও দেখা যায়। খড়ের পর্যায়শব্দ: পল, পোয়াল, কুটা, উরুলি, বিড়িখড়, আইড়, আউড়, আউড়ি, খেড় / খ্যাড়, বিচালি / বিচুলি।....পচাখড়—আইলসা-রা, হজা-মে।....কুচি কুচি করিয়া কাটা খড় (গোমহিষাদির জন্য)—শানি, ছানি।

খতিয়ান [আ°]—যে প্রমাণপত্রে (document) প্রজার সম্পত্তির বিশদ বিবরণ (সম্পত্তির শ্রেণী, পরিমাণ, দাগ, চৌহদ্দী, খাজানা, প্রজা ও মালিকের নাম ইঃ) লেখা থাকে, পরচা। হিসাবের খাতা, ledger.

খন্দ [স° কন্দ]—ফসল, শস্য।....রবিখন্দ—বসন্তকালে যে সব শস্য উৎপন্ন হয় [আ° রবী=বসন্ত]।

খন্দ [ফা° খনদক্]—খানা, ডোবা (খানাখন্দ)।

খরা, খরান-ম—খর রৌদ্র, গ্রীষ্মাধিক্য ('পশ্চিমে ধনু নিত্য খরা। পূবের ধনু বর্ষে কড়া'-খব)।

খলা / খোলা-পূব—ধান্যাদি মাড়াইবার বা ঝাড়িবার স্থান ('খেত খলা নাই তার, নাই হালের গরু'—মৈগী)। তৎপর্যায় :—খলান-রং, খলেন-য, খৈলান-ব, থামার-পব. রাঢ় (ঘরবাড়ি দ্র)।

খলা—চারা উৎপাদন করিবার স্থান (চারাখলা)।

খাটালি-রাঢ়—ক্ষেতমজুরদের যে কাজ দেয় বা খাটায় ; উহাদের নিয়োগকর্তা।

খাজানা [আ° খজানা]—রাজস্ব, কর, revenue, rent.....খাজাঞ্চী [আ° খজাঞ্চী]—ধনরক্ষক, treasurer.

খাটুনে / খাটুয়া—যে খাটিয়া খায়, শ্রমিক।

খাড়িমারা-চ. খু—জমির ঘাস আগাছা ইঃ উৎপাটন করা, জমিতাড়া।

খাতক [আ°]—দেনদার, debtor.

খামার-পব—ধান্যাদি ঝাড়িবার বা মাড়াইবার স্থান ('খামারে সারি সারি ধানের পালুই')।

খামার, খাসখামার—প্রজাবিলি বা বর্গাপত্তন না করিয়া যে জমি জোতদার নিজ চাষের জন্য রাখিয়া দেয়। **খারিফ শস্য** [আ° খরীফ]—শরৎকালের ফসল। **খাল জমি**-মে—নীচুজমি, জোল জমি (নাবাল দ্র)।

খাস [আ°]—নিজস্ব, own, private (খাসকামরা)। বিশেষ, special (opp. আম, general)।....খাসখামার, খাসজমিন—নিজের চাষবাসের জমি, যাহাতে প্রজা বসানো হয় নাই।....খাসমহল—যে জমি মালিকের নিজের দখলে থাকে।....খাসনবীশ—একান্ত সচিব, private secretary.....খাস বরদার—মালিকের দেহরক্ষী, personal attendant carrying firearms etc. **খিয়ার**-উব—এঁটেল মাটির জমি।

খিল, খিলা—পতিত জমি ; যে জমিতে কোনও ফসল উৎপাদন করা হয় না ('সরকার হইলা কাল, খিল জমি লেখে লাল'—কবিক। জলের অভাবে অনেক জমি খিল প'ড়ে আছে)।....খিলতোলা-ম—বনজঙ্গল কাটিয়া কোপাইয়া যে জমি কর্ষণযোগ্য করা হইয়াছে, জঙ্গল হাসিল করা জমি-চ, কাটাজমি-ব।

খুরপা / -পো / -পি [সং° খুরপ্র]—খন্তার ফলার আকার নিড়ানি বিঃ ; সমতল ভূমির দূর্বা ঘাস ইঃ ঠেলিয়া উঠাইতে ইহা খুব উপযোগী। তৎপর্যায় :—ছেনা-ম, ডাউকি-জ. কো। **খেচি**-ফ—সেচনী বিঃ।

খেত, ক্ষেত [স° ক্ষেত্র]—ফসলের খণ্ডভূমি, জমি।

খেতমজুর, ক্ষেতমজুর—যে ব্যক্তি মজুরি লইয়া অপরের জমিতে চাষ আবাদের কাজ করে, কৃষিশ্রমিক। বর্গাদারের ন্যায় ইহারা উৎপন্ন ফসলের কোনও ভাগ পায় না। ইহাদিগকে রোজ, মাস, কিংবা বৎসরের হিসাবে মজুরি দেওয়া হয়। এই মজুরি নগদ টাকায়, কখনো বা টাকায় ও ফসলে (খোরাকে) দুই প্রকারেই দিতে দেখা যায়। পশ্চিমবঙ্গে ১৯৭১-এর জনগণনায় কৃষিশ্রমিকের সংখ্যা ছিল প্রায় ৩৩ লক্ষ। কাজকর্ম ইঃর ধরন অনুসারে (nature of duties) ক্ষেত মজুরদের নানা অঞ্চলে নানা নামে অভিহিত করা হয়। যেমন, (১) কাটাউল / দাওয়াউল-শ্রী, দাওয়াল-ম, দাওয়ালে-খু, দাঐল-ফ. ব—খেত মজুরদের যাহারা ধান দাওয়ার বা কাটার কাজ করে। (২) বাছাউল-ফ. শ্রী—যাহারা শস্যক্ষেত্রের ঘাস বাছা বা নিড়ানের কাজ করে। (৩) বটিয়াল / বইট্যাল-ব, রোয়াউল-শ্রী—যাহারা রোয়া, বসায় বা লাগায়। (৪) নাগাড়ে, লাগাড়ে, মুনিষ-মু, ভাতুয়া-মে, মাহিন্দার / মাইন্দার / মান্দ্যা-মু. রাঢ়, বছরিয়া কামলা-ম—সারা বছরের জন্য বাঁধা বেতনে নিযুক্ত খেতমজুর বা অন্য সাধারণ শ্রমিক। ইহাদিগকে মনিবের চাষবাস, গোসেবা, হাটবাজার ইঃ প্রায় সব রকম কাজই করিতে হয়। ইহাদের বেতন বর্তমানে বছরে হাজার টাকার মতো। তৎসঙ্গে দিতে হয় প্রতিদিন দুইবেলা পূর্ণ আহার অথবা বছরে ১২ মণ ধান, জলপানি, তেল বিড়ি ও জামাকাপড় (অন্তত এক জোড়া ধুতি, দুই জোড়া গামছা, একটি জামা, একটি গায়ের সাধারণ চাদর)। (৫) কামলা, খাটুনে, খাটুয়া, ছুটো, জন, দিনমজুর, নগদা, পাইট, বদলা, বেরুনিয়া, মুনিষ—ইহারা রোজ হিসাবে নগদ টাকায় আট ঘণ্টা, কখনো বা নগদ টাকায় ও খোরাকে দিনভর (শুকো মজুরি দ্র) কাজ করে। মোট মজুরি পাঁচ ছয় টাকার (প্রায়) বেশী হয় না। সংবৎসর কাজও থাকে না, বড় জোর ছ'মাস, কোথাও অনেক কম। চাষআবাদের মরশুমে ইহাদের অনেকেই নিজেদের মুলুক ছাড়িয়া ভিন্ন ভিন্ন জেলায় চলিয়া যায়। (৬) কামিন-মে—কৃষিকার্যে নিযুক্ত নারী শ্রমিক। (৭) রেজা / র‍্যাজা-ন. মু—স্ত্রী মজুর। (৮) দাদনী—যে শ্রমিক আক্রার সময় ধান কর্জ লইয়া ফসলের মরশুমে মজুরি খাটিয়া তাহা শোধ করে। অন্য সাধারণ মুনিষ যে হারে মজুরি পায়, দাদনীদের মজুরির হার তাহার চেয়ে কম। যেহেতু কর্জ দেওয়াধানের মূল্যের সহিত তাহার সুদের অঙ্কটাও দাদনীর দায় বলিয়া ধরা হয়। (৯) মাস্‌কিয়া-পুব, মাসূড়া-কো. রং—মাস হিসাবে বেতন লইয়া যে অন্যের কৃষিকার্যাদি করে।

খেত্তী-মে—চাষী।

খেসকামলা-ম—এমন অনেক চাষী বা জোতদার আছে, যাহাদের লোকবল নাই, ধনবল আছে। কিন্তু চাষ আবাদের কাজে অনেক সময় এমন 'বতোর' বা জরুরি অবস্থার সৃষ্টি হয় যে, যথেষ্ট অর্থব্যয় করিয়াও 'জন' পাওয়া যায় না, অথচ অগৌণে কাজটি শেষ না করিলেই নয়। এমতাবস্থায় সেই চাষী বা জোতদারের অনুরোধক্রমে পাড়াপড়শী এবং আত্মীয়স্বজন মিলিয়া সময় মত তাহাকে শ্রমদানে সাহায্য করে। আত্মীয়কুটুম্ব হইতে আগত এই শ্রমিকদের খেসকামলা, মাগনীকামলা, উপরিদা লোক, ভেটবেগার ইঃ বলা হয়। ইহাদিগকে কোন টাকাপয়সা দিতে হয় না, কিন্তু একবেলা যথেষ্ট সম্মান ও আদরের সহিত ভুরিভোজন করানো হয়।....খেস-মুস—কুটুম্ব।

গল্লা-ম—নাড়ার আটি ; ইহা চব্বিশপরগনার প্রায় বিশ আটি বা এক 'তরপা' খড়ের সমান।

গল্লা-মু—শস্যাদির আটি। গলদা চিংড়ি।....গলটানো—আটি বাঁধা।

গহি / গোহি-জ· কো—লাঙ্গলপদ্ধতি, লাঙ্গলের রেখা, র‍্যা।

গাইছান-মে—জমি নিড়ানো এবং এলোমেলো ঘন ধানগাছ কিছু কিছু উপড়াইয়া ফেলা, কিংবা সুবিন্যস্ত করিয়া বসাইয়া দেওয়া (কাড়ান দ্র)।

গাইলা, গাইলা লাগা-ম—ধান জমিতে অনেক সময় দেখা যায়, স্থানে স্থানে ধানগাছগুলি বাড়িতেছে না, আস্তে আস্তে হলদে হইয়া মরিয়া যাইতেছে। ধানের এই অবস্থাকে বলা হয়,—গাইলা লাগা-ম, বগালাগা-রাঢ়, বসে যাওয়া-পব।....গাইলা—মরাটে ধানগাছ।

গাছাল-বাঁ, **গাছুড়ে / গাছি**—বড় বড় গাছ হইতে ফলপাড়িয়া বা গাছ কাটিয়া ছাঁটিয়া যাহারা পারিশ্রমিক বাবদ ফলের ভাগ বা নগদ (cash) কিছু পায় বা নেয়।.... গাছিমারা-মে—ক্ষেতের ঘাস উৎপাটন করা।

গাছি—প্রত্যয় বিঃ (স্থান বা গ্রাম অর্থে :—সাঁতরাগাছি, কাঁকুড়গাছি। নির্দেশকরূপে :—একগাছি চুল, মালাগাছি)।

গাড় /-ড়া /-ড়ি-রাঢ়, **গড্যা**-বাঁ, **গেঁড্যা**-মে, **গ্যাঁড়**-য—ডোবা। গর্ত ('চিরকাল গাড়ে থাকি বারি হইল চেঙ'। 'কলমীর শাক খায়্যা উজারিল গেঁড়্যা।'-রারচ)।

গাড়ান / গাড়ানি-দি· মা—কাদানো জমিতে রোয়া লাগানো।....গাড়া—পোঁতা, প্রোথিত করা।

গাতা / গাঁতা, গাতি / গাঁতি-পব—কোন কার্য সম্পাদনের জন্য বহু জনের মিলন এবং পারস্পরিক সাহায্যে কাজ। কৃষিকাজ এবং এইরূপ আরও অনেক কাজে বহু লোকের কায়িক পরিশ্রমের দীর্ঘদিন সাহায্য লইতে হয়। এজন্য যাহার নিজের খাটিবার লোক কম, অথচ চাকরবাকর রাখিবার মত অর্থসংস্থানও নাই, সেখানে সে সমযোগ্যতাসম্পন্ন অপর কয়েকজনের সঙ্গে একটি দল গঠন করে। এই দলের সকলে এক সঙ্গে পালাক্রমে এক একদিন এক একজনের কাজ করিয়া দেয়। পারস্পরিক সাহায্যে এইরূপ যৌথ কার্যক্রমকে গাঁতা, গাঁতি ইঃ বলা হয়। ময়মনসিংহের কোথাও কোথাও এইরূপ মিলিত কর্মপ্রচেষ্টাকে 'সাঙ্গার / হাঙ্গার' এবং উত্তরবঙ্গে 'ধরানি' বলা হয়।

গাঁতি—শক্ত মাটি খুঁড়িবার দু-মুখা অস্ত্র, pick.

গাদা—স্তূপ, রাশি (খড়ের গাদা)। তৎপর্যায়ঃ—কাঁড়, কাঁড়ি, কুড়, টাল, রাশ।

গাদা—লাঙ্গলের মধ্যভাগের মোটা অংশ। মাছের পিঠের দিকের অংশ (মাছের গাদা)। ঠাসিয়া ভরতি করা (বন্দুকে বারুদ গাদা)।····গাদা দেওয়া, গাদি দেওয়া—স্তূপীকৃত করা।····গাদি—স্তূপ (ক্ষুদ্রার্থে)।

গার্শী উৎসব—ধানগাছকে সাধ খাওয়ানো উৎসবকে মুর্শিদাবাদ এবং অন্য কোন কোন অঞ্চলে গার্শী বা গার্শী উৎসব বলা হয়। "এইদিনে পুরনারীবৃন্দ বিভিন্ন প্রকারের খাদ্যবস্তু লইয়া তাঁহাদের নিজ নিজ পরিবারের শস্যপূর্ণ আবাদী জমিতে গমন করেন এবং লক্ষণ হিসাবে সেই সকল জমির সাধভক্ষণ ক্রিয়া সম্পন্ন করেন।····যুবকবৃন্দ এইদিনে গান ও আনন্দদায়ক অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত থাকেন। ধরিত্রী শস্যপূর্ণা রূপ পরিগ্রহ করিয়া উঠায় যে শুভ সম্ভাবনার সূচনা হয়, গার্শী উৎসবের মধ্য দিয়া তাহারই আবাহন সম্পন্ন হইয়া থাকে"—('গণরাজ,খাগড়া, মুর্শিদাবাদ)। এখানে উল্লেখযোগ্য যে বাংলাদেশের বহু অঞ্চলে গারশী / গার্শী আশ্বিনের সংক্রান্তিতে অনুষ্ঠিত একটি মেয়েলী ব্রত বিঃ। লাঙ্গলের ফলার সাহায্যে উৎপন্ন কোনও দ্রব্য এবং 'খরা জাল' ব্যতীত অন্য জালে ধরা কোনও মৎস্য এই ব্রতে দেওয়া হয় না। সাপলার মূল এই ব্রতের একটি প্রধান উপকরণ ('দেবদেবীর নাম' দ্র)।

গিরি-উব [গৃহী]—গৃহকর্তা, জমি বা বাড়ির মালিক। হিমালয় (গিরিজায়া)। প্রত্যয় বিঃ (বাবুগিরি, গুরুগিরি)।

গুছি—ছোট গুচ্ছ। (চাষে) কাদানো জমিতে ধানের দুইটি তিনটি করিয়া

চারা এক সঙ্গে রোপণ করা হয়। এইরূপ দুইতিনটি চারার এক একটি গুচ্ছকে 'গুছি' বলিতে শুনা যায়। আবার কখনো কখনো একটি কাঠি বা চারাকেও গুছি বলা হয়।....গুছি দেওয়া-ম—রোয়া লাগানো ('কোল পাতলা ডাগর গুছি, লক্ষ্মী বলেন ঐখানে আছি'-খব)।

গুটা-পূব—শাকসবজির বীচি (লাউয়ের—)।

গুমা, গুমা দেওয়া-ম—আমন ধানের সাধভক্ষণ বা দোহদদান সংস্কার বিঃ। ধান গাছের গর্ভে শীষের উদ্‌গম হইলে আশ্বিনের সংক্রান্তিতে কৃষক গৃহস্থেরা গন্ধাদি দ্বারা ধান্যলক্ষ্মীকে অভিনন্দিত করে। সেদিন তাহারা আমের পাতায় সুগন্ধি মশলা (তৈলপক্ক মেথি ইঃ) মাখাইয়া পাকাটির মাথায় করিয়া ধানের ক্ষেতে ক্ষেতে গুঁজিয়া দিয়া আসে এবং ডাক দিয়া বলে—

আশ্বিন যায় কার্তিক আসে সকল শস্যের গর্ভ বসে,
রামের হাতের 'গুমা' ধান হইস্ তিন দুনা।

[দ্র 'সোনালী ধান,' মাসিক বসুমতী, অগ্রহায়ণ, ১৩৬১]

কোথাও 'রামের' স্থলে 'ভীমের' বলা হয়। (নল সংক্রান্তি ও লখীডাক দ্র)।

গুলা চাষ / গুলো চাষ-দচ—জমির মালিককে নির্দিষ্ট পরিমাণ ধান বুঝাইয়া দিবার সর্তে চাষআবাদের প্রথা। এইরূপ চাষে হাল গোরু বীজ সকলই চাষীর। বেশী ফলাইতে পারিলে চাষীরই লাভ, মালিক পূর্বনির্দিষ্ট পরিমাণেব বেশী দাবি করিতে পারে না। (চুক্তিবর্গা দ্র)। **গেঁইটোর পয়সা**—রাখাল দ্র।

গোখাবুড়ি-বর্ধ, **গোদা**-রা—গোষ্পদ, গোরুর খুরের চাপে সৃষ্ট গর্ত বিঃ।

গোগড় / গোঙাল-বী—ক্ষেতের আলের এপার ওপার চোরাগর্ত।

গোছ—গুচ্ছ (পানের—)। ধরন (লোকটা কেবলা গোছের)। পায়ের গোছ বা গোছা, ankle.....গোছগাছ—সাজানো গোছানো।

গোছলা, গোছা—গুচ্ছ। শস্যাদির আটি।

গোঠ<গোষ্ঠ—গোচারণ ভূমি ('কেনা বাঁশী বাএ বড়ায়ি এগোঠ গোকুলে'-শ্রীকৃ)। গোঠ এককালে গ্রামের গোপতিদের সাধারণ সম্পত্তি (public property) ছিল। শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠলীলা অবলম্বন করিয়া বাংলাভাষায় অপূর্ব পদাবলী সাহিত্য, অসংখ্য মেয়েলী সঙ্গীত ও গীতিকবিতার সৃষ্টি হইয়াছে। গোষ্ঠের রাখালিয়া গানও বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডার কম সমৃদ্ধ করে নাই। তৎপর্যায় :— গোবাম-চট্ট, চরাট-বী, বাথান, রমনা।

গোড়াকাটি-মে—ছোট ছোট করিয়া বাঁধা লম্বা ধানগাছের আটি। এই ধানের খড় সাধারণত ঘর ছাওয়ার কাজে লাগে।

গোড়া দাওয়া-মে—জমিতে কোদালের প্রথম পাড়।

গোড়েন, গোড়েন জমি—নাবাল জমি ; যে জমিতে গ্রামের উঁচু জমির জল গড়াইয়া গিয়া পড়ে এবং সঞ্চিত হয়।

গোপাট, গোবাট, গোরাট—মূল অর্থ গোমহিষাদি চলিবার গ্রাম্য পথ। তৎপর্যায় :—হালট-পূব, ডহর / ডয়র-ন. মা. দি। গোসম্পদ এবং গোচরের যখন অভাব ছিল না, তখন গোমহিষাদির নিত্য চলাচলের ফলে এই সকল পথের সৃষ্টি হইয়াছিল। চাষীরা হাল গোরু লইয়া এই সকল পথে মাঠে যাইত, রাখালেরা যাইত গোচারণ ভূমিতে। অবশ্য এখনও যায়। তবে বর্তমানে অনেক গোপাটই ব্যক্তিগত জমিজমার অন্তর্ভুক্ত হইয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে।

গোবাম-চট্ট—গোচারণভূমি।

গোমাই-বগু—গোমহিষাদির মুখের জাল বা আবরণ।

গোরুবাড়ি-শ্রী—পালাক্রমে রাখালদের পরস্পরের গোরু চরাইবার প্রথা।

গোরুর পানা-জ. কো—গোরুকে খাওয়াইবার জন্য আধিয়ার কর্তৃক গিরিকে দেয় খড়ের অংশ।

গোলা-উব—ডোবা পুকুর ইঃর পাঁক মাটি ; কোন কোন গাছের গোড়ায় সার-রূপে দেওয়া হয়।—ঘরদুয়ার লেপিবার গোলামাটি (রাঙামাটি) ।....গোলাহাঁড়ি (গৃহ-সামগ্রী দ্র)। **গোলা**—শস্যাগার (ঘরবাড়ি দ্র)।

ঘাসকুরনি-মে—নিড়ানি বিঃ।

ঘাসী, ঘাসেড়া—গোরু ঘোড়ার ঘাস কাটিয়া বা ঘাস ফেরি করিয়া যাহারা জীবিকা নির্বাহ করে।

ঘাসুড়্যা-বাঁ, **ঘাসুয়া দাও**-জ. কো—ঘাস কাটার ছোট দা।

ঘুঁটি-চ—জোল জমির সীমানা নির্দেশক জলজ ঘাস ইঃর স্তূপ, টেলিয়া / টেইল্যা-ম, টেক-চা. টা। পাশাখেলার ঘুঁটি (ঘুঁটি চালা)।

ঘুরি-ম—লাউ কুমড়া ইঃ লতানিয়া গাছের মাচা, আতাল-ম, ঝাঁকা-ব।

ঘোগ-মে—খাত, গর্ত। বন্যজন্তু (?) বিঃ ('বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা'-প্র)।

ঘোলা—পলি।

চক [হি°]—জমিদারির অংশ বিঃ। (বর্তমানে লুপ্ত)।

চকবন্দি—ভূমির বিভাগ। সীমানির্দিষ্ট ভূমি (ঘরবাড়ি দ্র)।

চর—নদীর পলি হইতে সৃষ্ট বিস্তীর্ণ ডাঙ্গা জমি। নদী এক পাড় ভাঙ্গিয়া অপর পাড়ে এইরূপ চরের সৃষ্টি করে। অনেক সময় নদীগর্ভেও পলি পড়িতে পড়িতে দ্বীপের আকারে চরের সৃষ্টি হয় ('এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা, মধ্যিখানে চর')। চরোজমিতে কাঁঠাল এবং কোন কোন রবিশস্য খুব ভাল জন্মে। চরের মানুষ (চরুয়া-ম) প্রায়ই দুর্দ্ধর্ষ প্রকৃতির হয়; তাহাদিগকে সর্বদা নদীর খেয়ালী প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া চলিতে হয়। নূতন নূতন চরের স্বত্বস্বামিত্ব লইয়া এক সময়ে জমিদারে জমিদারে দাঙ্গাহাঙ্গামার ও মামলামোকদ্দমার শেষ ছিলনা।

চাকরান [ফা°]—বেতনের পরিবর্তে বিনা খাজনায় প্রদত্ত জমি।

চাকা, মাটির চাকা-পূব—মাটির ডেলা, ইটা। চাকা—চক্রাকার বস্তু (গাড়ির—, মাছের—)। চক্রাকার (গায়ে চাকা চাকা দাগ)।

চাঙড় / চাওড়—মাটির বড় ডেলা। তৎপর্যায় :—মাটির চাপ /-পাট-মে, ছুড়া-হিজ, ঢেলা, ঢিমুল-জ. কো. ত, চাইন / চাকা-পূব। জমি কোপাইলে বা চাষ করিলে যে চাঙড় উঠে, মই দিয়া, কখনো বা লম্বা বাঁটের মুগুর (কুরসি) দিয়া তাহা গুঁড়া করা হয়। মাটি মাখিয়া বড় বড় যে পিণ্ড করা হয়, তাহাকে বলে 'মাটির তাল।' এই তাল হইতেই হাঁড়িকলসী তৈয়ার করা হয়।

চানা-মে—ক্ষেতে খামারে ইতস্তত ছড়ানো ধানের বিড়া (আটি)। এই বিড়াগুলিকে যখন একত্র করিয়া স্তূপ দিয়া রাখা হয়, তখন সেই স্তূপকে বলা হয় গাদা। উত্তর ময়মনসিংহে খড়ের গাদাকেও চানা বলে (খড়ের চানা)।

চানা <চনক—ছোলা।

চারা—ছোট গাছ (আমের—, ধানের—, বেগুনের—)।....চারাখলা—চারা উৎপাদনের স্থান। **চারা**—বাচ্চা মাছ, পনা (-মাছ)।

চারানি—ভাগরাখালি দ্র। **চারানি, চারানো**—ভাগ করিয়া দেওয়া, ছড়াইয়া দেওয়া।

চালা—(চাষআবাদ সম্পর্কে) শস্যাদির ঘনজাত চারা, জমির ঘাস ইঃ উৎপাটন করা, weeding. উঁচু নীচু মাটি কোদাল মই ইঃ দ্বারা চালিয়া সমান করা ('চারিদণ্ডে সকল চৌরস কৈল চাল্যা'—ধারচ)। ঘরবাড়ি ও গৃহসামগ্রী দ্র।

চালি—ধান ঝাড়ার বাঁশের মাচা বিঃ (ঘরবাড়ি দ্র)।

চাষ—কৃষি, ফসলাদি উৎপাদনের জন্য লাঙ্গলাদি দ্বারা ভূমিকর্ষণ (ধানের চাষ)। ....চাষান—জমি চাষ করা, হালবহা-উব, হালবাওয়া-পূব, লাঙ্গল

দেওয়া। (১) **প্রথম চাষ**—আঁকড়া ভাঙা। আগো ভাঙা-চ, আকর/আথর-উব, আঁচড়া পড়া, উগাল-রাঢ়, এগো চাষ-মে, জমি ভাঙা, লাঙ্গল পড়া। (২) **দ্বিতীয় চাষ**—দোছা-ফ. ব, দোয়ার-পব.য.খু, পাখনা-বাঁ, সামাল-রাঢ়. ম.শ্রী. ত্রি। (৩) **তৃতীয় চাষ**—তেউড় চাষ-রাঢ়, তেচাষ, তিয়ার/তেয়ার-পব.য.খু, তেছা-ফ.ব, পচানো, বোয়ানি-মে. দচ। (৪) **চতুর্থ চাষ**—কাদা করা, কাদানো-চ. রাঢ়।

হলচালন সম্পর্কে অনেক চাষীই খনারবচন মানিয়া চলে। অম্বুবাচী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা এবং কোন কোন পর্বদিনে তাহারা জমিতে লাঙ্গল দেওয়া বন্ধ রাখে।...চাষআবাদ, চাষবাস—কৃষিকার্য। কৃষিকার্য দ্বারা জীবিকা নির্বাহ।

চাষ—উৎপাদন (মাছের—)।

চাষা—চাষী, কৃষক। মূর্খ, অশিক্ষিত (চাষার মত ব্যবহার)।...চাষাড়ে—চাষার মত।...চাষাভুষা—চাষী এবং ঐ শ্রেণীর লোক।

চাষী—কৃষক, কৃষিজীবী, যে প্রধানত কৃষিকার্য দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে। তৎপর্যায়ঃ—খেত্তী-মে, কৃষক, কৃষাণ, কিসান, চাষা, লাঙ্গলিয়া/লাঙ্গল্যে/লাঙ্গুল্যে, হালিয়া, হাইল্যা, হাল্যা-মে, হাইলা, হালী, হালুচা-শ্রী, হালুয়া-ম. চা, হেলুয়া-বাঁ. বী, হেলো-ন. চ।

চাষী তথা কৃষকদের মধ্যে নানারকম শ্রেণীবিভাগ আছে: কেহ কেহ একাধারে কৃষক এবং মালিক (owner cultivator) দুই-ই; ইহাদের অনেকেরই অল্পবিস্তর জমিজমা আছে, ইহারা নিজেরাই নিজেদের জমিতে লাঙল দেয়, ফসল উৎপাদন করে এবং কৃষির উপস্বত্বই ইহাদের আয়ের প্রধান উৎস। আবার কেহ কেহ বিস্তর কৃষিজমির মালিক হইলেও নিজ হাতে চাষ করে না। ইহারা প্রায়ই ভাগচাষী বা লাগাড়ে মুনিষ (স্থায়ী খেতমজুর) দ্বারা নিজেদের জমিতে চাষবাসের কাজ করায়। ইহাদিগকে বড় কৃষক বা জোতদার কৃষক বলা যাইতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশে অধিকাংশ চাষীরই নিজস্ব চাষের জমি নাই, থাকিলেও উহার পরিমাণ অতি সামান্য। তাহাদের কেহ বর্গাদার, কেহ বা ক্ষেতমজুর হিসাবে অপরের জমিতে চাষবাস করে (বর্গাদার ও খেতমজুর দ্র)।

চাহারাম জমি [হি°]—চতুর্থ শ্রেণীর জমি, যে জমিতে মাত্র এক চতুর্থাংশ ফসল জন্মে।

চুক্তিবর্গা, সইয়াপত্তন-ম—এই প্রথানুযায়ী জমিতে কম বেশি যে পরিমাণ

ধরে না। জমির উপস্বত্ব ছাড়াও চাকুরি, ব্যবসায়, দাদন ইঃ নানাসূত্রে ইহারা আয় করে। আবার অনেকে একাধারে জোতদার এবং কৃষক দুই-ই, নিজেরাই নিজেদের জমি চাষ করে, জন খাটায়, অতিরিক্ত জমি বর্গা দেয়। জমিদারী প্রথা বিলোপের পূর্বে ইহারা সরাসরি জমিদারের বা কোনও মধ্যস্বত্বাধিকারীর রায়তশ্রেণীভুক্ত ছিল; বর্তমানে রাজ্যসরকারকে খাজনাপত্র বুঝাইয়া দিয়া জমিবাড়ির নির্ব্যূঢ় স্বত্ব ভোগ করে। (চাষী দ্র)।

জোমরা, জোঁইর—চাষীদের পাতার ছাতা বি: (পেখা দ্র)।

জোয়াল, জুয়াল [হি° জুআ, ই° yoke)—লাঙ্গল গাড়ি ইঃ টানিবার সময় যে কাষ্ঠদণ্ড বা বংশদণ্ড গোমহিষাদির কাঁধে জোতা হয়। তৎপর্যায়:— জোল-চ, জোয়াইল-ন, জোঁয়াল / জংগাল / জুয়া-জ. কো, জুমাল-ত্রি।.... জোয়ালের দুই মাথার গোঁজ বা কাঠি—শলি-মু. মে, শেয়ালি-য, শোল-চ. বাঁ. বী, সড়কি-ম, সুলটি-জ. কো, সোমরাইল-খু, সোঁয়াজ-ন।

জোয়াট, জোয়াল—উর্বরা (জোয়াট জমি)। **জোল জমি**—নীচু জমি।

ঝাঁকা-দচ—কৃষিপণ্যাদি বহন করিবার বাঁশের সরু কাঠির তৈয়ারি (থালার ন্যায়) বিস্তৃতমুখ অগভীর পাত্র বিঃ। বড় ঝাঁকার ব্যাস ৩ ফুটও হইতে পারে, কানা সাধারণত ৪।৫ ইঞ্চি উঁচু থাকে। চাষীরা ইহাতে করিয়া শাকসবজি, ফলমূল ইঃ বাজারে আনে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, নদীয়ার ঝাঁকার গড়ন স্বতন্ত্র, উহা বৃহৎ ঝুড়ি বিঃ। ঝাঁকামুটেদের ঝাঁকার ধরন আবার এই দুই অঞ্চলের ঝাঁকা হইতে পৃথক। উহার আর এক নাম পাছিয়া / পাইছা। চট্টগ্রামের কোথাও কোথাও খৈচালুনিরও এক নাম ঝাঁকা। কোচবিহারে ঝাঁকা বলিতে বুঝায় মাছের সচ্ছিদ্র চুপড়ি। ময়মনসিংহে বাঁশের ঘন কঞ্চিযুক্ত আগাকেও ঝাঁকা / ঝাঁকানিয়া বলে। চাষীরা লতানিয়া গাছের (শিম, পালা ঝিঙা ইঃ) গোড়ায় এই ঝাঁকা (কঞ্চিযুক্ত আগা) পুঁতিয়া দেয়।

ঝাড়াই, ধানঝাড়াই-রাঢ়. পব—কাটা ধানগাছ হইতে ধান পৃথক করিয়া লইবার পদ্ধতি বিঃ। এই পদ্ধতি অনুযায়ী চাষীরা ধানগাছ গোড়ায় কাটিয়া সরু সরু আটি বাঁধিয়া খামারে আনে এবং সেখানে কাঠের পাটায় বা বাঁশের চালিতে সেগুলি ঝাড়িয়া (আছড়াইয়া) ধান পৃথক করিয়া লয়। পর্যায়শব্দ:—ধান ঠেঙান, ধান বেড়েন।

ঝোপড়ি—ফসল আগলাইবার জন্য মাঠে ঝোপের মত করিয়া তৈয়ারি কুঁড়ে।

টাটি জমি-খু—চটান, গোচারণ ভূমি।

টারি-জ. কো—মৌজার অংশ যেখানে একজন জোতদার ও তাহার আধিয়ারদের ঘরবাড়ি থাকে। তৎপর্যায় :—চাতর, চাতাল।

টাল-মা—বিস্তৃত মাঠ। জলাভূমি। স্তূপ, রাশি (ধানের—)। লতানে গাছের মাচা। টালকা, ঠাণ্ডা।

টিকর-পূব. উব, **টিকরি**-মে, **টেকর / টেকোর**-বী—সমতল ভূমির মধ্যবর্তী উচ্চস্থান ('যদি বর্ষে মকরে। ধান হবে টেকরে'-খব)।

টেঁক, ট্যাঁক-ঢা—উঁচু নীচু জমি। জোল জমির সীমানা নির্দেশক মাটি ঘাস ইঃর ঢিবি, ঘুঁটি-চ। গেঁজ, গেঁড়, thizome (আদার—)।

টেঙ্গর / ট্যাঙ্গর-ঢা, **টোঙ্গর**—কাঁকুরে ডাঙ্গা জমি, যাহাতে ফসলাদি বিশেষ কিছু হয় না।

টোকা [পো° touca]-ন. হা. হু. বর্ধ—বাঁশের চেঁচাড়ি, গোলপাতা, তাল-পাতা ইঃ দ্বারা তৈয়ারি টুপির ধরন ছাতা বিঃ। ইহার বাঁট থাকে না। বাংলার প্রায় সর্বত্রই চাষীদের মধ্যে এই ধরনের ছাতার প্রচলন আছে। পর্যায়শব্দ :—পাতলা-ম, মাথলা-ঢা. দি. মা, মাথাল-উব, মাথালি / মাথাইল-টা. পা. য, মাথালি-মু, তকি / তইক্যা-চট্ট। (গৃহ-সামগ্রী দ্র)।

টোনা-ঢা—বলদের মুখের জালতি বিঃ (পাউড়ি দ্র)। -ম— কোন কিছু (মুড়ি, চিড়া, ফুল) রাখিবার জন্য ধুতির খুঁট বা শাড়ির আঁচল গুটাইয়া থলের মত যাহা করা হয় (মেয়েটা টোনায় ক'রে মুড়ি খাচ্ছে।)

ঠনা-ম—ঈষের খাঁজ, notch। মাটির ছোট বেদী যাহার উপর ভাতের হাঁড়ি কড়া রাখা-হয়। -শ্রী—পিলসুজ।

ঠিকা/ ঠিকে, ঠিকোর-মু—যে মজুর কোনও কার্যসম্পাদনের জন্যপ্রথমেই মোক্তা মজুরি ঠিক করিয়া লয়। এইরূপ কাজকে 'ঠিকা কাজ', 'ফুরনে কাজ', 'চুকে কাজ' ইঃ বলা হয়।....ঠিকা—নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট কাজ করিবার সর্তে অস্থায়ীভাবে নিযুক্ত (ঠিকা ঝি)। নির্দিষ্ট কয়েক বৎসরের জন্য দখলপ্রাপ্ত (ঠিকা প্রজা)। ....ঠিকাদার—যে চুক্তি করিয়া কোনও কার্য সম্পাদনের ভার লয়, contractor.

ঠুয়া / ঠোয়া, ঠুসি—বাঁশের তৈয়ারি গোরুর মুখের আবরণ (পাউড়ি দ্র)।

ডলনা-ব—বরিশালে কর্ষিত নাবাল জমি চৌরস করিবার জন্য 'ডলন৷' নামে তক্তার মত এক প্রকার মই ব্যবহার করা হয়। যাহা দিয়া ডলা বা মর্দন করা হয়।

ডহর / ডয়র-ন, মা. দি—গোমহিষাদি চলিবার নিম্ন পথ ('কানা গোরুর ভেনো ডহর'-প্র)।-বাঢ়—গোচারণভূমি।

ডহর—দহ, জলা, খাত। নৌকার খোল।

ডাকসংক্রান্তি—নলসংক্রান্তি দ্র।

ডাঙ্গা / ডাঙা--পব. উব—উঁচুজমি, যে জমিতে বৃষ্টির জল দাঁড়ায় না। তৎপর্যায় ঃ—আড়া, উঁচা-কো. রং, কান্দা-পূব, দহি-মে, বাদ-রাঢ় (নাবাল বা নাবোর বিপরীত)। বিশাল প্রান্তর (গনগনির ডাঙা, হিড়িম্বা ডাঙা-মে)। স্থান নির্দেশক প্রত্যয় বিঃ (স্থান বা গ্রাম অর্থে)। যেমন,—নারিকেলডাঙ্গা, তিলডাঙ্গা, বামুনডাঙ্গা, বেদেডাঙ্গা, নলডাঙ্গা, ফরাসডাঙ্গা। স্থল ('জলে কুমীর ডাঙায় বাঘ'-প্র)। মারকুটে (ছেলেটা ভীষণ ডাঙা)।

ডান / ডাইন-উব—আবাদী ভূমিখণ্ড।-পূব. রাঢ়—ডাকিনী, ডাইনী (স্বর্ণ ডাইনী! আমাদের দেশের ভাষায় 'স্বনাডান।' স্বর্ণডাইন অবিনাশকে খেয়েছে, রামজী সাধু ঝাড়বেন'—'ডাইনী', তারাশঙ্কর)।

ডাব-হিজ—নীচু জমি। অপক্ব নারিকেল (ঘরবাড়ি দ্র)।

ডুঙ্গি / ডুঙি -বাঁ—জলসেচনী বিঃ।-বগু—দইয়ের ছোট ভাঁড়।

ডেঙ্গা / ডেঙা—ডাঙ্গার উচ্চারণ ভেদ (ডেঙ্গা জমি)। **ডেঙ্গা-ম**—নাড়া। ডাঁটা, ডেঙো ডাঁটা-চ।

ডোঙ্গা / ডোঙা—দুনি, জমিতে জল বাহিত করিবার জন্য তাল খেজুর ইঃর গুঁড়ি (trunk) দিয়া তৈয়ারি নালীর মত সেচনী বিঃ। ঐরূপ গাছের গুঁড়ি দিয়া প্রস্তুত সরু লম্বা নৌকা বিঃ। কলার খোলের পাত্র বিঃ।

ঢিমুল—চাঙ্গড় দ্র। **ঢেলা**—মাটির ডেলা। ঢিল। বড় উকুন।

তরপা / তরফা—খড়ের বড় আটি ; ধানের খড় ছোট ২০ আটিতে ১ তরপা, ৪ তরপায় ১ পণ, ১৬ পণে ১ কাহন।

তলা-চ—বীজ ফেলিবার স্থান (বীজতলা)। অঙ্কুরিত বীজধান (তলা ফেলা, তলা ক্ষেত)।

তলা<তল (পাঁচ তলা বাড়ি)। দেবতার স্থান (ষষ্ঠীতলা, শীতলাতলা)। নিম্নবর্তী স্থান (গাছতলা) ; নিম্নদেশ (পায়ের তলা)।

তাকাবি [আ° তকাবী]—সরকার কর্তৃক কৃষককে অল্প সুদে বা বিনা সুদে প্রদত্ত ঋণ।

তাড়া—গোছা, বাণ্ডিল।···তাড়ি (ক্ষুদ্রার্থে)—শাকসবজির আটি। মদ্য বিঃ, toddy. **তিয়ার/তেয়ার**—তিন চাষ। পার্বণ।

তুড়ি-ব—গোমহিষাদির মুখবন্ধনী, পাউড়ি। দুই আঙুলের ফোটন।

তেউড়চাষ,, তেছা—তৃতীয় বারের চাষ।

তেরিজ [আ°]—মোট (অঙ্ক)। ভূসম্পত্তির বিবরণ যাহাতে লেখা থাকে।

তেহাই-রাঢ়—তিন ভাগের এক ভাগ।

তোবড়া-মা. দি—মাঠে তামাক-টিকা বহন করিবার তালপাতার ঠোঙা বিঃ। চোপসা ('ঠাকুরমার তোবড়া গাল')।

তৌজি [আ°]—খাজনার নির্ঘণ্ট, rent roll.

থড়কা-মে—ঘুন্টির মালা যাহা সাধারণত গোরুর গলায় পরানো হয়।

থল [<স্থল ?]—দিগন্তবিস্তৃত মাঠ (ভুধুঙের থল -ম)।

থানা, থানাপেটেলি-বী—শাকসবজির চারা উৎপাদনের স্থান। থানা—পুলিশ স্টেশন। আস্তানা।

থোড়—পাতার আবরণের ভিতর আবদ্ধ ধানের শীষ। ফলন্ত কলাগাছের ভিতরের শক্ত অংশ (কলার—)।

দ / দহ [<হ্রদ (বর্ণ বিপর্যয়ে)]—গভীর জলাশয় (কালীদহ)। গর্ত।

দখল [আ°]—অধিকার ; কোনও স্থান নিজের অধিকারে আনা। ব্যুৎপত্তি, জ্ঞান, proficiency.....দখলকার—অধিকারী। ,, দখলী....অধিকারভুক্ত(-স্বত্ব)। ....জবর দখল—বল প্রয়োগে বে-আইনীভাবে অধিকার।

দলিল [আ°]—প্রমাণপত্র, document. **দলিল দস্তাবেজ**—প্রমাণপত্রাদি।

দহর-দচ, দহলা ভুঁই-উব—নাবাল জমি। **দহি, দহিজমি**—উঁচু জমি, ডাঙ্গা।

দাউন / দাওন-পূব—মলনদড়ি। গোরু দ্বারা ধান ইঃ মাড়াইবার সময় ৫।৭ টি গোরু একসঙ্গে সারিবদ্ধভাবে জোতা হয়। এই জোতদড়িকে দাউন, দাওন, দাওনদড়ি, মলনদড়ি ইঃ বলা হয়।

দাওনমাড়া-চ—ধান ঝাড়িবার সময় ধানের যে সব ভাঙ্গা নাল এদিক ওদিক ছিটকাইয়া পড়ে, সেগুলিকে জড় করিয়া গোরু দ্বারা মাড়াইয়া ধান পৃথক করিয়া লওয়া, পোলমাড়া-ন. চ. মু. বী।

দাওয়া—ধান কাটা। বারান্দা।....দাওয়ামাড়ি—ধান কাটা এবং আটি আটি ধান খলায় খামারে আনিয়া গোরুদ্বারা মাড়াইয়া ফসল সংগ্রহের কাজ ('লক্ষ্মী না আগন মাসে বাওয়ার দাওয়ামাড়ি'-মৈণী)।

দাখিলা [আ°]—খাজনার রসিদ, কবচ-চ।

দাওয়াল /-লে /-উল, দাঐল—ধান দাওয়ার মজুর (খেতমজুর দ্র)।

দাঁড়া—সবজিবাগানের সারিবদ্ধ অনুচ্চ আল বিঃ, কেইল-ম.ত্রি।

আলু বেগুন হলুদ ইঃ এইরূপ দাঁড়া করিয়া লাগানো হয়।…দাঁড়া—শিরদাঁড়া, মেরুদণ্ড। গলদা চিংড়ির দাঁড়া।

দাঁড়িয়া / দাঁইড়্যা-ম [স° দণ্ডিকা]—উকুনবাড়ি। ইহাতে আর পৃথকভাবে বক্রাগ্র লোহা বা লোহার পাত বাঁধা হয় না, বংশদণ্ডটিরই আগায় ৬।৭ ইঞ্চি পরিমাণ কঞ্চি রাখিয়া আঁকড়ির মত তাহা বাঁকাইয়া দেওয়া হয়।

দাদন—মালিকের নির্দেশ মত কোনও ফসল উৎপাদনের জন্য চাষীকে অগ্রিম যে মূল্য দেওয়া হয় ('নীলের দাদন')। শ্রমমূল্যে ধান কর্জ দেওয়া। বায়না। সুদে টাকা খাটানো (দাদনী কারবার)। **দাদ্‌নী**—খেতমজুর দ্র।

দানা [ফা°]—বীজ, বীচি, seed (উচ্ছের দানা, কুমড়োর দানা, পুঁইয়ের দানা)। অন্ন (তিনদিন তার পেটে দানা নাই)।…দানাপানি—অন্নজল। …দানাদার—মিষ্টি বিঃ।…ঘুগনি দানা—বিবিধ উপকরণমিশ্রিত মটরসিদ্ধ।…ঘোড়ার দানা—ছোলা।…সাগুদানা—সাগু (রোগীর খাদ্য)।

দানা—দৈত্য (পল্লীগ্রামে 'দৈত্যদানা' কথাটি প্রায়ই শুনা যায়)। পণ্ডিতব্যক্তি, wise. বাঘ ('পাঠাইল লোহজঙ্গ দানা'।…'এত বলি দানা যায়, এথা গাজি ভয় পায়'—রায়ম)।

দায়শোধী-ম—অনেক সময় জমির মালিক চাষীর নিকট হইতে ফসলের অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করিয়া জমির সম্পূর্ণ উপস্বত্ব তাহাকে ছাড়িয়া দেয়; মালিককে আর সেই টাকা নগদ শোধ করিতে হয় না, চাষীই সর্তমত কয়েক বৎসরের ফসল ভোগ করিয়া মালিককে দায়মুক্ত করে। চাষআবাদের এই প্রথার নাম 'দায়-শোধী,' 'খাইখালাসি'।

দুগর-ম—লাঙ্গলের মুখ বা মুড়া (লাঙ্গল দ্র) যাহা পৃথক এক খণ্ড কাঠ দিয়া তৈয়ার করা হয়।

দুনি [দ্রোণী]-রাঢ়. পব—জলসেচনী বিঃ।…দুনিবহা-মু—দুনি দিয়া ক্ষেতে জল তোলা। সময়মত সুবৃষ্টি না হইলে চাষীকে ফসলের জমিতে খাল বিল পুকুর ইঃ হইতে জল সেচন করিতে হয়। এই কাজে তাহারা নানা নামের নানা প্রকার সেচনী ব্যবহার করে। যেমন, দুনি, ডোঙা-রাঢ়. পব, ডুঙি-বাঁ. মে, ডবকা-ম, সিনি / সিউনি / সেউনি-রাঢ়. পব, সেঁওচ / ছেঁওচ-ন. য, সিয়াৎ-বাঁ, সেওৎ / হেওৎ-ম. শ্রী, হেউৎ-নো, খেচি-ফ, ছেঁতি-বগু, কুন / কুন্দ্-ম. শ্রী, খাজাল-নো, দোলাখাল-চ, হাতখাল-চ, কেঠুয়া….।

দুপাটিয়া / দুপাইট্যা-ম—দুই পাটিযুক্ত মই। বাঁশের সিঁড়ি বিঃ।

দেবোত্তর [<দেবত্র]—দেবতার পূজা অর্চনার জন্য প্রদত্ত সম্পত্তি।

দেয়াড়-ন, **দিয়াড়**-মু (পাড় দিয়াড়-গ্রাম)—নদী তীরবর্তী জমি।

দোহারি-পূব, **দোজমি**-পব. রাঢ়—যে জমিতে বৎসরে অন্তত দুইটি প্রধান ফসল জন্মে। তৎপর্যায়ঃ—দোখন্দা-উব, দোফসলা, দোফসলী, ওলা।

দোছা, দোয়ার—দ্বিতীয় চাষ (চাষ দ্র)।

দোপরে [দ্বিপ্রাহরিক]-মু—যে মুনিষ সকাল হইতে দুপুর পর্যন্ত কাজ করে। ....বেয়লে [বৈকালিক]—যে মজুর বিকাল ৩টা হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজ করে।

দোফসলা /-লী—যে জমিতে বৎসরে দুইবার ফসল জন্মে।

দোয়েম [ফা° দুয়েম]—দ্বিতীয় শ্রেণীর জমি, যে জমিতে বারো আনা ফসল জন্মে।

দোলাঝাল-চ—জলসেচনী বিঃ। এই সেচনীর সহিত দড়ি সংযোগ করিয়া দুইজন দুই দিকে দাঁড়াইয়া দোলাইয়া দোলাইয়া জল সেচন করে।

ধড়—লাঙ্গল দ্র। স্কন্ধ হইতে নিতম্ব পর্যন্ত দেহাংশ। মুণ্ডহীন দেহ। দেহ ('ধড়ে প্রাণ নাই')।

ধান ঝাড়াই /-ঠেঙান /-বেড়েন—ঝাড়াই দ্র।

ধান মলন-ম, **ধান মাড়াই**-পূব. উব. য. খু—ধানগাছ গোরু দ্বারা মাড়াইয়া ফসল সংগ্রহ করিবার পদ্ধতি বিঃ। উল্লিখিত অঞ্চলে চাষীরা ধানগাছের মাজায় কিংবা মাথার দিকে কাটিয়া বড় বড় আটি বাঁধিয়া খোলায় থামারে আনে। পরে সেগুলি একটি খুঁটি (মি খুঁটি দ্র) পুঁতিয়া বা খুঁটি ছাড়াই বৃত্তাকারে ছড়াইয়া দেয় এবং তাহার উপর দিয়া ৫।৭ টি গোরু সান্নিবদ্ধভাবে ক্রমাগত ঘুরাইতে থাকে। ফলে গোরুর খুরের আঘাতে ধানগাছ হইতে ধান পৃথক হইয়া পড়ে। সমগ্র বাংলার দুই তৃতীয়াংশেরও অধিক চাষী এই মাড়াই পদ্ধতি অনুসরণ করে। পর্যায়শব্দ ঃ—মাড়া, মাড়া দেওয়া, মলন, মলন দেওয়া, মলান করা।

নগ্‌দা-মে—যে মজুর রোজ হিসাবে নগদ টাকায় কাজ করে।

নবান, লবান, নবান্ন—আমনধান গৃহগত হইলে কোনও শুভদিনে সম্পন্ন গৃহস্থ নূতন আলোচাল, দুধ, ডাব ও মিছরির জল, নারিকেল, গুড় কলা, কিসমিস ইঃর একটি উপাদেয় মিশ্র (mixture) তৈয়ার করিয়া প্রথমে দেবতা, পিতৃপুরুষ, গবাদি পশু, কাক সকলকে নিবেদন করে এবং পরে নিজে পরিবারস্থ সকলকে লইয়া প্রসাদ গ্রহণ করে। ইহা ছাড়াও অনেক পরিবারে এইদিন

পায়স-পরমান্ন ইঃরও সুব্যবস্থা হয়। তবে গরীব চাষীর ঘরে 'নবান' উৎসব নূতন ধানের চালে 'গুড়ভাত খাওয়া' বা 'নয়াখাওয়া' মাত্র।

নল সংক্রান্তি-হা. মে—আশ্বিনের সংক্রান্তি। অঞ্চলভেদে ইহা 'ডাকসংক্রান্তি,' 'গর্ভিণী সংক্রান্তি' নামেও অভিহিত। এইদিন চাষী গৃহস্থেরা সুফসল কামনা করিয়া ধানের জমিতে আনুষ্ঠানিকভাবে নল পোঁতে এবং ওল, মানকচু, শসার ডাঁটা, রাই সরিষা, আউশের আলোচাল, ঘি, মধু ইত্যাদি উপকরণে পূর্ণগর্ভা ধান্যলক্ষ্মীকে সাধ দেয়, ডাক ছাড়িয়া নানারূপ ছড়া কাটে। এই অনুষ্ঠানকে মেদিনীপুরে 'ডাকের পূজা' এবং প্রায় অনুরূপ অনুষ্ঠানকে উত্তরবঙ্গে 'লখীডাক', 'ডাক দেওয়া,' ময়মনসিংহে 'গুমা দেওয়া,' ফরিদপুর যশোহর মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি অঞ্চলে 'গার্শী উৎসব' বলা হয়। (গুমা, গার্শী, লখীডাক দ্র)।

নাকথড় / নাকথন-উব, **নাকাল**-চ. ন—গোমহিষাদির নাকের দড়ি, মোনাদ-মে। **নাঁগোল, নাঙোল**—লাঙলের রূপভেদ।

নাঙলা, নাঙইলা—জমির ঘাস ইঃ উৎপাটনের আঁচড়া জাতীয় যন্ত্র বিঃ।

নাটা / নাডা-ম—অনুর্বর। লাঙ্গলের রেখা।

নাড়া [স° নাল]—মাজায় বা মাথার দিকে কাটা ধানগাছের নিম্নাংশ।

নানকর জমি [আ°]—ভরণপোষণের জন্য প্রদত্ত জমি, maintenance land.

নাবাল, নাবো,নামা, নামাল-বী. মু—নীচু জমি, যে জমিতে চারিদিক হইতে বৃষ্টির জল গিয়া পড়ে এবং বৎসরের অধিকাংশ সময় থাকে। এইরূপ জমিতে আমন ধান (রোয়া এবং বাওয়া) ভাল জন্মে। তৎপর্যায় :—খালজমি-মে, গোড়েন জমি-মু, জলান-বাঁ, জোলজমি-চ. ন. মু. বর্ধ, ডাব-হিজ, দোলাজমি / দহলা ভুঁই-জ. কো. রং, বহাল-রাঢ়, বাইদ-পূব, বিলান জমি-ফ, লামা।

নালা—পয়ঃপ্রণালী, জলনিকাশের খাত, নরদমা, drain (পয়না দ্র)।

নিজেন-ন. মু. য, **নেজনা**-মে—লাঙ্গলের উপরের অংশ, মুঠি (লাঙ্গল দ্র)।

নিড়ানি, নিড়ুনি, নিড়েন, নিড়েনি-পব—শস্যক্ষেত্র হইতে ঘাস আগাছা ইঃ উৎপাটনের যন্ত্র বিঃ, weed-hook. বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে নানা ধরনের নানা নামের নিড়ানি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যেমন, অকশু-য, ঘাসকুরনি-মে, খুরপা /-পি, ছেউটি-জ. কো, ছেনি-ম, ডাউকি-উব, নিড়াইন্তা কাচি-ত্রি, পাঁচনি / পাঁচোন-পা, পাসনি / পাসুনি-বাঁ. বী. খু, পাছুনি / পাসুন-জ. কো।

....**নিড়ানো** [√নিড়া]—**শস্যক্ষেত্রের ঘাস ইঃ উৎপাটন করা।**

এই নিড়ান-কার্যে বাংলার চাষীদের নানা রকম ঘাস ও আগাছার সঙ্গে সংগ্রাম করিতে হয় ; তাহাদের কতকগুলি নাম এখানে উল্লেখ করা হইল—ওকড়া, কচুরি, কানঁছিড়ে, কালেয়া, কুলপো, কোদাই, চিচুয়া, ঝাঁজি, টিকি, দইখই, দুব্বা (দূর্বা), বাগানুনা, বিন্দিমুখা, ভটকা ,মনা, মাকড়জালি, মুথা, রোশনা, শ্যাওলা, হাগড়া এবং আরও কত কি ! রামেশ্বরের শিবায়নেও (শিবমঙ্গল) অনেক ঘাস আগাছার নাম আমরা পাই :

'অাঁঠু পাড়্যা ঈশানেতে আরম্ভে নিড়ান ।। বারবট্যা বরাট্যা চেঁচুড়্যে ঝাডা উড়ি। গুলমুথা পাতি মার‍্যা পুত্যা খায় গুড়ি ।। দল দূর্বা সোলা শ্যামা তেশিরা কেশুর । গড় গড় নানা খড় উপাড়ে দুর্ দুব্ ।। খর খর খুঁজিয়া খড়ের ভাঙ্গে ঘাড় । কুলি কুলি কর‍্যা চলে ধর‍্যা ধান্য ঝাড় ।।'—রারচ ।

পূর্ববঙ্গে আমনের জমিতে বীজ বপন বা চারা রোপণের পর নিডানের বড় প্রয়োজন হয় না ; অতিরিক্ত চাষ এবং মই দিয়া প্রথমেই এই কাজটি প্রায় শেষ করিয়া ফেলা হয় । কিন্তু আউশ ও পাটের জমি অন্তত দুইবার নিড়াইতে হয় ।

পড়া, পড়িয়া, পোড়ো—পতিত জমি ('মাগে হর একান্তর কোচ পাশে পড়া' -রারচ) ।....পড়া বাডি, পোড়ো বাড়ি—যে বাড়িতে লোকজন নাই, যে বাড়ি অব্যবহৃত অবস্থায় পড়িয়া আছে ।....জলপড়া, তেলপড়া—মন্ত্রপূত জল, মন্ত্রপূত তেল ।...পড়ো, পোড়ো—পড়ুয়া, ছাত্র ।

পয়না-ন, **পয়নালা, পল্লা**-ম—জলনিকাশের অপ্রশস্ত নালা, পয়ঃপ্রণালী ।

পয়স্তি [ফা° পয়বস্ত]—নদীর পলি হইতে সৃষ্ট চাষোপযোগী ভূমি (পয়স্তি জমি) ।

পরচা [ফা°]—খতিয়ান ।

পল [স° পলাল]—গোরু মাড়ানো খড় (পোয়াল দ্র) ।....পলগাদা—খড়ের স্তূপ, গাদা ।...পলমাড়া—(দাওন মাড়া দ্র) । **পল**—গাছের অসার অংশ ।

পল্লা-ম—পয়ঃ প্রণালী ।-বগু—পটোল ।

পাই-মু. দচ—ক্ষেতমজুরদের পালা করিয়া কাটিয়া ও বিছাইয়া যাওয়া ধান-গাছের সারি । ময়মনসিংহে চাষীদের ভাষায় ইহার 'চাতল' নামও শুনা যায় ।(গৃহ-সামগ্রী দ্র) ।

পাইকশতা [ফা°]—অনাবাসিক, non-resident....**পাইকশতা চাষী**—যে চাষী এক গ্রামে বাস করিয়া অন্য গ্রামে জমি চাষ করে, non-resident cultivator.....**পাইকশতা জমি**—যে জমি ভিন্নগ্রামের চাষী দ্বারা কর্ষিত হয় ।

তুঃ **খোদকশতা চাষী**—যে চাষী নিজের কর্ষিত জমিতেই বসবাস করে, resident cultivator.

পাইট—জন, মুনিষ, labourer.····পাইট খাটা—মজুরি করা।

পাইরি—কাজের পালা, turn। পাঁচসেরী মানপাত্র।

পাউড়ি-মু—গোমহিষাদির মুখের জাল বা আবরণ। চাষের সময় গোরুগুলি যাহাতে এটা ওটায় মুখ দিয়া বিরক্ত না করে, তদুদ্দেশ্যে চাষীরা উহাদের মুখে একরূপ জাল বা ঠোঙার ধরন বাঁশের আবরণ পরাইয়া দেয়। অঞ্চলভেদে ইহাদের নানা নাম শুনা যায়, গড়নেরও পার্থক্য লক্ষিত হয়ঃ গোমাই-বগু, জাল-বাঁ. বী, জালতি-চ. মে, টোনা-ঢা, ঠুয়া / ঠোয়া-ম, ঠুসি-মা. খু, তুড়ি-ব, পাড়া-ন।

পাখি / পাগি-ম, **পাগা**-মে. মু. বী—গোরুর গলায় বাঁধিবার এক ধরনের জোড়া দড়ি।

পাখনা—দ্বিতীয় চাষ। পাখা, ডানা, (মাছের পাখনা)।

পাখি-ঢা—জমির পরিমাণ বিঃ। অর, চাকার পাখি, spoke. খড়খড়ির কাঠের ফলা। পক্ষী।

পাচন, পাচনবাড়ি, পাচনি, পাজন-শ্রী [স° প্রাজন]—গোমহিষাদি তাড়াইবার ছোট সরু লাঠি। তৎপর্যায়ঃ—আইলা-ব, পাইনা-মে, পায়না-মু, পান্টি / পেন্টি-উব, শলা / হলা-ম।

পাঁচনি / পাঁচন-পা, **পাছুনি**-ক. কো—নিড়ানি বিঃ। ইহার মাথাটি বাংলা ৫ বা অর্ধচন্দ্রের মত।

পাজন-শ্রী [স° প্রাজন]—গোতাড়ন দণ্ড।

পাটা-পব.রাঢ়—কৃষি সম্বন্ধীয়পাটা বলিতে বুঝায়,—তক্তার ধরন পুরু কাষ্ঠখণ্ড। চাষীরা ইহার উপর ধান ঝাড়ে (ধান বেড়ে পাটা)। ধান ঝাড়ার বাঁশের মাচাকে বলে 'আগড়', 'চালি।'

পাটা—রাজমিস্ত্রীদের সমতল কাষ্ঠদণ্ড।-পূব—শিল, যাহার উপর মশলাদি পেষণ করা হয়। শিশুদের গলার অলঙ্কার বিঃ। ধোপাদের কাপড় কাচার তক্তা বিঃ (ধোপার—)। পাট্টা (জমির—)।····বুকের পাটা—বুকের বিস্তার, সাহস।

পাটাস-জ. কো—গোঁজ বিঃ (আড়চাল দ্র)।

পাটি—মইয়ের লম্বা বাঁশ (মই দ্র)।

পাটি—মাদুর বিঃ। সারি (দুপাটি দাঁত)। জোড়ার একটি (একপাটি জুতা)।

পাড়খোলা জমি-মু—পুকুরের পাড়সংলগ্ন জমি, পুকুর আড়া জমি। এইরূপ জমি সেচের খুব সুবিধা পায়।

পাড়া-ম—আটি বাঁধা কাটা ধানের সুসজ্জিত স্তূপ (ধানের পাড়া),পালুই-রাঢ়।

পাড়া [<পদ্র]—গ্রামের অংশ, মহল্লা (কুমোর পাড়া, কায়েত পাড়া)। গ্রাম (গুপ্তিপাড়া, ভাটপাড়া কোটালিপাড়া)।

পাড়া—পদচিহ্ন (বাঘের পাড়া)।....পাড়ানো—মাড়ানো, পা দিয়া দলন করা।

পাড়া-ন—পাউড়ি, গোমহিষাদির মুখের আবরণ। পাড়া [√পাড়্]—পাতিত করা, নামানো (আম—)। বিস্তৃত করা, পাতা (বিছানা পাড়া)।....ডাক পাড়া —উচ্চৈঃস্বরে ডাকা।....ঘুম পাড়ানো—ঘুমে প্রবৃত্ত করানো।

পাতলা-ম—চাষীদের টুপির ধরন পাতার ছাতা (টোকা দ্র)। হালকা।

পাথারি-জ. কো—অনুর্বর ভূমি। জলাভূমি <পাথার (সমুদ্র)।

পান-মু—খাঁজ, notch (ঈষের পান)। ঝাল, solder। উপাধি বিঃ। (উদ্ভিদ দ্র)।

পানা দেওয়া-শ্রী—ধান বা টাকা লইয়া হালের গোরু অন্য চাষীকে কয়েক মাসের জন্য ভাড়া দেওয়া।

পাশিট, পায়না—পাচনবাড়ি।

পালই / পালুই-রাঢ়—ধানের গাদা, আটি বাঁধা ধানের স্তূপ (খামার ভরতি সারি সারি ধানের পালুই)। তৎপর্যায়ঃ—ধানের পালা, ধানের পাড়া-পূব। ....পালই-ম—ঢেঁকি শাক। বনজ লতা বিঃ; ইহা চিড়িয়া ডুরির মত করিয়া বেড়া চাল ইঃ বাঁধা হয়।

পালট-শ্রী—ব্যা, লাঙ্গলের রেখা। লাঙ্গলের রেখার বেষ্টনী।...উলটপালট —উল্টাপাল্টা।

পালা-পূব—খড় বা সতৃণ ধান্যের সুসজ্জিত স্তূপ (খড়ের—, ধানের—)। ধান কাটা, নিড়ানো ইঃ কাজে একজন খেতমজুর এক একবার যতটা স্থান লইয়া অগ্রসর হয় (পালা ধ'রে এগনো)। 'ঘরবাড়ি' দ্র।....পালা দেওয়া—খড় বা ধানের আটি স্তূপীকৃত করিয়া সাজাইয়া রাখা।....পালা খাওয়ানো—ষাঁড় গোরুকে রাত্রিতে হিমে ছাড়িয়া বা বাঁধিয়া রাখা।....পালা [সং প্রালেয়]— তুষার।

পালান—বসতবাড়ি সংলগ্ন উর্বরা ভূমিখণ্ড।

পালো দেওয়া-খু—বেশেন-মু। ধান দাওয়ার সুবিধার জন্য জমির এলোমেলো ধানগাছ একখণ্ড লম্বা বাঁশ দিয়া চাপিয়া চাপিয়া একদিকে হেলাইয়া দেওয়া হয়।

পাশি-মে. মু—দুই মাথা সরু চেপটা ধরনের পেরেক বিঃ, পাতাম লোহা। লাঙলের মুখে ফাল আঁটকানো ইঃ কাজে ইহা বেশী ব্যবহৃত হয়।

পীরান, পীরোত্তর [ফা°]—কোনও পীরের উদ্দেশে প্রদত্ত নিষ্কর ভূমি।

পুঞ্জি / খেড়ের পুঞ্জি-ম—খড়ের সাজানো স্তূপ, পোয়ালকুড়।

পুঞ্জি—পুঁজি, মূলধন ('পুঞ্জি আর প্রবঞ্চনা বাণিজ্যের মূল'-রায়চ)।

পেকে / পেখা-রাঢ়—তালপাতা ইঃর ডোঙাকৃতি ছাতা, যাহা মাথা হইতে পিঠের উপর দিয়া কোমরেরও কিছুটা ঢাকে। ইহা মাথায় দিলে বর্ষীয়সী বাঙালী মহিলাদের আড় ঘোমটার মত দেখায়। তৎপর্যায় :—পাথিয়া-মে, জোমরা-ব. নো, জমির / জোঁইর-চট্ট, ঝাঁপি-উব, সাঁড়াশি-চ. মে।

পোয়াল-রাঢ়. মু. ন. চ. উব [স° পলাল]—খড়, গোরু মাড়ানো খড়। তৎপর্যায় :—পল-পব. মে. ঢা, আইড়, আইসা, আউড়, আউড়ি, খেড় / খ্যাড়, কুটা।-খু—বড় ঝুড়ি বিঃ।

পোয়ালকুড়—খড়ের সুসজ্জিত স্তূপ ('পোয়াল কুড়ে মুঁ বাঁধা'-মে. প্র)। তৎপর্যায় :—পলগাদা, পালা / খ্যাড়ের পালা-টা. ঢা. ফ. য. ব, খেড়ের ফেইন-শ্রী, কুটার মেই-ব, খড়ের গাদা-পব, পুঞ্জি / খেড়ের পুঞ্জি / লাছ / চানা-ম, পোয়ালের পুঞ্জি-উব, গলাই-জ, পালই / পালুই-রাঢ়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, গোরুমাড়ানো খড়ের স্তূপ এবং জন দিয়া ঝাড়াইকরা খড়ের স্তূপ দেখিতে ঠিক একরূপ নহে। গোরুমাড়ানো এলোমেলো খড় একটি শক্ত লম্বা খুঁটির চারদিকে বৃত্তাকারে পাটে পাটে বিছাইয়া দেওয়া হয়; স্তূপটি শেষে গম্বুজের আকার ধারণ করে। কিন্তু ঝাড়াইকরা খড়ের আটিগুলি প্রায়ই দোচালা চৌচালা ঘরের আকারে সাজাইয়া রাখা হয়। কাজেই পশ্চিমবঙ্গের খড়ের গাদা এবং পূর্ববঙ্গের খেড়ের পুঞ্জি বা পালার মধ্যে আকৃতিগত পার্থক্য আছে।

পৌঠি, পউটি—ধানের মাপ বিঃ। বীরভূমে ১০টিনে বা ৫মণে ১বিশ, ১৬বিশে বা ৮০ মণে ১ পৌঠি।

ফসল [আ°]—উৎপন্ন শস্য, crops.

ফাউড়া—লম্বা বাঁটের কোদাল বিঃ। নাতিদীর্ঘ কাষ্ঠখণ্ড বা বংশখণ্ড (ফাউড়া ছুঁড়ে আম পাড়া)।

ফাউড়ি-উব—ধান কলাই ইঃর রাশ রৌদ্রে ছড়াইয়া দিবার, কিংবা ছড়ানো ফসল টানিয়া রাশীকৃত করিবার লম্বা হাতলওয়ালা কাঠের পাটা বিঃ। তৎপর্যায়ঃ—ধান কোদালি-রং, পাউড়া-বগু, পাওট-ষ, সাপটা / সাবড়া-ম. খু,

সারপাট / হারপাট-ম. চা, টানা-ম। ২৪ পরগনায় ইহার 'পাটা' নামও শুনা যায়।

ফাল—লাঙ্গলের ফলক, ploughshare. **ফাল**—লাফ, লম্ফ (ফাল দেওয়া)।

ফালি-উব. পূব—লম্বা ধরনের জমি। ফালা (কুমড়োর ফালি)। ফাড়া কাঠ বাঁশ ইঃর লম্বা চেপটা খণ্ড (কাঠের ফালি)।

ফুলোন-রাঢ়—ধানের ফুল বা শীষ পাতার আবরণের ভিতর হইতে বাহিরে আসার অবস্থাকে বলে 'ধানের ফুলোন'। ডাক সংক্রান্তিতে চাষীরা মাঠে গিয়া ডাক ছাড়িয়া বলে—'ধান ফুলো', 'ধান ফুলো'।

বড়জালা—কাঁধে জিনিসপত্র বহন করিবার বাঁক।

বতোর-চ, বাত-ম, জো—চাষবাস ইঃর উপযুক্ত সময়।

বদলা-ব. ফ—মজুর, মুনিষ।....বদলা লওয়া—রোজ হিসাবে নগদ টাকায় মজুর খাটানো।....বদলা লওয়া—যে যেরূপ ব্যবহার করে, তদুত্তরে সেইরূপ ব্যবহার করা, 'খুনের বদলে খুন।'

বদলাকাজ, বদলিকাজ—বৃহৎ দল গঠন (গাঁতা দ্র) না করিয়া অনেক সময় চাষাভুষারা দুইজনেওপরস্পরের শ্রমের বিনিময়ে জরুরি কাজ সম্পন্ন করিয়া লয়। একজনের কায়িক পরিশ্রমের সাহায্যের বদলে তাহাকে অপর জনের অনুরূপ কায়িক পরিশ্রমের দ্বারা সাহায্য করার নাম (চাষবাস সম্বন্ধীয়) 'বদলা কাজ'। শ্রীহট্টে এই প্রথাকে বলে 'বালা।'

বন্দ [ফা°]—ফসলের খণ্ডভূমি। মাঠ (ঘরবাড়ি 'বন্দ্' দ্র)।

বর্গাচাষ—ভাগচাষ, অপরের জমিতে ফসল উৎপন্ন করিয়া উহার ভাগ পাইবার বা লইবার সর্তে চাষ আবাদের সুপ্রচলিত প্রথা। জমির মালিক এবং বর্গাদারের মধ্যে উৎপন্ন ফসলের কে কত অংশ পাইবে তাহা স্থানীয় প্রথা, চুক্তি অথবা সরকারী আইনানুসারে নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। বাংলার বহু অঞ্চলেই (সরকারী আইন যাহাই থাকুক না কেন) আপোষে উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক বর্গাদার পায় এবং অর্ধেক মালিকে নেয়। এই প্রথার কয়েকটি আঞ্চলিক নাম : আধি, আধিভাগ, আধিবর্গা। ফসলের এক তৃতীয়াংশ বর্গাদারের দুই তৃতীয়াংশ মালিকের,—এইরূপ ব্যবস্থাকে তেভাগা, ত্যাভাগো বলা হয়। জমি খুব সরস হইলে মালিক তিন ভাগ নেয় এবং বর্গাদার একভাগ পায়। বরিশালে এই প্রথার নাম 'চতৈ।' উৎপন্ন ফসলের ১৬ ভাগ মালিকের, ৮ ভাগ চাষীর—এই প্রথার নাম 'ষোল-চব্বিশে।' অবশ্য প্রত্যেকটি প্রথাই নানা

সর্তযুক্ত। ভাগের তারতম্য অনুসারে কোথাও মালিক লাঙ্গল গোরু বীজ ইঃ সরবরাহ করে, কোথাও বর্গাদারকে তাহা দিতে হয়; কোথাও ঝাড়াই-মাড়াই ও কাটাই খরচা বর্গাদার ও জোতদার উভয়ের, কোথাও বা একপক্ষের। এককালে বর্গাচাষে জমির স্বত্বস্বামিত্ব বর্গাদারে বর্তাইত না। বর্তমানে বর্গাচাষীদের অনুকূলে, জমিতে তাহাদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠাকল্পে আইন হইয়াছে ও হইতেছে।

বর্গাদার—যাহারা অপর সম্পন্ন কৃষক বা জোতদারের জমিতে চাষ আবাদ করিয়া উৎপন্ন ফসলাদির ভাগ পায় বা নেয়, share-cropper. তৎপর্যায়: আইদারী-বাঁ. রং, আইদোর-রা. বগু, আইধর-পু, আধিদার / আধিভাগী-ম. আধিয়ার-উব, বরখাদার, ভাগচাষী, ভাগারো-মু, ভাগীদার-পূব।

বগা লাগা-রাঢ়, বসে যাওয়া-চ—(গাইলা দ্র)।

বহাল / বহাল জমি-মে. পু—ভাল নাবাল জমি।

বাইচাষ-উব—খরো চাষ, গভীর চাষ।

বাইদ-ম—নামাল, নীচু জমি। কিন্তু রাঢ় অঞ্চলে 'বাদ' বলিতে বুঝায় 'ডাঙা'।

বাঁওড়—নদীর স্রোত বদ্ধ হইয়া যে জলার সৃষ্টি করে। নদীর বাঁক।

বাঁক—ভারী জিনিসপত্র মাথায় বহন না করিয়া যে দণ্ডের সাহায্যে কাঁধে ঝুলাইয়া নেওয়া হয়। এই রীতি ভারত এবং বাংলাদেশের বাহিরে দক্ষিণপূর্ব এশিয়াতেও ব্যাপকভাবে প্রচলিত আছে। বাইক-টা, বাউক-ম, বাকুয়া-কো, বাঁহুক-মু—বাঁকের বিবিধ আঞ্চলিক রূপ। অন্যান্য পর্যায় শব্দ:—বড়জালা, বাঙি-মে, বেই / বাঙ-শ্রী, ভারবাঁশ।....বাঁক—নদীর বাঁক। বক্রতা।

বাকুড় / বাকুড়ি-মু—এক চৌহদ্দিভুক্ত বৃহদায়তন ভূমি। বাসগৃহ (কবিক)। ....বাকড়—পেট, উদর (বাকড়ে আর কত ধরবে)।

বাগডোর—গোমহিষাদির মুখের লাগামের মত দড়ি, মুখোস ('শিবের সাক্ষাতে দিল বাগড়োর ধর্যা'-রারচ)।

বাগাল-রাঢ়—পশুপালন ও গোসেবার কাজে নিযুক্ত মুনিষ।....বাগালি—বেতন নিয়া গোসেবার কাজ, রাখালি।

বাঙ্-শ্রী, **বাঙি**-মে—বাঁক।....বাঙিদার—যে ব্যক্তি বাঁকে (বাঙি দ্বারা) মোট বহন করে। **বাঙ্গি**-ম—ফল বিঃ, ফুটি।

বাচড়া জমি—অনুর্বর জমি।....বাচড়া—ঘোড়ার বাচ্চা।

বাজরা-চ—হাটেবাজারে কৃষিপণ্য বহন করিবার বড় ঝুড়ি বিঃ।

বাজরা [স° বজ্রা]—শস্ত বিঃ। পাঁজরা, বুকের পার্শ্বদেশ।

বাজাল—জলসেচনী বিঃ।

বাঁটায় চাষ-চ. মে—এক বলদের মালিক যদি অপর এক বলদের মালিকের সহিত যুক্ত হইয়া পরস্পরের গোরুর সাহায্যে চাষআবাদ করে, তবে এইরূপ চাষকে 'বাঁটায় চাষ' বলা হয়। তৎপর্যায়ঃ—আংরাতিয়া হাল-রং, আঙুরে হাল-ক, আধহালা-পুব, গুপিনাহালা-ম। কোথাও কোন এক বলদের মালিকের চাষের জমি না থাকিলে, সে অপর এক বলদের চাষীকে তাহার বলদটি চাষের মরশুমে ধার দেয় এবং তদ্বাবদ উৎপন্ন ফসলের একটা ভাগ পায়। অনেক গরীব চাষীরই দুই বলদ কিনিবার সংস্থান থাকে না।

বাড়ি, ধানবাড়ি-পব. রাঢ়—পল্লীগ্রামে অভাবগ্রস্ত চাষী অনেক সময় সম্পন্ন জোতদারের নিকট হইতে এই সর্তে ধান কর্জ করে যে, পরবর্তী ফসলের মরশুমে সে এই ধান বৃদ্ধির সহিত (অর্থাৎ যে পরিমাণ ধান সে কর্জ লইতেছে তাহার চেয়ে বেশি) ফিরাইয়া দিবে। কত ধানে কত বৃদ্ধি দিতে হইবে, তাহা চাষী ও জোতদারের মধ্যে আলোচনায় স্থির হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছয়মাসে (সাধারণত আষাঢ়ে কর্জ নিয়া অগ্রহায়ণে শোধ করা হয়) এক মণ ধানে দেড় মণ ফিরাইয়া দিতে হয়। এইরূপ বৃদ্ধির সহিত পরিশোধ করিবার সর্তে ধান কর্জ দেওয়া বা নেওয়ার নাম 'ধান বাড়ি।' মূল ধানের উপর যে অতিরিক্ত ধান (সুদ ?) দিতে হয় তাহাই বাড়ি ধান ('বৃদ্ধি ধান্য দিয়া না লইবে বাড়ি'-কবিক)। কান্দি অঞ্চলে 'ধান ডেড়ি দেওয়া' কথাটিও শুনা যায়।

বাত—জো, উপযুক্ত সময় (বতোর দ্র)। রোগ বিঃ।

বাতাই-জ—বোনা, বীজ বপন।

বাতান,, বাথান—গোচারণ ভূমি। যেখানে বহুসংখ্যক গোমহিষাদি রাখা হয়। ('বাতানে মৈল নব লক্ষ গাই'—গাজীর পাঁচালী)।

বাদ-রাঢ়—ডাঙ্গাজমি।

বাদা [আ° বদিম্]—জলজ উদ্ভিদ ইঃ তে পূর্ণ জলাভূমি। জঙ্গুলে অঞ্চল।

বাদাড়—জঙ্গল, জঙ্গুলে স্থান (বনবাদাড়)।

বাঁধ-বাঁ. পু—দীঘি, বৃহৎ জলাশয়। বাঁধ থেকে সেচের কাজ চলে, অনেক সময় পানীয় জলও তোলা হয়। জল আটকাইবার মাটি ইঃর উঁচু বাঁধ বিঃ, embankment.

বারি-শ্রী—বার, পালা, turn. জল। মনসার ঘট।

বালা—বদলা কাজ দ্র। **বাঁশই, বাঁশো**-খু. ব—মই।

বাঁশগাড়ি—আইনবলে কোনও জমির দখল লইবার কালে সেই জমিতে বাঁশ (কঞ্চিসহ বাঁশের অগ্রভাগ) গাড়িয়া, ঢোল পিটাইয়া দখল প্রচার করিবার প্রথা বিঃ।

বাহান—ডালপালা, যাহা বাহিয়া লতানে গাছ উপর দিকে উঠে।

বিচরা-ম—শাকসবজি উৎপাদনের বসতবাড়ি সংলগ্ন খণ্ডভূমি (মরিচ বিচরা)।

বিচালি/ বিচিলি / বিচুলি—খড়, ধানের খড় (বিচালি ঘাটা)। নদীয়ায় ধানের খড় অর্থে 'বিচালি' শব্দেরই প্রয়োগ বেশি শুনা যায়; 'খড়' বলিতে সেখানে সাধারণত উলুখড়কে বুঝায়। [বিচালি শব্দের মূল অর্থ চালশূন্য অর্থাৎ শস্যহীন ধান্যনাল]

বিচ, বীচ—বীজের আঞ্চলিক উচ্চারণভেদ। ধানের ছোট চারা। বীচন।···বীচমারা—বীজতলা হইতে অন্যত্র বসাইবার জন্য চারা উৎপাটন।

বিচন, বীচন, বেচন—বিছুন/বেছন-পুব, বীজ, শস্যাদি উৎপাদনের জন্য সযত্নে রক্ষিত পুষ্ট পক্ক বীজ ('মা মোরে পাঠালে কিঞ্চিৎ বীচনের কারণ'-রারচ)। শস্যাদির চারা যাহা অন্যত্র বসাইবার জন্য উৎপাদন করা হয়।

বিচি, বীচি—বীজ (লঙ্কার—)। ফলের ছোট আঁঠি (কাঁঠালের—)। তৎপর্যায়ঃ—আঁঠি, গুটা, দানা, হালি।

বিড়া/বিড়ে—মাথায় বোঝা বহন করিবার বা তলাগোল কোনও পাত্র সোজা করিয়া বসাইবার খড় দড়ি কাপড় ইঃর চাকতি। তৎপর্যায়ঃ—বেঁড়ু/বেঁড়ো-রাঢ়, বোঁড়ো-মু। -মে—ধানের বড় আটি। -পুব—পানের গোছ (পানের বিড়া)।

˘বিদা, ˘বিধা, বিন্ধা, ব্যাধা—আঁচড়া দ্র।

বিয়ন/বেয়ন-চ—রোয়াধানের চারা (জাওয়ালি দ্র)।···বেয়ন ভাঙা—বীজতলা হইতে চারা উৎপাটন।···বাউচে রেখে বেয়ন ভাঙা—বীজতলা হইতে সমস্ত চারা উৎপাটন না করিয়া ৫-৬ ইঞ্চি অন্তর অন্তর এক একটি চারা রাখিয়া দেওয়া। ইহাতে বীজতলায় আর পৃথকভাবে রোয়া লাগাইবার আবশ্যক হয় না।

বিল—জলময় নিম্নভূমি (চলনবিল-রা)। সেচের সুবিধা থাকায় বিলের ধারে বোরো ধান ভাল জন্মে। বিল হইতে মাছও প্রচুর পাওয়া যায়।

বিল জাগানো-মে—দুর্গাপূজার মহাষ্টমীতে পিটালি গোলা জল শস্যক্ষেত্রে (বিশেষ করিয়া ধানের জমিতে) ছিটাইয়া দিবার উৎসব বিঃ।

বিলান জমি—যে জমিতে বারোমাস জল থাকে ; জলাভূমি।

বিশ—ধানের মাপ বিঃ (১ বিশে পাঁচ মণ)। পানের সংখ্যা বিঃ (ডুয়ার্স অঞ্চলে ৩৫২০টি এবং পাবনায় ৩২০০টি পানে ১ বিশ)। ২০ সংখ্যা।

বীজ—যাহা বপন বা রোপণের ফলে উদ্ভিদ জন্মে, বীচন। উদ্ভিদভেদে বীজ নানা প্রকার ঃ যেমন, ধানের বীজ ধান, শসার বীজ শসার বীচি, আমের বীজ আমের আঁঠি বা কলম, পটোলের বীজ পটোলের মূল, আখের বীজ —চোখশুদ্ধ আখের আগা বা টুকরা।....বীজধান—ধানের ফসল উৎপাদনের জন্য সযত্নে রক্ষিত সুপুষ্ট সুপক্ক ধান।

বীজতলা/বীচতলা—শস্যাদির চারা জন্মাইবার স্থান। এমন অনেক ফসল আছে যেগুলির বীজ সরাসরি নির্দিষ্ট জমিতে না ফেলিয়া প্রথমে অন্যত্র চারা জন্মাইয়া পরে তাহা উঠাইয়া যথাস্থানে বসানো হয়। যেমন, রোয়াধান, লঙ্কা, বেগুন, কপি, টমেটো, সুপারি ইঃ। বীজতলার বিভিন্ন আঞ্চলিক প্রতিশব্দ ঃ বীজখোলা-ন.য.ব.ফ, বীচআড়া-মু, বীচবাড়ি-উব, থানা-বী, (বেনতলা / তলাখেত-মে, তলাপেড়ে-দচ, চারাখলা-চট্ট, জালাপাট / বিচরা -ম, জালাবিচনা-নো, বিছনকাচা-বগু, হালিবিচরা-শ্রী)—যে স্থানে মাত্র ধানের চারা জন্মানো হয়। মেদিনীপুরে শুকনার বা ধুলোমাটির তলাকে 'কাঁকরিতলা' এবং কাদানো তলাকে 'পাঁচকাতলা' বলা হয়।

বেগার [ফা°]—যে বিনা বেতনে কাজ করে (বেগার ধরে আনা। তীর্থযাত্রার লোভে বড় লোকের বেগার হওয়া)।... বেগার খাটা—বিনা বেতনে কাজ করা।

বেন / ব্যান-মে—ধানের চারা।....বেনতলা—বীজতলা।

বেয়লে—দোপরে দ্র।

বেরুন-ব—ধানের কাটাই খরচা।

বেরুন-বাঁ—মজুরি।....বেরুনিয়া—মজুর।

বেলেন-দচ—দা, হেঁসো ইঃতে ধার তোলার (বালি দিয়া ঘষিয়া) কাঠের সরু পাটা বিঃ।

বেঁশেন—পালো দেওয়া দ্র।

বৈশালী আবাদ-জ. কো—বর্ষার ফসলের চাষ।

বোরানি—তৃতীয় চাষ। -ম—বোর দেওয়া, ডুব দেওয়া।

বোলেন-চ—বেণীর আকারে পাকানো খড়, খড়ের বেণী। ইহাতে দীর্ঘসময় আগুন ধরিয়া রাখা যায়। বিড়ি তামাক খাইতে ইহা দ্বারা গরীব চাষীদের দেশলাই খরচ কিছুটা বাঁচে, মশামাছিও তাড়ানো যায়। তৎপর্যায় ঃ—বেণী-

ম. মে, বেনা-ব, বেনিয়া / জাঁকা-হিজ, মোড়া-ন, ভুতি-জ. কো, সাঁজালি-হু. হা. বর্ধ. মু (উকা দ্র)।

ব্যাধা—ঘাস ইঃ উৎপাটনের আঁচড়া বিঃ। ব্যাধা দুইপ্রকার ঃ হাতব্যাধা ও থানব্যাধা। প্রথমটি হাতে টানে, দ্বিতীয়টি গোরুতে টানে।

ব্রহ্মোত্তর [<ব্রহ্মত্র]—ব্রাহ্মণকে উৎসর্গীকৃত ভূমি।

ভগা / ভগ্‌গা / ভোগা-ব—কাকতাড়ুয়া দ্র।

ভরাতী জমি—পয়ন্তী জমি।

ভাগরাখালি—কোন কোন অঞ্চলে প্রথম প্রসবের বৎস এবং দুগ্ধ পাইবার সর্তে দ্বিতীয় প্রসব পর্যন্ত একজনের বকনা কি ছাগী অপরজনে নিজ ব্যয়ে ও তত্ত্বাবধানে প্রতিপালন করিয়া দিবার প্রথা আছে। এঁড়ে বাছুর চরাইবার ক্ষেত্রে সর্তানুযায়ী নির্দিষ্ট মেয়াদ অন্তে উহার বিক্রয় মূল্যের একটা অংশ রাখাল ব্যক্তি পাইয়া থাকে। এইরূপ প্রথা 'ভাগরাখালি', 'চারানি', ইঃ নামে অভিহিত হয়।

ভাটিদেওয়া-চ—বেগুন লঙ্কা আখ ইঃর গোড়ায় সার দিয়া উঁচু করিয়া মাটি দেওয়া। ধোবাদের কাপড় সিদ্ধ করা (বিবিধ শব্দ দ্র)।

ভাতুয়া—একশ্রেণীর খেতমজুর। **ভাদোই ধান**-উব—আউশ ধান।

ভারবাঁশ—উভয় প্রান্তে ভার ঝুলাইয়া কাঁধে বহন করিবার বংশদণ্ড বিঃ।

ভি-বগু—জমি, ভূমি ('ভি লষ্ট করে চ্যারার মাটি। বাড়ি লষ্ট করে পরার বিটি'-প্র)।....চ্যারা—কেঁচো।

ভিটাজমি—উঁচুজমি, যাহাতে হয়ত এককালে লোকের বাড়িঘর ছিল, আইট-য। **ভুতা**-জ. কো—খাই খরচ, খোরাকি।

ভুতিয়া / ভুইত্যা-ম—খড়ের মূর্তি। বড়রকমের কিছু (ভুইত্যা কলা)।

ভুর-ম—জাঁক-পব, কলার ভুরার (ভেলার) আকারে সজ্জিত পাটগাছের আটিসমূহ। এইগুলি মাটি, গাছের গুঁড়ি, জলজ উদ্ভিদ ইঃর চাপান দিয়া জলে ডুবাইয়া পচানো হয়। স্রোতের জলে এবং জলজ ঘাসের চাপানে পাটের আঁশ ও রং ভাল হয়। বদ্ধ ময়লা জলে পাট নিম্নমানের হয়। ....ভুর দেওয়া, জাঁক দেওয়া, জাঁত দেওয়া, চাক দেওয়া—উল্লিখিতরূপে পাটগাছ পচানো।

মই [স° মদিকা]—কর্ষিত ভূমির ডেলা ভাঙ্গিবার এবং জমি চৌরস করিবার বাঁশের যন্ত্র (harrow) এবং উঁচুতে উঠিবার সিঁড়ি (ladder)

—এই উভয় অর্থেই মই শব্দ ব্যবহৃত হয়। তবে সিঁড়ি মই এবং কৃষিকার্যে ব্যবহৃত মইয়ের গড়ন ঠিক এক নয়। পর্যায়শব্দ :—মইয়া, চকম-ত্রি, চগো-পা, চঙ্গ-ম. ব. দি. মা. জ, চৌকাম-শ্রী, ত্বগাটিয়া / তুপাইট্যা, বাঁশই / বাঁশো-ব. খু। এখানে উল্লেখযোগ্য যে বাংলাদেশের কোন কোন অঞ্চলে কৃষিকার্যে ব্যবহৃত মইয়ের দুইটির পরিবর্তে তিনটি পাটি বা বাঁশ থাকে ; কোয়া দিয়া আটকাইবার সময় ধারের বাঁশ দুইটি ধনুর মত কিঞ্চিৎ বাঁকাইয়া দেওয়া হয়, মাঝখানেরটি থাকে সোজা।....মইতাড়া-মে, মইয়ের পাটি / পাটি-পব—কোয়া বা খিল দ্বারা আটকানো মইয়ের দুইপাশের বাঁশ।····কোয়া [ও° কঁয়া], খাওয়া-জ. কো—মইয়ের বাঁশ আটকাইবার খিল বা গোঁজ।

মলন—মর্দন। গোরু দ্বারা মাড়াইয়া ধান্যাদি পৃথক করার কাজ (মাড়াই দ্র)।

মাইন্দার / মান্দ্যা (মাহিনদার)-রাঢ়. মু—বাঁধা বেতনে সারা বৎসরের জন্য নিযুক্ত মুনিষ।....মান্দারি—বাঁধা বেতনে গো-সেবার চাকুরি, রাখালি।

মাঙনহালা-ব—প্রতিবেশী চাষীদের ভোজ দিয়া তাহাদের দ্বারা জমি চাষ করাইয়া লওয়া (খেসকামলা দ্র)।

মাটি—বাংলার মাটি নানা শ্রেণীর :—(১) আঁটালো, এঁটেল, চিকনা, মাটিয়াল / মাইট্যাল / মেটেল—শক্তমাটি, এই মাটিতে বালি এবং পলির পরিমাণ খুব কম, কাদার পরিমাণ বেশি। (২) কাঁকরিয়া / কাঁকর‍্যা / কাঁকুরে—কাঁকর যুক্ত মাটি। (৩) কাদামাটি, পাঁকমাটি—নরম মাটি ; জলের সংস্পর্শে যে মাটি সহজেই গলিয়া যায়। (৪) খড়ি মাটি—সাদা রঙের মাটি। (৫) দোআঁশ, দোআঁশলা—ইহাতে বালি এবং কাদার পরিমাণ প্রায় সমান। (৬) নোনামাটি —যে মাটিতে লবণের ভাগ বেশি। (৭) পলিমাটি—বন্যা ও নদীর স্রোত বাহিত মাটি, alluvium, এই মাটিতে কোন কোন ফসল খুব ভাল জন্মে। (৮) পাউশ মাটি—জল পড়িলে এই মাটি অল্পক্ষণেই চুনের মত গলিয়া ফুলিয়া উঠে। (৯) বাউন্তমাটি—কালো রঙের মাটি। (১০) বিন্দেমাটি —রাঙামাটি ; না-লাল না-সাদা এইরূপ মাটি। (১১) বেলে মাটি, বেলিয়া-বাঁ, বালুয়া / বাল্যুয়া-পূব—এই মাটিতে বালির পরিমাণ খুব বেশি। (১২) ভুতুড়া / ভুতুড়ে—ভিজা মাটি। (১৩) রাঙামাটি—ঈষৎ লাল (গেরুয়া) রঙের মাটি। (১৪) রেতিমাটি—ধুলামাটি ; সাধারণত নদী মজিয়া এইরূপ মাটির সৃষ্টি হয়। (১৫) হিটেল মাটি—চাষের সময় যে মাটি হইতে বড় বড় ডেলা উঠে এবং সহজে গুঁড়া হইতে চায় না।

মাড়া—মাড়াই। ধান মাড়াই দ্র।

মাড়া [√মাড়্]—পেষণ করা (খলে মকরধ্বজ মাড়া)।....মাড়ানো—পদার্পণ করা (তিন সত্যি করলাম, এবাড়ি আর কখনো মাড়াব না)। পা দিয়া দলন করা।

মাথলা / মাথাল / মাথালি / মাথাইল—পাতার তৈয়ারি ছাতা বিঃ।

মাদা-চ—ঝিঙা, কাঁকুড়, উচ্ছে, মিষ্টি কুমড়া ইঃ তরকারিফলের বীচি পুঁতিবার জামবাটির মত গর্ত বিঃ।

মান্দা-ম—মাছ আটকাইবার জন্য চাষীরা নাবাল জমির স্থানে স্থানে ছোটখাট খানাখাত কাটিয়া ডালপালা ফেলিয়া রাখে। এই সমস্ত খানাডোবারই এক নাম 'মান্দা।'

মালিক [আ°]—অধিকারী (জমির—)। প্রভু (দুনিয়ার—)।....মালিকানা—মালিকের প্রাপ্য লভ্যাংশ, royalty.....মালিকানা—অধিকারগত স্বত্ব, proprietary rights.

মিখুঁটি, মিই, মেই—গোরু দিয়া ধান মাড়াইয়ের পূর্বে কোথাও কোথাও (ম. খু. ফ. ব.) খলায় খামারে দুগ্ধাদি ঢালিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে একটি খুঁটি পোঁতা হয়; ইহাকে মিখুঁটি বলে। মিখুঁটিকে কেন্দ্র করিয়া ধানের আটিগুলি বৃত্তাকারে ছড়াইয়া দেওয়া হয় এবং ৫।৭টি গোরুকে এক সারিতে জুতিয়া ছড়ানো ধানের আটিসমূহের উপর দিয়া ক্রমাগত ঘুরানো হয়। কোথাও কোথাও (ম. ঢা. শ্রী. ত্রি.) মিই খুঁটি পোঁতা হয় না। সেসব অঞ্চলে যে গোরুটি কেন্দ্রে থাকে তাহারই পিছনের বাঁ পা প্রায় একই স্থানে থাকিয়া খুঁটির কাজ করে। এই গোরুটিকে 'মেইবলদ', 'মেইয়ার বলদ' বলিতে শুনা যায়।

মীরাস [আ°]—উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি (তার তালুক মীরাস কিছুই নাই)।

মুড়ি-ম—ধানের বড় আটি (এক মুড়ি ধান)। চাল ভাজিয়া প্রস্তুত হালকা ধরনের খাদ্য। মুড়া (মুড়িঘণ্ট)। কিনারা (মুড়ি সেলাই)।....লেপমুড়ি—লেপ দিয়া গা ঢাকা।

মেদেজমি-মু—উর্বরা জমি, লাল জমি-রাঢ়, লালী-ফ (আউয়াল দ্র)।

মোনাদ-মে—গোমহিষাদির নাকের দড়ি।

রবিশস্য—বসন্তকালে উৎপন্ন ফসল [আ° রবী-বসন্ত]।

রাখাল [রক্ষাপাল]—গোরক্ষক, যে গোমহিষাদি চরায়। তৎপর্যায়ঃ—রাখাউল-

শ্রী, রাখুয়াল / রাখুয়্যাল-পূব, আখুয়াল-রং. কো, আখৈলা-য়া, নোয়াখালিয়া-জ. কো, বাগাল-বাঁ. মে. বর্ধ।....রাখালি —গোসেবার চাকুরি।....গৈইটোর পয়সা -মু—অন্য লোকের গোরু চরাইয়া রাখালেরা মাসের শেষে যে টাকা পায়। বাংলার বহু অঞ্চলে এক একজন রাখাল একসঙ্গে বহু গৃহস্থের গোরু চরাইয়া মোটা মাসমাহিনা পাইয়া থাকে।

রায়ত [আ° রাইয়ত]—অধিকারভুক্ত জমি বা বাড়ির জন্য সরকারকে যে কর দেয়, tenant.

রাশ, রাশি—কোনও বস্তুর স্তূপ, গাদা (ধানের রাশ, ধান্যরাশি)।

রাশ—লাগাম, rein (রাশ টেনে রাখা)। বাংলায় 'রাশ' শব্দ অপর বহু শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া বিভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে: রাশধান—ভালমন্দ মিশ্রিত ধান। রাশদই—মাঝারি ধরনের দই। রাশদন—ঠিকমাপের ওজনপাত্র (দন-চ. উব—চাল ইঃ মাপিবার পাত্র বিঃ)। রাশনাম—জন্মরাশি অনুসারে নাম। রাশভারী—গম্ভীর প্রকৃতির লোক। রাশপাতলা—লঘুপ্রকৃতির লোক।

রেহেন [আ° রহন]—বন্ধক, ঋণের জন্য গচ্ছিত সম্পত্তি, mortgage (রেহেনী জমি)।

রোজ—দিন মজুরি। প্রতিদিন।

রোয়া [√রু <রুহ্]—রোপণ করা।

রোয়া, রোয়াধান—আমন ধান ; ইহার চারা কাদানো জমিতে লাগানো হয়।

রোহন-মে—জ্যৈষ্ঠ মাসের ১৩ তারিখ হইতে ৩১ তারিখ পর্যন্ত কাল (period)। ধান বপনের অনুষ্ঠান বিঃ।

র্যা-মু—লাঙ্গলপদ্ধতি, লাঙ্গলকৃত রেখা (সীরালি দ্র)।....র্যাধরা—চাষ করিবার সময় লাঙ্গলের রেখা সোজা করিয়া নেওয়া।....র্যাকানা—লাঙ্গলের রেখা আঁকাবাঁকা হইলে চাষীরা বলে, 'র্যাকানা হয়েছে'।

লখীডাক, ডাক দেওয়া-উব—আশ্বিন সংক্রান্তির সন্ধ্যায় উত্তরবঙ্গে রাজবংশীরা নিজ নিজ ধানবাড়িতে যায় এবং 'লখীডাক' বা 'ডাক দেওয়া' নামে একটি প্রথা পালন করে। তাহারা পাটকাঠির গোছা (উকা) জ্বালাইয়া ক্ষেতে ক্ষেতে ঘুরায় এবং ধানের অধিক ফলন কামনা করিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া বলে 'সোরহা! সোগারে ধান টোনামোনা, মোর ধান পাকা সোনা। সোরহা!' বিভিন্ন অঞ্চলের ছড়ার ভাষা বিভিন্ন হইলেও ভাবটি প্রায় এক: অপরের ধান তেমন ভাল না হইলেও, আমার ধান যেন ভাল হয়, প্রচুর জন্মে। (The Rajbansis of North Bengal দ্র)।

লঙ্গা-টা—জলাভূমি।

লাখেরাজ [আ° লাখরাজ]—নিষ্কর, করমুক্ত (—জমি) 'বিবিধশব্দ' দ্র।

লাগাড়ে, লাগাড়ে মুনিষ—নাগাড়ে, বাঁধা বেতনে বৎসরের মজুর।

লাঙ্গল [সাঁ° নাহেল, হি° হল / হর]—সুপ্রসিদ্ধ ভূমিকর্ষণ যন্ত্র, ই° plough. নাঙ্গল, নাঙল / নাঙোল, নাঁগোল, নাঁওল, লাঁওল—লাঙ্গলের বিভিন্ন আঞ্চলিক রূপ। তৎপর্যায়—হাল<হল।

লাঙ্গলের বিভিন্ন অংশ : (১) ধড় বা দেহ—স্থূলকোণী (obtuse angled) প্রধান যে কাষ্ঠখণ্ড দ্বারা লাঙ্গল তৈয়ার করা হয়, তাহার মধ্যস্থলের বাঁকা মোটা অংশ। এই অংশের নিম্নদিকে থাকে (২) লাঙ্গলের মুখ বা মুণ্ড, যাহার সহিত ফাল আঁটা থাকে এবং যাহা ভূমিতে প্রবিষ্ট হয়। স্থানভেদে ইহার মুড়া / মুড়ো-পব. রাঢ়, মুয়া / ডুগর-ম, কয়ার-কো. রং ইঃ নাম শুনা যায়। (৩) ধড় বা দেহের উপর দিকে থাকে লেজ বা হাতল যাহার মাথায় মুষ্টিতে চাপিয়া ধরিয়া চাষীরা লাঙ্গল চালায়। উপরদিককার এই অংশটিকে বলা হয় : মুঠা / মুঠি / মুঠো-পব, মুইঠ-বাঁ, মুঠিয়া-রং, বোঁটা, খুঁটি / লাঙ্গলের খুঁটি-ম, নিজেন-ন. য, লিজেন-মু. নেজনা-মে, কুণ্ডি-চট্ট। (৪) ধড়ের বাঁকা মধ্য অংশের এক নাম 'গাদা'-মু. খু। (৫) ফাল [হি° ফার, সাঁ° পাল]—লাঙ্গলের মুণ্ড বা মুড়াসংলগ্ন লৌহফলক, ploughshare. মুড়ার সহিত ফাল আঁট-কাইবার দুই মাথা সরু চেপটা ধরনের লোহাকে বলে, জোঁকা, পাশি-মে. মু। ....নথিমপুর জেলায় কোন কোন লাঙ্গলে বাঁশের ফালও ব্যবহৃত হয় (লিখিয়াছেন, নির্মলকুমার বসু—ভারতের গ্রামজীবন, সা. প. প. ৬৮শ বর্ষ দ্র)। (৬) ঈষ—লাঙ্গলদণ্ড, আড়া- খু। ঈষের নীচের দিকের খাঁজকে (যাহা ধড়ের মধ্যে প্রবিষ্ট থাকে) বলে, পান-মু এবং উপরদিকের খাঁজকে বলে ঠনা-ম।

লাঙ্গলের গড়নপিটন সর্বত্র একরূপ নহে। পশ্চিমবঙ্গের গাঙ্গেয় অঞ্চলে অধিক প্রচলিত লাঙ্গলের ধড় ও মুড়া অখণ্ড ; অর্থাৎ একটি অখণ্ড কাঠে এই দুইটি অংশ এবং অপর একটি পৃথক কাঠে মুঠা বা নিজেন তৈয়ার করা হয়। মুঠাটি ধড়ের উপরিভাগে সামনের দিকে খাঁজ কাটিয়া আটকাইয়া দেওয়া হয়। পক্ষান্তরে বাংলা-দেশের বহু জেলায়ই (১) ধড় মুড়া ও মুঠা একটি অখণ্ড কাঠে তৈয়ারি,—এইরূপ এক কাঠের লাঙ্গল এবং (২) মুঠা ও ধড় একটি অখণ্ড কাঠের, আর মুড়া পৃথক কাঠের,—এইরূপ দুই কাঠের লাঙ্গল দেখা যায়। প্রথমোক্ত লাঙ্গল সাধারণত শক্ত মাটির এবং শেষোক্ত লাঙ্গল নরম মাটির বা জোল জমির চাষে অধিক ব্যবহৃত হয়।

লাঙল করা, লাঙল দেওয়া—লাঙল দিয়া জমি চাষ করা।

লাঙলহালা-মু—বর্গাচাষের প্রথা বিঃ। এই প্রথা অনুযায়ী জমির মালিক লাঙল গোরু সরবরাহ করে এবং সমস্ত খড় সে পায়, ভাগচাষী শুধু ফসলের অংশ (সাধারণত এক তৃতীয়াংশ) নেয়।

লাছ-ম. শ্রী—খড়ের গাদা। **লাছ / লাশ**—মৃত দেহ।

লাল / লালজমি-রাঢ়, **লালী / নালী**-ক—চাষের উর্বরা জমি ('সরকার হইলা কাল, খিল জমি লেখে লাল'—কবিক)।

লুটি-মে—গোরু মাড়ানো খড়ের আটি।

লুড়াউল—ধান কাটার পর যে ব্যক্তি অপরের ক্ষেত হইতে পরিত্যক্ত ধান, ধানের শীষ কুড়াইয়া আনে, gleaner. ....লুড়া—কুড়ানো ধান, ধানের শীষ ইঃ।

লোদা জমি—পাঁকমাটির জমি।....লোদ—পুরাতন পুকুর ডোবা ইঃর পাঁক।

শলি—জোয়ালের দুই মাথার কাঠি। সরু কাঠি।

শালিজমি—আমনধানের জমি, শোলজমি-রাঢ়। ময়মনসিংহে শালি জমি বা শাইল জমি বলিতে বুঝায় বোরো ধানের জমি।

শিউলী / সিউলী—যে খেজুর গাছের মাথা চাঁচিয়া রস বাহির করে। জাতি বিঃ।...শিউলি [<শেফালিকা]—ফুল বিঃ।

শিরালি / হিরালি [<শিলারি (বর্ণবিপর্যয়ে)]-ম. শ্রী. ত্রি—মন্ত্রশক্তি দ্বারা শিলা (hail-stone), বজ্র ইঃর আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে পারে, এইরূপ মন্ত্রসিদ্ধ ব্যক্তি। চৈত্র বৈশাখ মাসে বোরোধান পাকিয়া উঠিবার মুখে শিলাবৃষ্টিতে উহার প্রভূত ক্ষতি করে। এজন্য মন্ত্রশক্তিতে বিশ্বাসী বোরো জমির অনেক মালিক ফসলরক্ষার্থে যৌথভাবে স্বল্পকালের জন্য শিরালি নিযুক্ত করে।

শুকো মজুরি-রাঢ়—সকাল থেকে বেলা ডোবা পর্যন্ত কাজ।

শেয়ালি, শোল—জোয়ালের কাঠি (জোয়াল দ্র)।

শোলজমি—উর্বরা জমি, আমন ধানের জমি।

সাজার / হাজার-ম—বহুজনের মিলিত কর্মপ্রচেষ্টা (গাঁতা দ্র), সাজ (কবিক)।

সাপটা / সাবড়া—ফাউড়ি। বাছবিচার শূন্য (সাপটা কেনা, সাপটা খাওয়া)।

সামাল—দ্বিতীয়বার চাষ (চাষ দ্র)। যোগাড়যন্ত্র ('হালের সামাল কিসে হবে সুন্দরি'-রারচ)।....সামাল দেওয়া—সংযত করা।....সামলানো—সংযত করা; সাবধান করা। লুকাইয়া রাখা, সাবধানে রাখা।....সামাল সামাল—সাবধানতাসূচক উক্তি।

সামুরে চাষ / ছামুরে চাষ—যৌথভাবে চাষের প্রথা বিঃ। বৃহৎ ভূমিখণ্ড এক হালে চাষ করা কঠিন। এজন্য কয়েকজন চাষী মিলিয়া পর্যায়ক্রমে এক একজনকে দলবদ্ধভাবে নিজেদের হাল গোরু দিয়া সাহায্য করে। ইহাই সামুরে চাষ।

সার—জমির উর্বরতাবর্ধক জিনিস, manure. ক্রমাগত ফসল উৎপাদনের ফলে জমির স্বাভাবিক উর্বরতাশক্তি বিনষ্ট হয়। সার সেই শক্তি যোগায় এবং বাড়ায়। সার প্রধানত দুই প্রকার: জৈব ও রাসায়নিক। বর্তমানে সরকারী সাহায্য ও চেষ্টা উদ্যোগের ফলে চাষীরা রাসায়নিক সারই অধিক ব্যবহার করে। গোবর, খিঁচ, পচলা, আবর্জনা, চিটা, কুটা, পাঁক, পাঁশ প্রভৃতির ব্যবহার ক্রমে কমিয়া যাইতেছে। কথিত হয়, লাউ গাছে মাছের জল, নারিকেলে নুন, মানে ছাই, বাঁশে চিটা, কলায় মাটি, আখে খোল, লেবুতে পাঁক, সুপারির গোড়ায় মান্দার পাতা সুফল প্রদান করে। গোবর প্রায় সকল শস্যেরই একটি উৎকৃষ্ট সার (খনার বচন দ্র)।

সিকস্তা জমি—যে জমি নদীতে ভাঙ্গিয়া নিয়াছে।....সিকস্তা [ফা°]—ভগ্ন, broken, damaged.

সীরালি, সীরানি [সং° সীতা, হি° হরাঈ]—লাঙ্গলপদ্ধতি, লাঙ্গলকৃত রেখা ('সীরানিতে সুন্দর সাগর হবে ক্ষেতে'—রারচ)। তৎপর্যায়ঃ—সীরেল-চ. ন. ম. খু, সীললে-ন, র‍্যা-মু, রেখ / রেগ-ম. ত্রি, পালট-শ্রী, নাটা-ব, গোহি / গহি-জ. কো।

সুলটি—জোয়ালের কাঠি।

সেঁওচ, সেওৎ, সেওনি—জলসেচনী (তুনি দ্র)।

সেচ—শস্যক্ষেত্রাদিতে জল সেচন। সময় মত সুবৃষ্টির অভাবে শস্যাদির যাহাতে ক্ষতি না হয় এবং উঁচু ডাঙ্গা জমিতেও যাহাতে ভাল ফসল উৎপাদন করা যায়, সেজন্য সেচের প্রয়োজন হয়। বর্তমানে এ বিষয়ে চাষীরা নানাভাবে সরকারী সাহায্য পাইয়া থাকে।....সেচা [সেচ্ < সিচ্]—সেচন করা। জলাশয়াদি হইতে জল তুলিয়া ফেলা।

সোনাবাদা-বাঁ—রবিশস্যের ডাঙ্গা জমি [ফা° সুনা]।

সোমরাইল, সোঁয়াজ—জোয়ালের কাঠি।

সোয়েম [ফা° সুয়েম]—তৃতীয় শ্রেণীর জমি, যে জমিতে অধেক ফসল জন্মে।

স্যাওচাষ—অগভীর চাষ। তুঃ বাইচাষ—গভীর চাষ।

হাওর [< সায়র < সাগর]-ম. শ্রী—বৃহৎ জলাভূমি। কোন কোনটির

আয়তন বহুশত বিঘা। বর্ষাকালে ইহারা সাগরের রূপ ধারণ করে। অনেক হাওরেরই মধ্যভাগে বারমাস জল থাকে এবং উহাদের চারদিকের ঢালু জমিতে আমনের ও বোরোর চাষ হয়। ফাল্গুন চৈত্র মাসেই চষাজমিতে আমনের বীজ ছিটাইয়া দেওয়া হয়, বর্ষার জল বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ধানের চারাগুলি বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এই শ্রেণীর বোনা আমনের স্থানীয় নাম 'বাওয়া'। হাওরের অগভীর জলায় বোরো ধানও প্রচুর জন্মে। ঢালু ডাঙ্গায়ও আল বাঁধিয়া বোরোর চাষ হয়, জমিতে সেচ দেওয়া হয়। লোকসংখ্যা যখন এত বাড়ে নাই এবং জমির চাহিদাও কম ছিল, তখন কোন কোন হাওর নলখাগড়ার বনে আচ্ছন্ন থাকিত এবং সেগুলি দস্যুতস্করের থানা হইয়া উঠিত('জালিয়া হাওর নাম ব্যক্ত ত্রিভুবন। দিনেকের পথ জুড়ি নলখাগড়ার বন ।।'—মৈগী)।

হজা—পচাখড়।

হাজাশুকা—অতিবৃষ্টিতে এবং বৃষ্টির অভাবে শস্য নষ্ট হইলে চাষীরা বলে, 'হাজাশুকোর বছর'।....হাজা [√হাজ্]—জলে ভিজিয়া নষ্ট হওয়া। পাঁকুই। ....শুকা / শুকো—শুষ্কতা। বৃষ্টির অভাব ('দিনে জল রাত্রে তারা। এই দেখবে শুকোর ধারা—খব)।

হাতা—মুষ্টি পরিমাণ, হালা (এক হাতা খড়)।

হাল [স° হল]—লাঙ্গল (হালগোরু)।....হালচার-মে—আনুষ্ঠানিকভাবে প্রথম হলকর্ষণ।....হাল দেওয়া, হালবহা, হালবাওয়া—লাঙ্গল দ্বারা জমি চাষ করা।....হালধরা-জ—বর্গাপত্তন, বর্গাচাষে জমি দেওয়া। কিন্তু বাংলায় লাঙ্গল অর্থে হাল শব্দের ব্যবহার থাকিলেও প্রায় এই শব্দটি দ্বারা কৃষির সাজ সরঞ্জামের একটি পূর্ণ সংগ্রহ বা সেটকে (set) বুঝায়। যখন বলা হয়, 'মানিক মণ্ডলের পাঁচখানা হাল', তখন বুঝিতে হইবে, তাহার শুধু পাঁচখানা লাঙ্গলই নয়, পাঁচখানা জোয়াল, পাঁচখানা মই, পাঁচ জোড়া বলদ এবং পাঁচ জন ক্ষেতমজুরও আছে। শুধু তাহাই নহে, পাঁচখানা লাঙ্গল চালাইবার মত যথেষ্ট পরিমাণ (কমপক্ষে ৬০ বিঘা) চাষের জমিও আছে।...এক লাঙ্গলের চাষ—প্রায় ১৫ বিঘা জমিতে চাষআবাদ।

হাল-শ্রী—জমির পরিমাণ বিঃ (১২ কেয়ারে ১ হাল। কেয়ার প্রায় ১ বিঘার সমান)। নৌকার হাল rudder. গাড়ির চাকার লৌহবেষ্টনী। লোহা ইঃর পাত। অবস্থা (আমার হাল কে দেখে)। বর্তমান কাল (হালের খাজনা)

হালট [< হালবাট <হলবাট < হলবর্ত্ম]-ম. পা. বগু—চাষীদের হালগোরু

লইয়া মাঠে যাইবার পথ। বর্তমানে ইহার অর্থ দাঁড়াইয়াছে মেঠোপথ, গ্রাম্যপথ। (গোবাট দ্র)।

হালা—মুষ্টি পরিমাণ ('চারি হালা খড় ছাইল চারি পাট'—কবিক)। তৎপর্যায় :—হাতা, গোছা, গোছলা।....হালা-ফ. ব—ধান্যাঙ্কুরের ডালি বা সরা যাহা কার্তিক পূজায় প্রতিমার সামনে রাখা হয়।

হালি-ম—বীজ। যাহা চারা উৎপাদনের জন্য রাখা হয় (হালিধান)। -শ্রী—ধানের চারা। টিকটিকি। ফলাদির চারটি (এক হালি কলা=৪টি কলা)। [আ°]-ন. মু—নূতন (ওরা এ গাঁয়ে হালি এসেছে। হালিশহর।)।

হালিয়া, হাইল্যা, হাইলা, হালী [স° হালিক]—হালের মালিক, চাষী। হাইল্যা-বা—ময়রা।

হালুচা-শ্রী, **হালুয়া**-ম. ঢা—চাষী ('হাল বাও হালুয়া ভাইরে হাতে সোনার নড়ি')।....হালুয়া—সুজি চিনি ও ঘিয়ের তৈয়ারি খাবার বিঃ, মোহনভোগ।

হাল্যা, হেলুয়া, হেলো—চাষী।

হেলে, হেল্যা—হালের বলদ ('কোথা হাল্যা কোথা হেল্যা কোথা বা লাঙ্গল' রারচ)। [এখানে উল্লেখযোগ্য যে, হাল্যা, হেলো এবং হেলে, হেল্যা—এই কথাগুলি যথাযথ প্রয়োগ করিতে না পারিলে 'বক্তাকে' অনেক সময় চাষীর নিকট অপমানিত হইতে হয়]।

হেঁটোল মুনিষ-বী—যে চাষীর নিজের লাঙ্গল নাই, সে কোনও লাঙ্গল--গোরুর মালিককে দুইদিন চাষ করিয়া দিয়া নিজের চাষের জন্য ঐ লাঙ্গল-গোরু একদিন পায়। এইরূপ চাষীকে 'হেঁটোল মুনিষ' বলা হয়।

চতুর্থ অধ্যায়

অগথ—বকফুল ('অগথ কপিথ সুন্দরী'-শ্রীকৃ)। অগস্ত্য ঋষি।

অড়র, অড়হর [স° আঢ়কী, হি° রহড়]—ডালশস্য বিঃ। তৎপর্যায়ঃ—অড়ল-দচ. খু. পা, অড়াল-বগু, অহর / আড়ই-জ. কো. রং, আইরি-ন. বর্ধ, আররি-য, আটুল / আটোর-রা. বগু, আড়ল-ম. ঢা (মুস), রহড়-মু. মে।

আইরি [স° আঢ়কী]—অড়হর ('ঐ যে গাঁটি যাচ্ছে দেখা আইরি খেতের আড়ে'-বাগচী)।

আঁওলা / আওলা-মে. বাঁ. বী, **এওলা**-শ্রী—আমলকী।

আওলাত [আ° আলাদ্]—বৃক্ষাদি স্থাবর সম্পত্তি।

আকলা, আকালি-উব—লঙ্কা (আকালি ভিটা)।

আখ, আক [স° ইক্ষু, হি° ঈখ / উখ, ও° আখু)—নালযুক্ত তৃণ বিঃ, যাহার রস হইতে গুড় চিনি ইঃ তৈয়ার করা হয়। তৎপর্যায় ঃ—আউখ-ঢা. ফ. ব, উখ-ম. ত্রি. শ্রী, কুশর, কুশ্যার-চট্ট, কুশিযার / কুশাইর / কুশাইল-জ. কো. রং. ঢা. ফ. খু. ত্রি, কুশোর-মু. পা. রা। আখের জাত অনেক : কাজলা, কুইয়ারি, কেজা, গেণ্ডারি, ধলসিন্দুর, বোম্বাই, ভারং, মাদ্রাজী, লম্বরি, লালী ইঃ।…খুয়া-বাঁ—আখের ছিবড়া।…পণ্ডাসুর—আখবাড়ির অধিদেবতা।

আঞ্জির / আঁজির [স° অঞ্জীর]-রাঢ. দচ—পেয়ারা।

আটশর—গুচ্ছতৃণ বিঃ।

আতা [স° আতৃপ্য, পো° ata]—সুপ্রসিদ্ধ ফল। তৎপর্যায় ঃ—নাওয়া / নেওয়া / লেওয়া-উব, নোনা-ম. শ্রী, শরিফা / শোরফা-ত্রি, সীতাফল-উব। এখানে উল্লেখযোগ্য যে কলিকাতা অঞ্চলে যে ফলটিকে 'আতা' বলা হয়, পূর্ববঙ্গ ও শ্রীহট্টের বহু অঞ্চলে তাহা 'নোনা' নামে পরিচিত। ইহার বহিরাবরণ গুটি গুটি ধরনের। আবার সেই সকল অঞ্চলে যাহাকে আতা বলে, কলিকাতা অঞ্চলে তাহাকে নোনা (পো° anona) বলা হয়। ইহার বহিরাবরণ গুটিশূন্য।

আদা [বৈ° আদার, স° আর্দ্রক, হি° আদরখ]—বহু গেঁড়যুক্ত কন্দ বিঃ। …আদায় কাঁচকলায়—পরস্পর শত্রুভাবাপন্ন (মামা ভাগনে হলে কি হবে,

তাদের আদায় কাঁচকলায় সম্বন্ধ)। আদা রেচক এবং কাঁচকলা রোধক গুণবিশিষ্ট ; তাই পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা বুঝাইতে এইরূপ বাগধারার সৃষ্টি হইয়াছে।....আদাজল খেয়ে লাগা—কষ্ট হইলেও কোনও কার্যসিদ্ধির জন্য বিশেষ চেষ্টা করা। ···আদার ব্যাপারী—আদাব্যবসায়ী। যে কোনও বড় ব্যাপারে মাথা ঘামায় না (আদার ব্যাপারীর আবার জাহাজের খবর)।

আনাজ, আনাইজ-পূব [সং অন্নাদ্য, হিং অনাজ]—খাদ্যরূপে ব্যবহার্য কাঁচা শাকসবজি, vegetables (কপি, মুলা, বেগুন, নটে)।....আনাজিকলা—কাঁচকলা।

আনারস [পোং ananas]—অম্লমধুর ফল বিঃ। তৎপর্যায় :—বিতুং-শ্রী, মিতুজ-খু।

আবাত্তি-পূব—অপুষ্ট (—ফল)। তুঃ বাত্তি—পুষ্ট।

আম, আঁব [সং অম্র / আম্র, হিং আম]—সুপ্রসিদ্ধ ফল। আমের জাত এবং নাম অনেক : কিষণভোগ, ক্ষীরসাপাতি, গোপালভোগ, গোলাপখাস, ফজলি, বোম্বাই, লেংড়া, হিমসাগর ইঃ। স্বাদ, গন্ধ, বর্ণ, আকার ইঃ বিবেচনা করিয়া বাঙালী তাহার এই প্রিয় ফলটির বহুশত নাম রাখিয়াছে (ভূমিকা 'আম' দ্রষ্টব্য)।

আম সংক্রান্ত বিবিধ শব্দ :

বউল-পূব, বোল-ন. মু, মোল- রাঢ়—আমের মুকুল।

আমের কুসি /-গুটি-চ.ন. মু. বর্ধ. য. ফ, আমের চুনা-মে, আমের কড়া /-কড়ি -পূব. উব—সদ্যোজাত আম।

আমের ডগা /-ডুগা-ঢা. ম, আমসরৎ-ফ. ব, আম সরা-হিজ—আম্রপল্লব।

দরকাঁচা-ক, দরকচা-পূব—ভিতরে কোথাও নরম, কোথাও শক্ত—এইরূপ ফল।

ডাকরিয়া-ম, ডাঁটো-ন, ডাঁসা-পব, বত্রো-য, রাঁয়া-মে—পাকিবার পূর্বাবস্থায় উপনীত।

ডোমক-দচ—আধপাকা। আমলাগা—আম পাকা।

বর্ণচোরা—পাকিলেও যে আমের রং বদলায় না, কাঁচার মতই দেখায়।

কাঁচামিঠা /-মিঠে—অপক্ক অবস্থায় মিষ্টি, কিন্তু পক্কাবস্থায় পানসে।

আমের আঁঠি, আমের বড়া-ম. ঢা—আমের বড় বীজ ('জ্যৈষ্ঠ মাসে আমের বড়া দুইজনে লাগাইল'—মৈগী)।

পুঁয়ে-ব—অঙ্কুরিত আঁঠি।

আম হইতে প্রস্তুত নানারকম খাদ্যসামগ্রী :

আমচুর-ক, আমসি-ম, ফলসি-পূব. পা—কাঁচা আমের শুষ্ক ফালি।

আমসত্ত্ব, আমাত / আমাট-মু. বী—পাকা আমের শুষ্ক ঘনরস।

আমের আচার—তৈল মশলাদি সহযোগে রক্ষিত ডাঁটো আম।

কাসন্দি / কাসুন্দি [সং কাসমর্দ]—কাঁচা আম, হলুদ, সরিষা, তেল ইঃ যোগে প্রস্তুত আচার জাতীয় খাদ্য বিঃ। লোকমত এই যে, বংশের 'রীত' না থাকিলে কেহ এই জিনিস তৈয়ার করে না। রীত থাকিলে বিশেষ দিনে (প্রায় অক্ষয় তৃতীয়াতে) পবিত্র শরীরে আনুষ্ঠানিকভাবে এই কাজে হাত দেওয়া হয়। কাসুন্দিকে 'আম কাসুন্দি' বলিতেও শুনা যায়।

আমআদা—আদার মত বহু গেঁড়যুক্ত আম্রগন্ধী মূল বিঃ।

আমড়া [সং আম্রাতক]—আম্বড়া-শ্রীকৃ, টকফল বিঃ। প্রধানত দ্বিবিধঃ বিলাতী ও দেশী।....আমড়া কাঠের ঢেঁকি—অপদার্থ।....আমড়াগাছি—তোষামোদ।

আমরুল [সং অম্ললোনী]—অম্লশাক বিঃ ; ইহা আহারে রুচি জন্মায়।

আমলা-পব [বৈং অমলা]—আমলকী, স্বনামখ্যাত ফল বিঃ। তৎপর্যায় :—অমলই / আমলই-ত্রি, আঁলই / অলমই-চট্ট, আঁওলা / আওলা-বাং বী. মে, এওলা-শ্রী। **আমলা** [আং]—রাজকর্মচারী।

আমলি [সং আম্লিকা]—তেঁতুল।

আমসফরি, আমসবরি [আম (আমেরিকা)+সফরি]—আমেরিকা সফরকারী ফল বিঃ, পেয়ারা। অনেকের মতে পর্তুগীজরা এই ফলটি দক্ষিণ আমেরিকা হইতে এই দেশে প্রথম আমদানি করে। (পেয়ারা দ্র)।

আমসি [সং আম্রপেষী]—আমচুর, কাঁচা আমের শুষ্ক ফালি।

আমাত, আমাট / আমোট [সং আম্রাত]—আমসত্ত্ব (আম দ্র)।

আলু [সং আলুক, হিং আলূ]—১ **গোলআলু**, potato (তরকারি)। ইহার জাত অনেক :-কাটোয়া, ঠিকরি, দেশী, নৈনিতাল, বোম্বাই, মাদ্রাজী, রংপুরিয়া ইত্যাদি।....২ **রাঙাআলু**—লম্বা ধরনের মিষ্টি আলু যাহা সাধারণত কন্দফল হিসাবে কাঁচা কিংবা সিদ্ধ করিয়া অথবা পুড়াইয়া খাওয়া হয়। বাংলার গৃহিণীরা ইহা দ্বারা অতি উপাদেয় পিঠা (আলুর পুলি) তৈয়ার করেন। তৎপর্যায় :—মিষ্টিআলু, লালআলু, শকরকন্দ।....৩ **শাঁকআলু**—শঙ্খের ধরন সাদা রঙের আলু যাহা সাধারণত কাঁচা খাওয়া হয়। তৎপর্যায় :—

চুনআলু, গুড়মালু-মে / কেশুর-বগু ।....৪ **চুবড়ি আলু** [হি° রতালু]—চুপড়ির ধরন বৃহৎ কন্দ বিঃ (তরকারি)। তৎপর্যায় :—থামআলু, থাম আলু-মে. মু, মচাআলু, মাছআলু-ম. জ. কো, মেটেআলু-ব. খু, মাইট্যা আলু-পূব।

আলুই—কালমেঘের পাতা। -**বী**—মুঠা, হালা (এক আলুই খড়)।

আঁশফল-চ—লিচু জাতীয় ছোট ফল বিঃ। অনেকগুলি একসঙ্গে থোকা থোকা হয়। তৎপর্যায় :—পিস্‌ফল-ফ, মেওয়া-ম। চব্বিশপরগনার বেহালা অঞ্চলে ইহা প্রচুর জন্মে।

আসশেওড়া-পব [<আস্ত শাখোট]—ঝুনো গাছ বিঃ। ইহার ডাল সাধারণত দাঁতনরূপে এবং পাতা ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়। তৎপর্যায় :—আসটে-মু, আসটালি-পূব, আসকেল-চ, আইডালিয়া / আটকিরা-ঢা. ফ. ব, মঠখিলা-ম।

ইকড়-ম. ত্রি. শ্রী, **ইকড়া**-উব. উআসা [স° ইক্কট]—খাগড়া জাতীয় তৃণ বিঃ, বাতা / বাতাগাছ। মেদিনীপুরে ইহা 'খড়ি' বা 'খড়িগাছ' নামে পরিচিত। বরজ ফাঁদিতে পানচাষীদের বিশেষ প্রয়োজনে আসে এবং তাহারা ইহার রীতিমত চাষ করে। বাঙালীর অনেক আচার অনুষ্ঠানেও (গোরুর দেবতা গুরুথনাথের সেবায়, প্রথম ধানকাটা উৎসবে, চৈত্রসংক্রান্তিতে গোরুকে নাওয়াইবার কালে) ইহার ডাক পড়ে।

ইঁচড়, এঁচড়—অপুষ্ট কাঁচা কাঁঠাল যাহা সাধারণত তরকারিরূপে খাওয়া হয় (এঁচড়ের ডালনা)।....ইঁচড়ে পাকা—অকালপক্ক। জেঠা বা ডেঁপো ছেলেদের প্রতি প্রায়ই এই কথাটি প্রযুক্ত হয় (এমন ইঁচড়ে পাকা ছেলেদের আর ভবিষ্যৎ কি)। **উকল্যা**—চোরকাঁটা দ্র।

উচ্ছা / উচ্ছে-পব—তিক্ত তরকারিফল বিঃ। তৎপর্যায় :—উইস্তা-টা. ঢা. ফ. ব, উস্তে-পা. ব, উদাইয়া / উদুইয়া-শ্রী. ত্রি, তিতাগুটা-ম, পুটুল্যা কল্লা-মু, বনকরলা-নো।

উড়িধান [স° ওড়িকা / ওড়ী]—বিনা চাষে উৎপন্ন ধান বিঃ। তৎপর্যায় :—ঝরা ধান। কোন কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ইহার প্রয়োজন হয়।

উরি-ম. শ্রী, **উস্‌সি**-মুস—শিম ('নয়া বাড়ি লইয়ারে বাইন্ধা লাগাইল উরি'—মৈমনী)।

উলু, উলুখড়, উলুছন-পূব [স° উলুপ, উলুক]—শক্ত তৃণ বিঃ। ঘর ছাওয়ার

কাজে ইহা অধিক ব্যবহৃত হয়। তৎপর্যায় :—উলা /উল্যা-পা. রা, ছন -পুব, জোন-মে ('শীতলপাটি দিয়া বিনোদ ঘরের দিল বেড়া। উলুছনে ছাইল চাল দেখতে মনহরা ॥'—মৈগী)। নদীয়ার কোথাও কোথাও উলুখড়কে খড় এবং ধানের খড়কে বিচালি বলা হয়।....উলু / উলি-পুব—উইপোকা।....উলু —উলুধ্বনি। এড়াইজ [এড়গজ]-ম—চাকন্দ/ চাকুন্দে-চ।

ওকড়া—আগাছা বিঃ।—ইহার ফল কাঁটাযুক্ত।

ওড়ফুল, উড়ফুল [<ওড্র]—এক শ্রেণীর লাল জবা।

কচড়া—মেদিনীপুরে মহুয়ার ফলকে 'কচড়া' এবং ফুলকে 'মহুল' বলা হয়।

কচা-ন—এক জাতের ছোট গাছ ; ডাল পুঁতিলেই গাছ হয় ; সবজিবাগানের বেড়াতেই অধিক দেখা যায়। তৎপর্যায় :—এরণ্ড-ম, ভেরেণ্ডা-দচ, জাড়া-হিজ, জামাল গোঠা-মু। সজনে থাড়া।

কচু—মূল বা কন্দ জাতীয় আনাজ বিঃ,arum.কচুর জাত এবংনাম অনেক :— (১) আদাড়ে কচু-রাঢ়, আন্নাকচু-ম, গুঁড়ি কচু-য. ব, বুনো কচু-ক—ইহারা আদাড়ে পাঁদাড়ে বিনা যত্নে আপনিই জন্মে। ইহাদের গোড়া শক্ত বা মোটা হয় না ; ডাঁটা ও পাতা শাকরূপে খাওয়া হয়। (২) আনাজী কচু-হিজ, জলকচু, জাইত্ (জাতি) কচু-ম, পানিকচু-ফ. ব, মরমাকচু-ক—ইহাদের গোড়া মূলার ন্যায় মাটির উপরে ও নীচে কাণ্ডাকারে (trunk) বৃদ্ধি পায় এবং যত্ন করিলে ও সার দিলে ২৷৩ ফুটও লম্বা হয়। পূর্ববঙ্গে ইহা বর্ষার একটি প্রধান তরকারি। (৩) কচু জাতীয় আর একটি কন্দ আছে, যাহার ডাঁটায় কিংবা পাতায় আঘাত করিলে দুধের মত একপ্রকার জলীয় পদার্থ বাহির হয়। আদাড়ে কচুর ন্যায় ইহারও তেমন কাণ্ড হয় না, ডাঁটা এবং পাতাই অধিক খাওয়া হয়। কলিকাতার বাজারে ইহা চিনিমান বা চীনামান, বরিশালে দুধমান, ঢাকায় ধলকচু, ময়মনসিংহে দস্তর এবং খুলনায় দস্তাকচু নামে পরিচিত। (৪) গুটিকচু, গুঁড়িকচু, মুখিকচু, গাঁটিকচু—আদা হলুদের মত এই কচুর শুধু গেঁড় (tuber) হয় এবং সেগুলি তরকারিরূপে খাওয়া হয়। কোথাও কচু ওল ইঃর গেঁড় বা ফেঁকড়াকেও 'মুখি' বলা হয়। (৫) কচুগাছের গোড়া হইতে বহির্গত লতানিয়া শিকড়কে বলা হয়—ল'কচু-মে, লতি-ক, কচুর লতা-ম, কচুর ব'-চ, কচুর বৈ-ব. ফ ('সরিষা বাটা দিয়া রান্ধে পানিকচুর বৈ'-বিগুপ্ত), কচুর বেই-বগু. খু। (৬) মান,মানকচু [স° মানক, হি° মানকন্দ]—বড় জাতের কচু। ইহার গুঁড়ি বেশ মোটা ও লম্বা এবং পাতা খুব বড় হয়। বৃষ্টির দিনে

কখনো কেহ এই মানের পাতা মাথায় দিয়া চলাফেরা করে ('বৃষ্টি পড়ে টুপুর টাপুর বাইরে কেন ভিজ। ঘরের পাছে মানের পাতা কাইটা মাথায় ধর ॥' —পুগী)। পর্যায়শব্দ :—মানাকোচু-জ. কো, বড়কচু-টা. চা, ফান-শ্রী, ফেনকচু-ম। ছাই মানকচুর উৎকৃষ্ট সার। (৭) হাটে বাজারে আরও নানা নামের নানা জাতের কচু দেখা যায়। যেমন, পঞ্চমুখি, পেঁচা, গারো (হয়ত গারো পাহাড় হইতে প্রথম আমদানি করা হইয়াছিল)।

কঞ্চি, কইঞ্চা-পূব [স° কঞ্চিকা, ফা° কমৃচী]—বাঁশের শাখা। তৎপর্যায় :—আটকি, জিংলা / জিংগৈল-ম, টনি-ফ. ব। বাংলার বহু অঞ্চলে কাঁচাবাড়ির ঘরের বেড়ার কাজে কঞ্চির ব্যবহার দেখা যায় (ঘরবাড়ি 'ছিটেবেড়া' দ্র)। কঞ্চি দিয়া ঝোড়া, ঝুড়ি, চুপড়ি, টুকরি ইঃ তৈয়ার করা হয়। লাউ, শিম, পালা ঝিঙা, পালা শসা ইঃ লতানে গাছের মাচায়ও ইহার প্রয়োজন হয়। কোন কোন অঞ্চলে ছাঁদনাতলায় কঞ্চি পুঁতিয়া বিবাহ হইতেও দেখা যায় (আচার-অনুষ্ঠান দ্র)।

কড়া / কড়ি—সদ্যোজাত ফল (আমের—)। গৃহসামগ্রী দ্র।

কৎবেল, কয়েৎবেল [স° কপিত্থবিল্ব, হি° কৈথ, সাঁ° কচ্‌বেল, ই° wood-apple]—সাধারণ বেলের আকার বীচিপ্রধান টকফল বিঃ। ছেলেমেয়েদের অতিপ্রিয়।

কদর-উব—ধুঁধুল। [আ°]—আদর, যত্ন।

কদিমা—মিষ্টি কুমড়া। **কদু**-মুস—লাউ।

কনাল-চট্ট—বাতাবিলেবু।

কপি / কোপি [পো° couve]—তরকারি বিঃ। তিন রকম কপির সঙ্গে আমরা অধিক পরিচিত : ১ ফুলকপি [হি° ফুলগোভী, ই° cauliflower]—তরকারিরূপে ব্যবহৃত ফুল বিঃ ২ বাঁধাকপি [ই° cabbage]—শাক বিঃ। ৩ ওলকপি [ই° kohlrabi]—মূল বা কন্দ বিঃ।

কমলা, কমলালেবু-নেবু—সুন্দর সুমিষ্ট রসাল ফল বিঃ। দার্জিলিঙের লেবু সর্ব্বোৎকৃষ্ট। **কয়কল**-শ্রী—পেঁপে।

করমচা [স° করমর্দ, করঞ্জা, হি° করৌন্দা]—টকফল বিঃ। তৎপর্যায় :—করঞ্চা, করঞ্জা, করমৃজা, করজা। অরণ্যষষ্ঠী ব্রতে বিবিধ ফলমূলের সহিত কোন কোন অঞ্চলে করমচা দিবারও প্রথা আছে ; সেদিন ইহা খাইতে নাই।

করলা / করেলা [স° কারবেল্ল, হি° করেলা]—তিক্ত তরকারিফল বিঃ।

তৎপর্যায় :—কইর্‌লা-টা. ঢা, কইল্যা-পা, কল্লা-পূব, চৈন্না কল্লা-মু, কোল্লা-উব, কাল্লা-বাঁ. বী, কেল্লা-হিজ।

করালি-ফ—বাঁশের কোঁড়। -উব—চৈতালী আম।

কল—অঙ্কুর, নবোদগত উদ্ভিদ। **কলআঁটি-বর্ধ**—তালের ফোঁপর।

কলা—[স° কদলী, হি° কেলা, সাঁ° কয়রা]—কদলী, রম্ভা, সর্বজনপরিচিত ফল। কলো-জ. কো, ক্যালা-জ. কো. দচ—কলার আঞ্চলিক রূপভেদ।

কাঁচকলা [কাঁচা কলা]—কাঁচা অবস্থায় তরকারিরূপে ব্যবহৃত একশ্রেণীর কলা। অবশ্য এই কলা পাকাইয়াও খাওয়া যায়। তৎপর্যায় :—আনাজীকলা-পূব, রিষ্যাকলা-ম [রিষ্যা <ঋষিয়া ?], দখনিসাগর-মে, দখিনাকালো, শাকখোয়াকলো-জ. কো।

পাকা কলা একটি অতি উপাদেয় ফল। ইহাদের জাত এবং নাম অনেক : পাকা কলার কতকগুলি বীচিপ্রধান, কতকগুলি স্বল্পবীচিযুক্ত এবং কতকগুলি বীচিশূন্য। (১) কয়েকপ্রকার **বীচিপ্রধান কলার** আঞ্চলিক নাম :—আঠাকলা-বগু, আঠিয়া / আইঠ্যা / আইঠা-পূব. উব, ডেমরিকলা-চ, দয়া-খু, বাইশা / কেড়কেড়ি আইঠ্যা-ম, ভীমআইঠ্যা / ভুইত্যা-ম, রামকলা-শ্রী। (২) **স্বল্পবীচিযুক্ত কলা** :—কাঁটালিকলা-পব, জাইত্ (জাত) কলা-পূব, ডিঙ্গা-ম / ডিঙ্গামানিক-শ্রী, কালীভোগ-পব / গুমা-ম, গেড়া-শ্রী / গেড়াডুম্বুর-ম, জিন-খু / ডোগরে, মদনা-ঢা. পা. বগু, মানিক-জ. কো. রং, রম্বি-চ, লম্বি-শ্রী. খু, শাইল-শ্রী। (৩) **বীচিশূন্যকলা** :—অগ্নিচাঁপা-শ্রী, অগ্নিশ্বর, অগ্নিসাগর, অনুপম, অমৃত, কাবুলি, ঘিউ মর্তমান, চাটিম, চাঁপা / চিনিচাম্পা, ছগরচিনি-জ. কো. রং, জাজী / জাহাজী, দুধসাগর, মধুয়া-উব, মনুয়া-বগু, মনোহরা, মর্তমান, মালভোগ, সবরীকলা / সফরী, সিঙ্গাপুরী।

বীচিহীন কলার মধ্যে 'মর্তমান' সর্বোৎকৃষ্ট। পূর্ববঙ্গে ইহার অপর নাম 'সবরীকলা' বা 'সফরীকলা'। জনশ্রুতি এই যে, চাঁপাকলা বিশ্বামিত্রের সৃষ্টি; এজন্য শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানাদিতে ইহা ব্যবহৃত হয় না (ভূমিকা 'কলা' দ্র)।

কলাগাছের বিভিন্ন অংশ এবং তজ্জাত সামগ্রী

কাঁদি, কলারকাঁদি [স° স্কন্ধ]—একটি কলাগাছের কাঁধে অর্থাৎ মোচায় থোকা থোকা যতগুলি ফল জন্মে, একত্র সম্বদ্ধ তাহাদের সবগুলি কাঁদি বা কলার কাঁদি নামে অভিহিত হয়। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ইহার আরও কয়টি নাম

শুনা যায়। যেমন, কলার কান্দি, কলার কাঁইদ, কলার কাইন, কলার ছড়ি, কলার ছড়া।

ছড়া, কলার ছড়া—১০/১২টি কলার এক একটি গুচ্ছ। তৎপর্যায়:—কলার কানা-ব, কলার কান্দা-ম, কলার ফানা-ঢা. ফ. ব. ত্রি. ব, কলার ফেনা-মে, ঝুকি-জ. কো, পাশনি। এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় যে 'ছড়া' কোথাও কাঁদির অংশ মাত্র,—১০/১২টি কলার একটি গুচ্ছ। কোথাও বহুগুচ্ছ সমন্বিত সম্পূর্ণ কাঁদি।

মোচা—কলার মঞ্জরী। তৎপর্যায়:—ভোঁড়া-মে, থৌড়/থৌড়া-ম, পির-জ. কো. রং।....মোচাঘণ্ট—মোচা তরকারি হইতে প্রস্তুত বাঙালীর অতি প্রিয় খাদ্য।

থোড়—ফুলন্ত বা ফলন্ত কলাগাছের ভিতরের শক্ত অংশ (তরকারি)।
তৎপর্যায়:—আঠ্যা/মাজা-মে, আইঠা-চট্ট, ভাদাল-পা. রা. বগু, ভারালি/ভেরাইল-পূব।

খোল, খোলা, কলার পেটো—কলাগাছের আবরণ বা বাকলা ('কার শ্রাদ্ধ কেবা করে, খোলা কেটে বামুন মরে'-প্র)।

চাটখোলা-ম—কলাগাছের খোলা হইতে প্রস্তুত আয়তাকার ভোজনপাত্র বিঃ। মহোৎসবাদিতে (মচ্ছবে) পূর্ববঙ্গে ইহার বিশেষ ব্যবহার দেখা যায়।

ডোঙ্গা/ডোঙা—কলার খোলার ডোঙ্গাকৃতি পাত্র বিঃ। সাধারণত শ্রাদ্ধাদি কৃত্যে ইহার ব্যবহার বেশী দেখা যায়। খোলার এইরূপ পাত্রের অপর নাম 'থালি' ('লাছিয়া খোলের থালি আতপতণ্ডুল ঢালি'—বিগুপ্ত)।

বাস্না—কলাগাছের শুকনা বাগুড়ি বা শুকনা খোলা।

ছোটা—দড়িরূপে ব্যবহৃত বাস্না বা কলার খোলার প্রান্তভাগ, ফাত্রা-ঢা, ছেট্টুল-ম, ছোতা/ছুতা।

আংটপাতা/আঙোট পাতা-পব. রাঢ়—অখণ্ড তথা অক্ষতশীর্ষ কদলীপত্র।

আগপাতা—কলাপাতার অগ্রভাগ। ইহাতে অনেকক্ষেত্রে দেবতার উদ্দেশে ভোগনৈবেদ্যাদি দেওয়া হয়।

কলার মাজ, মাজপাতা—কলাগাছের নবোদ্গত দণ্ডাকার পাতা।
অনেক আচার-অনুষ্ঠানে (বিবাহে, কার্তিক পূজায়) ইহার প্রয়োজন হয়।

বাগলা, বাগড়া, বাগুড়া, বাগুড়ি—কলা, তাল, নারিকেল ইঃর সপত্র শাখা। তৎপর্যায়:—ডাগুয়া/ডাউগ্যা-ম, ডাইগ/ডেগ/ডেগো, বাইল, বালদো, বাল্লী, বেল্লে, বাগুরা/বাউগ্যা। ('কলার বাগুড়ি যেন কাঁপে কলেবর'—কবিক)।

তেউড়/তেড়—কলার চারা। তৎপর্যায়ঃ—ডেম, কলপুলি, পুয়া, পুল, বুগি/বোগ।
পানমুচি ভাঙা—মোচা বাহির হইবার অব্যবহিত পূর্বে কলার একটি ছোট পাতা উদ্‌গত হওয়া। প্রসবের পূর্বে স্রাব হওয়া (গর্ভিণী নারী সম্পর্কে)।
মান্দাস, ভুরা—কলার ভেলা ('বেহুলা ভাসিয়া যায় কলার মান্দাসে'—কেক্ষেমা)। তৎপর্যায়ঃ—ভুর, ভেরুয়া, মাঞ্জুষ। কয়েকটি কলাগাছ সারিবদ্ধভাবে একত্র বাঁধিয়া কিংবা গোঁজ দ্বারা আটকাইয়া মান্দাস তৈয়ার করা হয়। পল্লীগ্রামে অনেক সময় ইহা ছোট নৌকার কাজ দেয়। সহসা কোনও অঞ্চল বন্যা প্লাবিত হইলে বিপন্ন পল্লীবাসীদের তখন কলার ভেলাই আশ্রয় হইয়া দাঁড়ায়।

কলাই, কালাই-পুব [সং কলায়]—বিবিধ ডালশস্যের সাধারণ নাম। যেমন, মুগকলাই, বিরিকলাই, মাষকলাই, মসুরিকলাই। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, 'কলাই' বলিতে অঞ্চলভেদে বিশেষ বিশেষ ডালশস্যকেও বুঝায়। যেমন, বর্ধমানে মাষজাতীয় একপ্রকার ডালকে কলাইর ডাল বলা হয়। আবার মুর্শিদাবাদের জঙ্গীপুর অঞ্চলে 'কালাই' বলিতে মাষকেই বুঝায়। বরিশালে খেসারিশাককে 'কলই শাগ' এবং খেসারির ডালকে 'কলাইর ডাইল' বলিতে শুনা যায় ('সুক্তাপাতা দিয়া রান্ধে কলাইর ডাইল'—বিগুপ্ত। নিসিন্দাপাতা যোগে খেসারির সুক্তা পূর্ববঙ্গের অনেক সামাজিক ভোজেও পরিবেশিত হয়)। কলিকাতার বাজারে মটরশুঁটিকে কলাইশুঁটি, কড়াইশুঁটি বা শুধু শুঁটি বলা হয়। মেদিনীপুরে মাষকলাইয়ের নামান্তর মাষকড়াই,—কড়াইয়ের ডাল= মাষের ডাল।

....ডাল, দাল [সং দালি, হিং দালি, সাঁং ডাল]—দলিত বা ভুষি ছাড়ানো ডালশস্য। 'ডাইল' ডাল-এর উচ্চারণভেদ।....ভুষি, ভুসি [সং বুষ, বুস]—ডালশস্যাদির খোসা, চোকল।....শুঁটি, ছই/ছইলা—মটর খেসারি ইঃর বীজ-কোষ, pod.

কলি—পিয়াজকলি, পিয়াজের শীষ, কলিসহ উদ্‌গত পিয়াজের শক্ত ডাঁটা। কলিকা, কুড়ি (ফুলেরকলি)। বৈষ্ণবের তিলক বিঃ (রসকলি)। কলিচুন, শামুক পোড়া চুন (কলি ফেরানো)। গানের বা কবিতার পদ। কলিযুগ (এ কলির ধর্ম)। বিবাদ (কবিক)।

কসি [ওং]-মে—কচি (কসি আমড়া)। **কাঁইবীচি**—তেঁতুলের বীচি।

কাউয়াজাঙ্গি-ম, **কাউয়াঠেঙা**-চ [সং কাকজঙ্ঘা]—ভুট্টাগাছের মত গাছ; ইহার পাকা সাদা বীচিতে ছোট ছোট মেয়েরা মালা গাঁথে।

কাঁকরোল [সং কঙ্করোল, আ° কাক্রুলহু]—তরকারি ফল বিঃ; ইহার গায়ে নরম কাঁটা থাকে; কারকুল-পুব, খি কল্লা-বী।

কাঁকড়ি [সং কর্কটী, হিং ককড়ী]—শসা জাতীয় লম্বা ধরনের ফল বিঃ।

কাঁকুড় [ভা° কক্কিরই]—ফুটিজাতীয় ফল বিঃ; কাঁচা অবস্থায় তরকারিরূপেও ব্যবহৃত হয়।

কাঁচড়া—অম্লশাক বিঃ। **কাছোড়**—একজাতের ফুটি।

কাঁটাল, কাঁঠাল [সং কণ্টকাল, হিং কট্‌হল, সাঁ° কানঠাড়]—পনস, গায়ে কাঁটা কাঁটা সুবৃহৎ ফল, কাঠল / কাডল-পুব, কঠোয়াল-জ. কো, কাণ্ঠোয়াল-শ্রীক্, ই° jackfruit. ....কাঁঠালের মঞ্জরী বা সদ্যোজাত কাঁঠাল—মুচি-চ. ন. মে, মুছি-ত্রি. ফ. ব, মুজি-ম।....অপুষ্ট কাঁচা কাঁঠাল—ইঁচড়, এঁচড়।....খাজা কাঁঠাল—যে কাঠালের কোয়া শক্ত।....রসখাজা—কোয়া শক্তও নয়. নরমও নয়।....গালা, ঘোলা, লেটা-ম—যে কাঁঠালের কোয়া খুব নরম এবং রসাল। ....কোয়া—কোষ।....ভুতি, ভুতুড়ি [সং বুস্ত]—কাঁঠালের কোয়া ছাড়ানো খোসা জাতীয় অভক্ষ্য অংশ। তৎপর্যায় :—ভতুয়া / ভত্যুয়া-ম, ভথা / ভতা-ত্রি. ব, ভুচ্‌রা-ফ।....মুলী / মুইল্যা-ম—ফলের ভিতরের মুষলাকার শক্ত অংশ, যাহার চারদিকে কোয়া থাকে।....চাপিলা-ম. মইকোষ-শ্রী—বীচিশূন্য চেপটা ধরনের কোয়া।

কাঁটালি কলা—স্বল্পবীচিযুক্ত কলা বিঃ। অনেক আচার-অনুষ্ঠানে কাঁটালি কলার প্রয়োজন হয়। দেশগাঁয়ে একটা কথা আছে, 'সর্ব ঘটে কাঁটালিকলা।'

কাঁদি, কানা, কান্দা, কান্দি—কলা দ্র।

কামরাঙা [সং কর্মরঙ্গ]—শিরতোলা অম্লফল বিঃ। তৎপর্যায় :—কারভাঙা-মে, কারাঙ্গি / কারেঙ্গা-উব, কৌরা-চট্ট, শিরাল।

কাশ্যা, কেশ্যা <কাশ—দীর্ঘ ধারাল তৃণ বিঃ। শ্রাদ্ধাদিতে ইহার বিশেষ প্রয়োজন হয়। **কুই**-টা, **কুঁই**-বর্ধ—আমের আঁঠির শাঁস।

কুঁচ [সং কুঞ্চিকা]—গুঞ্জা। একটি কুঁচফলের ওজন এক রতির বা $\frac{1}{96}$ তোলার সমান ধরা হয়। কোথাও কোথাও ইহাকে 'রতিগুটা'ও বলা হয়।

কুটুরা-ম—ডুমুর (কুটুরাগাছ)।

কুঁড়ি-মে—তরকারি বিঃ। কোরক, মুকুল।

কুমড়া / কুমড়ো [সং কুষ্মাণ্ড, সাঁ° কোহণ্ড, হিং ভুটুয়া, ও° পানি কখারু (সং কর্কারু)]—চালকুমড়া। এই জাতের কচি কুমড়ার গায়ে শুঁয়া থাকে এবং

পাকা কুমড়া চুনের রং ধারণ করে। তৎপর্যায়ঃ—কুমড় / কুমড়া-পুব, কোঁড়া-চট্ট, বলিকুমড়া (কোন কোন দেবতার পূজায় এই কুমড়া বলি দেওয়া হয়), দেশী কুমড়া, জাত কুমড়া-খু, চুনিয়া কুমড়া / পানি কুমড়া-উব, ছাঁচি কুমড়া-বর্ধ. বী. মু, গিমি কুমড়া / সূর্যি কুমড়া (আকার অনেকটা গোল)। বিপ্রদাসের মনসাবিজয়ে পাকা সাদা কুমড়াকে 'পাঁড়ু কুমড়া' বলা হইয়াছে। পাকা 'চালকুমড়া' দিয়া ঔষধও তৈয়ার করা হয় (কুষ্মাণ্ড খণ্ড)।

কুমড়া / কুমড়ো—মিষ্টি কুমড়া ; ইহা মিষ্টি স্বাদযুক্ত। তৎপর্যায়ঃ—বিলাতি কুমড়া-বর্ধ, বিলাতি লাউ-ম. পা. বগু, বিলাতি-দি. মা, সফরি লাউ-শ্রী, মগলাউ (কালো রঙের), মিঠা লাউ-ম. ত্রি, বিটকুমড়া-জ. কো, কদিমা-বী. দি. মা, ডিংলা-বাঁ. বী. মু, বৈতাল / বৈতালু-মে. বর্ধ।....নদীয়া জেলায় বৎসরে তিনবার তিনরকম মিষ্টি কুমড়ার চাষ হয়। আষাঢ়ী কুমড়া (উৎপাদন সময় বৈশাখ-আষাঢ়), ঙ্গেড়ো কুমড়া (ভাদ্র-অগ্রহায়ণ), তেতো কুমড়া (কার্তিক-চৈত্র)।....ভুঁই কুমড়া—কন্দ বিঃ ; সাধারণত ইহা ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়।

কুল [স° কোল]—ছেলেপিলের অতি প্রিয় ফল (বরই দ্র)।....টোপাকুল—দেশী বড় কুল, পাকিলে ইহা খুব নরম হইয়া যায়।....নারকেলীকুল—নারিকেলের ধরন কুল, ইহা বাংলার বাহির হইতেই বেশী আমদানি হয়। অনেকে সরস্বতী পূজার পূর্বে কুল খায় না। এই পূজায় দুধ ভরতি দোয়াতের মুখে কুল দিতে দেখা যায়।

কুল [স°]—বংশ। জাতি। সমাজ। সমূহ।....কূল—নদ্যাদির তীর।

কুশর, কুশার, কুশইর, কুশিয়ার [বৈ° কুশর]—ইক্ষু, আখ।

কোঁড়, কোঁড়া—বাঁশ ইঃর অঙ্কুর বা নূতন চারা। তৎপর্যায়ঃ—করালি-ফ. ব, করুল-টা. পা. চা, কেরুল-ম, ('আষাঢ় মাস্যা বাঁশের কেরুল মাটি ফাট্যা উঠে'-মৈগী), গজড়-হিজ, গজল-চ।

কোষ্টা—পাট, jute.

ক্ষীরা, খিরা [স° ক্ষীরিকা, হি° খীরা]—শসা জাতীয় ফল বিঃ। ক্ষীরই, ক্ষীরাই, ক্ষীরেই, ক্ষীর‍্যা—ক্ষীরার বিভিন্ন আঞ্চলিক রূপ। কোথাও কোথাও শসাকেও ক্ষীরা বলা হয়। কিন্তু শসা ও ক্ষীরা ঠিক এক জিনিস নয়। ক্ষীরা কমলালেবুর মত অনেকটা গোল, শসা লম্বাটে। ক্ষীরাকে ভুঁইশসাও বলে। ইহার গাছ মাত্র মাটির উপরেই বাহিয়া যায় ; শসা মাটি ছাড়াও ডালপালা বাহিয়া উপর দিকে উঠে (পালা শসা)।

খড়ি, খড়িগাছ—ইকড় দ্র।

খনা / খনি-ত্রি. নো. চট্ট, **খানা**-য. খু—ডাবের কোমল শাঁস। তৎপর্যায় :—নেওয়া, লেওয়া।....খনা / খোনা—যে নাকি সুরে কথা বলে।

খসলা-মে,—নটে শাক বিঃ।

খাগ, খাগড়া [সং খড়্গ]—নল জাতীয় তৃণ বিঃ, শর, reed. একসময়ে পুঁথিপত্র খাগের কলমেই অধিক লেখা হইত। সরস্বতী পূজায় এখনও খাগের কলম দেওয়ার প্রথা আছে।

খাড়া—ডাঁটা, ডাঁটার মত সোজা লম্বা ধরনের তরকারি ফল (সজ্‌নে খাড়া)। দণ্ডায়মান (খাড়া হওয়া)। সোজা (খাড়া করা)। জরুরি (খাড়া হুকুম)। পুরা (খাড়া তিন ঘণ্টা)।

খিরা—ক্ষীরার অপভ্রংশ।

খুড়িয়া—কাঁটা নটে

খুদরা-শ্রী—এক জাতের শাক।

খেজুর, খাজুর-[সং খর্জুর, হিং খজুর]—স্বনামখ্যাত বৃক্ষ বা তাহার ফল। ....খেজুর মাথি—খেজুর গাছের মাথার কোমল শাঁস।....খেজুরে রস—খেজুর গাছের মাথা চাঁচিয়া যে রস বাহির করা হয়।....খেজুরে গুড়—খেজুরের রস হইতে প্রস্তুত গুড় : (ক) পাটালি—জ্বাল দেওয়া ঘনীকৃত রস সরায় কিংবা সরার আকার মাটির গর্তে অথবা পাটিতে ঢালিয়া ইহা তৈয়ার করা হয়। (খ) মুচিগুড় —ঘনীকৃত রস বিশেষ ধরনের মুচিতে বা মুচির আকার মাটির গর্তে ঢালিয়া প্রস্তুত গুড়। (গ) নলেন গুড়—নূতন খেজুরে গুড়।....শিউলী/সিউলী—যাহারা খেজুর গাছের কাঁধ চাঁচিয়া রস বাহির করে।....লাখড়া [হিং লখড়ি (শাখা)]—খেজুর গাছের কণ্টকযুক্ত শাখা।

খেঁড়ো-বর্ধ. বী. মু—তরমুজ জাতীয় ফল। কাঁচা অবস্থায় তরকারিরূপেই অধিক খাওয়া হয়।

খেসারি—ডালশস্য বিঃ, ফ্যাসারি-পা। বর্তমানে খেসারি 'খঞ্জকারী' বলিয়া একটা কথা উঠিয়াছে। কিন্তু বাংলাদেশের একটি উপরি ফসল খেসারি। আশ্বিন কার্তিকে সদ্য শুকাইয়া যাওয়া রোয়াধানের জমিতে ইহার বীজ ছিটাইয়া দেওয়া হয় ; ধান কাটার পর ফেকাশে নাড়াজমি 'কলই শাকে' (খেসারি শাকের অপর নাম কলইশাক) আবার সবুজ হইয়া উঠে, মাঘ ফাল্গুনে ফসল গৃহগত হয়। গরীব গৃহিণীরা খেসারির ডালমাত্র উপকরণ হাতেও অতিথি অভ্যাগতকে পঞ্চব্যঞ্জনে আপ্যায়িত করিতে পারেন। তিনি রাঁধেন—নিসিন্দাপাতা দিয়া খেসারির সুক্তা, তেঁতুল দিয়া খেসারির অম্বল, খেসারির ডাল, ডালের বড়া,

ডাঁটা পাতা যোগে ডালের ঘণ্ট। কলাইয়ের মরশুমে উপাদেয় কলাইশাকও বাদ দেন না।

খোঁচা-বগু—পদ্মের চাকা বা ফল। **খোসকা**—ডুমুর।

গজড়, গজল—কোঁড় দ্র। **গজারি**—শাল বা শাল জাতীয় বৃক্ষ (বাংলাদেশের ভাওয়ালের গজারিগড় বিখ্যাত)।

গবা-বাঁ—কষা, কষযুক্ত। **গরান**—বৃক্ষ বিঃ, mangrove সুন্দরবনে প্রচুর জন্মে।

গর্জন—এই বৃক্ষের নির্যাস হইতে তেল ঘাম (গর্জন তৈল) বা বার্নিশ হয়।

গাছতরমুজ—পেঁপে (ব্যঙ্গোক্তি)। **গাছপাঁঠা**—কাঁঠাল (ব্যঙ্গোক্তি)।

গাঁদাল, গাঁধাল, গাঁধালি [সং গন্ধালী]—তীব্র গন্ধবিশিষ্ট লতানে গাছ বিঃ। তৎপর্যায়ঃ—গেঁধেল, গেঁধেলে, গন্ধভাজিল্যা-মু, গন্ধভাদালি, গন্ধভাদুলিয়া-পা, গন্ধভেদালিয়া /-ভেদাইল্যা-পূব।

গিমা/গিমে [সং গ্রীষ্মসুন্দরক]—তিক্তশাক বিঃ ('চৈত্রে গিমা তিতা। বৈশাখে ঘির্‌ত নালিতা'-বারমাস্যা)।

গিলা/গিলে—বন্য ফল বিঃ ; ইহার ফুটখানেক লম্বা এক একটি কোষে চেপটা ধরনের চার পাঁচটি বড় বীজ থাকে। পূর্ববঙ্গের বহুস্থানে বিবাহের সময় বর কন্যাকে হলুদ ও গিলাবাটা মাখাইয়া আনুষ্ঠানিকভাবে নাওয়ানো হয়। গরীব মেয়েদের সাবানের পরিবর্তে মাথায় গিলাবাটা ব্যবহার করিতেও দেখা যায়। ইহা কাপড়জামা কোঁচাইবার কাজেও লাগে (গিলে করা পাঞ্জাবি)।

গুটা—বীচি (লাউয়ের—)।

গুটি—সদ্যোজাত ফল (আমের—)। রেশমের কোষ, cocoon. বসন্তের ব্রণ। ছোট বর্তুলাকার বস্তু। গুলি, কাঠের টুকরা বিঃ (ডাংগুটি/ডাংগুলি)। ঘুঁটি (দাবার—)।....গুটি পোকা—রেশমের গুটিমধ্যস্থ কীট।....গুটি গুটি চলা—আস্তে আস্তে পা ফেলিয়া চলা।

গুয়া [সংগুবাক, সাঁং গুয়া, হিং সুপারী]—সুপারি ('পাএ পেলাইল রাধা তোর গুআ পানে।'—শ্রীকৃ। 'বাটাভইরা জামাইর মা দেও গুয়া পান'-মৈগী)। বর্তমানে গুয়া কথাটি শিক্ষিত সমাজে বড় একটা শুনা যায় না।...গুয়াতি—সুপারি বিক্রয় করিয়া যে জীবিকা নির্বাহ করে।

গেঁয়ো—জলাশয়ের ধারে জাত উদ্ভিদ বিঃ (গেঁয়ো বন)।

গৈয়ব, গৈয়া [ইং guava]—পেয়ারা (পেয়ারা দ্র)।

গোকুলফুল-মু—বকফুল।

গোলজাম-পা, **গোলাপজাম** [হি° গুলাবজামুন]—গোলাপী রঙের গোল ধরনের একপ্রকার ফল। কালোজামের স্বাদ বা আকৃতির সহিত ইহার কোনও মিল নাই। বাংলাদেশের কোনও কোনও অঞ্চলে (ব) ইহার 'আমরুজ' নামও শুনা যায়।

গোলপাতা—তৃণ বিঃ। ইহার পাতায় ঘরের চাল ছাওয়া হয়।

গৌরীশঙ্কর-শ্রী—দোরঙা ফুল বিঃ, দোপাটি।

ঘাটুকাল, ঘেঁটকুল, ঘেঁটু [স° ঘণ্টাকর্ণ]—এক জাতের বুনো গাছ বা তাহার ফুল। তৎপর্যায়ঃ—ভাঁট, ভাঁইট-পূব। কথিত হয়, এই ফুল শিবের অতিপ্রিয়। ঘেঁটুর কচিপাতা শাকরূপেও ব্যবহৃত হয়।

ঘেঁটু—ঘণ্টাকর্ণ, চর্মরোগের দেবতা বিঃ (দেবদেবী অধ্যায় দ্র)।

চই [স° চবি]—লতা বিঃ (শাক); ইহার পাতা ছোট পানের ধরন। চই—চুষি পিঠা।

চাকন্দ, চাকন্দিয়া, চাকুন্দে-চ [স° চক্রমর্দ]—বুনো ছোট গাছ বিঃ; মুগের ছড়ার মত (কিছুটা লম্বা) ইহার ছড়া হয়, ফুল হল্‌দে। ময়মনসিংহে এই গাছটিকে 'এড়াইজ' এবং হিন্দীতে 'এড়গজ' বলে।

চাকি—পদ্মফুল মজিয়া চাকতির মত যে ফল জন্মে। তৎপর্যায়ঃ—পদ্মের চাকি-পূব, পদ্মের চাকা-উব, পদ্মের টাটি-বর্ধ, খোঁচা-বগু। এক একটি ফলে আতার বীজের ন্যায় বহু বীজ থাকে, ছেলেপিলেরা সেগুলি খাইতে খুব ভালবাসে। (গৃহ-সামগ্রী দ্র)।

চাপিলা-ম—কাঁঠালের বীচিশূন্য কোয়া। খয়রা মাছ।

চালিতা / চালতা / চালতে—বহু খোসা বা আবরণযুক্ত টকফল বিঃ, পাঁচকোল-জ. কো, চৈল্‌তা-শ্রী।

চিচিঙ্গা / চিচিঙে [স° চিচিণ্ড]—সাদা রেখা বিশিষ্ট দুইমাথা সরু লম্বা ধরনের তরকারি ফল বিঃ। চাষীরা ইহার আগায় মাটির ডেলা বা ইটের টুকরা বাঁধিয়া রাখে যাহাতে ফলটি খুব লম্বা হয়। তৎপর্যায়—কুশি-য. খু, দুধকুশি-উব, হুঁপা-বাঁ. বী. বর্ধ। ইহার 'গোশৃঙ্গ' নামও শুনা যায়।

চিনাল-ঢা—লম্বা জাতের সাদা ফুটি। **চিনিমান, চীনামান**—কচু দ্র।

চুতুরা / চুতরা-ম—বিছুটির প্রকারভেদ; পাতা অনেকটা ডুমুরের পাতার মত।

চুবড়ি আলু—আলু দ্র।

চুমরি, চুরি—যে আবরণ বা কোষের মধ্যে নারিকেল জন্মে।

চোকল, চোকলা, চোঁকা-মু. বী—ফল ও শস্যাদির বহিরাবরণ, খোসা।

চোরকাঁটা-ক—তৃণ বিঃ। ইহার ফুলের শুঁয়া পথিকের কাপড়ে অলক্ষ্যে কাঁটার মত বিঁধিয়া যায়। তৎপর্যায়ঃ—উকন্তা, উকুন্তা / উকুনে-মু. পা. রা. বগু, চোরকাঁচকি-মু,ভাউইয়া-চট্ট, ভাঁটুই-দচ, লেংরা- পুব।

চ্যারিটি-চ—বাঁশের ধারাল ত্বক, চিয়াড়ি-মু, বাঁশের ছিল্‌কা-ম ('হলে চ্যারিটি মলে থাটুলি'-প্র। জন্ম মৃত্যু দুই ঘটনায়ই বাঁশের প্রয়োজন হয়। পল্লীগ্রামে দাইরা প্রসূতির নাড়ী কাটিতে চ্যারিটি ব্যবহার করে ; আবার শবদেহ বহন করিতেও বাঁশের থাটুলির প্রয়োজন হয়)।

ছড়া—গুচ্ছ (কলার—, ধানের)।

ছড়া [সং ছটা]—জল ইঃর—ছিটা, ছিটাছড়া (পল্লীগ্রামে হিন্দুগৃহিণীরা ঘুম হইতে উঠিয়াই উঠানে, আনাচেকানাচে গোবরছড়া দেন)। কবিতা বিঃ (ছেলে ভুলানো ছড়া, ব্রতের ছড়া, ছড়াকাটা)।

ছাট-বর্ধ—গাছের সরু ডাল।

ছাটা-ম—সুপারির পাতা। চোখের ছানি। (চোখে ছাটা পড়া)।

ছাতা-পব, **ছাতু**-বর্ধ [সং ছত্রক]—ব্যাঙের ছাতা, ইং mushroom।

ছাতা—ছাতলা, ছেৎলা। শেওলা।

ছাতিম [সং সপ্তচ্ছদ]—সপ্তপর্ণ। তৎপর্যায়ঃ—ছাইতান / ছাইত্যান-পুব, ছেয়তন-মু, ছাতীঅন / ছাঞিয়ন-শ্রীকৃ। (শান্তিনিকেতনের ছাতিমতলা বিশ্ববিখ্যাত। প্রতি বৎসর ৭ই পৌষ এখানে উৎসব হয়।

ছাল [সং ছল্লি]—ত্বক, বাকল, bark (গাছের ছাল)। খাল, চামড়া (হরিণের ছাল)।

ছিবড়া—রস বাহির করিবার পর আখ ইঃর পরিত্যক্ত অসার অংশ।

ছিম < শিম—তরকারি ফল বিঃ। -বগু—কচ্ছপের প্রকারভেদ।

ছুটি—সজনে ডাঁটা, থাড়া।....ছুটিকলাই—মসুর।

ছৈঁ / ছুঁই-চট্ট. নো—শিম।

ছোটা—দড়ির মত ব্যবহৃত কলার বাসনা বা কলার পেটোর প্রান্তভাগ।

ছোবড়া—নারিকেল ইঃর আঁশযুক্ত খোসা।

ছোবা—ঝাড় (বাঁশের—, কলার—, ধানের—)।

ছোলঙ্গ—টাবালেবু ('ছোলঙ্গ চিপিআঁ নিমঝোলে খেপিলেঁ।'—শ্রীকৃ)।

ছোলঙ্গ-য. ফ, **ছোলম**-র. য, খু—বাতাবি লেবু।

ছোলা [তা° চোল্লম]—ডালশস্য বিঃ, চানা, বুট। ফলাদির বহিরাবরণ, খোসা।

ছোলা [√ছুল্]—চাঁচা, পরিষ্কার করা (উঠানছোলা—কোদাল দিয়া উঠানের ঘাস ইঃ চাঁচিয়া পরিষ্কার করা)। ছাল, খোসা ইঃ ছাড়ানো (আলু ছোলা, পাঁঠাছোলা)।....চাঁচাছোলা—পরিষ্করণ (চাঁচা ছোলার কাজ)। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, তকতকে (উঠোনটা বেশ—)। চক্ষুলজ্জাহীন, কাটখোট্টা (লোকটা একেবারে চাঁচাছোলা, কথায় কোন রসকষ নাই)।

জটলাই-দচ—বাঁশের আগার জটপাকানো কঞ্চি (বাঁশের জটলাই)।

জাড়া, জামাল গোঠা—ভেরেণ্ডা দ্র।

জাম [স° জম্বু. হি° জামুন]—বর্ষার ফল বিঃ। তিন জাতের জামের সহিত আমাদের পরিচয় আছে ; কালোজাম, গোলাপজাম ও বনজাম (কাদাজাম-মু)।

জামির [স° জম্বীর, সাঁ° জাম্বীর]—গোঁড়ালেবু। টাবা। এখানে উল্লেখ যোগ্য যে পূর্ববঙ্গের বহু অঞ্চলে লেবুর (যে কোনও জাতের) সাধারণ নাম জামির।

জাম্বুরা / জম্বুরা-পূব. ত্রি. শ্রী. দি. মা—বাতাবি লেবু।

জালি [< জালক]—কচিফল (জালি কুমড়া)।

জিউলি-চ. ন. য, **জিয়েলি**-খু—এই গাছ দীর্ঘদিন বাঁচে, ডাল পুঁতিলেই গাছ হয় (কচা দ্র) ; প্রায়ই সীমানায় এবং বাগানের বেড়ায় পোঁতা হয়। এই গাছ হইতে আঠা পাওয়া যায়। তৎপর্যায় :—**জিগা**-পূব. শ্রী. উব, কাপিলা-ব কাশীমূলা-ঝাড়।

জার্মান-পব, **জার্মানি**-পূব—কচুরিপানা।

ঝাদি-জ. কো. রং—বাতাবি লেবু। **ঝালপাত**-মুস—তেজপাতা।

ঝিঙ্গা / ঝিঙে [স° ঝিঙ্গক]—তরকারিফল বিঃ।....পালা ঝিঙ্গা—যে ঝিঙ্গা ডালপালা আশ্রয় করিয়া ঝুলিয়া থাকে এবং বেশ লম্বা হয়।....ভুঁয়ে ঝিঙ্গা—এই জাতের ঝিঙ্গাগাছ মাটির উপর দিয়া লতাইয়া যায় এবং ইহার ফল মাটির উপরেই শায়িত অবস্থায় বৃদ্ধি পায়।....বারপাতা ঝিঙ্গা—এই জাতের ঝিঙ্গাগাছে বারটি পাতা হইলেই ফুল ও ফল ধরে।

ঝুরি—বটগাছের দোদুল্যমান শিকড়। তৎপর্যায় :—ব', বয়া, নামাড় ই° aerial root.

ঝোড়-ন—ঝোপ, ছোট গাছগাছড়ার জঙ্গল, bush.

টলা, টনি—কঞ্চি। **টবটবি**-ত্রি—সাপলা, কুমুদ ফুল।

টমেটো / টম্যাটো [ই° tomato, হি° টমাটর / বিলায়তী বায়গন]—গুটি বেগুন-মে, টক বেগুন-ন, বিলাতী বেগুন-ঝাড়. পুব।

টাঁকু-মে—আমের আঁঠি। **টাকু**—তকৃলি।

টুনিফুল—বিল-ঝিলের ধারে জাত এক প্রকার লতানে গাছের ফুল। এই ফুল নাকি লক্ষীর অতি প্রিয়, কোজাগরী লক্ষীপূজায় দেওয়া হয়।

টিউরি-রং—ঠাকরি দ্র। **টুসি**-মু—ডগা।

টেপারি [<টঙ্কারী]—কুলের ধরন টকমিষ্টি ফল বিঃ।

টেলিয়া / টেল্যা, টেল—উপশাখা।

ঠাকরি /ঠাকুরি-ম. চা, ঠিকরি-ব—মাষকলাই জাতীয় হরিদ্রাভ ডালশস্য বিঃ। তৎপর্যায়—টিউরি-রং, বিরিকলাই- বর্ধ. বাঁ. বী।

ডগ, ডগা, ডুগল / ডুগা-পুব—বৃক্ষলতাদির বা তাহাদের শাখার অগ্রভাগ, আগা, ডগলা-বাঁ, টুসি-মে।...আঙুলের ডগা—আঙুলের মাথা।

ডাগুয়া / ডাউগ্যা—কলা নারিকেল ইঃর সপত্র শাখা। কলা দ্র।

ডাঁটা—শাকসবজি জাতীয় দুর্বল কাণ্ডের (trunk) গাছ (কাটোয়ার ডাঁটা, ডেঙো ডাঁটা)। ডাঁটার জাত অনেক: কাটোয়ার ডাঁটা—মিষ্টি স্বাদযুক্ত সাদা রঙের ডাঁটা, লম্বায় বাড়ে না, কিন্তু বেশ ঝাড় হয়। ডেঙো ডাঁটা-ক, ডেঙ্গা-ম. শ্রী, ডাউঙ্গা-ব. ফ. ত্রি, ডাঁরি-মু.—এই ডাঁটা বেশ লম্বা ও মোটা হয়, ডালপালা বেশি থাকে না। নটে, নটে ডাঁটা—শাক জাতীয় ছোট ডাঁটা। নটে নানাপ্রকারের—কন্কানটে, কাঁটানটে, চাঁপা নটে, পদ্মনটে ইঃ। কাঁটানটের অপর আঞ্চলিক নাম—কাঁটা খুঁড়িয়া / -খুইড়্যা-ম, খুঁড়িয়া-উব, খুঁড়ে ডাঁটা-ক। ঢোলা—ভিতর ফাঁপা এক প্রকার ছোট ডাঁটা। লালশাক —গাঢ় লাল রঙের শাক জাতীয় ডাঁটা।

ডাঁটা—শাকসবজি জাতীয় গাছের সরু ডাল (কুমড়োর ডাঁটা, পুঁই ডাঁটা, কচুর ডাঁটা)। ডাঁটার ধরন তরকারিফল বিঃ, খাড়া (সজনে ডাঁটা নজনে ডাঁটা)।

ডালিম, ডালুম, দাড়িম-পুব [স° দাড়িম্ব]—বেদানা জাতীয় ফল বিঃ।

ডাঁসলা-বাঁ, **ডাঁসা, ডাঁটো**—আধপাকা (ডাঁসা পেয়ারা)।

ডিংলা / ডিংলে—মিষ্টি কুমড়া (কুমড়া দ্র)।

ডুমুর [স° উড়ুম্বর]—ছোট জাতের কষাটে ফল বিঃ। ডুমুর গাছের পাতা খস্‌খসে এবং বটপাতার মত বড়। তৎপর্যায়:—ডোঁর-চট্ট, কুটুরা / কুডুরা-ম, খোকসা-জ. কো, খোসকা-মু, বুহই-ব।

দখনিসাগর, দখিনা—কাঁচকলা (কলা দ্র)।

দরকচা, দরকাঁচা-ভিতরে কোথাও নরম কোথাও শক্ত এইরূপ (দরকাঁচা আম)।

দল, দাম—জলজ ঘাস বিঃ। **দাম**—আগেকার তাম্রমুদ্রা বিঃ (৪০ দামে ১ টাকা)। <দ্রম্ম<গ্রীক drakhme. দর, মূল্য। হিন্দুর পদবী বিঃ।

দস্তর, দস্তাকচু—চিনিমান (কচু দ্র)।

দুধকুশি—চিচিঙ্গা। **দুধমান**—কচু দ্র।

দোপাটি—দোরঙা ফুল বিঃ। তৎপর্যায়ঃ—দুফুটি-ম, দুবুটি-পা, দুমুখি-ফ. ব, দুমুঠি-মু, গৌরীশঙ্কর-শ্রী।

ধনিয়া / ধইন্যা / ধনে [সং ধন্যা, হিং ধনিয়াঁ]—মশলা বা তাহার গাছ বিঃ; coriander. তৎপর্যায়ঃ—ধইনা-পূব, ধুনিয়া-বাঁ. বী, ধঞে-য।...ধনেপাতা অনেকেই ঝোলেঝালে ব্যবহার করে।

ধান [সং ধান্য, হিং ধান]—বাঙালীর এবং অপর বহু জাতির সর্বপ্রধান খাদ্য-শস্য। পশ্চিমবঙ্গ ত্রিপুরা ও বাংলাদেশে প্রধানত তিন শ্রেণীর ধান উৎপন্ন হয়ঃ আউশ, আমন ও বোরো। বর্তমানে আরও নানা শ্রেণীর নানা নামের উচ্চ ফলনশীল ধানের বারমাসই আবাদ হইতেছে। অবশ্য তজ্জন্য সার ও সেচের উপর অধিক নির্ভর করিতে হয়।

১ **আউশ** [<আশু], আউষ [<আবর্ষ]—আশুধান্য, বর্ষাকালের ধান্য, যে ধান অল্পসময়ে বর্ষাকালে উৎপন্ন হয়। খনার বচনে 'আউশ ধানের চাষ। লাগে তিন মাস॥'....'বৈশাখের প্রথম জলে। আশুধান দ্বিগুণ ফলে॥'....'আউশের ভুঁই বেলে। পাটের ভুঁই আটালে॥' রংপুরে আউশ ধানকে 'বিতরি', জলপাইগুড়ি ও কোচবিহারে 'ভাদোই', শ্রীহট্টে 'আড়াই' (আড়াই মাস্যা ?), বাঁকুড়ায় 'ভুতমুড়ি' এবং ঝাড়গ্রাম অঞ্চলে 'তড়াধান' বলে।

২ **আমন**—হৈমন্তিক ধান। উত্তরবঙ্গে 'হেঁউত ধান' (<হেমন্ত) এবং রাঢ় অঞ্চলে 'শোলধান', 'শালিধান'নামও শুনা যায়। কাতারি-শ্রী—যে ধান কার্তিক মাসে পাকে। আমন ধান বাঙালী কৃষকের সর্বপ্রধান ফসল। এই ফসল নির্বিঘ্নে বাড়ি আসিলে সে মনে করে, লক্ষ্মী গৃহগত হইল। এই ধানের আমান্নই সে দেবতার উদ্দেশে নিবেদন করে। আমন ধান দ্বিবিধ প্রণালীতে উৎপন্ন করা হয়ঃ (ক) শুকনার চাষে বর্ষার পূর্বেই বীজ ছিটাইয়া এবং (খ) কাদানো জমিতে চারা রোপণ করিয়া। রোপণ করিয়া উৎপন্ন আমনের অপর নাম 'রোয়া' বা 'রোয়া ধান'। যে সব জমি বর্ষার প্রথমেই জলে প্লাবিত হইয়া যায়,

সেসব জমিতেই প্রথমোক্ত প্রণালীর চাষ অধিক দেখা যায়; এই শ্রেণীর আমনের অপর নাম 'বাওয়া'-ম. শ্রী (চাষ-আবাদ 'হাওর' দ্র)।

৩ **বোরো**—আমন ধানের ন্যায় বোরো ধানেরও চারা রোপণ করা হয়। সাধারণত অগ্রহায়ণের শেষ হইতে পৌষ মাস ভরিয়া ইহার চাষ হয়। এই ধানের গোড়ায় সর্বদা জল রাখিতে হয় এবং আবশ্যক হইলে জমিতে সেচ দিতে হয়। ময়মনসিংহের পূর্বাঞ্চলে বোরোকে 'শাইল ধান' বলিতেও শুনা যায় ('ফাল্গুন মাস চল্যা যায়রে চৈত্রমাস আসে। সোনার কুইল কু ডাকে বইন্যা গাছে গাছে ॥ আগ রাঙ্গিয়া শাইলের ধান উঠ্যাছে পাকিয়া।'—মৈমী)। চব্বিশপরগনায় যেমন হামাই ধানের মুড়ি, তেমনি বাংলাদেশের পূর্ব্ব ময়মনসিংহে শাইল ধানের চিড়া বিখ্যাত ('শালিধানের চিরা (ড়া) দিয়াম আরও সবরী কলা। ঘরে আছে মইষের দইরে বন্ধু খাইবা তিনো বেলা ॥'-মৈমী)।

ধান, ধানগাছ লক্ষ্মীর প্রতীক। চাষীরা প্রথম ধান বোনার সময় অনুষ্ঠান করে; আনুষ্ঠানিকভাবে প্রথম ধান কাটে; পৌষ সংক্রান্তির পূর্বদিন আওনি বাওনি বাঁধে; ধান ছড়ায়, ধান ভরতি কুনকেতে লক্ষ্মীপূজা করে। ধান ঐশ্বর্যের প্রতীক, তাই সে কল্যাণীয় কল্যাণীয়াদের ধান দিয়া আশীর্বাদ করে। (চাষ-আবাদ দ্র)।

ধানের জাত ও নামের অন্ত নাই; তদুপরি একই ধানের এক এক অঞ্চলে এক এক নাম। শ্রীসন্তোষ কুমার শেঠ 'বঙ্গে চাল তত্ত্ব' গ্রন্থে লিখিয়াছেন, ভারতে এক আন্তর্জাতিক কৃষি প্রদর্শনীতে দশ হাজার রকম ধানের নাম পাওয়া গিয়াছিল এবং চার হাজার রকম ধানের নমুনা প্রদর্শনীতে দেখানো হইয়াছিল। এখানে সমগ্র বাংলার (পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশ) ধান চালের কয়েক শ' নাম বর্ণানুক্রমে দেওয়া হইল। এই নাম রাখার ক্ষেত্রেও বাঙালীর শিল্পীমনের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় ঃ—

ধানের নামাবলি

অঞ্জনলক্ষ্মী, অমৃতশালি।

আকাশমণি, আগালি, আগুনবাণ, আঙুরশাল, আজান, আঁধারকালি, আমফপড়া, আশ্রমশাল।

উড়কি, উড়াশাল, উড়ি, উড়িশাল, উত্তমশালি, উরুলা।

ওড়কচু।

কদমা, কনকচুড়, কপিলভোগ, কয়া, করমশাল, কর্পূরকাটি, কপূরথালি,

কলমকাটি। কলমা :—কার্তিক কলমা, কালো আঁচিল কলমা, কালোভূত কলমা, জটাকলমা, দুধ কলমা, নয়ান কলমা, ভূত কলমা, মানিক কলমা। কলামোচা, কাকুয়া, কাজলা, কাটারিভোগ, কাঁটারাঙ্গি, কাতি, কামদ / কাঁওদ, কামানি, কামিনী, কার্তিকা, কালোজিরা, কালোমানিক, কালিন্দী, কাশফুল, কুমারভোগ, কুসুমকলি, কৃষ্ণশালি, কেউটেশাল, কেওয়া, কেকোঁ, কেয়াপাতা, কৌতুকমণি।

খয়েরচুর, খয়েরশালি, খাসকামানি, খিলই, খেজুরছড়া, খেজুরথুপী।

গঙ্গাজল, গজমুক্ত, গজালিয়া, গড়াই, গড়িয়া, গন্ধতুলসী, গন্ধমাধব, গন্ধমালতী, গন্ধমুরারি, গন্ধরাজ, গন্ধেশ্বরী, গয়াবালি, গানজিয়া, গুজুরা, গুড়গুড়ি, গুয়াশালি, গৃহিণীপাগলা, গোপালভোগ, গোবিন্দতুলসী, গোবিন্দভোগ, গোলাপসরু, গৌতম / গোতম, গৌরাঙ্গশাল, গৌরী, গৌরীকাজল।

ঘিশালি, ঘেরতকলা, ঘোড়াশাল।

চন্দনকাঠি, চন্দনচূড়া, চন্দনশালি, চন্দ্রফুলি, চরণজী, চন্দ্রমণি, চামরমণি, চামরশালি, চিত্তরাঙ্গি, চিনিসাগর, চেঙ্গা, চেঙ্গোরাঙ্গি।

ছত্রশালি, ছাঁচিমোল, ছায়াচুর, ছিলেট।

জগন্নাথশালি, জটাশালি, জনকরায়, জলি, জামাইনাড়ু, জামাইভোগ, জোড়মাধব।

ঝরা, ঝাঁঝি, ঝিঙ্গাশাল।

ঠাকুরভোগ।

ডগরাশাল, ডহরনাগরা।

তাইচুন, তাইনান, তিলসাগরী, তুলসী, তুলসীমালা, তুলসীহস্তা, তুলাপাঞ্জি, তুলাশাগি।

দল, দলকচু / দলকচুয়া, দাদখানি, দায়াশালি, দাহিয়া, দুধকমল, দুধরাজ, দুধসর / দুসসর, দুধসাগর, দুবরাজ, দুর্গাভোগ, দেরাদুন।

নন্দনশালি, নরদা, নাইওর, নাগি, নানা, নারিকেলফুল, নিমাই, নীলকণ্ঠী, নেনিয়া নাগরা, নেয়ালি, নেলপাই, নোনাগাজি, নোনাবোগড়া।

পক্ষীরাজ, পদ্মকেশরী, পদ্মরাজ, পর্বতজিরে, পাটনাই, পাটশালি, পাটেশ্বর, পাতরা, পাতসাভোগ, পাতারকাতার, পানকলস, পানিশাইল, পানাতি, পায়রাউড়ি, পায়রারস, পারিজাত, পালকশাল, পিঁপড়াবাঁক, পিঁপড়াসারি, পেশোয়ারি।

বংশীরাজ, বঙ্গেশ্বর, বচি, বনরাজি, বরণ, বলাইভোগ, বাঁকই, বাঁকচুর, বাঁকতুলসী বাঁকশালি, বাঁকুই, বাগড়ি, বাইগনবীচি, বাঘানেপা, বাজাই, বাজোল, বাদ,

বাদরাজি, বাদশাপছন্দ, বাদশাভোগ, বাদাই, বাদাল, বামুনভোগ, বালাম, বাঁশগজা, বাঁশগজাল, বাঁশফুল, বাসকামিনী, বাসমতি, বিন্ধ্যশালি, বিন্নাফুলি, বিরই, বিরইন, বিরি, বিরুটি, বিষ্ণুভোগ, বুঁচি, বুড়ামাতা / বুড়ামাত্তা, বেতো, বেনাফুল, বোয়ালি।

ভবানীভোগ, ভাদ্রমুখী / ভাদ্দমুখী, ভাসা, ভাসাকলম, ভাসামানিক, ভোগজিরা, ভোগরাজ।

মউলতা, মতিহার, মধুমালতী, ময়ূরপঙ্ক্ষী, মরিচশালি, মহিষাদল / মষদল, মহারাজা, মহিষনাদ, মহীপাল, মাকু, মাধবলতা, মানিকশোভা, মালশিরা, মুক্তাঝুরি, মুক্তাশালি, মুক্তাহার, মেই আপছিয়া, মেঘনাল, মেটে, মোল্লাজটা।

যশোয়া, যাত্রামুকুট।

রক্তশালি, রণজয়, রাইমণি, রাঙ্গামাটি / রাঙ্গামাইটা, রাঙ্গি, রাঙ্গিশাল, রাজ কিশোর, রাজদল, রাজভোগ, রাজমহল, রাজামণ্ডল, রাঁধুনীপাগলা, রানীপাগলা, রাবণ, রামকানাই, রামশালি, রায়গড়, রায়দা, রূপনারায়ণ, রূপশাল।

লক্ষ্মীকাজল, লক্ষ্মীচূড়া, লক্ষ্মীদীঘা, লথনা, লতামৌ, লাউফলা, লাউশালি, লাকি, লাল, লালকামিনী, লালবন্দ, লীলাবতী, লোটন, লোয়াগড়া, লোয়াডাং, লোহাজাং।

শঙ্করচিনা, শঙ্করজটা, শঙ্করমুখী, শঙ্খনাদ, শণফুলি, শশীবালাম, শিবজটা, শিয়ালরাজা, শীতলজিরা, শুয়াশালি, শোলপনা।

সজনী, সন্ধ্যামণি, সমুদ্রফেনা, সমুদ্রবালি, সরচাঁপা, সাচি, সালকয়া, সিন্দুরকৌটা সিন্দুরমুখী, সীতালক্ষ্মী, সীতাশাল, সীতাহার, সুকুই, সুধাভোগ, সুনি, সুন্দরী, সুবর্ণখড়গ, সুলতানচাঁপা, সূর্যভোগ, সূর্যমণি, সূর্যমুখী, সোনা, সোনাখড়কে, সোনাগাজি, সোনাদীঘা, সোনামুখী,সোমরা।

হনুমানজটা, হরগৌরী, হরকালী, হরিকালী, হরিভোগ, হরিমতি, হরিরাজ, হরি শঙ্কর, হলদিয়া বারুক, হলুদগুঁড়া, হাতীকান, হাতীদাঁত, হাতীনাদ, হাতীপাঞ্জর, হাতীশাল, হামাই, হালনি, হিঞ্চি, হীরাশাল, হুপানি, হোগলা।

ধানী লঙ্কা—ক্ষুদে লঙ্কা-ন, ধানের মত ছোট একপ্রকার লঙ্কা ; কিন্তু ছোট হইলেও ইহার ঝাঁজ খুব বেশি।

ধাপ-ক. ব—জলের উপর দল দাম পানা ইঃর আবরণ।

ধুতুরা / ধুত্‌রা / ধুত্‌রো [ধুস্তুর / ধুত্তুর / ধত্তুর, হি° ধতূরা, / ই° datnra]

—একপ্রকার কণ্টকী ফল বা ফলের গাছ। ধুতুরা ফুল ও ফল শিবের অতিপ্রিয় বলিয়া কথিত হয়। ধুতুরা বীজ বিষতুল্য।

ধুঁধুল, ধুন্দুল [হিঁ ঘিয়া তরাই]—ঝিঙা জাতীয় তরকারিফল বিঃ। তৎপর্যায় ঃ—কদর-রা, ধুন্দল / পুরল / পোরল-পুব, পুরুল-মে।

ধেড়ি—ঢেঁড়স।

নজনা / নাজনা-চ. ন—সজিনা জাতীয় তরকারিফল বিঃ, নজনে ডাঁটা-ক, নাইজনা-ফ. ব।

নটে—ছোটজাতের ডাঁটা।

নাকড়ি, নাকুড়—নোড় দ্র।

নামাড়-বী—বটের ঝুরি।

নারঙ্গ, নারঙ্গি, নারাঙ্গি, নারেং [সং নাগরঙ্গ, ফাং নারন্‌গ, হিং নারংঙ্গী]—কমলালেবু। সাধারণত নাগপুরের লেবুকেই এই সকল নামে অভিহিত করা হয়।

নারিকেল [নালকেল (কেরল), সাঁং নারকণ্ড, হিং নারিয়ল]—স্বনামখ্যাত ফল বা ফলের গাছ। নরিয়া-মে, নাইরকল-পুব, নাইয়ল-ত্রি. নো, নারকল / নারকেল-পব, নারগোল-চট্ট, নাহোল-বগু, নেরোল-দচ—নারিকেলের উচ্চারণ ভেদ। নারিকেলকে কেহ কেহ 'ঋষিফল,' 'ঋষিবৃক্ষ' বলিয়া থাকে। জনশ্রুতি এই যে, নারিকেল বিশ্বাবিত্র ঋষির তপস্যালব্ধ ফল। পল্লীগ্রামে জীবিত নারিকেলগাছ পারতপক্ষে কেহ কাটে না, কাটা ব্রহ্মহত্যার তুল্য মনে করে। ইহা মাঙ্গলিক বস্তুরূপে পরিগণিত। বিবিধ লৌকিক আচার অনুষ্ঠানে এবং শাস্ত্রীয় পূজা অর্চনায় নারিকেল উত্তম ফলরূপে ব্যবহৃত হয়। দক্ষিণ ভারতে পূজার ডালিতে এবং উপঢৌকনাদিতে গোটা নারিকেল (ছোবড়া ছাড়ানো) দিতে দেখা যায়। সেখানে বরুণের পূজায় নারিকেলের অর্ঘ্য দিবার রীতি আছে। স্থানভেদে নারিকেল ভাঙ্গিয়া অনেক শুভকর্মের সূচনা করা হয়।

নারিকেলের (ফলের ও গাছের) বিভিন্ন অংশের নাম ঃ

১ চুমরি, চুরি, [<চমরী ?], মোচ-দচ, ঠোঙা-মু—নারিকেলের মঞ্জরীকোষ, যে কোষ বা আবরণের মধ্যে নারিকেল জন্মে। ২ কাঁদি [স্কন্ধ]—কান্দ্‌ / মোচা-মু, নারিকেলের গুচ্ছ, এক একটি কোষে যতগুলি নারিকেল জন্মে। ৩ ডাব—অপক্ব নারিকেল ঃ (ক) করকচি-চ, কচিডাব, মুচিডাব-ন. মে, টরকি-ব—যে নারিকেলে শাঁস হয় নাই, শুধু জল। (খ) নেওয়াপাতি / লেওয়াপাতি, শাথাপাতি-হিজ—কোমল শাঁসযুক্ত ডাব। ৪ দোমেলা—পাকার পূর্বাবস্থায় উপনীত। ৫ ভুয়া / ভুয়ো-পব, ইন্দ্রজেলা-মে, আওয়া-ম—যে নারিকেলের

ভিতর জল বা শাঁস কিছুই থাকে না। ৬ ঝুনা [<জীর্ণ, <প্রা° ঝনী<ধ্বনি] —পাকা নারিকেল, যে নারিকেলের জল নড়ে। ঝুনা নারিকেলের বহির্ভাগ ধূসর এবং শাঁস শক্ত হইয়া যায়। ডাবের চেয়ে ইহার ব্যবহারিক এবং আর্থিক মূল্য অনেক বেশি। ডাব হইতে শুধু জল, কিন্তু ঝুনা হইতে ছোবড়া, কয়ার, মালা, শাঁস ও কপরা পাওয়া যায়। ৭ ছোরড়া, ছোবলা, ছোবা-পূব—নারিকেলের খোসা বা অংশুযুক্ত আবরণ। ছোবড়া জলে ভিজাইয়া, থেঁতো করিয়া যে আঁশ পাওয়া যায়, তাহাকে বলে 'কয়ার।' কয়ার হইতে দড়ি (কাতা), গদি, পাপোশ ইঃ তৈয়ার করা হয়। ৮ মালা-পব, মালই-ম. ঢা. পা —ছোবড়ার নীচেকার কঠিন অংশ বা আবরণ যাহার ভিতর শাঁস ও জল থাকে। এই কঠিন আবরণ দ্বারা হুঁকার খোল, ওড়ং ইঃ তৈয়ারি হয়। ৯ শাঁস [<শস্য]—মালার ভিতরের নরম বা শক্ত ভক্ষ্য অংশ। ১০ কপরা / কোপরা —রৌদ্রে বা উত্তাপে শুকানো শাঁস। ইহা পিষিয়া নারিকেল তৈল প্রস্তুত করা হয়। ১১ বাইল, বাল্‌দো, বাগলা / বাগলো, বাগড়া / বাগড়ো, ডাগুয়া / ডাউগ্যা—নারিকেল তাল ইঃর সপত্র শাখা। ১২ কাটি / কাঠি—পাতার মধ্যশিরা ; ইহা দ্বারা সাধারণত ঝাঁটা তৈয়ার করা হয়। ১৩ পাতা—প্রধানত ঘর ছাওয়ার কাজে এবং জ্বালানিরূপে ব্যবহৃত হয়।

নোনা মাটি এবং নোনা আবহাওয়া নারিকেলের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। ('নারিকেল গাছে দিলে লুনে মাটি। শীঘ্র শীঘ্র কাটে গুটি।।'....'দাতার নারিকেল বখিলের বাঁশ। কমে না বাড়ে বারোমাস।।'—খব)। পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশপরগনা, নদীয়া, হাওড়া ও হুগলীতে, বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে, দক্ষিণ ভারতে, কেরলে, আন্দামানে, ইন্দোনেশিয়ায়, শ্রীলঙ্কায়, ফিলিপ্পিনে প্রচুর নারিকেল জন্মে।

নালিতা / নাল্‌তে-পব, **নালিয়া / নাইল্যা**-পূব—পাটগাছ।....নালতে শাক—পাটশাক। 'প্রাকৃত পৈঙ্গলে' নালিতা শাকের সপ্রশংস উল্লেখ আছে : 'ওগ্‌গর ভত্তা রম্ভঅ পত্তা / গাইক ঘিত্তা দুধ্‌ধ সজুত্তা / মইলী মচ্ছা নালিচ গচ্ছা / দিজ্জই কন্তা খা পুনবন্তা।' বারমাস্যা ছড়াতেও আছে ; 'চৈত্রে গিমা তিতা / বৈশাখে ঘিরৃত নালিতা।'

নিছর, নেকুর—পানিফল।

নেবু, লেবু [স° নিম্বু, নিম্বুক, হি° নীবু]—সুগন্ধি অম্লফল বিঃ। ইহার জাত অনেক : কাগজি, গন্ধরাজ, গোঁড়া-ক / গৌড়া-পূব, জামির, টাবা,

পাতি। কমলানেবু এবং বাতাবিনেবুকেও সংক্ষেপে 'নেবু', 'লেবু' বলা হয়। মোসাম্বিও 'সরবতি লেবু' নামে পরিচিত।

নোড়-চ—গায়ে পলকাটা ছোট টকফল বিঃ; শাখায় ও কাণ্ডে থোকা থোকা হয়। তৎপর্যায়ঃ-নাকড়ি / নাকুড়-বাঁ. বী, নৈল-ব, রোয়াইল-টা. ঢা. ফ, লেওইর-শ্রী. হরবরই-ম, হরবরি-ঢা. ত্রি, হরিফল-রা. বগু।

নোনা [পো° anona]—আতা জাতীয় ফল (আতা দ্র)।

পটোল, পরলা-বাঁ, **পোল্লা**-রা. বগু [স° পটোল, হি° পলভল্]—প্রসিদ্ধ তরকারিফল বিঃ, কদা-কো। ('তা মুনিআঁ ঘৃতে মো পরলা বুলিআঁ ভাজিলেঁ। এ কাঁচা গুআ।'—শ্রীকৃ)।....**পলৃভা**—পটোলের পাতা।

পরগাছা—যে গাছ অপর গাছের উপর জন্মে এবং সেই গাছেরই জীবনরসে পুষ্ট ও বর্ধিত হয়। লোকবিশ্বাস, যে গাছের উপর এই গাছ জন্মে, সেই গাছ পূর্ব জন্মে ধার করিয়া ধার শোধ করে নাই, তাই উত্তমর্ণ এ জন্মে পরগাছা হইয়া তাহার পাওনাগণ্ডা শুষিয়া লইতেছে।

পাট [স° পট্ট, তা° পট্টই (গাছের ছাল), হি° পটুআ]—নালিতা গাছের (পাট গাছের) অংশুযুক্ত ছাল। পাটগাছ। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ক্ষেত্রে বাংলার কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে পাটের স্থান সকলের উপরে। একসময়ে বাংলাদেশেই পাটের চাষ বেশি হইত এবং সেখানকার পাটই সারা বিশ্বের চাহিদা মিটাইত। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গেও পাটের চাষ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। দোআঁশ মাটিতে পাট ভাল জন্মে; শুকনার চাষে ইহার বীজ ছিটাইয়া দেওয়া হয়। চারার বৃদ্ধির মুখে অন্তত দুইবার নিড়ান দিতে হয়। পাটগাছের অপর নাম নালিতা / নালতে, নালিয়া / নাইল্যা। নালতে শাক বা পাটশাক অনেক বাঙালীরই অতি প্রিয়।

পাটের জাত অনেকঃ পূর্ববঙ্গে দেশাল / দেশী, সাতনলা, তুষা, শ্যামপুরী, মেস্তা ইঃ নাম শুনা যায়। ইহাদের মধ্যে 'তুষা' সর্বোৎকৃষ্ট, ফসল ভাল হইলে গাছ ১০ / ১২ ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়। বর্ষার মাঝামাঝি পুষ্ট পাটগাছ গোড়ায় কাটিয়া ছোট ছোট আটি বাঁধিয়া 'জ াঁক' দিয়া জলে পচানো হয় (চাষআবাদ 'ভুর' দ্র) এবং যথাসময়ে জল হইতে উঠাইয়া ছাল ছাড়াইয়া সেগুলি রৌদ্রে শুকাইয়া লওয়া হয়। আঁশযুক্ত এই ছালই পাট বা কোষ্টা, jute.

ছালছাড়ানো পাটগাছকে বলা হয়ঃ পাটকাটি/-ঠি, পাটখড়ি-ম. ত্রি. শ্রী, পাটশোলা-পূব, পাতকাটি-মু, পেঁকাটি / পাঁকাটি-পব, শিঙোট-বগু। পাঁকাটির

অধিকাংশই জ্বালানিরূপে ব্যবহৃত হয়। ইহা ঘরের চাল ছাওয়া এবং বেড়ার কাজেও লাগে। দেওয়ালীর সন্ধ্যায় পাঁকাটিতে আগুন ধরাইয়া 'উল্কাদানের' এবং অলক্ষ্মীকে বিতাড়ন ও লক্ষ্মীকে আবাহনের প্রথা আছে (আচার-অনুষ্ঠান দ্র)। পাট শুকাইয়া বিক্রয়ার্থ নানা ধরনের নানা ওজনের আটি বাঁধা হয় (চাষ আবাদ, আটি দ্র)।....পাটের ব্যাপারী—পাটুয়া / পাটু্য়া।

পাট হইতে সরু মোটা নানা রকম দড়ি প্রস্তুত হয়ঃ (ক) মোটা দড়ি—কচ্ডা-য, কাছি, কাড়া-ম, দড়া, রশা, অশা-রং। (খ) মাঝারি ও সরু দড়ি,—দড়ি, রশি, অশি-রং, ডোর, ডুরি, সুতলি, তাইতা / তাত্তুয়া-ম. ঢা, গুন (ইহা দ্বারা নৌকা টানে)। বাংলার পাটজাত শিকাশিল্প একসময়ে বিখ্যাত ছিল। পাটের সুতা হইতে গুন [< গোণী] বা চট (gunny) এবং চট দ্বারা নানা রকম থলে (বস্তা, ছালা-পূব, বোরা) প্রস্তুত করা হয়।....পাটকল, Jute Mill—যে কলে পাট হইতে উক্ত নানারূপ দ্রব্যাদি প্রস্তুত হয়।

পাতি, পাতিঘাস-চ—জলজ তৃণ বিঃ। ইহা দ্বারা ঝেত্লা / ঝ্যাত্লা নামে পরিচিত এক প্রকার মাদুর বা চেটাই তৈয়ার করা হয়।

পাতি, পাতিয়া—দণ্ডাকার শাখাবিহীন উদ্ভিদ বিঃ। জলা বিল ঝিল ইঃর ধারে বাঁশ বা কলার ঝাড়ের আকারে অনেকগুলি একসঙ্গে জন্মে। ইহার ত্বক হইতে পাটি, শীতল পাটি, মাদুর ইঃ তৈয়ারি হয়। তৎপর্যায়ঃ—মোকৃতা / মুক্তা-ম. শ্রী. ত্রি, মোতা-কো. রং, মোত্তাক-ফ. য।

পাতিলাউ-শ্রী—লাউ<অলাবু।

পান [স° পর্ণ]—পানগাছ বা তাহার পাতা। পানগাছের ফুল বা ফল কিছুই হয় না, শুধু পাতা ('ফলও নাই ফুলও নাই। ধরে বারো মাস'—ধাঁধাঁ)। গ্রন্থি ও পাতাসহ কাণ্ডের কাটিং পুঁতিয়া নূতন গাছ উৎপাদন করা হয়। **পানের জাত অনেক**ঃ কড়ুই (হাওড়া, নণ্টেবাঁটুল), গাজিপুরী, গেছো, ঘন গেঁটে, ছাঁচি, দেশী, বাংলা, বাগেরহাটি, ভেড়ামারি, মগাই (গয়া), মজাল, মিঠা, হরগৌরী ইঃ।....মিঠাপান—মিষ্টিস্বাদযুক্ত পান। বাংলাপান—ঝালস্বাদযুক্ত পান, ঝালপান। ছাঁচিপান—সুগন্ধি পান বিঃ। মজাল—গুগোল তুলসীর মত গন্ধ। হরগৌরী—একশিরা সাদা, এক শিরা সবুজ। ঘনগেঁটে—খুব বড় জাতের পান—একটিতে মাথা ঢাকা যায়। গেছোপান, গাছুপান—যে পানগাছ অন্য কোন গাছ বাহিয়া উঠে ও বৃদ্ধি পায়।

চুন, সুপারি, খয়ের প্রভৃতি যোগে **পান খাইবার রীতি** শুধু পশ্চিমবঙ্গ ও

বাংলাদেশে নয়, বাংলার বাহিরে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে, পাকিস্তানে, মালয়, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি রাষ্ট্রে এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় বিভিন্ন দ্বীপে বহু প্রচলিত। বিবাহাদি সামাজিক অনুষ্ঠানে, অতিথিঅভ্যাগতের আদর আপ্যায়নে অনেক জাতির মধ্যেই পান একটি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে (ভূমিকা'পানতামাক' দ্র)।....পানকরা—পানের ছোটবড় আকার অনুসারে পান বাছাই করিয়া গোছ সাজাইয়া যাওয়া।....পান ভাঙা—গাছ হইতে বোঁটাসহ পান তুলিয়া আনা।....পানের খিলি—চুন সুপারি ও মশলাদি সহ সাজাপান॥ তৎপর্যায়ঃ—খিলি, খিলিপান, পানের পুরা-ফ, পানের ঢোক-ম।....সাদাপান—জরদা গুণ্ডি ইঃ ছাড়া শুধু চুন সুপারি ও খয়ের দিয়া সাজা পান।...মিঠাপান—মিষ্টি মশলাদি দেওয়া পানের খিলি।....বরোজ—পানক্ষেত। তৎপর্যায়ঃ—পানবাড়ি-উব, পানের বর-ম, বোরুই-বী। পানের বরোজগুলি সমতল ছাদবিশিষ্ট ঘরের মত দেখায়। উহাদের চারিদিকে খড়ি গাছ, পাঁকাটি ইঃর বেড়া থাকে এবং উপরে উলুখড় ইঃ বিছাইয়া পানগাছে ছায়া করিয়া দেওয়া হয়। কথায় বলে, 'রোদে ধান, ছায়ায় পান।' পান লতানে গাছ, এজন্য প্রত্যেকটির গোড়ায় ছাদ পর্যন্ত লম্বা বাহনকাঠি পোঁতা থাকে।....বরোজ ফাঁদা—বরোজ পত্তন করা। সাধারণত কার্তিক মাসে পুরাতন খড়, খড়ি, কাঠি ফেলিয়া সেগুলি আবার নূতন করিয়া দেওয়া হয়।....পানচাষী—বারুজীবী। তৎপর্যায়ঃ—বারুই-ক, বারই-পুব, লতাবৈদ্য-শ্রী।........পানাতি-কো. রং—পান বিক্রয় করিয়া যে জীবিকা নির্বাহ করে। ....কালিয়াদানা—পান বরোজের অধিদেবতা।

পান বেচাকেনার হিসাবঃ—ইহা বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন প্রকার। (১) পশ্চিমবঙ্গের ২৪ পরগনা ও নদীয়াতে ৩২টি পানে এক গোছ এবং ৯৬টি পানে এক শ' এবং এইরূপ ১২শ' (৯৬×১২) পানে এক পাই। কয়েক পাই পান দিয়া এক একটি 'মোট' বা বাণ্ডিল করা হয়। কলাপাতা বা খড় দিয়া কোথাও চৌকোনা, কোথাও বা লাড্ডুর মত করিয়া 'মোট' বাঁধা হয়।

(২) মেদিনীপুরে ৫০টি পানে এক গোছ এবং ১০ হাজার পানে এক 'মোট'।

(৩) পূর্ববঙ্গে গোছ নাই, 'বিড়া' আছে; সেখানে ২০ গণ্ডা বা ৮০টি পানে ১ বিড়া বা ১ পণ; এইরূপ ১৬ পণে এক কাহন এবং ৩০০ পানে এক কোনা।

(৪) জলপাইগুড়ির ডুয়ার্স অঞ্চলে ২০ গণ্ডায় বা ৮০টি পানে ১শ' এবং ৪৪ শ'তে (৪৪×৮০=৩৫২০) ১ বিশ। আবার ঐ জেলারই অন্যত্র ২১ শ'তে

বা ১৬৮০টি পানে ১ বিশ। (৫) পাবনায় ৪০টিতে ১ বিড়া, ২ বিড়া বা ৮০টিতে ১ শ' এবং ৪০ শ'তে ১ কুড়ি বা ১ বিশ।

(৬) যশোহরে ৮০টি পানে ১ পণ, ৬৪ পণে ১ কুড়ি। (৭) ফরিদপুরে ২১ গণ্ডায় ১ পণ, ৪০ পণে ১ কুড়ি॥

পানিতালা-ফ—তালশাঁস।

পানিফল / প্যানফল—পাইফল-মু, জলজ কণ্টকফল বিঃ। তৎপর্যায়ঃ—নিহুর-ঢা.ফ, নেকুর-য, শিঙ্গাড়া / শিংড়া-পূব, শিঙ্গাড়-রা.বগু.মা.দি, শিঁকুড়ি-পা, শিঙ্গাইড়-শ্রী, হিঁয়ারি-চট্ট।

পালই-ম—ঢেঁকিশাক। শক্ত লতা বিঃ; ইহা দ্বারা বেতের মত ফাড়িয়া চাল বেড়া ইঃ বাঁধা হয়।

পালং, পালম [সং পালঙ্ক, হিং পালক]—শাক বিঃ। পালং প্রধানত তিন প্রকার ঃ ১ ঝাড় পালং, ২ শীষ পালং, ৩ টক পালং। **পালং**—পালঙ্ক, খাট ('খাটপালং, নেপদোলং, গির্দে আশেপাশে। রূপ যৌবন সদাই সুখী স্বামী ভালবাসে॥'—সেঁজুতি ব্রতের ছড়া)।

পিঠালি / পিটালি—অসার বৃক্ষ বিঃ; পাতা অনেকটা পানের মত। নদীয়াতে ইহার 'ভাটাম' নামও শুনা যায়। ভিজা চালবাটা (পিটালির আলপনা)।

পিড়িং-মে—শাক বিঃ। **পিন্ন**-জ. কো—কলার মোচা।

পির, পীর—মুসলমান সাধুপুরুষ।

পুয়া, পুয়ালি, পুল, পুলি—চারাগাছ (কলার পুয়া /-পুল, বেগুনের পুয়ালি)। আসামে কলার চারার এক নাম 'কলপুলি।'

পেঁপে [পোং papaya, হিং পপীতা]—ফল বিঃ। কাঁচা পাকা দুই অবস্থায়ই খাওয়া হয়। কাঁচা পেঁপের কষ হইতে পেপেইন পাওয়া যায়। কথিত হয়, পর্তুগীজরা দক্ষিণ আমেরিকা হইতে এই ফলটি প্রথম এদেশে আনে এবং ইহার চাষ প্রবর্ত্তন করে। পেঁপের সমনাম এবং উচ্চারণভেদ অনেক ঃ পাপিয়া / পাইপ্যা / পাইপা-ম, পাপুয়া / পাউপ্যা / পাউপা-ঢা. টা, পেঁপে / পিঁপিয়া-মু, পিঁফা-রাঢ়. পা, পাপিতা-মা.দি, পাপিজ-রা, পম্ফা-ক, পোম্বা-ব, পোইয়া / ফোইয়া-চট্ট, ফেপো-খু, হাউপ্যা-নো, কম্পা-ঢা. ত্রি, মধুফল / হাবুল-ত্রি, কয়ফল / হাইয়া -শ্রী, গাছতরমুজ-বগু।

পেয়াজ, পিয়াজ [ফাং পিয়াজ, হিং প্যাজ, সাঁং পিয়ার, সং পলাণ্ডু]—উগ্রগন্ধ কন্দ বিঃ, পিয়াজি-জ, পোরুন / ফোরুন-চট্ট।....**পেয়াজ কলি / -কালি**—

কলিসহ উদ্গত পেঁয়াজের ডাঁটা, পেঁয়াজের শীষ।....পিঁয়াজি, পেঁয়াজি—বেসন মাখানো পেঁয়াজের বড়া।

পেয়ারা [পো° pera, হি° অমরূদ, ই° guava]—বালক বালিকাদের অতিপ্রিয় ফল; বৎসরে দুইবার জন্মে, বর্ষায় ও শীতে। পেয়ারার জ্যাম জেলিও অতি উপাদেয় খাদ্য। তৎপর্যায়ঃ—সফরি / সবরি / সফরি আম / সবরি আম-পূব. শ্রী.ত্রি, আম সোঁপরে-বী, আমসফরি-য. পা, টামসুপারি-জ. কো, আঁঞ্জির / আঁজির-দচ. রাঢ়, গয়া / গয়ে-য.খু, গম / গয়ম / গয়াম-চট্ট. নো, গৈয়ব-ম. শ্রী, গৈয়া-ঢা. ফ. ব. ত্রি।

ফাতরা—কলার খোলা বা বাসনার প্রান্তভাগ যাহা দ্বারা শাকসবজি ইঃর আটি বাঁধা হয়। ধানের অনিষ্টকারী পোকা বিঃ। যাহার কথার ঠিক নাই (লোকটা একেবারে ফাতরা)।

ফুটি-ক—ছোট ও মাঝারি চালকুমড়ার ধরন ফল বিঃ, পাকিলে সর্বাঙ্গে চিড় খায়। তৎপর্যায় ঃ—বাঙ্গি-পূব. উব. শ্রী. ন.য.বাঁ.বী।....ফুটিফাটা—পাকা ফুটির মত ফাটা। (খরায় মাঠ ফুটিফাটা হয়ে গেছে)।

ফেঁকড়া, ফঁ্যা-, ফ্যাঙরা -বী—উপশাখা। ফ্যাসাদ (সে এসে ফ্যাঁকড়া, বাঁধালে)। এক বিষয় হইতে অন্য বিষয়ের উদ্ভব।

বা, বয়া—বটের ঝুরি। **বই / বৈ, বেই**—গুল্মাদির লতানে শিকড়।

বউল, বো'ল—মুকুল (আমের—)। **বকফুল**—অগথ, গোকুল-মু, বাকফনা, বাসকনা (সাধারণত ভাজা খাওয়া হয়)।

বটগাছ, বড়্গাছ—সুবৃহৎ পূজ্য বৃক্ষ। এই বৃক্ষে অনেক লৌকিক দেবতার অধিষ্ঠান কল্পনা করা হয়। কোন কোন বটতলা লৌকিক দেবতার থানও বটে। বটের ছায়া অতি সুশীতল। কথায় বলে, বটের ছায়া মায়ের মায়া।

বড়া-ম—বড়বীজ, আঁঠি (জ্যৈষ্ঠ মাসে আমের বড়া দুইজনে লাগাইল'-মৈশী)।

বড়া [<বটক]—গোল ধরনের ভর্জিত পিষ্ট খাদ্যবস্তু (ডালের—, তালের—)।

বনঝাউ, বনঝামা—বুনো গাছ বিঃ; জলার ধারে প্রচুর জন্মে।

বনতুলসী—তুলসীগাছের মতনই ঝাড়যুক্ত ছোট বুনো গাছ বিঃ; পাতা এবং ফুল দুই-ই বেশ সুগন্ধি। ইহার অপর নাম 'রামতুলসী'।

বনালা—বনজ (বনালা ঔষধ)।—বন্য (বনালা পাখি)।

বরই [স° বদরী, হি° বের] -পূব. চট্ট. য. খু—ফল বিঃ, কুল। তৎপর্যায়ঃ—বইর-

মা. দি, বরি-ত্রি, বরুই-পা, বো'র-মা. বগু, বোগারি-জ. কো. রং।....বয়ের কুল-মে, বউল বরই-ম—নারকেলি কুল।

বরবটি [সং বর্বটী]—শিম জাতীয় (লম্বা সরু) তরকারিফল বিঃ। পাকা বরবটির বীজ শুকাইয়া ডাল করিয়াও খাওয়া হয়। তৎপর্যায়ঃ—বড়কলই-জ. কো, কালাই-বগু, মুগছিমুর-ম, লালসা / লুবিলা -ম. ত্রি, রামাইশ-শ্রী।

বাইগন, বাইঙ্গন [সং বাতিঙ্গন, হিং বায়গন, সাঁং বেংগাড়]—বেগুন, তরকারিফল বিঃ ('নয়া বাড়ি লইয়ারে বাইন্ধা লাগাইল বাইঙ্গন'-মৈগী)।

বাইল-পূব, **বালী**-রাঢ়—কলা, সুপারি, নারিকেল ইঃর সপত্র শাখা ('ভএ কাম্পো যেহ্ন নব কদলীর বালী'-শ্রীকৃ)।

বাইল—মিথ্যা প্রলোভন।....বাইল দেওয়া—মিছামিছি প্রলুব্ধ করা।

বাগড়া / বাগড়ো, বাগলা / -লো, বাগুড়া, বাগুড়ি—কলা নারিকেল ইঃর সপত্র শাখা।

বাগাত—ফলের বাগান।....**বাগাতি**—ফলকর।

বাঙ্গি-পূব. উব. শ্রী. ন. য. বাঁ. বী—ফুটি। বাঁক, ভারবহন দণ্ড বিঃ।.... বাঙ্গিদার—যে বাঁকে ঝুলাইয়া কাঁধে জিনিসপত্র বহন করে।

বাজবরণ—বজ্রদ্রুম। এই গাছের পাতা নাই, শুধু কাণ্ড ও শাখা, সর্বাঙ্গে কাঁটা। এক একটির গোড়া হইতে বহু কোঁড় বাহির হইয়া ঝাড়ের আকারে বর্ধিত হয়। পাতা না থাকায় সাধারণ লোক ইহাকে 'নেড়া সন্তান'ও বলে।

বাতা—বাতাগাছ ('পাঞ্চ গাছি বাতার ডুগল হাতেতে লইয়া'-মৈগী।)

বাতা—চওড়া বাখারি বিঃ। গোরু বাছুরের মুখে ও খুরে ঘা হওয়া।

বাতাবি, বাতাপি—বড়জাতের টকমিষ্টি ফল বিঃ। এই ফলটি যবদ্বীপের রাজধানী বাটাভিয়া বা বাতাবিয়া হইতে এদেশে প্রথম আসে; তাই এইরূপ নামকরণ হইয়াছে। কিন্তু বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে ইহার আরও অনেক আঞ্চলিক নাম শুনা যায়। যেমন, জম্বুরা / জাম্বুরা-পূব. শ্রী. ত্রি. দি. মা, মজবুরা-ত্রি, মথুর-বগু, মতুয়া / মহুর-খু, মাতু / মাতুয়া-শ্রী, মাতলাম-রং, ঝাদি-জ. কো, ছোলঙ্গ-ফ. য, ছোলম-য, কনাল-চট্ট। **বাত্তি**—পুষ্ট।

বাথুয়া / বেথুয়া / বেথো / বেতো [সং বাস্তুক]—শাক বিঃ (কচি বেগুন দিয়া উপাদেয় বটে)। তৎপর্যায়ঃ—বথুয়া-উব, বাথুয়া-ম।

বাবুই—ঘাস বিঃ; দড়ির জন্য ইহার চাষ হয় (বাবুই ঘাসের দড়ি)। **তুলসীর প্রকারভেদ** (বাবুই তুলসী)। পাখি বিঃ (তালগাছে বাবুইর বাসা)।....

বাবুই খেলা—বাবুই ঘাসের গুচ্ছ মোটা করিয়া পাকাইয়া ধর্মের ভক্ত্যাদের চাবুক মারার অনুষ্ঠান বিঃ।

বাঁশ [<বংশ]—অতি প্রয়োজনীয় উদ্ভিদ; এক একটির গোড়া হইতে বহুসংখ্যক কোঁড় বাহির হইয়া ঝাড়ের সৃষ্টি করে। **বাঁশের জাত অনেক:** (১) ভেলকো বাঁশ-চ—বড় জাতের শক্ত ও পুরু বাঁশ। ইহা আবার দুই প্রকার: (ক) গুঁড়ি ভেল্‌কো ও (খ) ঢুলি বা ঢোলা ভেল্‌কো। প্রথমোক্তটি খুব পুরু এবং ঘন গাঁটযুক্ত। সাধারণত ইহা দ্বারা ঘরের খুঁটি, ভারা, আড়া, পাড়, ঠেকনা ইঃ তৈয়ার করা হয়। দ্বিতীয়টির গোড়ার দিকে গাঁট ঘন এবং পুরু, কিন্তু উপরের দিক ফাঁপা, গাঁটও পাতলা। ভেল্‌কোর অন্য আঞ্চলিক নাম—বরা-ফ. ব, বরাক / বরুয়া-ম. ঢা. শ্রী. ত্রি। ঢুলি ভেল্‌কোর ময়মনসিংহে 'উরা' নামও শুনা যায়।

(২) তলতা-পব, তল্লা বা মুলি বাঁশ-পূব—এই জাতের বাঁশ ফাঁপা ও সরল, ইহাদের গাঁট নরম ও পাতলা। এইগুলি ফাটাইয়া বা থেঁতো করিয়া ঘরের বেড়া, ঝাঁপ, চটি, বাখারি ইঃ তৈয়ার করা হয়। এতদ্ব্যতীত আরও নানা জাতের নানা নামের বাঁশ আছে। যেমন, ছামাড়, তড়পি, বাঁশনি, মরাল, শুঁয়াপাতি, বেউড়, জাওয়া, কেউটে ইঃ। বাঁশ হইতে যেমন হয় ফুলের সাজি, তেমনি হয় হাড়ীর ঝাঁটা। যেমন হয় লাঠি, তেমনি হয় বাঁশি। বাঁশ নানা আকারে নানাভাবে মানুষের অশেষবিধ প্রয়োজন মেটায়। ঝাঁকা, ঝোড়া, ডালা, কুলা, ঝাঁপ, বেড়া, ভারা. আড়া, লাঠি, কাঠি কতকিছুই না বাঁশের দান। ('চ্যারিটি' দ্র)। বাঁশের অনেক অনিন্দ্যসুন্দর শিল্পদ্রব্য চোখে পড়ে। বাঁশের মণ্ড কাগজের একটি প্রধান উপাদান। সামাজিক এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানেও বাঁশের একটি বিশেষ স্থান আছে। অরণ্যষষ্ঠী ব্রতে মা বাঁশের মাজপাতা সন্তানের কপালে ঠেকাইয়া 'ষাট' 'ষাট' বলিয়া আশীর্বাদ করেন। কোথাও কোথাও বাঁশের কঞ্চিতে ঘেরা ছাঁদনাতলায় বিবাহকার্য সম্পন্ন হয়। কোন কোন আদিবাসী সমাজে বংশ-প্রতীকে কোন কোন দেবতার পূজা হইয়া থাকে। শনি মঙ্গলবারে, মতান্তরে রবি ও বৃহস্পতিবারে বাঁশ কাটিতে নাই। বাঁশের গোড়ায় ধানের চিটা ও চৈত্রমাসে মাটি দিলে বাঁশের ঝাড় দ্রুত বৃদ্ধি পায়। ফাল্গুনে বাঁশবনে আগুন দিয়া ঝরাপাতা সব পুড়াইয়া দিবার বিধান আছে। (খবচন দ্র)।....বাঁশগাড়ি—আদালতের আদেশে কোন জমির নিলাম বিক্রয় বা দখল-গ্রহণ বিজ্ঞাপিত করিবার জন্য সেই জমিতে বাঁশ গাড়া।....বাঁশড়া <বাঁশ+আড়া—বাঁশবন। বহু ঝাড়

সমন্বিত বাঁশবাগানকে উত্তরবঙ্গে 'আড়া' বলিতে শুনা যায়।....বাঁশদেওয়া—অত্যধিক বিপদে ফেলা ; জব্দ করা।

বাস্‌না—কলাগাছের শুকনা পাতা (কলা দ্র)।

বিউলি—খোসা ছাড়ানো বিরিকলাই। **বিরিকলাই**—ঠাকরি দ্র।

বিছুটি, বিছুতি, বিছাতি [<বৃশ্চিকালী]—বুনো গাছ বিঃ। ইহাদের পাতায় শুঁয়া থাকে ; সেগুলি গায়ে লাগিলে গা জ্বালা করে ও চুলকায়।....জলবিছুটি—বিছুটির প্রকারভেদ।

বিধির বাড়ুন—চোরকাঁটা (ব্যঙ্গোক্তি)।

বিন্না / বির্ণা [স° বীরণ]—বেনা, উলুখড় জাতীয় শক্ত গুচ্ছতৃণ বিঃ। ডাঙ্গা জমিতে, পুকুরের পাড়ে বা আলের ধারে ঝাড় বাঁধিয়া এই তৃণ জন্মে। কোন কোন ব্রতকথায় (যেমন পূর্বময়মনসিংহের ক্ষেত্রব্রতের কথায়) আরাধ্য দেবতার নির্দেশে বিন্নাগাছের গোড়া খুঁড়িয়া ব্রতিনীর সাতরাজার লুকায়িত ধন-প্রাপ্তির উল্লেখ আছে। ব্রতের নিয়মেও উঠানে পুকুর কাটিয়া, পাড়ে বিন্নাগাছ ও কুলগাছ পুঁতিয়া উহাদের গোড়ায় সাতটি কড়ি গুঁজিয়া রাখিতে এবং ব্রতের শেষে সেগুলি 'সাত রাজার ধন' স্বরূপ ঘরে তুলিয়া লইতে দেখা যায়।

বুগি-ম, **বোগ**-ন. ঢা. ফ—কলার চারা (কলার বুগি)।

বুট—ছোলা, চানা। জুতা বিঃ, ই° boot.

বেকুড় / ব্যাকুড়-ক, **বেখই / বেহই**-ম [<বৃহতী]—বন্য তিক্ত ফল বা তাহার গাছ বিঃ। ইহার পাতা অনেকটা বেগুনের পাতার মত, সর্বাঙ্গে ছোট ছোট কাঁটা, কড়াইশুঁটির দানার মত ফল। তৎপর্যায় :—বিরুতি, বুঁহই।

বেগুন [স° বাতিঙ্গন, বার্তাকু, হি° বায়গন]—তরকারিফল বিঃ। বাইগন, বাইগুন, বাইগোন, বাইঙ্গন, বাইয়ন, বাগন, বাগুন, ব্যারগন—বেগুনের বিভিন্ন আঞ্চলিক রূপ। বেগুনের জাত অনেক : আমঝুঁকি—আকারে ছোট, এক বোঁটাতে ঝোঁকার মত অনেকগুলি হয়। কুলিবেগুন—লম্বা সরু বেগুন। দোকো—বারমেসে। মাকড়া বেগুন—ডোরাকাটা বেগুন। মুক্তকেশী—সাদা বেগুন। লাফা বাইগন বা তাল বাগুন—খুব বড় গোল বেগুন।....বেগ্‌নি / বেগুনি—বেসন দিয়া ভাজা বেগুনের ফালি।

বেত [<বেত্র]—বেতসলতা, কাঁটাযুক্ত জঙ্গুলে লতা বিঃ, ই° cane। বাংলার স্থানে স্থানে এবং আসামের পার্বত্য অঞ্চলে প্রচুর জন্মে। নানাভাবে ইহা ব্যবহৃত হয়। বেতের ধামা, ঝোড়া, বেতের লাঠি, বেতের চেয়ার, বেতের

মোড়া, বেতের বাক্স পেটরা, বেতের ছাতির বাঁট,—এইগুলির সঙ্গে আমরা বিশেষ পরিচিত। কুটিরশিল্প হিসাবে একসময়ে বাংলার **বেতশিল্প** চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। ত্রিপুরার বাঁশ ও বেতের জিনিস এখনও প্রসিদ্ধ। 'বার্‌বাংলা'র ঝাঁপে বেড়ায় শিল্পীরা বেতশিল্পের পরাকাষ্ঠা দেখাইত। ঐগুলিতে নানারকম লতাপাতা, জীবজন্তুর মূর্তি, এমনকি পৌরাণিক কাহিনীরও বিশেষ বিশেষ অংশ অজন্তার গুহাচিত্রের মতই ফুটিয়া উঠিত। বেতের সরু পাত চালবেড়া, ডালাকুলা ইঃ বাঁধাছাঁদার কাজে বিস্তর ব্যবহৃত হয়। **বেত লৌকিক ধর্মানুষ্ঠানে**ও স্থান পাইয়াছে। ধর্মের এবং শিবের গাজনে ভক্ত্যাদের বেতের ছড়ি ধারণ করিতে এবং ছড়িহাতে 'ধর্মডাক' ছাড়িতে ও ছোটাছুটি করিতে দেখা যায়। কোথাও কোথাও ধর্মশিলার সঙ্গেও একগাছা বেত রাখিয়া দেওয়া হয় ('রাঢ়ের সংস্কৃতি' দ্র)।....সুন্দিবেত-ম. ত্রি. শ্রী. আসা—এক শ্রেণীর অতি সরু সুদীর্ঘ বেত, একশ' হাতের উপরেও লম্বা হইতে দেখা যায়।....বেতের আঁকড়া—বেতের গাঁট বা পাতার পার্শ্ব হইতে ঘন কাঁটাযুক্ত লম্বা যে শুঁড় বা শাখা বাহির হয়। একসময়ে ভূসম্পত্তির দখল লইয়া জমিদারে জমিদারে যে দাঙ্গাহাঙ্গামা হইত, তাহাতে বেতের আঁকড়া অস্ত্রের কাজ দিত। সেই সময়ে অনেক লাঠিয়ালই ঝাঁকড়া চুল (বাবরি) রাখিত। বেতের আঁকড়া লগির মাথায় বাঁধিয়া ঐ চুলে দূর হইতে জড়াইবার চেষ্টা করা হইত; একবার জড়াইতে পারিলে প্রতিপক্ষ লাঠিয়ালের নিগ্রহের সীমা থাকিত না।....বেথৈল—পাকা বেতফল (ছেলেপিলের প্রিয়)।....ব্যাতাগ (বেত+আগ)-ব.ফ—বেতের কোমল অগ্রভাগ (অনেকে ভাজিয়া খায়)। ....ব্যাতাসি—বেতের খোল।

বেত, বেতি—বাঁশ ইঃর চেঁচাড়ি বা চেয়াড়ি যাহা দ্বারা ডালা কুলা চাটাই দরমা ইঃ বোনা হয়। অঞ্চলভেদে এই চেঁচাড়িকেও বেত বলিতে শুনা যায় (বাঁশের বেত / বেতি)। অপুষ্ট বাঁশের বেত (ময়মনসিংহের কোথাও কোথাও যাহাকে তোয়াল / তুয়াল বলে) দ্বারা চাল বেড়া ইঃ বাঁধা হয়।

বেতো, বেথো—বাথুয়া শাক। **বেতো**—বাতরোগগ্রস্ত (বেতো রোগী)।

বেনা <বীরণ—তৃণ বিঃ (বিন্না দ্র)। হাতপাখা। মাটির প্রতিমার খড়ের কাঠামো। বেণীর আকারে প্রস্তুত খড়ের মশাল (বোলেন দ্র)।

বেনারমুল—উশীর, খস্‌খস্।

বেল [স° বিল্ব, হি° শ্রীফল, সাঁ° সিজো]—সুপ্রসিদ্ধ ফল। তৎপর্যায়: শ্রীফল /

ছিরফল / ছেরফল, সদাফল। তুলসী এবং বটের ন্যায় বেলগাছও পূজ্য এবং পারতপক্ষে ইহা কেহ কাটে না। যেমন তুলসী বিষ্ণুর, তেমনই বেল শিবের প্রিয়। শিবচতুর্দশীর ব্রতকথায় ইহার মাহাত্ম্য কীর্তিত হইয়াছে। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে কাঁচা ও পাকাবেলের নানা ভেষজগুণের উল্লেখ আছে।

বেল—সুগন্ধি ফুল বিঃ। তৎপর্যায় :—বেলি, মালতী-ব, মোতিয়া।

বেল [ফা°]—জরির নক্সাকাটা ফিতা, lace.

বেল—[ই° bell]—ঘণ্টা।....বেলমোক্তা [আ° বিল্‌মোক্তা]—মোটামুটি সর্বসমেত। **বৈতাল, বৈতালু**—মিষ্টি কুমড়া

বোঁচ, বোহোর-ব—টকমিষ্টি ফল বিঃ, বঁইচ, বঁইচি।

ভাং, ভাঙ [স° ভঙ্গা]—সিদ্ধিগাছের পাতা (মাদক)। সরস্বতী পূজার অপরাহ্নে ভাং খাওয়ার প্রথা আছে।....ভাঙ্গড়—সিদ্ধিখোর। লৌকিক শিব।

ভাঁট, ভাঁইট—ঘেঁটুগাছ। **ভাটুই**—চোরকাঁটা।

ভাদাল / -লি, ভারালি—কলার থোড়।

ভুট্টা [হি°]—ভুঁটা-পা, মকাই/মাকাই -উব, মাক্কা, মাক্কাজোড়া-ম, maize। ভুট্টার দানা খই করিয়া ও আগুনে ঝল্‌সাইয়া এবং পিষিয়া সেই আটার চাপাটি করিয়া খাওয়া হয়।

ভুবি-ম. শ্রী—বর্ষাকালের বন্য টকফল বিঃ। দেখিতে টোপা কুলের ধরন ; কাণ্ড এবং শাখা ভেদ করিয়া থোকা থোকা জন্মে ; ভিতরে কমলালেবুর কোয়ার মত কোয়া থাকে ; পাতা কনকচাঁপা কি শ্বেত বাকসের পাতার মত। তৎপর্যায় :— লটকা / লটকন / লটকনা-টা. ঢা. ফ. ব. ত্রি. পা. বগু, চুকাগুটা-ম।

ভেঁট-ম. পা. বগু. বর্ধ—কুমুদ ফল, কুমুদের ফুল মজিয়া গোলাকার যে ফল হয়। এই ফলে সরিষার মত অসংখ্য বীচি থাকে। ছেলেপিলেরা এই বীচি কাঁচাই খায়, গরীবদের ভাজিয়া খই করিয়া খাইতেও দেখা যায়। তৎপর্যায় :—ভেঁইট -বী, ভেটই-ত্রি, ভেঁপ-ন. য. য, ঢেঁপ-খু। **ভেট**—উপঢৌকন।

ভেটকুল-চ—কচুজাতীয় গুল্ম বিঃ ; ডাঁটা চড়চড়িরূপে খায়, মূলে ঔষধ হয়।

ভেরেণ্ডা / ভ্যারেণ্ডা—রেড়ি গাছ। ইহার বীজ হইতে তেল হয় (রেড়ির তেল—castor oil)। তৎপর্যায় :—ভেরন / ভেন্না / ভ্যান্না-পূব. ত্রি. শ্রী, ভেল্লা / ভ্যাল্লা-বগু, এড়ি / এড়ুই-দচ (রেড়ির অপভ্রংশ)। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, এই ভেরেণ্ডা বা রেড়ি কোথাও কোথাও 'এরণ্ড' নামেও অভিহিত হয়। আবার বাংলার বহু অঞ্চলে 'এরণ্ড' এক স্বতন্ত্র বৃক্ষ। উহা দুই প্রকার : সাদা ও

লাল ; ইহার বীচি হইতে তেল হয় না,ইহা দ্বারা সাধারণত সবজিবাগানের বেড়া দেওয়া হয়, ডাল দিয়া অনেকে দাঁত মাজে। দক্ষিণ চব্বিশপরগনায় এই 'এরণ্ড'কেই 'ভেরেণ্ডা' বলা হয় : নদীয়াতে ইহা 'কচা', মেদিনীপুর হিজলিতে জাড়া', মুর্শিদাবাদে 'জামালগোঠা', রাজসাহী বগুড়াতে 'ক্যান্দড়া' এবং অপর বহুস্থানে 'এরণ্ড / এরন' নামে পরিচিত। কাজেই ভেরেণ্ডা ও এরণ্ড কোথাও একই গাছ, কোথাও দুই পৃথক গাছ।....ভেরেণ্ডা ভাজা—উপার্জন না করিয়া পরের উপর বসিয়া খাওয়া ; অনর্থক কাজ করা।

মইকোষ-স্ত্রী—কাঁঠালের বীচিশূন্য কোয়া।

মকাই, মাকাই [হি° মকঈ]—ভুট্টা। **মগডাল**—বৃক্ষের উচ্চ শাখা।

মজবুরা [<জম্বুরা (বর্ণবিপর্যয়ে)]—বাতাবি লেবু।

মঠখিলা—আসশেওড়া। **মতুয়া**—বাতাবি **মধুফল**—পেঁপে।

মনসা, মনসাগাছ—সিজ, সিজমনসা, মুহীবৃক্ষ। মনসাগাছকে সর্পের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মনসার প্রতীক মনে করা হয়। অনেক বাড়িতেই মনসা গাছ কি মনসামঞ্চ দেখা যায় ; ইহার গোড়ায় প্রতিদিন ধূপবাতি দেওয়া হয় (ভূমিকা 'মনসা ও চেঙ্গমুড়ি' দ্র)। ঘট বা মূর্তিতে পূজা করিলেও পূজাস্থানে মনসার একটি সপত্র শাখা থাকে। ভাদ্রের সংক্রান্তিতে যে অরন্ধন বা রান্নাপূজা উৎসব হয়, তাহাতে উনুনে মনসাসিজ পুঁতিয়া রন্ধিত যাবতীয় বস্তু সাজাইয়া দিয়া সর্পদেবীর উদ্দেশে ভক্তি কামনা জানানো হয়। ডঃ অমলেন্দু মিত্র বলেন, 'রাঢ় অঞ্চলে উচ্চবর্ণ এবং নবশাখ সম্প্রদায়ের মধ্যে দশহরার দিন মনসার ডাল গৃহ-প্রাঙ্গণে পুঁতে প্রতি পঞ্চমীতে মনসাপূজা দেওয়া হয়। তারপর সেই ডাল বিজয়া দশমীর দিন বিসর্জন দেওয়ার রীতি' (রাঢ়ের সংস্কৃতি)।

মনসার ব্রতকথায়ও আছে, দেবী গৃহস্থবধূর কাছে নিজের পরিচয় দিয়া বলিতেছেন, 'আমি সিজমনসাগাছে থাকি, আমাকে ঐ গাছের ডাল পুঁতে পূজো করবি, সাপের ভয় থাকবে না।' ময়মনসিংহে মনসাপূজার সময় যে সব নাচাড়ী গাওয়া হয়, তাহাতেও সিজবৃক্ষের উল্লেখ আছে : '....সিজবৃক্ষের ডাল আনি উপরে চান্দুয়া টানি, মাগো,—সেবকে পূজয়ে ভক্তিভাবে।' (এই কোষকার লিখিত 'বাংলার মনসাপূজা', মাসিক বসুমতী, শ্রাবণ ১৩৫৬ দ্র)।

মরিচ-পূব. মু [হি° মিরচা / মির্চ্, সং° মারিচ]—বাংলাদেশের বহু অঞ্চলে এবং পশ্চিমবঙ্গের কোথাও কোথাও লঙ্কাকে মরিচ বলা হয়। সেই সকল

স্থানে কাঁচালঙ্কা 'কাঁচামরিচ' এবং শুকনালঙ্কা 'শুকনামরিচ' নামে পরিচিত। গাঙ্গেয় অঞ্চলে মরিচ বলিতে বুঝায় গোলমরিচ। লঙ্কা দ্র।

মর্তমান—বীচিশূন্য অত্যুৎকৃষ্ট কলা। অনেকের মতে ইহা মার্টাবান হইতে প্রথম এদেশে আসে, তাই এইরূপ নামকরণ হইয়াছে।

মলম / মলান-বী—নাল, মৃণাল।

মসুর, মসুরি, মুসুরি [স° মসূর, হি° মসুর]—ডালশস্য বিঃ। তৎপর্যায় :—ছটকলাই / ছুটিকালাই-উব।

মহুয়া, মউয়া [<মধুক]—ইহার ফুল ও ফল মিষ্টি স্বাদযুক্ত। মহুয়ার ফুলকে 'মহুল / মউল' এবং ফলকে 'কচড়া' বলা হয়। আদিবাসী পরিবারে এই ফুল ও ফল হইতে খাদ্য পানীয় তৈয়ার করা হয় এবং ইহাতে তাহাদের কিঞ্চিৎ আর্থিক সংস্থানও ঘটে।

মাদার / মঁাদার-বী. ন—ডেহু, ডেওফল।

মান্দার [স° মন্দার]-পূব—কাঁটাযুক্ত অসার গাছ বিঃ। এই গাছে পলাশ ফুলের ন্যায় ঈষৎ বাঁকা লাল রঙের ফুল হয়। দক্ষিণ চব্বিশপরগনায় ইহাকে পালতে মঁাদার, তেপালতে, তেফলতে বলা হয়। কাঁটাশূন্য মান্দারও আছে, ইহা কাঁটা মান্দারের চেয়ে অনেক বড় হয়; কোথাও কোথাও ইহাকে 'পানি মান্দার' বলে।

মাল-উব—সরিষা।....মালের ফুল—সরিষার ফুল ('ঘাঁটায় ঘাঁটায় মালের ফুল। মা'র বাড়ি ব্যান কতদূর?' -বলোনা)। <মল্ল—বলিষ্ঠ যুবক; কুস্তিগীর। [আ°]—পণ্যদ্রব্য, goods. মদ, তাড়ি (লোকটা মাল খেয়েছে)।.... মালমশলা—উপকরণ।

মালা—নারিকেলের যে শক্ত আবরণের মধ্যে শাঁস ও জল থাকে। খোলার অর্ধভাগ। মাল্য (ফুলের—, মালাবদল)।—সমূহ (পর্বতমালা)।

মুক্তাগাছ-ম—ইহার ত্বক দ্বারা পাটি মাদুর ইঃ তৈয়ার করা হয়।

মুচি / -ছি / - জি—কাঁঠালের নবোদ্গত ফল, মুচি / মুছি—ছোট সরা, মোচা-মু। মুষা।

মুলা / মুলো, মুলাই-জ. কো [স° মূলক, হি° মূলী]—প্রসিদ্ধ কন্দ বিঃ। মুলার জাত অনেক : আউষে, (বর্ষাকালে হয়), বোম্বাই, হিংলি, চীনা (সাদা৯) ইঃ। পৌষের শেষ শনিবারে দেবতাকে মুলা নৈবেদ্য দিবার প্রথা আছে। মাঘে মুলা খাওয়া নিষিদ্ধ। তখন মুলায় নাকি পোকা জন্মে।

মেওয়া [ফা°]—ময়মনসিংহে আঁশফলকে মেওয়া বলা হয়। পেস্তা বাদাম ইঃর সাধারণ নামও মেওয়া ('মেওয়া মিশ্রি সকল মিঠা মিঠা গঙ্গাজল। তার থাক্যা অধিক মিঠা দেখ শীতল ডাবের জল ॥'—মৈমী)।

মেড়া-বী. মু—শরফুল (মেড়াপোড়া)। মেড়া <মেঢ্র—ভেড়া। উগারের (মাচার) খুঁটি। চালের গুঁড়ার পিণ্ডাকার পিঠা বিঃ (মেড়া পিঠা।

মেথি-মে, **মাথি**-চ—খেজুর গাছের মাথার ভিতরের নরম অংশ।

মেথি [<মেথী / মেথিকা]—মশলা বা তাহর গাছ বিঃ (মেথিশাক)।

মেস্তা—পাটগাছের প্রকারভেদ।

মেহেদি, মেদি, মেন্দি-পুব—হেনা, ছোট গাছ বিঃ। ইহার পাতার রসে নখ, পাকা চুল, দাড়ি ইঃ রং করে। গাছে সবজি বাগানের বেড়া হয়।

মোচা—কলার ফুল (মোচাঘণ্ট)॥ কোথাও কোথাও ভুট্টা, কাঁঠাল ইঃর নবোদ্‌গত ফলকেও 'মোচা' বলা হয়।

মোল, মৌল—মুকুল, বোল।

মৌরি [স° মধুরী]—মশলা বা তাহার গাছ বিঃ। ইহার 'গুয়ামুরি' নামও শুনা যায়।....গুয়ামুরি হাসি-পুব—মৌরির মত হাসি, মৃদু মধুর হাসি।

রয়না-চ. খু. ফ. ব—বৃক্ষ বিঃ। কাঠ বেশ শক্ত ; ইহার বীজ হইতে জ্বালানি তেল হয়। তৎপর্যায় :—রনা-ত্রি, পিতরাজ-উব. পুব, বৈন্তরাজ / বৈন্তিরাজ-ম।

রয়না—স্বাধস মাছ।

রলা—শালের সরু গুঁড়ি।

রামঝিঙা, রামতরই, রামপটোল—ঢেঁড়স।

রামাইশ-শ্রী—বরবটি।

রঁায়া-মে—ডাঁসা, ডাঁটো ((রঁায়াফল)।

রুই—শিমুলতুলা, বালিশের তুলা। মৎস্য বিঃ। উই, উইপোকা।

রোয়াইল—নোড় দ্র।

লঙ্কা / লঙ্কামরিচ—মশলাফল বিঃ। তৎপর্যায় :—মরিচ-পুব, গাছমরিচ-বগু, মরুচ / মোরচি-জ. কো. রং, মৈচ, আকালি-দি, ঝাল-ন. দি. মা, শোঁপরে-বী, শুঁপ্র্যা-বাঁ।....**লঙ্কা**—রামায়ণোক্ত রাবণ-রাজ্য।

লটকা, লটকন, লটকনা—ভুবি দ্র।

লাউ, নাউ [স° অলাবু, হি° লাউকী / কদ্দু]—তরকারিফল বিঃ। তৎপর্যায়ঃ—কদু, ছাঁচি লাউ, দেশী লাউ, পাতি লাউ, শীত লাউ।....বাওয়স, বাওস, বোস—পাকা লাউ, যাহার খোলা পাকিয়া শক্ত হইয়া গিয়াছে।.... লাউ, লাউয়া—পাকা লাউয়ের খোলা (shell) দিয়া তৈয়ারি বাদ্যযন্ত্র বিঃ। ভিক্ষাপাত্র। এইরূপ বাদ্যযন্ত্র ও ভিক্ষাপাত্র সাধারণত আউল বাউল ও

বৈরাগীদের হাতেই দেখা যায়।....টোকা / তারকা-জ. কো. রং—লাউয়ের খোলার পাত্র।

লাটা—বুনো কাঁটা গাছ বিঃ (লাটাবন)। কুন্দুলে-হা. হু।

লাফা-উব—শাক বিঃ। বেগুনের প্রকারভেদ (লাফা বাইগন)।

শরখড়ি—তৃণ বিঃ, খাগড়া (শরখড়ির ঝোপ)।

শকরকন্দ—যে কন্দ শর্করার ন্যায় মিষ্টি, রাঙাআলু, লালআলু (আলু দ্র)।

শরিফা [আ°]—আতা দ্র।

শসা [স° ক্ষীরিকা, হি° খীরা]—ফল বিঃ, cucumber. তৎপর্যায় :— শোঁয়াস-মু. রা. বগু, মাঁরবা-বী, ফোয়া-ত্রি, হয়া-শ্রী, বরিষাফল / -হল-চট্ট। (ক্ষীরা দ্র)।

শাক, শাগ [হি° সাগ, ই° greens]—বৃক্ষলতাদির পত্র ও বৃন্ত যাহা খাদ্যরূপে গ্রহণ করা যায়। যেমন, পালং, পুঁই—, নটে—। সংস্কৃতে শাক বলিতে পত্র, পুষ্প, ফল, নাল, কন্দ সব কিছুকেই বুঝায়। কাজেই সেকালের আর্য-ঋষিদের 'শাকান্ন', আর বর্তমান যুগের বাঙালী পল্লীবধূদের 'শাকভাত' ঠিক এক জিনিস নয়।

শাল, সাল—সুপ্রসিদ্ধ বৃক্ষ (শালের খুঁটি, শাল কাঠের দরজা)। ঘরদুয়ার এবং আসবাবপত্র তৈয়ারির কাজে শালকাঠের বহুল ব্যবহার দেখা যায়। ইহা জ্বালানি রূপেও ব্যবহৃত হয়। ইহার পাতাও ভোজনপাত্র, ঠোঙা ইঃর কাজ দেয়। শালের নির্যাস আমাদের নিত্য ব্যবহৃত ধুনা।....শালকোঁড়া—নবোদ্গত শালগাছ।....বাতি, শালবাতি—শালের সরু গুঁড়ি।

শাল [ফা°]—পশমী চাদর বিঃ (কাশ্মীরী শাল)! মৎস্য বিঃ (শাল মাছ)। শালা, গৃহ (ঢেঁকশাল, টাঁকশাল)। কাঁটা বা সূক্ষ্মাগ্র কোনও বস্তু (পায়ে শাল বিঁধেছে)। [সাঁ°]—গুড়। আখ মাড়াই ও গুড় তৈয়ারির স্থান। **শালগম** [ফা°]—কন্দ বিঃ (তরকারি)।

শালি-পব—হৈমন্তিক ধান্য, আমন ধান।

শালি, শাইল-ম. শ্রী—বোরো ধান (ধান দ্র)।

শালুক-ক—কুমুদ ফুল। ইহার অপর আঞ্চলিক নাম : শাপলা / সাপলা-পুব. দচ, সুঁদি (বেগুনী রঙের), নাইল / নালফুল-ন. মু. রা, টবটবি-ত্রি, কৈলাড়ি-হিজ। পূর্ববঙ্গের বহু অঞ্চলে শালুক বলিতে কিন্তু কুমুদ বা শাপলার মূলকে বুঝায়, ফুলকে নয়। সংস্কৃতেও শালুক কুমুদাদির মূল। এই মূল গার্শীব্রতের

একটি প্রধান উপকরণ ; গরীবেরা ইহা সিদ্ধ করিয়াও খায়। উত্তরবঙ্গে শাপলা ফুলে মনসার ঘট ও মনসামূর্তি সাজাইয়া দিবার প্রথা আছে।

শিউলি [<শেফালী, শেফালিকা]—সুগন্ধি ফুল বিঃ, শরৎকালে ফোটে। পূর্ববঙ্গে ইহার 'শিঙ্গাড়া ফুল' নামও শুনা যায়, শিয়েলি-খু, শামালিকা-বগু।

শিংড়া, শিঁকুড়ি, শিঙাড়, শিঙ্গাড়া [সং শৃঙ্গাটক, হিং সিঙ্গেড়া]—পানিফল। ....শিঙ্গাড়া—শিউলি ফুল। আলু কপি ইঃর পুর দেওয়া ময়দার খাবার বিঃ (ফুলকপির শিঙ্গাড়া)।

শিম [সং শিম্ব, হিং সেম]—তরকারিফল বিঃ। তৎপর্যায়ঃ—উরি-ম. শ্রী, উস্‌সি-মুস, দ্বিদল-ন, ছুঁই-নো. চট্ট, ছিম, ছিমরা-ঢা. ফ. ব, ছিমা-জ. কো. ত. রং, ছিমুর-ম। শিমের জাত অনেক : আলতাপাতি, কাঠশিম, কাতলি, ক্ষীরসাপাতি, ঘেরৃতকাঞ্চন, জামাইপুলি, টকই, পাঁকালে, পুঁটুলে, মাথমছিম, বাঘের নথ, হাতির কান ইঃ।

শিরাল—শিরাবিশিষ্ট টকফল বিঃ, কামরাঙ্গা।

শুঁইট-পুর—শটী, হরিদ্রার ধরন কন্দ বিঃ। ইহা হইতে পুষ্টিকর শিশুখাদ্য (পালো) তৈয়ারি হয়।

শুঁটি—মটর খেসারি ইঃর লম্বা ধরনের বীজকোষ (কড়াই শুঁটি)।

শুঁঠ<শুণ্ঠী—শুকনা আদা।

শেওড়া / শ্যাওড়া / সে- / স্যা- [সং শাখোট]—ঘনপাতাবিশিষ্ট ঝোপের আকার বৃক্ষ বিঃ, সাঁড়াগাছ. সাওড়াগাছ-মে। পূর্ববঙ্গে ইহার গোড়ায় অনেক লৌকিক দেবতার পূজা হয়। কোথাও (ম) এই বৃক্ষে বনদুর্গার অধিষ্ঠান কল্পনা করা হয়। শেওড়াগাছ ভূতপ্রেতের থানা বলিয়াও জনশ্রুতি আছে। (শেওড়াগাছের ভূত)। ইহার ডাল দিয়া দাঁত মাজিতেও দেখা যায়।

শেয়াকুল, শিয়েলকুল, শিয়ালকাঁটা, শেয়ালকাঁটা—বুনো কাঁটাগাছ বিঃ।

সজ—পূর্ববঙ্গের বহু জায়গায়ই ধনিয়াকে (ধনে) সজ বলা হয়। আবার সজ অনেক মশলার কৌলিক পরিচয়ও বটে। যেমন, ধন্যা সজ, মৌরি সজ, শলুফা সজ।

সজিনা, সজনে [সং শোভাঞ্জন]—ডাঁটার ধরন সরু ও লম্বা তরকারিফল বিঃ। তৎপর্যায়ঃ—কচা, খাড়া, সজনে খাড়া, সজনা, সাজনা।

সৌলফা, শুলফা / শুলফো [সং শতপুষ্পা]—মৌরি জাতীয় শাক বা তাহার ফল (মশলারূপে ব্যবহৃত) বিঃ, শলুপ, শলুফা-পুব. উব।

সফরি / সবরি, সফরি আম / সবরি আম—পেয়ারা। কথিত হয়, পর্তুগীজরা দক্ষিণ আমেরিকা হইতে এই ফলটি প্রথম এদেশে আনে ; সফর করিয়া আসিয়াছে বলিয়া এইরূপ নামকরণ হইয়াছে।

সফরি কলা / সবরি কলা—মর্তমান। ইহাও বিদেশ হইতে সফর করিয়া আসিয়াছে বলিয়া এইরূপ নামে পরিচিত হইয়াছে ('শালি ধানের চিড়া দিয়াম আরও সবরি কলা'-মৈগী)।

সরিষা / সরষে [স° সর্ষপ, হি° সরসোঁ]—তৈলশস্য বিঃ (সরষের তেল)। মশলা বিঃ ('সরিষা বাটা দিয়া রান্ধে পানিকচুর বৈ'—বিগুপ্ত)। সইরষা, সষ্যা, সরু, হরু—সরিষার আঞ্চলিক রূপভেদ। ইহার অপর নাম 'মাল্' (মালের ফুল-বগু)। সরিষার তেলকে ছাঁচি তেল, কটু তেল বলিতেও শুনা যায়।....খইল / খো'ল—তৈল নিষ্কাশিত তিল সরিষা ইঃর ছিবড়া ; ইহা প্রধানত সার এবং গোমহিষাদির খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। ওঝারা তুকতাকে, ঝাড়ফুঁকে, ভূত ছাড়াইতে সরিষা ব্যবহার করে। 'সরিষার মধ্যেই ভূত'—যে রক্ষক সেই ভক্ষক অর্থে প্রায়ই ব্যবহৃত হয়।....রাইসরিষা—রাজ সর্ষপ। ইহার গাছ সাধারণ সরিষার চেয়ে বড় হয়।

সাপলা, শাপলা—কুমুদফুল। বর্তমানে ইহা বাংলাদেশের জাতীয় পুষ্প (শালুক দ্র)।

সুঁদি, সুন্দি—বেগুনী রঙের সাপলা।

সুন্দরী, সুঁদরি—সুন্দরবনে জাত লাল রঙের বৃক্ষ বিঃ (সুন্দরী কাঠ)।

সিজ [স° স্নুহী, হি° সিজ]—মনসাগাছ।

সিদ্ধি গাছ—এই গাছের পাতা হইতে সিদ্ধি বা ভাঙ্, আঠা হইতে চরস এবং স্ত্রী গাছের ফুল হইতে গাঁজা উৎপন্ন হয়। ভারত ও বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে ইহার চাষ হয়। সিদ্ধি গাছের পাতা সরু,শিউলি বা জবার পাতার ন্যায় ইহার পাতারও উভয়প্রান্ত চেরা চেরা এবং অগ্রভাগ ছুঁচালো। ফুল ও বিচি অনেকটা সাদা, ফেকাশে। সিদ্ধি (ভাঙ), চরস, গাঁজা তিন-ই মাদকদ্রব্য ; চরস্ ও গাঁজার ধূমপান করা হয়, সিদ্ধি ঘুঁটিয়া বা লাড়ুবড়ি করিয়া খাওয়া হয়। নানা লৌকিকছড়ায় ও লোকগীতিতে, শিবায়নে, অন্নদামঙ্গলে শিবকে সিদ্ধিখোর বলা হইয়াছে এবং শিবের সিদ্ধি ঘোঁটার ও সিদ্ধি খাওয়ার অনেক উল্লেখ আছে। হিন্দুর অনেক আচার-অনুষ্ঠানে, যেমন, বিজয়া দশমীর রাত্রিতে প্রতিমা বিসর্জনের পর, সরস্বতী পূজার অপরাহ্নে, গোরুর দেবতা গোরক্ষনাথের সেবায়

সিদ্ধি খাওয়া দোষের মধ্যে গণ্য হয় না। পূর্ববঙ্গের লৌকিক দেবতা ত্রিনাথের সেবায় (মেলায়) গাঁজা একটি প্রধান উপকরণ।

সীতাফল—আতা।

সুপারি / সুপুরি, সুবারি / সুবুরি—গুবাক, গুয়া, betel-nut. পানের সহিত বা পৃথকভাবে সুপারি চর্বণ করিবার রীতি শুধু ভারতে ও বাংলাদেশে নয়, অপর বহু দেশেই প্রচলিত আছে (পান দ্র)।....চিকি সুপারি—(কিঞ্চিৎ অপুষ্ট) সিদ্ধ করা সুপারি বিঃ।....পাকই—কচি অপুষ্ট সুপারি।...বাইল, ছাটা-ম—সুপারির পাতা।... বাধা—সুপারির ছড়া।

পল্লী অঞ্চলে ওজন ছাড়াও হাটেবাজারে গৃহস্থের বাড়িতে পণ, কুড়ি বা গা হিসাবে সুপারি কেনাবেচা হয়। গাঙ্গেয় অঞ্চলে ৮০টি সুপারিতে ১ পণ, প্রতি পণে ২টি কি ৪টি অতিরিক্ত দিতে হয়; ইহাকে বলে 'শলা'। বাংলা-দেশের বহু স্থানেই ১০টি সুপারিতে ১গা এবং ২০গা বা ২০০টি সুপারিতে ১ কুড়ি; প্রতি কুড়িতে ১ গা 'আগাপাছা' বা অতিরিক্ত দিতে হয়।

সুষুনি / সুষনি [স° সুনিষণ্ণক]—জলজ শাক বিঃ ('সুষনি কলমী ল-ল করে রাজার বেটা পক্ষী মারে।'—যমপুকুর ব্রতের ছড়া)। দীপান্বিতা কালীপূজার পূর্বদিন যে চোদ্দশাক খাওয়ার প্রথা আছে, তাহাতে এই সুষনি শাক স্থান পাইয়াছে। উত্তরবঙ্গে ইহার 'নিদালি' (নিদ্রালুতা জন্মায় ?) নামও শুনা যায়।

হলুদ, হলদি [স° হলদ্দী, হরিদ্রা, হি° হলদী]—সুপ্রসিদ্ধ কন্দ বিঃ ('কাঞ্চা হলদি যেন তোহ্মার বরণ !'—শ্রীকৃ)। রান্নার মশলারূপে ব্যবহার ছাড়াও প্রায় সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই বিবিধ আচার-অনুষ্ঠানে, বিশেষ করিয়া বিবাহে, পার্বণ স্নানে, প্রসাধনে হলুদের (কাঁচা হলুদের) ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায়। হলুদগাছ অনেক ব্রতে স্থান পায়। পূর্ব ময়মনসিংহে হলুদগাছের গোড়ায় লক্ষ্মীর অধিষ্ঠান কল্পনা করিয়া কোজাগরী লক্ষ্মীপূজার দুইদিন পূর্বে দেবীকে সেখান হইতে বরণ করিয়া (হলুদগাছসহ) ঘরে আনা হয়। আয়ুর্বেদশাস্ত্রে হলুদের নানা ভেষজ গুণের উল্লেখ আছে। হলুদ রঞ্জক, কান্তিবর্ধক, বিশোধক, রোগপ্রতিষেধক, বহুবিধ ব্যাধিনাশক। পাড়ায় যাহাকে না হইলে চলে না, সর্বক্ষেত্রে যাহার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়, তাহাকে আমরা 'হলুদের গুঁড়ো'র সঙ্গে তুলনা করি। আমরা আরও বলি, 'তোদের হলুদমাখা গা, তোরা সোজা রথে যা। আমরা হলুদ কোথায় পাব, আমরা উল্টো রথে যাব।' সর্বত্র হলুদের

শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত।....গায়েহলুদ-পব, হলুদকোটা-পূব. উব—বৈবাহিক মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান। (ভূমিকা 'গায়ে হলুদ' দ্র)।

হাগড়া / আগড়া—লঙ্কাগাছের ধরন আগাছা বিঃ; পড়ো জমিতে প্রচুর জন্মে (হাগড়াবন)। তৎপর্যায়ঃ—বিষকাটালি।

হাবুল—পেঁপে। **হিঁয়রি**—পানিফল।

হেঁতাল <হিন্তাল—বৃক্ষ বিঃ। মনসামঙ্গলে চাঁদসদাগরের হেঁতালের লাঠির উল্লেখ আছে। হেঁতালের গন্ধে হয়ত সর্প দমিত হয়।

হেলঞ্চ, হেলাঞ্চা, হেলেঞ্চা [সং হিলমোচিকা]—জলজ তিক্ত শাক বিঃ। কোন কোন রোগে হেলেঞ্চার শুক্তা পথ্য হিসাবে দেওয়া হয়। তৎপর্যায়ঃ—হিঞ্চা / হিঞ্চে / হিংচে, ইন্‌চা / ইন্‌চে, ইঙ্গিচা (কবিক), এলেঞ্চা, হ্যালোমচা।

হোগল, হোগলা—জলজ উদ্ভিদ বিঃ। ইহার পাতায় ঘর ছাওয়া, মাদুর, তৈয়ারি ইঃ নানা কাজ হয়। দক্ষিণ বঙ্গের অনাবাদী বহু জলাই হোগলাবন।

পঞ্চম অধ্যায়

জীবজন্তু

(ক) মাছ

আইড় / আড় [সং আড়ি]—আড় মাছ, আঁশবিহীন বৃহৎ মৎস্য।

আজলা / আজলি-রা—ভেটকি জাতীয় মাছ।

আমেরিকান কই—তেলাপিয়া, হ্যাধশ ধরনের মাছ; অতি দ্রুত ইহাদের বংশ বৃদ্ধি পায়।

আমেরিকান রুই—মাথা ছোট পেটমোটা একজাতের মাছ।

ইংলা—আঁশবিহীন একজাতের ছোট মাছ।

ইচলা, ইচা, ইচিলা, ইচ্যা [সং ইঙ্কাক, সাং ইচা]—চিংড়ি।

ইল্শা, ইলিশ [সং ইল্লিশ]—বাঙালীর অতি প্রিয় সুস্বাদু তৈলাক্ত মৎস্য। দেখিতে সুন্দরও বটে। 'মাছের তেলে মাছ ভাজা' কথাটি এই ইলিশ মাছের ক্ষেত্রেই প্রযুক্ত হয়। পদ্মা ও গঙ্গার ইলিশ বিখ্যাত। বাংলাদেশের কোন কোন অঞ্চলে শ্রীপঞ্চমী দিন, কিংবা মাঘের অন্য কোনও দিন জোড়া বেগুনসহ জোড়া ইলিশ ঘরে আনিবার প্রথা আছে। হিন্দু গৃহিণীরা সেদিন দুইটি মাছ যথারীতি সিন্দূরাদি উপকরণে বরণ করিয়া ঘরে তোলেন, না ভাজিয়া রাঁধেন, আঁইশগুলি 'মধ্যম পালার' গোড়ায় পুঁতিয়া রাখেন। এই অনুষ্ঠান হইতেই বছরের ইলিশ-খাওয়া আরম্ভ হয় এবং বিজয়া পর্যন্ত চলে। অনেকে বিজয়ার পর হইতে সরস্বতী পূজার পূর্বদিন পর্যন্ত ইলিশ খায় না।

উড়াল / উড়োল-মু, **উড়ুয়া**-কো—এই মাছ অধিকাংশ সময়ই জলের উপর ভাসিয়া বেড়ায়।

উলকা / উলকো-চ—চেং মাছ। **এলং**-ম.চা.বগু, **এলেঙ্গা**-খু <সং এলঙ্গ।

কই [সং কবয়ী]—প্রসিদ্ধ মাছ; বেশ শক্ত, সহজে মরে না, ডাঙ্গায়ও অনেকক্ষণ বাঁচিয়া থাকিতে পারে। ইহাদের পিঠে এবং পেটে লম্বা একটানা ছুঁচালো পাখনা আছে।....**কইটুরিয়া** /-**টুইর‍্যা**-ম—কই মাছের বাচ্চা, ছোট কই।

কচড়া-খু—ছোট জাতের মাছ, চুনো মাছ।

কলকে মাছ-য—তপসে ধরনের এক প্রকার মাছ। **করতি**—খয়রা দ্র।

করাত মাছ—ইহার পাখনা করাতের ন্যায় ধারাল।

কাঁকাল / কাঁকিলা [স° কঙ্কত্রোট]—লম্বা ছুঁচালো ঠোঁট একশ্রেণীর মাছ ; প্রায় জলের উপর ভাসিয়া থাকে। তৎপর্যায়ঃ—কাঁকিল্যা-মু, কাঁইক্‌লা-ঢা. ফ. ব. পা, কাঁকলা-বগু, খাকিলা / খাকলে-রং, কাগাল, কাইক্যা-ম. নো, খুড়ে, থুরকিন-ব, গোঙা-মে, গাংদাড়া-হা. হু. বর্ধ. মে, বকঠুঁটো মাছ / বগো মাছ-চ. ন।

কাজরি / কাজলি—ছোট জাতের সুস্বাদু মাছ।

কাজল গৌরী—ইলিশের প্রকারভেদ (সর্বোৎকৃষ্ট)।—পাখি বিঃ।

কাতল / কাতোল, কাত্‌লা [স° কাতল]—রোহিত পর্যায়ের মাথা বড় পেটমোটা মাছ।

কানকো, কানকুয়া, কান্তা-পূব—গালাসি-চ, মাছের চিরুনিতুল্য শ্বাসযন্ত্রের (ফুলকা) ঢাকনি বিঃ, ই° gillflap.

কানপনা-ম—চুনো মাছ বিঃ ; জলের উপর ভাসিয়া বেড়ায়, মাথায় একটি সাদা দাগ আছে, অনেকেই খায় না।

কাল্‌বোস-ক—মাঝারি পোনামাছের (রুই) ধরন ; মাথা ছোট, পেট একটু চওড়া এবং রং কিছুটা কালো। কালবাউস-ম. নো, কালিবাওস-ঢা. বগু, কালিয়ারা / কাইল্যারা-শ্রী, কাইল্যা বাগরি-ম।···চন্দনী বাওস—যে কাল. বোসের রং শ্বেতচন্দনের মত কিছুটা সাদা।

কুচা / কুচো—নানা জাতের একত্র করা ছোট মাছকে বলা হয় কুচা বা কুচো মাছ। তৎপর্যায় ঃ—চুনা / চুনো-ক, চুঁচড়ো-বগু, খরচা-মু, গুঁড়ামাছ-ম, চাঁদ-কুড়ো-বী।

কুঁচিয়া / কুঁচে [স° কুচিক]—সাপের ধরন মাছ (?) বিঃ, কুইচ্যা / কুইচা-পূব, বামরুল-মে।

কেচকি, কাচকি-পূব. ত্রি. নো—দেখিতে অনেকটা ছোট মৌরলা মাছের মত, অতি সুস্বাদু। তৎপর্যায়ঃ—কাজলি, কেচা, তাজি, স্বর্ণখড়িকা / সোনা খড়কে।

কোড়াল-পূব—ভেটকি জাতীয় মাছ।

কোল—বড় মাছের পেটের অংশ (চিতলের—), পেটি-পূব।

খয়রা-ক—ইলিশের গড়ন সাদা রঙের ছোট মাছ। তৎপর্যায়ঃ—খোরি / খয়রা-মু, গাংখয়রা, গাংখলশে-খু, ফুকা, হুগা-শ্রী, করতি-পা. বগু. রং, চাপিলা / চাইপলা / চাপলে-পূব. পা, চাপলি / চাবলি-ব।

খরশল্লা-রাঢ়—খরগুল্লা-খু, খরিশলা-ঢা. টা. পা. বগু, খুরশি, ভাঙ্গড় / ভাঙড়-চ।

টেঁপা—পিঠ সবুজ, পেট সাদা, মুখে ফুঁ দিলে গোল হইয়া ফুলিয়া উঠে। তৎপর্যায় :—পোটকা-ফ. বি. নো, ফোটকা-ম।

টেংরা / ট্যাংরা—এক শ্রেণীর আঁশবিহীন ছোট মাছ। মুখের দুই পাশে এবং পিঠে ছুঁচালো কাঁটা থাকে। বড় জাতের টেংরা—গাগলা, গাগর। ছোট জাতের টেংরা—বাজরা-ঢা. ফ, বজরি-ম। রংপুর কোচবিহার অঞ্চলে টেংরার 'টেংনা' নামও শুনা যায়।

ডাঁড়কে-ন. বর্ধ, **ডঁড়ক্যা**-বগু, **ডানকিনা**-ঢা. ফ. রাঢ়, **ডানিকোনা**-মে—চুনোবর্গের মাছ, দাঁড়ি / দাঁড়কে-চ. ন. রাঢ়, দাড়কিনা-ম, রানী।

ঢাইন, ঢাঁই, ঢ্যাং—সমুদ্রজাত এক শ্রেণীর আঁশবিহীন বৃহৎ মৎস্য।

তপসী / তপসে [সং তপস্বী]—তপসিয়া-পূব, সোনালী রঙের ছোট মাছ, মুখে বিড়ালের গোঁফের মত গোঁফ আছে।

তাজি—কেচকি দ্র।

তারাবাইন—বাইনের প্রকারভেদ। ইহাদের গায়ে তারার মত বহু দাগ থাকে।

তেলাপিয়া—আমেরিকান কই দ্র।

দাঁড়ি / দাঁড়কে—ডাঁড়কে দ্র।

দাঁতনে-দচ—ছোট জাতের মাছ বিঃ।

ধেড়াই, নয়না—ন্যাধশ মাছ।

ধোদামাছ-য—লোনা মাছ।

নলা-পূব—কিলো দেড়কিলো ওজনের ছোট পোনামাছ (রুই)। তৎপর্যায় :—নওলা-য. উব, নউচি-ন, নইচা-ফ, নহলা-মু, গরমা-ঢা. শ্রী, রউকড়া-ম. রা. বগু।

নাইপ্তা—কালো রঙের চুনোজাতীয় মাছ, অনেকেই খায় না।

নাদিন, নান্দিন, নান্দেন—কালবোস ধরনের মাছ, তবে ইহার রং কিছুটা বেগুনী।

নিশে-মে—তপসে জাতীয় মাছ।

নেধশ / ন্যাধশ-ক—এইগুলি সাধারণত জলের তলায় পাঁকে থাকে, মুখ অনেকটা কাতলমাছের মত বিস্তৃত। গায়ে হলদে কালো নানা রকম দাগ থাকে। তৎপর্যায় :—ভেদা-বী / ভেদি / ভেদুরি-পূব, মেনি-ঢা, রয়না-রাঢ়. য.খু. ঢা. ফ. চট্ট, নয়না, খাঁদি-চ. য, পদ্মকাতল-ঢা, ধেড়াই-রং, ধেন্ধা / ধ্যান্ধা-বগু, খড়িকাটি-রা, রাতজাগা-পা, ভেড়ামাছ-শ্রী, লোদৈ-নো।

পটকা—বায়ুস্থলী, ফুটকা-পূব, ইং air bladder.

পাঁকাল / প্যাঁকাল-ক—বাইন জাতীয় মাছ, মুখ ছুঁচালো, লেজ সরু, চামড়া শক্ত। ইহারা সাধারণত পাঁকে থাকে। তৎপর্যায়—গচি-বী. মা. দি. রং, পুঁইয়া / পুঁয়ে-বী. বগু, চিকরা-ম।

পাখনা-ক—মাছের ডানা বিঃ, ফইর-ম, ই° fin। পাখির ডানা, wing.

পেটি—মাছের পেটের অংশ, কোল। কোমরবন্ধ।

পাঙ্গাশ / পঙ্গাশ [স° পিঙ্গশ]—বড়জাতের আঁশবিহীন মাছ।

পাবদা-ক—ছোটজাতের আঁশবিহীন সুস্বাদু মাছ। তৎপর্যায় :—পাব, পাবা-খু, পাবিয়া / পাইব্যা-ম. শ্রী, পাপতা-চা. ফ. উব।

পায়রাতলি-দচ—মৎস্য বিঃ।

পারশিয়া / পারশে-ক—পাকশিয়া / পাকশে-পূব, চেলকা-মে, কিছুটা বাটার ধরন সাদা রঙের মাছ। **পিছা**—মাছের লেজ। ঝাঁটা।

পুঁটি [স° প্রোষ্ঠী, সাঁ° পুথি]—বহু পরিচিত সাদা রঙের ছোট মাছ। ছোট মাছ হইলেও বাঙালীর সাংস্কৃতিক জীবনে ইহা স্থান পাইয়াছে। বিজয়াদশমীর অনুষ্ঠান বিশেষে পুঁটি মাছ না হইলেই নয়।....গোবরে পুঁটি—ইহার লেজের দুইদিকে কালো রঙের দুইটি দাগ থাকে, চেপটা গড়ন।....তিত্‌পুঁটি—ছোট পুঁটি।....সরলপুঁটি-পব—বড়জাতের পুঁটি। তৎপর্যায় :—সরপুঁটি-পূব, সেরনপুঁটি-বগু. রং, পোঁটা-ম. শ্রী।

পুঁয়ে—পাঁকাল মাছ। **পোটকা**—টেপা।

পোঁটা—বড়জাতের পুঁটি, সরলপুঁটি।

পোনা-পব—রুই কাতলা ইঃ বড় মাছের বাচ্চা। তৎপর্যায় :—চারামাছ-চ, পাইকা মাছ-ম, নোয়ারি।....পোনামাছ-পব—রুই কাতলা ইঃ বড় মাছ। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, পূর্ববঙ্গের এক বিস্তৃত অঞ্চলে পনা (পোনা) বা পনামাছ (পোনা-) বলিতে বুঝায় শাল শোল লেটা ইঃর বাচ্চাকে, বড় মাছের বাচ্চা বা বড় মাছকে নয়। শাল শোলের বাচ্চার ঝাঁক তদঞ্চলে 'পনাবাইস' নামে পরিচিত। **পোয়া, পোয়ামাছ**—মাথা বড় লেজ সরু মাঝারি ধরনের মাছ।

ফলি, ফলুই, ফলে—ফলিয়া / ফইল্যা-ম, কান্‌লা-ম. শ্রী, চিতলমাছের ধরন এক জাতের ছোট মাছ। লোকাচার মতে বসন্তরোগীকে আরোগ্যলাভের পর কোথাও কোথাও ফলিমাছ প্রথম পথ্য দেওয়া হয়।

ফুলকা / ফুলকো—মাছের চিরুনিতুল্য শ্বাসযন্ত্র ; ইহার অপর নাম ছাবুয়া / ছাব্যুয়া-ম, ই° gill.

ফেঁশা / ফ্যাঁশা-পব, **ফেউয়া**-ম. শ্রী. ত্রি—খয়রা জাতীয় মাছ। এই মাছে খুব কাঁটা, কাঁটাও খুব সূক্ষ্ম। **বইচা**-ম. শ্রী. ত্রি—কুচো চাঁদা।

বইরালি-কো—ছোট জাতের সুস্বাদু মাছ। **বগোমাছ**—কাঁকাল।

বাইটকা-রাঢ়—বাটা জাতীয় মাছ।

বাইন / বান, বাইম / বাম—পাঁকাল জাতীয় মাছ, হঠাৎ দেখিলে সর্প বলিয়া ভ্রম হয়। ইহাদের মুখ সরু, চামড়া শক্ত; কাদা জলেই ইহারা বেশি থাকে; মুর্শিদাবাদে ইহাদের 'কাদামাছ' নামও শুনা যায়। সাধারণত তিন শ্রেণীর বাইন চোখে পড়ে; গাংবাইন—খুব বড় জাতের। তারা বাইন—গায়ে তারার মত দাগ। কেড়া বাইন—ছোট জাতের বাইন।

বাউস—কালবোস। **বাওলি, বাতাসি**-চ—পাবদা জাতীয় ছোট মাছ।

বাগাড়, বাঘাইড় [বাঘা আইড়]—আঁশবিহীন বৃহৎ মৎস্য; ইহার মুখ অর্ধবৃত্তাকার, গায়ে হলুদ ও কালো রঙের চাকা চাকা দাগ।

বাচা, বাচি-মে—ছোট জাতের আঁশবিহীন সুস্বাদু মাছ।

বাটা—সুস্বাদু মাছ বিঃ। ইহার জাত অনেক : বাটা, কুর্‌চি বাটা (ঘনিয়া দ্র), খড়কে বাটা, টাটকেনি-ঢা. ফ. ব, ভাংনা-ম. পা. রং, ভাঙন বাটা-চ, রাখলা / আখলা-বগু, রায়ফল-ব, রায়েক-ঢা. ফ. খু. পা।

বাঁশপাতা—চেপটা ধরনের সাদা ছোট মাছ, চেলা।

বেত্‌লা-খু—ইহা শিঙি মাছের মত কাঁটা মারে।

বেলে—এই মাছ খুব নরম, অগভীর জলে বালি মাটির উপর শুইয়া থাকে। তৎপর্যায়:—বালকড়া-বী. মু, বালকিড়া / বালকুড়া-হিজ, বালিগড়া-য. শ্রী. রং, বালিয়া / বাইল্যা-পূব, বাইলে-রা. বগু, কটকটিয়া / কটকইট্যা-ম।

বোয়াল / বোল [স° বোদাল, সাঁ° বোয়াড়]—আঁশবিহীন বিস্তৃতমুখ বৃহৎ মৎস্য বিঃ।···রাঘব বোয়াল—খুব বড়জাতের বোয়াল। বাংলার বহু রূপকথা ও ব্রতকথায় এই রাঘব বোয়ালের উল্লেখ আছে। যাহারা পরকে বঞ্চিত করিয়া নিজেরা ফাঁপিয়া উঠে, অনেক সময় বিদ্রূপচ্ছলে তাহাদের প্রতি 'রাঘব বোয়াল' কথাটি প্রযুক্ত হয় ('রাঘব বোয়ালদের শায়েস্তা করতে না পারলে চুনোপুঁটি ধরে কি হবে?')।····বোয়াল পাত্‌য়া-ম—ছোট বোয়াল।

ভুরুঙ্গা-রাঢ়. উব—বিলঝিলের ছোট জাতের রুই।

ভাঙড় / ভাঙড়—পারশে মাছের গড়ন এক জাতের মাছ।

ভেটকি [স° ভেটক]—বড় জাতের প্রসিদ্ধ মাছ। পূর্ববঙ্গে এই মাছটি খুব কম দেখা যায়। ভেটকির ধরন এক মাছকে তদঞ্চলে 'কোড়াল' বলা হয়।

ভোলা—ছোট জাতের সামুদ্রিক মাছ; সুন্দরবনের খালে নদীতে প্রচুর পাওয়া যায়।

মহাশোল, মাশুল—রুই জাতীয় মাছ।

মাগুর [স° মদগুর, সাঁ' মাগরী]—মজগুর-ব ; আঁশশূন্য জাওলা মাছ বিঃ (জাওলা দ্র)।...গাংমাগুর, কানমাগুর—বড় জাতের মাগুর।

মুসা-কো. রং—বাটার ধরন মাছ, কিন্তু ইহাতে কাঁটা কম।

মৃগেল, মিরগেল—মিরকা / মিরগা-পূব, পোনা মাছ বিঃ।

মৌরলা [স° মুরল]—গায়ের দুই পাশে সাদা রঙের দুইটি রেখাটানা ছোট মাছ। তৎপর্যায়ঃ—মকা-শ্রী, মরলা / মলা-ম, ময়া / মোয়া-মু. উব. ঢা, মায়া-খু. য, মলন্দি-ফ, মলান্দি / মলিন্দা-ব, মৌটে-চ. ন, মৌশি-পা, মুরল-মে, মুরলি-দচ, বইচা-নো।

রউ [<হি° রহু, স° রোহিত]—রুইমাছ।...রউকড়া—ছোটরুই (নলা দ্র)।

রয়না—নেধশ। **রায়খরা / রাইখয়রা**-মু. বী, **রায়ফল, রায়েক**-য—বাটা পর্যায়ের মাছ।

রিঠা / রিঠে—আঁশবিহীন একপ্রকার মাছ। ইহার কানকোর দুই পাশে দুইটি ও পিঠে একটি ছুঁচালো বড় কাঁটা থাকে।—ফল বিঃ (ইহা দ্বারা সাধারণত পশমী কাপড় কাচে)।

রুই [স° রোহিত, হি° রহু, সাঁ° রুই]—রউ-ম. উব, সুপরিচিত সর্বোৎকৃষ্ট মৎস্য। কথিত হয়, 'মাছের মধ্যে রুই, শাকের মধ্যে পুঁই।'....মুড়িঘণ্ট—রুই বা তজ্জাতীয় মাছের মাথা দিয়া প্রস্তুত উপাদেয় ব্যঞ্জন বিঃ। রুই—উইপোকা। —শিমুল তুলা।

লাচ'—ছোট জাতের আঁশবিহীন সুস্বাদু মাছ। **লুড়কুচি**-রাঢ়—মৎস্য বিঃ।

লেটা / ল্যাটা-ক—শোল জাতীয় মাছ, কিন্তু শোলের চেয়ে ছোট এবং নরম। তৎপর্যায়ঃ—উকল-ম, উপল-শ্রী, গড়ই-মু. রা. বগু, গড়াই-রং, গড়ুই-রাঢ়, গোটকোন-মু, গুটি-দি. মা, চেংটি / সাঁটি-কো. রং, ছিঙ্গুড়ি-বর্ধ, টাকি-ঢা. ফ. ব, নেটা / ন্যাটা-ন, লাটি / লাইট্যা-ম।....নেটা, লেটা—যে ডান হাতের কাজ বাঁ হাতে করে।

শঙ্কর মাছ, শাকস্-ঢা—সামুদ্রিক মৎস্য বিঃ ; ইহার চাবুকের মত লম্বা লেজ থাকে। **শাটিং**-চ—খয়রা ধরনের মাছ।

শাল মাছ—শোল জাতীয় মাছ ; ইহার গায়ে কালো চাকা চাকা দাগ থাকে। তৎপর্যায়ঃ—গজার, গজাল।

শোল, শৌল [স° শকুল, সাঁ° কারশোলা]—শকুল।

শিং, শিঙ্গি / শিঙি [সং শৃঙ্গী, সাঁ সিসিং]—মাগুর জাতীয় মাছ; তবে ইহার মাথা মাগুরের চেয়ে ছোট এবং ইহার কান্‌কোর দুই পাশে যে দুইটি ছুঁচালো শিং বা কাঁটা থাকে, তাহাদের গালায় (খোঁচায়) ভীষণ ব্যথা হয়। এই মাছ দীর্ঘ দিন জিয়াইয়া রাখা যায়; এজন্য ইহা 'জিওল মাছ' বা 'জিয়ল মাছ'নামেও পরিচিত। বগুড়ায় ইহার অপর নাম 'কানছ্‌'। রোগীর পথ্যরূপে নির্দিষ্ট হইলেও অনেক হিন্দুতে এই মাছ খায় না (হয়ত গোরুর শৃঙ্গের সহিত ইহার নামের সাদৃশ্য আছে বলিয়া)।

শিলোন—আইড় জাতীয় মাছ। তৎপর্যায়ঃ—শিলং-ম, শিলিন্দা-দচ. খু, কচা-বগু। **শেলে**-ক—ভেটকির ধরন সামুদ্রিক মাছ। **সাঁটি**—লেটা দ্র।

স্বুবর্ণখড়িকা / সোনাখড়কে—স্বর্ণাভ খুব ছোট মাছ; সাধারণত ভাজা খায়।

(খ) মাছ ধরিবার নানারকম সাজসরঞ্জাম

চিত্র ছাড়া যেমন মাছের, তেমনই মাছ ধরার বিচিত্র যন্ত্রপাতিরও যথাযথ রূপ ফুটাইয়া তোলা সম্ভবপর নহে। বিভিন্ন অঞ্চলে উহাদের নামই শুধু বিভিন্ন নয়, তাহাদের ধরনগড়নেও পার্থক্য আছে। এখানে সেই সকল সাজ সরঞ্জামের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা দেওয়া হইল :—

আওড়া-ফ—বাঁশের তৈয়ারি দোমুখা ফাঁদ বিঃ।

আটল-পব. ব. খু—বাঁশের সরু কাঠির তৈয়ারি বাক্সের মত ফাঁদ। খুলনাতে ইহার 'চারো' এবং নোয়াখালিতে 'পারল' নাম শুনা যায়।

আতর-ন, **আনতা**-ঢা. ত্রি. নো—বাঁশের ফাঁদ। দুইয়ের গড়নে কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে।

আঁদ-চ—তাল গাছের ডাগের আঁশ। আটল ঘুনি ইঃ বোনার কাজে লাগে। জোয়ালের দড়ি তৈয়ারিতেও ব্যবহৃত হয় (আঁদ দড়ি)।

উকা, উখো—বড় ঘুনি বিঃ।—পাঁকাটির মশাল।

উছ / উছা-ম—চালুনির মত করিয়া বোনা একটি আয়তাকার (oblong) চাটাইয়ের একপাশ দুমড়াইয়া দুইটি কোণ একত্র করিলে ইহার নমুনা পাওয়া যায়। ইহা অনেকটা চাষীদের পেকের ধরন; ইহা দ্বারা শাল শোল লেটা ইঃর পোনায় ঝাঁক ধরা হয়।

উঠ্‌নি—স্রোতের বিপরীত দিকে মাছের গতি।

উড়া জাল—যে জাল উড়াইয়া ফেলা হয়, খেপ্‌লা জাল।

উনিয়া / উইন্যা-ম—বাংলা ৫ প্যাঁচের ধরন বাঁশের সরু কাঠির ফাঁদ বিঃ,—অনেকটা মেদিনীপুরের 'মুগরি'র মত ; ইহাতে সাধারণত মৌরলা ইঃ ছোট মাছ ধরা হয়।

কই জাল / কইয়া জাল-পুব. য. খু—কই শিঙি ইঃর মাথা কিছুটা গলাইতে পারে, সুতা দিয়া এইরূপ খোপ খোপ করিয়া বোনা ২৫-৩০ ফুট লম্বা ২-৩ ফুট চওড়া জাল বিঃ। জলায়, নাবাল ধান জমিতে কই শিঙির চলাচলের পথে এই জাল আড়াআড়িভাবে পাতিয়া রাখা হয়। ইহার অপর নাম 'ফাঁসি-জাল', 'নাগাজাল'-জ. কো।

কনুই জাল—খেপলা জাল (ইহার কতকাংশ কনুইয়ের উপর তুলিয়া ঘুরাইয়া উড়াইয়া ফেলিতে হয়)।

কুঁড়া জাল / কুঁড়ো জাল / কুঁড়ো জালি-পব—সমচতুর্ভুজ (এক একটি ধার ৮-৯ ফুট থাকে) জালের দুই দুইটি কোণের সঙ্গে কোনাকুনিভাবে (diagonally) দুইটি গোল বাখারি অর্ধ বৃত্তাকারে বাঁধিয়া এবং বাখারি দুইটির সংযোগস্থলে একটি বংশদণ্ড (হাতল) সংযুক্ত করিয়া এইজাল তৈয়ারি হয়। ইহা জলে ডুবাইয়া কিছু খুদকুঁড়া ছড়াইয়া দিলে ইহার উপরে চুনোমাছ আসিয়া জড় হয় ; তখন ঐ হাতল ধরিয়া উপর দিকে টানিয়া তুলিলেই মাছ আটকা পড়ে। তৎপর্যায়ঃ—চটকা জাল-রং, ছুপনি জাল / ঝাটি জাল-জ. কো, টাগজাল-ম, ধর্মজাল-য. ফ. নো, শিবজাল।

কেঁচা-মু. বী, **কোঁচ**-ম. ত্রি. শ্রী, **কোঁচা**-উব—লোহার একত্র সম্বদ্ধ বহু চুঁচালো শলার দণ্ডাকার হাতলযুক্ত অস্ত্র বিঃ। **কোনা জাল**-ফ. খু—ইলিশ ধরার জাল বিঃ।

খগরা, খাগরা—সগরা দ্র। **খড়কি জাল**—ইলিশ ধরার জাল বিঃ।

খড়ি-চট্ট —মাছ জড় করিবার জন্য খালে বিলে জোল জমিতে স্থানে স্থানে ডাল-পালা ফেলিয়া রাখা হয়। ঐ সকল স্থানকে খড়ি, কুমোর-ব, ঝাঙ্গড়-মা মান্দা-ম বলা হয়। (উদ্ভিদ দ্র)

খরা / খরা জাল-ম—ইহার অপর নাম ফেটাজাল-চ, ভেসাল জাল-চ. ঢা. ফ. য. খু। একটি চাটাইয়ের একপাশ দুমড়াইয়া দুইটি কোণ একত্র করিলে এই জালের কিছুটা নমুনা পাওয়া যায়। ইহা দ্বারা মাছ ধরিতে দুইজনের প্রয়োজন হয় এবং নৌকা লাগে।

খাতুল—মাছ ধরার বাঁশের ফাঁদ বিঃ।

খুইয়া-ম—হোচা জাল বা ঠেলাজালির ধরন ; ইহা গামছা বা পাতলা কাপড় দিয়া তৈয়ার করা হয়, সাধারণত কুচোমাছ ধরে।

খেপলা জাল / খ্যাপলা জাল-চ. য. ফ. ব—এই জাল কতকাংশ কনুইয়ের উপর তুলিয়া শরীর একটু ঝাঁকিয়া ঘুরাইয়া নিক্ষেপ করিতে হয়। ইহা চক্রাকারে জলে ছড়াইয়া পড়ে। তাড়াতাড়ি যাহাতে তলায় যাইতে পারে, তজ্জন্য ইহার মাথায় বহুসংখ্যক সচ্ছিদ্র লৌহখণ্ড মালার আকারে বাঁধিয়া দেওয়া হয়। এই লৌহখণ্ডগুলির এক আঞ্চলিক নাম 'জালের কাঠি'। অঞ্চলভেদে খেপলা জালের নানা প্রতিশব্দ শুনা যায় : খ্যাওলা জাল-খু, খেয়া জাল-মু, ফিকা জাল-মে, মুঠ জাল, ঝাঁকি জাল-ম. ঢা. ফ. নো, আংটা জাল / ভাউরি জাল-জ. কো, উতার জাল-ঢা, উড়া জাল, ঘুরনি জাল, কনুই জাল, থাপা জাল-ম।

গগন বেড়—বেড় জাল, সাধারণত যে জাল দিয়া সারা পুকুর বেড়িয়া পোনা মাছ ধরা হয়।

গলসা-খু—নদীতে মাছ ধরিবার খুব লম্বা জাল বিঃ।

গাঁতিজাল-চ. রাঢ়—এই জালের বরফির মত ছোট ছোট খোপে কই শিঙি মাগুর ইত্যাদির মাথা আটকা পড়ে। তৎপর্যায়ঃ—কইজাল / কইয়া জাল।

গোবাজাল-চ. খু—এই জাল চার পাঁচ জনে টানিয়া নেয়, অনেকটা গগনবেড়ের মতো।

গোরনালা-বাঁ—মাছ চলাচলের নালা।

ঘাই—জালের ঘর বা খোপ।

ঘাই-চ—জলের উপরে মাছের লেজের আঘাত। তৎপর্যায় :—উগোল / উশকাড়া-য. খু, উশা-ম, উলুশ-ঢা. ত্রি।

ঘুনি-চ. ন. য. খু. বর্ধ. রাঢ়—বাঁশের সরু কাঠির তৈয়ারি বাক্সের ধরন ফাঁদ বিঃ, আন্‌তা-নো।

চটকা জাল—কুঁড়োজাল।

চণ্ডীজাল-ফ—ইলিশ ধরার জাল বিঃ।

চাকুন-দচ—জেলেদের মাছ বহন করিবার বড় ঝুড়ি বিঃ।

চাভিজাল-মু, **ছাবিজাল**-জ. কো—খেপলা জাল বিঃ।

চার—মাছকে প্রলুব্ধ করিবার নানা জাতের সুগন্ধি মশলার পিণ্ড (পুকুরে চার ফেলা)।

চুঁই-বাঁ, **চুঙি**-মে—ফাতনা।

চৌড়া-মে—বাঁশের শলার তৈয়ারি চতুর্মুখ ফাঁদ বিঃ ; ইহাতে বড় বড় মাছ আটকায়।

ছাঁকনি জাল / ছাগনি জাল (ছাঁকনা-/ ছাগনা-)-চ. য. খু. মু. মে—বাঁশের

বাখারি সংলগ্ন একধরনের অর্ধবৃত্তাকার জাল ; এই জালে ভাসা মাছ ছাঁকিয়া তোলা হয়। ইহা 'চাকজাল' 'চাকিনজাল' নামেও পরিচিত।

ছিপ—মাছ ধরিবার সুতা ও বড়শিযুক্ত সরু দণ্ড বিঃ, fishing rod (পুকুরে ছিপ ফেলা)। **ছিপ**—দ্রুতগামী লম্বা নৌকা বিঃ।

জলঙ্গা—সগরা দ্র।

জাকই-জ. কো. বং—সরুমুখ চেপটাতলা মাছের চুপড়ি বিঃ।

জাঙ্গাল—সমুদ্রে মাছ ধরিবার বৃহৎ জাল।—প্রশস্ত উচ্চ বাঁধ।

জান-মে—বাঁশের শলার ঠাসবোনা বেড়া। মাছ আটকাইবার জন্য স্রোতের মুখে বা গভীর জলে যেখানে মাটির বাঁধ দেওয়া সম্ভব নয়, সেখানে প্রায়ই এইরূপ বেড়া বা জাল ব্যবহার করা হয়। তৎপর্যায় :—গড়া-ঢা, বানা-ম, পাটা-দচ. য. খু। জান-কো. বং—মাছ আটকাইবার খাত বিঃ।

জাল, জালি—তুলা পাট শণ বা নাইলন ইঃর সুতা দিয়া খোপ খোপ করিয়া বোনা মাছ ধরার সাজ বিঃ। জাল, জালি (ক্ষুদ্রার্থে) নানা প্রকারের। এক এক রকম জাল দিয়া এক এক রকম মাছ ধরা হয়। বলিতে কি, যত রকমের মাছ, তত রকমের জাল : ইলিশের জাল, পোনামাছের জাল, চুনোমাছের জাল, মৌরলার জাল, কই জাল ইঃ।....জালনৌকা খাটা—জাল ও নৌকা ভাড়া খাটানো।....জালে যাওয়া—জাল ও নৌকা লইয়া মাছ ধরিতে (প্রধানত ইলিশ বা সামুদ্রিক মাছ) যাওয়া। এজন্য জেলেদের বেশ কিছুদিন বাড়ি হইতে দূরে জলে নৌকায় কাটাইতে হয়।

জালি / ঠেলাজালি-ম—চব্বিশপরগনার ফেটাজাল বা ঢাকা ফরিদপুর যশোহরের হোচাজালের মত ত্রিকোণাকার ; কিন্তু ইহার তিনটি বাঁশের মধ্যে ডানদিকের হাতলটি থাকে বেশ লম্বা। এই জাল সামনের দিকে ঠেলিয়া লইয়া যাওয়া হয়। ইহা দ্বারা সাধারণত কুচোমাছ, কুচো চিংড়ি ধরে।

জেলে ডিঙি—বড় বড় নদীতে বা সমুদ্রে মাছ ধরিবার বিশেষ ধরনের নৌকা।

ঝকা / ঝোকা-জ. কো—পোলো। **ঝাঁজরি**—ভেটকি ধরার ফাঁদ বিঃ।

ঝুপড়া-ন, **ঝুপড়ি**-মে—পোলো (জলে চাপ দিবার সময় ঝুপ্‌ঝাপ্‌ শব্দ হয় বলিয়া এইরূপ নামকরণ হইয়া থাকিবে)।

টাগজাল—কুঁড়া জাল দ্র। **টাঙ্গি**-ফ—বড়শির ফাতনা।—ছোট কুড়াল।

টাবানো—মাছ জড় করিবার জন্য ছিপের মাথা দিয়া জলের উপর একনাগাড়ে কয়েকবার আঘাত করা।

খুইয়া-ম—হোচা জাল বা ঠেলাজালির ধরন ; ইহা গামছা বা পাতলা কাপড় দিয়া তৈয়ার করা হয়, সাধারণত কুচোমাছ ধরে।

খেপলা জাল / খ্যাপলা জাল-চ. য. ফ. ব—এই জাল কতকাংশ কনুইয়ের উপর তুলিয়া শরীর একটু ঝাঁকিয়া ঘুরাইয়া নিক্ষেপ করিতে হয়। ইহা চক্রাকারে জলে ছড়াইয়া পড়ে। তাড়াতাড়ি যাহাতে তলায় যাইতে পারে, তজ্জন্য ইহার মাথায় বহুসংখ্যক সচ্ছিদ্র লৌহখণ্ড মালার আকারে বাঁধিয়া দেওয়া হয়। এই লৌহখণ্ডগুলির এক আঞ্চলিক নাম 'জালের কাঠি'। অঞ্চলভেদে খেপলা জালের নানা প্রতিশব্দ শুনা যায় : খ্যাওলা জাল-খু, খেয়া জাল-মু, ফিকা জাল-মে, মুঠ জাল,ঝাঁকি জাল-ম. ঢা. ফ. নো, আংটা জাল / ভাউরি জাল-জ. কো, উতার জাল-ঢা, উড়া জাল, ঘুরনি জাল, কনুই জাল, থাপা জাল-ম।

গগন বেড়—বেড় জাল, সাধারণত যে জাল দিয়া সারা পুকুর বেড়িয়া পোনা মাছ ধরা হয়।

গলসা-খু—নদীতে মাছ ধরিবার খুব লম্বা জাল বিঃ।

গাঁত্তিজাল-চ. রাঢ়—এই জালের বরফির মত ছোট ছোট খোপে কই শিঙি মাগুর ইত্যাদির মাথা আটকা পড়ে। তৎপর্যায়ঃ—কইজাল / কইয়া জাল।

গোবাজাল-চ. খু—এই জাল চার পাঁচ জনে টানিয়া নেয়, অনেকটা গগনবেড়ের মতো।

গোরনালা-বী—মাছ চলাচলের নালা।

ঘাই—জালের ঘর বা খোপ।

ঘাই-চ—জলের উপরে মাছের লেজের আঘাত। তৎপর্যায় :—উগোল / উশকাড়া-য. খু, উশা-ম, উলুশ-ঢা. ত্রি।

ঘুনি-চ. ন. য. খু. বর্ধ. রাঢ়—বাঁশের সরু কাঠির তৈয়ারি বাক্সের ধরন ফাঁদ বিঃ, আন্তা-নো।

চটকা জাল—কুঁড়োজাল।

চণ্ডীজাল-ফ—ইলিশ ধরার জাল বিঃ।

চাকুন-দচ—জেলেদের মাছ বহন করিবার বড় ঝুড়ি বিঃ।

চাভিজাল-মু, **ছাবিজাল**-জ. কো—খেপলা জাল বিঃ।

চার—মাছকে প্রলুব্ধ করিবার নানা জাতের সুগন্ধি মশলার পিণ্ড (পুকুরে চার ফেলা)।

চুঁই-বাঁ, **চুঙি**-মে—ফাতনা।

চৌড়া-মে—বাঁশের শলার তৈয়ারি চতুর্মুখ ফাঁদ বিঃ ; ইহাতে বড় বড় মাছ আটকায়।

ছাঁকনি জাল / ছাগনি জাল (ছাঁকনা-/ ছাগনা-)-চ. য. খু. মু. মে—বাঁশের

বাথারি সংলগ্ন একধরনের অর্ধবৃত্তাকার জাল ; এই জালে ভাসা মাছ ছাঁকিয়া তোলা হয়। ইহা 'চাকজাল' 'চাকিনজাল' নামেও পরিচিত।

ছিপ—মাছ ধরিবার সুতা ও বড়শিযুক্ত সরু দণ্ড বিঃ, fishing rod (পুকুরে ছিপ ফেলা)। **ছিপ**—দ্রুতগামী লম্বা নৌকা বিঃ।

জলঙ্গা—সগরা দ্র।

জাকই-জ. কো. রং—সরুমুখ চেপটাতলা মাছের চুপড়ি বিঃ।

জাঙ্গাল—সমুদ্রে মাছ ধরিবার বৃহৎ জাল।—প্রশস্ত উচ্চ বাঁধ।

জান-মে—বাঁশের শলার ঠাসবোনা বেড়া। মাছ আটকাইবার জন্য স্রোতের মুখে বা গভীর জলে যেখানে মাটির বাঁধ দেওয়া সম্ভব নয়, সেখানে প্রায়ই এইরূপ বেড়া বা জাল ব্যবহার করা হয়। তৎপর্যায় :—গড়া-ঢা, বানা-ম, পাটা-দচ. য. খু। জান-কো. রং—মাছ আটকাইবার খাত বিঃ।

জাল. জালি—তুলা পাট শণ বা নাইলন ইঃর সুতা দিয়া খোপ খোপ করিয়া বোনা মাছ ধরার সাজ বিঃ। জাল, জালি (ক্ষুদ্রার্থে) নানা প্রকারের। এক এক রকম জাল দিয়া এক এক রকম মাছ ধরা হয়। বলিতে কি, যত রকমের মাছ, তত রকমের জাল : ইলিশের জাল, পোনামাছের জাল, চুনোমাছের জাল, মৌরলার জাল, কই জাল ইঃ।....জালনৌকা খাটা—জাল ও নৌকা ভাড়া খাটানো।....জালে যাওয়া—জাল ও নৌকা লইয়া মাছ ধরিতে (প্রধানত ইলিশ বা সামুদ্রিক মাছ) যাওয়া। এজন্য জেলেদের বেশ কিছুদিন বাড়ি হইতে দূরে জলে নৌকায় কাটাইতে হয়।

জালি / ঠেলাজালি-ম—চব্বিশপরগনার ফেটাজাল বা ঢাকা ফরিদপুর যশোহরের হোচাজালের মত ত্রিকোণাকার ; কিন্তু ইহার তিনটি বাঁশের মধ্যে ডানদিকের হাতলটি থাকে বেশ লম্বা। এই জাল সামনের দিকে ঠেলিয়া লইয়া যাওয়া হয়। ইহা দ্বারা সাধারণত কুচোমাছ, কুচো চিংড়ি ধরে।

জেলে ডিঙি—বড় বড় নদীতে বা সমুদ্রে মাছ ধরিবার বিশেষ ধরনের নৌকা।

ঝকা / ঝোকা-জ. কো—পোলো। **ঝাঁজরি**—ভেটকি ধরার ফাঁদ বিঃ।

ঝুপড়া-ন, **ঝুপড়ি**-মে—পোলো (জলে চাপ দিবার সময় ঝুপ্‌ঝাপ্‌ শব্দ হয় বলিয়া এইরূপ নামকরণ হইয়া থাকিবে)।

টাগজাল—কুঁড়া জাল দ্র : **টাঙ্গি**-ফ—বড়শির ফাতনা।—ছোট কুড়াল।

টাবানো—মাছ জড় করিবার জন্য ছিপের মাথা দিয়া জলের উপর একনাগাড়ে কয়েকবার আঘাত করা।

টেঁটা / ট্যাটা—অঙ্কুশের ধরন বর্শা বিশেষ ; ইহার সহিত একটি সরু দড়ি বাঁধা থাকে এবং সেই দড়ি হাতে রাখিয়া বর্শাটি খুব দূরে ছুঁড়িয়া মারা হয়। ইহাতে মাছ, কি অন্য কোনও জন্তু জানোয়ার বিদ্ধ হইলে সহজে ছুটিয়া যাইতে পারে না। তৎপর্যায় :—কাতা, কালা, চল-নো।

টোপ—ছিপে মাছ ধরিবার সময় বঁড়শিতে যে আধার (খাদ্য) গাঁথা হয়।.... টোপ ফেলা—প্রলুব্ধ করা।

ঠুয়া-ম. ত্রি, **ঠুসি**-য. রং—বাঁশের শলির তৈয়ারি একমুখ বন্ধ চোঙ্গাকৃতি ফাঁদ বিশেষ। সাধারণত ক্ষেতের আলে নালি কাটিয়া স্বল্প জলে ইহা পাতিয়া রাখা হয় ; কোনও মাছ একবার ঢুকিলে আর বাহির হইতে পারে না।—গোরুর মুখের আবরণ বিঃ।

ডুরি—চিংড়ি ধরার ফাঁদ বিঃ।—কোঁচের শলা।—সুতলি।—কাছিম বিঃ।

তগি-বর্ধ—দুইটি খুঁটির সহিত জলের ঠিক উপরে একটি সুতলি বাঁধিয়া উহাতে ২।১ ফুটের ব্যবধানে এক একটি বঁড়শি টোপ গাঁথিয়া ঝুলাইয়া রাখা হয়। ইহারই নাম তগি-বর্ধ, দঁড়-চ. মে. য. খু, দাউন / দাওন-ঢা. ফ. ত্রি. বগু, লেইতা বড়ি-নো। **দাঁড়াজাল**-ফ—ইলিশ ধরিবার জাল বিঃ।

দুয়ের, দোয়াইর-ফ—ভাইর-ম, টেপাই / ধিয়োই / ধেরু-জ. কো. রং, ড্রামের ধরন বাঁশের ফাঁদ বিঃ। **ধর্মজাল**-য—কুঁড়োজালি-মু।

ধোড়কা-জ. কো. রং—চোঙাকৃতি বাঁশের ফাঁদ বিঃ। **নেজা**—বর্শা বিঃ।

পচকা-মু—মাছ মারিবার বর্শা বিঃ, টেটা।

পলো / পোলো—পলি / পল্‌হোই-মু, পলুই-বাঁ. বী, পলৈ-শ্রী, পলাই-রা. রং, পলপা-নো, ঝুপড়ি-মে, ঝুপড়া-ম, ঝোকা-জ. কো।

পাতনজাল-ফ—ইলিশ ধরার জাল বিঃ।

ফাতনা-পব—শোলা বা পালকখণ্ড যাহা ছিপের সুতায় বাঁধা থাকে। তৎপর্যায় :— কটি / কড়ি-ঢা, কোঁতারি-পা, চুঁই-বাঁ. বী, চুঙি-মে. রা, চুমা-নো, চো-ব, চুমকা-চট্ট, টাঙ্গি-ফ, তেরেণ্ডা-ম, পাত্‌না-চ, পাতাকাটি, ফাত্‌রা-টা, ফাতা-রা, যুলতা-কো।

ফাঁসজাল-খু, **ফাঁসিজাল**-রং—এই জালে মাছের গলা আটকা পড়ে।

ফেটাজাল / ফেটিজাল-চ—বিস্তৃতমুখ ত্রিকোণাকার জাল বিঃ। সাধারণত ইহাদের বড়গুলিকে ভেসাল জাল এবং ছোটগুলিকে (যাহা হাতে ঠেলিয়া নেওয়া হয়) ফেটিজাল বলা হয়। **বইত্‌নামা**—হাঁউক নামা দ্র।

বড়শি, বঁড়শি <বরিশ—ছিপে মাছ ধরিবার অঙ্কুশের ধরন ছোট কাঁটা বিঃ। ···বড়শি বাওয়া-ম, বড়শি ফেলা—ছিপে মাছ ধরা।

বর্শা—সড়কি, চল, spear. যশোহর এবং খুলনা অঞ্চলে 'বর্শা'র অপর একটি মানে আছে : পাটকাঠির সহিত হাতখানেক সুতায় বঁড়শি বাঁধিয়া টোপ গাঁথিয়া ধানের নামাল জমিতে ফেলিয়া রাখা হয় ; টোপ খাইতে আসিয়া মাছ ধরা পড়ে এবং উহার টানাটানিতে পাটকাঠিটি ধানের গোছায় আটকাইয়া যায়। মাছ মারার এই পদ্ধতি 'বর্শা' নামে অভিহিত হয়।

বাচাড়ি জাল-খু—বড় খেপলা জাল বিঃ ; ইহা একজনে উড়াইয়া ফেলিতে পারে না, ৩-৪ জনে টানিয়া লইয়া যায়।

বিত্তি-বর্ধ—বাঁশের শলির ফাঁদ বিঃ, ঘুনি-চ।

বেউতিজাল / বাউতিজাল-খু, **বেংতিজাল**-দচ—খুব লম্বা জাল ; নদীতে স্রোতের মুখে পাতিয়া রাখে এবং কোথায় পাতা হইয়াছে তদ্বিষয়ে নৌকা চালকদের কোনও চিহ্ন দ্বারা সাবধান করিয়া দেওয়া হয়। নতুবা অনেক সময় এই সব জালে নৌকা জড়াইয়া পড়ে এবং বিড়ম্বিত হয়।

ভাইর-ম—বাঁশের শলির ড্রামের ধরন ফাঁদ বি: (দুয়ের দ্র)।

ভাসানি—সমুদ্রে মাছ ধরার জাল বিঃ। **ভেসালজাল**—(খরাজাল দ্র)।

মাল্লি-কো. রং—মাছ আটকাইবার বাঁধ। **মুগরি**-মে—উনিয়া দ্র।

রামচাক-ন—বড় জাল বিঃ (বৃহৎ অর্থে বাংলায় 'রাম' শব্দের ব্যবহার খুব বেশি। যেমন, রামঝিঙা, রামকলা, রামপাখি, রামছাগল, বোকারাম)।

লোচ / লোট-চ—জালের থলের মত অংশ, যেখানে মাছ গিয়া আটকা পড়ে।

সগরা-রা, **সাগরা**-ঢা. ফ. য. খু—মাছ আটকাইবার বাঁশের চেচাড়ি ও বাখারির তৈয়ারি সরঞ্জাম বিঃ। আয়তাকার বৃহৎ চাটাইয়ের এক পাশ দুমড়াইয়া দুইটি কোণ একত্র করিলে ইহার নমুনা পাওয়া যায় (কিছুটা নদীয়ার 'পেকে'র ধরন)। মাছ জড় করিবার জন্য ইহা ডালপালায় (বিশেষ করিয়া শেওড়ার) ভরতি করিয়া খালে বিলে ডোবায় ডুবাইয়া রাখা হয় এবং ৬-৭ দিন পর পর পাড়ে তুলিয়া প্রচুর মাছ (প্রধানত জাওলামাছ) ধরা হয়। ইহার অপর আঞ্চলিক নাম : খগরা-ম. শ্রী, থাগরা-ব, জলঙ্গা-টা. রং, জালাঙ্গা-জ।

সাবাড়—সমুদ্রে মাছ ধরার সুবৃহৎ জাল। **সারনিজাল**-মে—বেড়জাল বিঃ।

সালাংজাল / সাংলে জাল-ফ. ব. য. খু—ইলিশ ধরার বড় জাল বিঃ।

সুরকি দেওয়া—ছিপের সুতা ঢিল দেওয়া (মাছকে নিয়া খেলাইবার উদ্দেশ্যে)।

হাঁউক নামা-ম, **বইত্‌নামা**-রং—ডাকহাঁক দিয়া পূর্বনির্দিষ্ট দিনে খালে বিলে এক সঙ্গে বহু লোকের মাছ ধরিতে নামা।

হেজা-কো—মাছ ধরার বাঁশের ফাঁদ বিঃ।

হোচা-ঢা. ফ. য. খু—ত্রিকোণাকার ঠেলাজাল বিঃ; ইহার ছিদ্রগুলি খুব ছোট থাকে যাহাতে কুচো মাছও আটকা পড়ে। ইহা ময়মনসিংহের 'খুইয়া' পর্যায়-ভুক্ত।

২ পশু

আঁড়িয়া, আঁড়্যা, এঁড়্যা, এঁড়ে [অণ্ডযুক্ত]—ষাঁড় ('ঘরে আছে বুড়্যা আঁড়্যা ধরে মহাবল'-রারচ)।....এঁড়ে বাছুর—পুং বাছুর (গোরু দ্র)।

ইঁদুর, ইন্দুর [সং ইন্দুর, উন্দুর]—মূষিক, rat, mouse তৎপর্যায়ঃ—উন্দুর-পুব. পা. শ্রী. ত্রি. চট্ট, উন্দর / মুসা-খু, উঁদুর-মে. নো, এঁদুর / এন্দুর-রং, মস / সালেরা-জ. কো।....ছোট জাতের ইঁদুর—নেংটি ইঁদুর / নেংটে ইঁদুর-ক, নেকনাই / ন্যাকনাই-জ. কো, নেঙাই-মু. বধ, বাইতাশলই-টা. ঢা. ফ. ব, বাইত্তা উদুর-নো, বাতারি-ম, শরলা-ম, শলই / শলাই-ব, শলা উন্দর-খু, শলেয়া-রং। ....বড় জাতের ইঁদুর—গেছো ইঁদুর, কটার-বাঁ, ধড়েয়া-কো. রং।....গুঁকড়া—ইঁদুরের মাটি; ওঝারা তুকতাকে ব্যবহার করে।....শিশুদের দাঁত পড়িলে ইঁদুরের গর্তে ফেলিবার প্রথা আছে; তাহাতে নাকি উঠন্ত দাঁত ভাল হয়।

উদ্‌বিড়াল / -বেড়াল [সং উদ্র]—মৎস্যপ্রিয় এবং মৎস্যশিকারী বেজির ধরন জন্তু বিঃ, ইং otter. তৎপর্যায়ঃ—উদ্-ম. শ্রী. ত্রি. নো, ধাড়িয়া / ধাইড়্যা / ধাইড়া / ধেড়ে-য. খু. ফ. ব, ভোঁদড়-পব।

এঁড়ুয়াল-বাঁ—গাভীর স্তন, পালান।

ওঁদা [<অঁওধা]—পুংবিড়াল, হুলা / হুলো।

কইলা / কইলে [<কপিলা]—নবজাত স্ত্রীবাছুর (গোরু দ্র)।

কটা / কডা-ব—কাঠবিড়াল জাতীয় প্রাণী (বড়); ইহারা নারিকেলের প্রভূত ক্ষতি করে।

কটার—গেছো ইঁদুর, বুনো ইঁদুর। **কটাশ**-পব. রাঢ়—খটাশ।

কটি, কটিবানর-ম. ঢা. [তেং কোটি-বানর]—কাঠ-বিড়াল দ্র।

কাকুনী-ম—স্ত্রীমহিষ। **কাচর**-ম—পুংমহিষ (কাঁড়া দ্র)।

কাচিবাছুর—সদ্যোজাত গোবৎস।

কাঠবিড়াল / -বেরালি—পিঠে লম্বা ডোরা, লোমশ পুচ্ছ, ইঁদুরের ধরন

একপ্রকার গেছোপ্রাণী। ইহা ফলাদির খুব অনিষ্ট করে। তৎপর্যায় :—
কক্বা-শ্রী, কটা-ব (বড়জাতের), কটি / কটিবানর-ম. ঢা, কাটবিল্লি-বাঁ. বী,
চলা-নো. চট্ট, ল্যাপার মুশা-মে, ই° squirrel.

কাঁড়া-বাঁ. বী—পুংমহিষ।....স্ত্রী. কাঁড়ী।

কুকুর [স° কুক্কুর,হি° কুত্তা]—প্রভুভক্ত প্রাণী, dog। কুত্তা, কুঁউর / কুঁর-
চট্ট, ভোটা-রং।....কুকুরের জাত অনেক। শিকারী কুকুরকে পূর্ববঙ্গের বহু
অঞ্চলে 'ইশকারী কুকুর' বলিতে শুনা যায়।....খেঁকী কুকুর—যে কুকুর সামান্য
কারণেই খেঁকায়।

কেঁদোবাঘ [কেঁদো <কেঁধো < কাঁধুয়া]—নেকড়ে জাতীয় হিংস্র প্রাণী বিঃ।
ইহার স্কন্ধ উন্নত এবং ইহার আক্রমণের লক্ষ্যস্থলও শিকারের স্কন্ধদেশ। এই
দুই কারণেই হয়ত ইহা এইরূপ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। চট্টগ্রামে
'কেন্দুয়া বাঘ' বলিতে 'হায়না'কে বুঝায়। বীরভূমে ইহার অপর নাম
'শেলেদা বাঘ'।

খটাশ, খাটাশ [স° খট্টাশ / -স]—গন্ধগোকুল / -লা, গন্ধমার্জার, গঁয়দা-উব,
কটাশ-পব. রাঢ়, পাউশ বিড়াল -মু, ই° polecat, civer cat. ইহাদের গায়ে
দুর্গন্ধ, দেখিতে অনেকটা বিড়ালের মত। ডাঙ্গা জমিতে আড়ভাবে গর্ত
করিয়া বাস করে; শীতকালের রাত্রিতে ইহাদের হো-হো-হো ধ্বনির মত
চীৎকার শুনা যায় ('উলুবনে খটাশ বাঘ'-প্র)।

খরগোশ, খরা-দচ, **খেরয়া**-মে [ফা° খরগূশ্, হি° খরহা]—শশক, hare
(বড় জাতের), rabbit (ছোট জাতের) (শশা দ্র)।

খেঁকশিয়াল / -শিয়ালি—ছোট জাতের শিয়াল, পাতি শিয়াল, ই° fox.

গয়াল—গো জাতীয় বন্য জন্তু বিঃ।

গাড়ল [<গড্ডল]—বড় জাতের ভেড়া।—গালি বিঃ, যে পরের বুদ্ধিতে চলে।

গোবাঘা—যে বাঘের আক্রমণের লক্ষ্য প্রধানত গোরুবাছুর; বড় জাতের
বাঘ। আবার কাহারো কাহারো মতে 'গোবাঘা' 'হায়না'রই নামান্তর।

গরু, গোরু [<গোরূপ]—গোজাতির সাধারণ নাম। বাংলায় গোরু বলিতে
স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে উভয় জাতির গোরুকেই বুঝায়। ১০

(১) **পুংগোরু:** ষাঁড় [স° ষণ্ড, হি°সাঁড়]—বৃষ, ox. তৎপর্যায় :—
আঁড়িয়া / এঁড়ে (অণ্ডযুক্ত), ডেকা-পূব।....ধর্মের ষাঁড়, রাউলের ষাঁড়, খোদার
ষাঁড়-মুস—যে ষাঁড় স্বাধীনভাবে ইতস্তত চরিয়া বেড়ায়, যে ষাঁড়ের

উপর কাহারও দাবিদাওয়া নাই। সাধারণত হিন্দুরা পরলোকগত আত্মার শান্তি কামনায় বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধে এইরূপ ষাঁড় উৎসর্গ করিয়া থাকে।....বিরিষ, ব্যারেষ [<বৃষ]—বৃষের অপভ্রংশ। সাধারণের মুখে শ্রাদ্ধে প্রদত্ত ষাঁড়ের এইরূপ নাম শুনা যায়।....বিচাল / ভুলুয়া-শ্রী—লড়াইয়ের ষাঁড়।....মহাকাল—বৃহদাকার ষণ্ড, যাহা শিবের মন্দির প্রাঙ্গণে চরিয়া বেড়ায়। শিব।

বলদ, বর্‌দা-পু [<বলীবর্দ]—ছিন্নমুষ্ক ষণ্ড। তৎপর্যায়:—আবান-ঢা, আবাল / আওয়াল-ষ. ত্রি, দামড়া, দামা-শ্রী।....হেলে-চ. ন. মু, হেল্যা-মে, লাঙলা গোরু মু—যে গোরু লাঙ্গল টানে। ....বাইচে—লাঙ্গল বা গাড়ি টানিতে পটু। ....আচোট-দচ, আবোর-মু. বী, আবট-বাঁ—যে গোরু লাঙ্গল বা গাড়ি টানিতে অভ্যস্ত নয়।....দরজা গোরু—লাঙ্গলাদি টানিতে অপারগ রুগ্ন বা বৃদ্ধ গোরু। ....গড়িয়া বলদ—যে বলদ লাঙ্গলাদি টানিবার সময় বার বার শুইয়া পড়ে।

(২) **স্ত্রীগোরু:** গাই, গাভী [স° গবী, হি° গায়]—স্ত্রীগোরু, যে গোরুর বাছুর হইয়াছে, cow.....বৈতরণী—শ্রাদ্ধাদিতে যে স্ত্রীগোরু বা বকনা উৎসর্গ করা হয়।—উড়িষ্যার নদী বিঃ। যমালয়ের কল্পিত নদী।....গাব্বিন-বাঁ, গাভিন-পুব, ডেকী-শ্রী—গর্ভিণী (গাভিন গাই)।....পলোটী—যে গাভী প্রথম প্রসব করিবে।....গাভড়া—যে গাভীর গর্ভপাত হইয়াছে।....কেলেন—যে গাই প্রতি বৎসর গাভিন হয় না।....কাচিগাই [কাচি<কচি ?]—নবপ্রসূতা গাভী। ....হেতো-ষ—যে গাভীর বাছুর নাই, যে গাভীর কৃত্রিম উপায়ে দুধ দোহন করা হয়।....দুধালো / দুধলো, দুধেল—দুগ্ধবতী।

গাভী সংক্রান্ত অন্যান্য শব্দ: পাল—গবাদি পশুর সঙ্গম।....পাল যাওয়া, পাল পাওয়া, ডাকা—গবাদি পশুর সঙ্গমকাল উপস্থিত হওয়া।....পাল দেওয়া, পাল ধরানো—গবাদি পশুর সঙ্গম করানো, breeding. ....গাভ—গর্ভ।.... বিয়ান / বিয়েন—প্রসব।....আঁওল-রাঢ়, জল/ফুল-পুব. মু—প্রসবের পর গাভীর উদর হইতে রক্তমাংস জড়িত যে পদার্থ বাহির হয়।....পালান [তা° পাল / তে° পালু=দুধ]—গাভীর স্তন। তৎপর্যায়:—উর্‌-ম, এঁড়ুয়াল-বাঁ, ওলান-নো. ত্রি।.... বাঁট, বান-ম—স্তনের বোঁটা, যাহা দিয়া দুধ বাহির হয়।....পানান / পানানো—দোহন করিবার পূর্বে বাছুরের সাহায্যে কিংবা কৃত্রিম উপায়ে বাঁটে দুধ আনা। ....ছাঁদ, ছাঁদনদড়ি—দোহন করিবার সময় যে দড়ি দিয়া গাভীর পিছনের পা বাঁধা হয়।....ফুকা—গাভীর যোনিতে ফুঁ দিয়া দোহনের প্রক্রিয়া বিঃ। দোহন—দোয়া, দুধ বাহির করা।

(৩) **বাছুর**[[বৎসরূপ]—গোবৎস, calf.····কমলে বাছুর-য, কাচি বাছুর-ম, কোঁএলা বাছুর—সদ্যোজাত বাছুর।

(ক) পুং বাছুর—এঁড়ে, এঁড়ে বাছুর, ডেকাবাছুর, ষাঁড়বাছুর। (খ) স্ত্রীবাছুর —কাঁড়ুল-চট্ট, কইলা / কইলে-পব, নই-ন. বর্ধ, ফেটানী-বী, বকন / বকনা / বকুন বাছুর, বাচ্চি-জ. কো।····শড়কা—মৃত অবস্থায় প্রসূত গোবৎস।

(৪) **আকৃতিপ্রকৃতিঅনুযায়ীগোরুকেনানাবিশেষণেবিশেষিত করা হয় :** কোটা, কোটাশিঙে—যে গরুর শিং নীচের দিকে বাঁকানো। ···স্বর্গপাতালে—যে গোরুর এক শিং উপর দিকে, আর এক শিং নীচের দিকে বাঁকানো।···· মৈনা, মেনা শিঙে—যে গোরুর শিং নড়ে।····ফেটা শিঙে / ফ্যাটাশিঙে—যে গোরুর শিং পাশের দিকে হেলানো।····শিয়াল লেজা—যে গরুর লেজের আগায় খুব বেশি লোম।···হনুলেজা—যে গোরুর লেজ খুব লম্বা।····বুগদা—যে গোরুর নাভি খুব ঝুলানো।····ধবলী, হাঁসা—সাদা রঙের গোরু।····কেলে, শ্যামলা, শ্যামলী—কালো রঙের গোরু।....পিয়ালা—লাল রঙের গোরু।···গুড় পিয়ালা—গুড়ের মত রং যে গোরুর।····মাট পিয়ালা—ধূসর বর্ণের গোরু।···· শিকটানা—যে গোরু পা টানিয়া টানিয়া হাঁটে। ....নাগ ফেণী—যে গোরু সাপের মত জিহ্বা বাহির করিয়া বার বার নাকে ঢোকায় ও বাহির করে। ঝনকা—রাগী গোরু, যে গোরু (হেল্যা) গুঁতায়।

(৫) **বিবিধ :** ষাঁড়ের ঝুঁটি—ষাঁড়ের স্কন্ধের উচ্চ মাংসপিণ্ড, ককুদ। তৎপর্যায়: —গজ-ম, চোচ-চা, ঝিটা-মে।···গুপাইল-য—লেজের লোমগুচ্ছ।····লতি—গলকম্বল ; dewlap.····হাম্বা<হম্বা—গোরুর ডাক।··· আঁওসা / এঁসো, খুরাই —গোরুর মুখের বা খুরের ঘা।....বাতা—গোরুর মুখে বা খুরে ঘা হওয়া।···· ভাগাড়, গোভাগাড়—মৃত গোমহিষাদি যেখানে ফেলা হয়।···পেরাই / প্যারাই —গবাদির মুষ্কছেদন।···ঠরকা—গোরুর গলার কাঠের ঘণ্টা।

গোরু সংক্রান্ত প্রবাদ বচনেরও অন্ত নাই : গোরু মেরে জুতো দান,এড়া গোরুর দেড়া টান, হিসাবের গোরু বাঘে খায় না, ষাঁড়ের শত্রু বাঘে মারে, ঘরপোড়া গোরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ভয় পায়, অবোধের গোবধেই আনন্দ, ক-অক্ষর গোমাংস, গোজন্মে মুক্তি, গোরু বিকায় ঠাটে, -কাপড় বিকায় পাটে, কানা গোরুর ভেনো ডয়র, দুধ দেয় গোরুর লাথিও ভালো, কাজির গোরু খোদা রাখাল, এক গোয়ালের গোরু, কালো গোরুর দুধ ভালো, কানা গোরু বামুনকে দান,—বামুন বলে আমার সর্বকল্যাণ॥

বাঙালীর **আচার অনুষ্ঠানে গোরু** বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছে। হিন্দুরা গাভীকে লক্ষ্মীর প্রতীক মনে করে। বৃষ মহাদেবের বাহন। মৃতের আত্মার সদ্‌গতি কামনা করিয়া তাহারা শ্রদ্ধাদি কৃত্যে বৃষ, বৎসতরী ইঃ উৎসর্গ করে। পৌষসংক্রান্তিতে এবং চৈত্রসংক্রান্তিতে, কার্তিকী অমাবস্থায় এবং অন্য কোন কোন সময়ে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে নানাভাবে গোপূজার রীতি আছে (আচার-অনুষ্ঠান 'বাঁধনা' দ্র)। গোরু বাঁধা অবস্থায় আগুনে পুড়িয়া মরিলে, গৃহস্থকে দাঁতে কুটা করিয়া, গলায় দড়ি ঝুলাইয়া চালপয়সা মাগিয়া আনিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে দেখা যায়।

গোরুর দেবতার মধ্যে গোরক্ষনাথ / গুরুখনাথ, ত্রিনাথ, সোনারায়, মানিক-পীর, গাজীপীর, পাঁচপীর প্রভৃতি প্রধান।

গোসাপ—গোধা, গোধিকা। তৎপর্যায় ঃ—গোধি-পু, সোনা গোধা-মু. বী, গুইল -পূব. শ্রী. ত্রি. নো, গুইসাপ-পা. টা. ঢা, গোহেড়কেল-দচ, গুঁইহাঁডোল-ন।

চিকা, চিয়া [সং চিক্ক]—গন্ধমূষিক (ছুঁচা দ্র)। চিকা—× ঢেড়া চিহ্ন।

ছাগল—সংস্কৃতে ছাগল বলিতে স্ত্রীপুরুষ উভয়কেই বুঝায়। কিন্তু বাংলায় ছাগল মানে স্ত্রীছাগল, ছাগী, পাঁঠী, বকরী, she goat.....ধাড়ী, ডার-বী—যে ছাগলের অনেকবার বাচ্চা হইয়াছে।....বুড়ো ধাড়ী—গালি বিঃ।....পুংছাগল—ছাগ, পাঁঠা, বকরা, he goat.....রামছাগল—বড়জাতের ছাগল।—গালি বিঃ, নির্বোধ।....খাসী [আং খস্‌সী] ছিন্নমুষ্ক ছাগ।

ছুঁচা / ছুঁচো [সং ছুছুন্দরী]—গন্ধমূষিক, ইং shrew ('বাহিরে কোঁচার পত্তন, ভিতরে ছুঁচোর কেত্তন'-প্র)—তৎপর্যায়ঃ—চিকা-পূব. উব, চিয়া-চট্ট, সাঁইল্যা-কো. রং। ছোঁচ, ছোঁচা—অতি নীচ প্রকৃতির লোক, ঠগ।

ছেদা-শ্রী, ছেদার-কো. রং [সং ছেদার]—শজারু, ইং porcupine.

টলা-শ্রী. ত্রি—বনবিড়াল।

টিকিয়া-চট্ট—চিতাবাঘ, গায়ে চাকা চাকা দাগ, leopard.

ধেড়ে [<ধাড়িয়া]—মৎস্য শিকারী জন্তু বিঃ (উদ্ দ্র)।....ধেড়েঘাটা—চিত্রা নদীর তীরবর্তী বাংলাদেশের যশোহরের একটি গ্রাম। হয়ত এককালে এই স্থানটি ধেড়ে অধ্যুষিত ছিল এবং এখানে জেলেরা ধেড়ের সাহায্যে মাছ ধরিত।

নই—স্ত্রীবাছুর। নদী ('কেনা বাঁশী বায়ে বড়ায়ি কালিনী নই কূলে'-শ্রীকৃ)।

নেউল, নেউর-শ্রী [সং নকুল, হিং নেওলা]—বেজি, বেঁজি, বিজি-মু, ইং mongoose.

নেকড়ে, নাকাড়ি [<নেকড়িয়া]—নেকড়ে বাঘ, wolf.

নেকনাই-জ. কো. ত, **নেঙাই**-বর্ধ. মু—নেংটি ইঁদুর। **নেল**-ঢা—ভাম।

পঁড়া-মে, **পাঁড়া**-দি. মা—পুংমহিষ।....পাঁড়ী—স্ত্রীমহিষ (মহিষ দ্র)।

ফেউ, ফেউর [<ফেরু]—শৃগাল ('বাঘের পেছনে ফেউ'-প্র)।....ফেউলাগা—মিছামিছি উত্ত্যক্ত করা।

বাঘ—ব্যাঘ্র (বর্তমানে ভারতের জাতীয় পশু)। সুন্দরবনের অতিকায় বাঘকে Royal Bengal Tiger বলা হয়। গোবাঘা, চিতাবাঘ, নেকড়ে বাঘ, বাঘডাসা, বাঘরোল, বাঘালিয়া, ব্যাঙরাল—ইহারা নানাশ্রেণীর বাঘ বা বাঘের তুল্য জীব।....বাঘা—বাঘের তুল্য। বাঘ অর্থেও বাঘা শব্দটির প্রচলন আছে ('বাঘায় বুলে বাঘুনী ওরে, ঐ না পথে যাইও। অমুকের গোরু দেইখ্যা সেলাম জানাইও'-ম—কার্তিক ব্রতের গীত। অমুকের স্থলে কাহারো নাম বলা হয়)।.. বাঘিনী, বাঘুনী—স্ত্রীবাঘ।

কৃষ্ণরাম দাসের **'রায়মঙ্গলে'** ব্যাঘ্রদেবতা দক্ষিণরায়ের ও বড় খাঁ গাজীর **বহু বাঘ-বাঘিনীর নামের উল্লেখ** আছে। এই সকল নাম যে কবির নিছক কল্পনাপ্রসূত, তাহা নহে। অনেক নামই উহাদের আকৃতি-প্রকৃতি লক্ষ্য করিয়া, উহাদিগকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করিয়া ব্যাঘ্র অধ্যুষিত অঞ্চলের সাধারণ মানুষের দেওয়া। কালানল / পাবকমুখী - যে বাঘের মুখ-গহ্বর আগুনের মত লাল ও ভয়ঙ্কর। কাশুয়া বাঘরোল—যে বাঘ কাশবনে থাকে। কিড়িমিড়ি—যে বাঘ শিকার দেখিয়া দাঁত কিড়মিড় করে। গুড়গুড়্যা—যে চুপি চুপি শিকারের দিকে অগ্রসর হয়। টঙ ভাঙ্গা—যে বাঘ টঙ ভাঙ্গে। দাবাড়া—যে দাবাড় দেয়। পাটাবুকা—বুক যাহার পাটার মত প্রশস্ত। ফেটানাকা—যে বাঘের নাক খুব চওড়া। নাদাপেটা—যে বাঘের পেট নাদার মত বড় ও গোল। বাটপাড়্যা—যে বাঘের ব্যবহার বাটপাড়ের মত। বিলকাঁধা—যে বাঘ বিলঝিলের ধারে শিকারের আশায় ওত পাতিয়া থাকে। বেড়াভাঙ্গা—যে বাঘ বেড়া ভাঙ্গে। মাচবাঘরোল—মাছখেকো বাঘ। লক্লকি—যাহার জিহ্বা লক্ লক্ করে। হুড়কাখসানে—ঘরে প্রবেশ করিবার জন্য যে বাঘ হুড়কা খসাইতে চায়। হোগলাবুনিয়া—যে বাঘ হোগলাবনে থাকে। হামলা—যে বাঘ যখন তখন আসিয়া হামলা বাঁধায়। হুমো—যে বাঘ হুম্ হুম্ ডাকে (হুম, হালুম —বাঘের ডাক)। দক্ষিণরায়ের ব্যাঘ্রবাহনের নাম 'লোহাজঙ্গ দানা' এবং বড় খাঁ গাজীর বাহনের নাম 'খান দাউড়া' / 'খান দাউদা'।

এই হিংস্র জন্তুটিকে কেন্দ্র করিয়া বাংলায় অসংখ্য ছড়া-গান, কথাকাহিনী, লোককৃত্য ও লোকাচারের সৃষ্টি হইয়াছে। ব্যাঘ্রদেবতারূপে অনেক পীর-দেবতা পূজা ও শিরনি পাইয়া থাকেন। **প্রসিদ্ধ ব্যাঘ্র দেবতা ও পীরের নাম** :—দক্ষিণবঙ্গে (দচ. খু. য, সুন্দরবন) দক্ষিণরায়, বড়খাঁ গাজী, মোবারক গাজী ও বনবিবি ; উত্তরবঙ্গে (রংপুর, পাবনা) সোনা রায় বা সোনাপীর ; পূর্ববঙ্গে (ম. ত্রি. শ্রী) বাঘাই ঠাকুর, গাজীসাহেব ও শালপীন ; ঝাড়খণ্ডে বাঘুৎ। বীরভূমের বাঘরায়চণ্ডীকেও কেহ কেহ ব্যাঘ্রাসীনা ব্যাঘ্রদেবতা বলিয়া থাকেন। ইঁহাদের মাহাত্ম্যজ্ঞাপক বিবিধ ছড়া পাঁচালী গাহিয়া বাংলার (পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশ) বহু অঞ্চলে ছেলেপিলেরা পৌষমাসে 'মাগন' মাগে, শিরনি দেয়, চড়ুইভাতি করে। ময়মনসিংহে পৌষমাগনের ঐ সকল ছড়াগানের লোকপ্রসিদ্ধ নাম **'বাঘাইর বয়াত'**, নদীয়ায় **'ভারবোল'**, বরিশালে **'কুলাইর মাগন।'**

বাঘডাসা-পূব. শ্রী. ত্রি, **বাঘরোল**-চ. খু, **বাঘালিয়া / বাঘাইল্যা**-ম. শ্রী. ত্রি—ছোট জাতের বাঘ বা বাঘের তুল্য জন্তু বিঃ ; ইহারা সাধারণত হাঁস মুরগী ছাগল ইঃর উপর আক্রমণ চালায়।

বাঙ্গর-ম—মহিষ। **বাতারি, বাতাশলই**—নেংটি ইঁদুর (ইঁদুর দ্র)।

বাঁদর, বাদর, বান্দর [সং বানর, হিং বন্দর]—কপি, বহু পরিচিত চঞ্চল প্রকৃতির লোমশ প্রাণী বিঃ। ইহারা ফলফুলাদির খুব অনিষ্ট করে, অথচ সংস্কারবশত কেউ ইহাদিগকে প্রাণে মারে না।....হুপ—বানরের ডাক।

বিড়াল—মার্জার, cat. বেড়াল, বেরাল—বিড়ালের রূপভেদ। তৎপর্যায় :—বিলই-ব, বিলাই -উব. পূব, বিলি -বগু, বিলেই-চট্ট [হিং বিল্লী, তেংপিল্লী], মিউর-চট্ট, মেউর-খু, মেকুর-পূব. ন. য [সং মার্জার], নাকার-জ. কো. রং। বাঘের সহিত বিড়ালের কতকটা আকৃতিগত সাদৃশ্য আছে বলিয়া ইহাকে 'বাঘের মাসী'ও বলা হয়।....**পুংবিড়াল**—মদ্দাবিড়াল [ফাং মর্দ], উন্দা-পুব, ওঁদা-পব [<ঔওধা], উলা- পুব, হুলা / হুলো(হোলযুক্ত), ভোঁজা-নো।....**স্ত্রীবিড়াল**—মাদীবিড়াল, মেই, মেচি, মেনি।

বনবিড়াল—বাটবিলাই-জ. কো, উআঁপ-ম, মোআঁপ-নো. চট্ট, গাওড়া-ফ.ব. মু, টলা-শ্রী, গাড়ো / গাড়োয়া-উব. ত্রি। ইহাদের ডাক অনেকটা 'উআঁপ' কি 'মাঁপ-এর মত। শেষরাত্রিতে যখন বনবিড়ালের ডাক শুনা যায়, তখন বৃদ্ধাদের কেহ জিজ্ঞাসা করে, 'সুখ না দুখ' ? জিজ্ঞাসার পর শ্রুত ডাকের ভঙ্গি হইতে

প্রশ্নকারিণী আপনার ভাগ্যে কি আছে বুঝিয়া লয়।...বিড়ালতপস্বী—ভণ্ড। **বিড়ালের পোষমানা** সম্পর্কে নানা গল্পকথা, কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। অঞ্চলভেদে কালো বিড়ালকে ষষ্ঠীর বাহন বলা হয়। মাছের কাঁটা ফুটিলে বিড়ালের পা ধরিতেও দেখা যায়।

ভইষ, ভঁইষ—মহিষ।...ভয়ষা, ভঁয়ষা—মহিষজাত (—ঘি,—দই)।

ভাম-পব—ইহারা একদিকে যেমন কলা কাঁঠাল ইঃ ফল বিনষ্ট করে, অন্যদিকে তেমনই হাঁস মুরগী ইঃর উপরও আক্রমণ চালায়। তৎপর্যায়ঃ—নেল-ঢা, লঙ্গর-ম, নারকেল-খু, ডিগলাজ-নো।

ভেড়া [স° ভেড়, হি° ভেঁড়]—মেষ, sheep. তৎপর্যায়ঃ মেড়া, গাড়ল।.... স্ত্রী. ভেড়ী, ewe. ....ভেড়ুয়া / ভেড়ো—ভেড়ার তুল্য, ভীতু।—স্ত্রৈণ।—বাইজীর সহিত যে বাজায় বা সঙ্গত করে।...ভেড়ার ঘর—(আচার-অনুষ্ঠান দ্র)।

ভোঁদড়—মৎস্যশিকারী জলজন্তু বিঃ ('ওরে ভোঁদড় ফিরে চা, খোকার নাচন দেখে যা ॥'—ছড়া)।

মহিষ, মোষ [হি° ভৈঁসা]—মহিষ, ভইষ / ভঁইষ-পূব, বাঙ্গর-ম।....পুংমহিষ —আন্না-ন. মু, কাচর, চলা-চট্ট, পঁড়া-মে, পাঁড়া-দি. মা, কাঁড়া-বাঁ. বী, বয়ার-ম।....স্ত্রীমহিষ—কাকনী, কাঁড়ী-বাঁ. বী, পাঁড়ী-দি. মা।........অর্নি—বুনো মহিষ।....মইষাল—যে মহিষ চরায়, মহিষের রাখাল। মইষাল ও পল্লীবালার প্রেম ও পূর্বরাগ লইয়া বাংলায় অনেক লোকগীতি ও গীতিকা ('মইষাল বন্ধু') রচিত হইয়াছে। **মাদী** [ফা° মাদা]—স্ত্রী জন্তু (মাদী বিড়াল)।

মেকুর [স° মার্জার]—বিড়াল।

রাউলের ষাঁড়—গোরু দ্র।....কোনও যুবক যদি উপার্জন না করিয়া অপরের উপর বসিয়া খায়, তবে অনেক সময় তাহার প্রতি 'রাউলের ষাঁড়' কথাটি প্রযুক্ত হয়।....রা'ল, রাউল—সূর্য।

রান [ফা°]—পশ্বাদির উরুদেশ (পাঁঠার রানের মাংস)।

লঙ্গর-ম. রা. পা—ভাম দ্র।

লাফা, লাফারু [লাফ (লম্ফ)+আরু]—যে লাফাইয়া চলে, খরগোশ।

শরলা, শলই,/ শলাই, শলেয়া—নেংটি ইঁদুর, mouse.

শশা [স° শশ+আ]-উব, **শশারু** [স° শশ+আরু]—শশক, খরগোশ, তৎপর্যায়ঃ—শুশা-ত্রি, শোঁশা-বাঁ. বী, শ্যাশা-জ. কো, খড়া-দচ, খেড্যা-মে,

লাফা-খু, লাফাঙ্-ন. পা. ফ. ব. য, ভোট-উব, ফটিয়া / ফইট্যা-ম।

শিয়াল, শেয়াল [স° শৃগাল,] বিভিন্ন ভাষার সাহিত্যে শৃগালকে অতি ধূর্ত প্রাণী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে এবং ইহার সম্বন্ধে নানা উপকথা প্রচলিত আছে।

শুশু-ক [স° শিশুক]—স্তন্যপায়ী জলজন্তু বিঃ। তৎপর্যায় ঃ—শুশ্‌নি-দচ, শুশুঙ্-ঢা, শোঁশ, তালভোস-মু. বর্ধ, হু-শ্রী, শিশু-ম. পা. বগু. রা।

শেলেদা-রাঢ়—কেঁদো বাঘ।

শোরেল—বন্য প্রাণী বিঃ।

সজারু / শজারু [স° শল্লকী, হি° সাহিল]—গায়ে লম্বা কাঁটাযুক্ত পশু বিঃ ; porcupine. তৎপর্যায় ঃ—শেজা / শ্যাজা-পূব, শ্যাজার-পা. শল্ল-ন, ছেদা-শ্রী, ছেদার-কো. রং।

হেঁড়োল-হা. হু. বর্ধ, হোঁড়ল-মু. মে, **হোঁদড়-ক—হায়না**, hyena. তৎপর্যায়ঃ —কেঁদো বাঘ (?), কেন্দুয়াবাঘ-চট্ট, শেলেদা- রাঢ়।

৩। পাখি

আণ্ডা, এণ্ডা [স° অণ্ড]—ডিম, egg. ....আণ্ডাবাচ্চা—ছানাপোনা (পাখি সম্পর্কে), ছেলেপিলে (মানুষ সম্পর্কে)।

আধার / আদার—পাখির খাদ্য।

আলা-চ—একস্থানে অবস্থিত বহু পাখির বাসা। আলো।

কড়গাই-ঢা—পাখি বিঃ।

কড়ুলি-চ—একজাতের হাঁস।

কবুতর [ফা°. হি°]—পায়রা, ই°pigeon. কবতুর-মে, কবিতর-ন. মু, কইতর-ম. ঢা. টা. শ্রী. ত্রি. নো. চট্ট,কতুর-পা. য, কোতৈর-ফ. ব—কবুতরের বিভিন্ন আঞ্চলিক রূপ (পায়রা দ্র)।

কাক, কাগ [হি° কৌওয়া]—বহু পরিচিত পাখি, ই° crow. কাকের বিভিন্ন আঞ্চলিক রূপ ঃ—কাই / কাউয়া-চট্ট, কাইয়া-টা. ঢা. দি. মা, কাউ / কাউয়া-পূব. শ্রী. ত্রি. উব, কাও-য, কাওয়া / কুয়া-মে, কেওয়া / কেউয়া-বাঁ, কৌয় / ক'য়ো-বী.মু, কোয়া / কোয়্যা-পা।....**বড়জাতের কাক**—দাঁড়কাক-ক, দাঁওকাক-য, ডালকৌয়-বী, ঢাল কাউয়া-কো. রং, ধার কাউয়া-রা. বগু, ধোর কাউয়া-চট্ট। ইহাদের সর্বশরীর কালো।....**ছোট জাতের কাক**—পাতিকাক-ক, পাতিকাউয়া / ধুরাকাউয়া-ম....। ইহাদের গলদেশ ধূসর। কা—কা—কাকের স্বাভাবিক ডাক ; কিন্তু নানা ভঙ্গিতে ইহাদের আরও নানারূপ

ডাক শুনা যায়। ইহার কর্কশ শব্দ ও খলপ্রকৃতি গৃহস্থকে দিনভর উত্ত্যক্ত করে। কাককে অশুভ বার্তাবহও মনে করা হয়; বিভিন্ন সময়ে ইহাদের নানা ভঙ্গির ডাক, পক্ষবিধুনন বৃদ্ধাদের মনে নানারূপ আশঙ্কা জাগাইয়া তোলে।.... কাকবলি, কাগবইল-পূব—নবান্নে, মৃতাশৌচে কাকের উদ্দেশে দেয় নৈবেদ্যাদি। অনেকের বিশ্বাস, শ্রাদ্ধ শান্তি না হওয়া পর্যন্ত মৃত ব্যক্তির আত্মা কিছুকাল কাকদেহে অবস্থান করে এবং পিণ্ডাদি কাকরূপেই গ্রহণ করে। কোন কোন দেবতাও (যেমন, বনদুর্গা) কাকরূপেই ভক্তের নৈবেদ্য গ্রহণ করিয়া থাকেন। বাংলা প্রবাদে এবং উপকথায় কাক একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছে।

কাক, কাগ [স° কর্ক, ই° cork]—শিশি বোতলের ছিপি।

কাকাতুয়া—শুক জাতীয় পাখি বিঃ, parrot. ইহার মাথায় ঝুঁটি আছে।

কাঠঠোকরা—ইহাদের চঞ্চু দীর্ঘ ও তীক্ষ্ণ; বৃক্ষাদি ঠোকরাইয়া কোটর করিয়া অথবা স্বাভাবিক কোনও কোটরে ইহারা বাস করে এবং পোকামাকড় খায়; ই° woodpecker, ঠক্কর পাখি-খু ('গাছে ছিল ঠক্কর পাখি ঠোক মারিল'-যশুছড়া)।

কাদাখোঁচা—লম্বা ঠোঁটওয়ালা ছোটজাতের পাখি বিঃ; জোঁক, কেঁচো ইঃ খায়; হি° চাহা, ই° snipe.

কানাকুয়া-ঢা. ফ. য, **কুকু / কুকো**-৮চ, **কুকুয়া / কুক্যুয়া**-ম—দাঁড়কাকের মত বড় কালো ও ধূসর রঙের পাখি, ঠোঁট কিঞ্চিৎ বাঁকা ও ছুঁচালো, ডাক অনেকটা 'কুক্-কুক্'-এর মত শোনায়। ঝোপে ঝাড়ে বাসা বাঁধে, বেশি উঁচুতে উড়িতে পারে না, বাগবাগিচায় বিচরণ করে। যাত্রাকালে এই পাখি পথে পড়িলে অমঙ্গল আশঙ্কা করা হয়, অনেকে ইহার নাম পর্যন্ত উচ্চারণ করিতে চায় না। কুমিল্লায় ইহাকে 'আইড়া (আড়িয়া) কুকি', নোয়াখালিতে 'হাঁড়িকুড়ি', এবং গাঙ্গেয় অঞ্চলে 'হাঁড়িচাঁচা' বলা হয়।

কাস্তেবক—বকভেদ; ঠোঁট কাস্তের মত বাঁকা। ইহারা সাধারণত ব্যাং খায়।

কীর-শ্রী—শুক জাতীয় পাখি। **কুঁচবক**—বকভেদ; সাধারণত ব্যাং খায়।

কুটুম পাখি—এই পাখি দেখিতে অতি সুন্দর, ডাকও মিষ্টি (অনেকটা 'ইষ্টিকুটুম'-এর মত শোনায়)। ইহার মাথা ও গলা এবং লেজের দিক কালো, পিঠ হলদে (ডিমের হলদে অংশের ন্যায়), ঠোঁট লাল। ইহার অপর নাম: ইষ্টিকুটুম পাখি, কুসুম পাখি, বেনেবউ, হলদে পাখি। এই পাখির

চামচিকা / চামচিকে [সং চর্মচটিকা]—চামচড়া-পূব, ছোটজাতের নিশাচর পাখি বিঃ। সাধারণত ঘরের উচ্চ মাচায়, পাটাতনে, চালের নীচে, বাতার ফাঁকে ঝুলিয়া থাকে ('বিশ্বকর্মার পুত চামচিকে'-প্র)।

চিড়িয়াখানা—পশুপক্ষী সরীসৃপ ইঃ যেখানে রাখা হয়, zoo. চিড়িয়া [হিং] —পাখি।....চিড়িয়া চটকুন-মা—পাখি এবং তজ্জাতীয় প্রাণী, পাখিটাখি।

চিল, চিলা-উব [সং চিল্ল, হিং চীল]—বাজজাতীয় অপেক্ষাকৃত ছোট পাখি, kite. ইহারা হঠাৎ ছোঁ মারিয়া মাছ মাংস খাবার ইঃ লইয়া পালায়।

চৈতার বউ-পূব—বউ-কথা-কও পাখি, পাপিয়া ('আসমানেতে চৈতারবউ ডাকে ঘনে ঘন'—মৈগী)।

চোখ গেল—পাখি বিঃ। ইহার সম্বন্ধে একটি গল্প শুনা যায় : দুই বন্ধুর একজন ছিল অন্ধ। একদিন সে শ্বশুর বাড়ি যাইবার উদ্দেশ্যে বন্ধুর চক্ষু দুইটি ধার লইল। কিন্তু বহু অনুনয় বিনয় করা সত্ত্বেও বন্ধুকে সে আর তাহা ফিরাইয়া দিল না। মৃত্যুর পর চক্ষুহীন বন্ধু পাখি হইয়া জন্ম গ্রহণ করিল এবং তাহার বুলি হইল 'চোখ গেল' 'চোখ গেল'।

চৌশিঙ্গা—মাছরাঙ্গা।

ছাতার / -রে—ছোট জাতের পাখি, দলবদ্ধ হইয়া চলে এবং সমস্বরে ডাকে।

ছানা—ছাও-পূব, পাখির বাচ্চা।—ছেঁড়া দুধ।

জলপিপি—বকের প্রকারভেদ।

টিয়া, টেয়া—তোতা, শুকপক্ষী।

টুনটুনি, টুনি-পূব—চড়াইয়ের ধরন অতি ছোট পাখি, মধুচুষ্কি-মু। ক্ষুদ্র হইলেও বাংলার উপকথায় অনেক বড়কে সে হার মানাইয়াছে, জব্দ করিয়াছে।

ডাক, ডাহুক [সং ডাহুক, দাত্যূহ]—পাখি বিঃ। ইহাদের নিম্নদেশ সাদা, পৃষ্ঠদেশ ধূসর, চঞ্চু কিছুটা ছুঁচালো। বাগবাগিচায় চরিয়া বেড়ায়, বেশি উঁচুতে উড়িতে পারে না। অনেকগুলি একত্র হইলে ভীষণ কলরব আরম্ভ করে। শিকারীকে পোষা ডাকের সাহায্যে বন্য ডাকধরিতে দেখা যায়। ডাইক, ডাউক —ডাহুকের রূপভেদ। প্র. 'ডাহুক রসিক লোক, ডুব মারিতেছে'।—বিষবৃক্ষ।

ডানা, ডানক্—পাখা, wing (পাখির—), পাক্-পূব, ফাক্-চট্ট,।

ঢুপি—ঘুঘু ('পালা ঢুপি সঙ্গে নাগর আইসে পন্থ দিয়া'—মৈগী।....পালাঢুপি—পোষাঘুঘু। ঘুঘু শিকার অনেক যুবকের হবি (hobby)। পোষা ঘুঘুর সাহায্যে তাহারা এই শিকার করে।

তই তই, চই চই—হাঁসকে ডাকার সঙ্কেত।

তিতি তিতি—মুরগীকে ডাকার সঙ্কেত।

তোতা [ফা° তূতী]—টিয়া, শুক, ই° parrot ('উড়িয়া যাও হীরামন তোতা উঠরে আকাশে', -মৈগী)।

দণ্ড, ডণ্ড—নিশাচর পাখি বিঃ। ইহা শয়নগৃহের উপর দিয়া উড়িয়া গেলে গৃহকর্ত্রী অমঙ্গল আশঙ্কা করেন।

দয়েল, দোয়েল—ছোট গায়ক পাখি। তৎপর্যায় :—দোহিল-মু, দইথল / দইহল / দইয়ল-ম, কালীদোয়েল-মে। **ধনেশ**—ধনঞ্জয় পাখি।

নাকটা—হংসজাতীয় পাখি, জলাভূমিতে বিচরণ করে।

নীলকণ্ঠ—নীল রঙের ছোট পাখি বিঃ। টেশ্‌কনা। খঞ্জন। কথিত হয়, বিজয়া দশমীতে, (মতান্তরে) সরস্বতী পূজার অপরাহ্নে এই পাখি দেখা শুভজনক। শিব।

পউখপাখালি-ম. চা, **পাখপাখালি**-ব. য—পক্ষীসমূহ, পক্ষী এবং তজ্জাতীয় প্রাণীসমূহ। তৎপর্যায় :—পাখিটাখি, চিড়িয়াচটকুন-মা।

পর [ফা°]—পাখির পালক, feather.—প্রহরের অপভ্রংশ (একপর রাত)। পাহারা।....পর দেওয়া (পাহারা দেওয়া)।....পর—অপর (পরোপকার)। —পশ্চাৎ, পিছে (তারপর)।

পাখি<পক্ষী—বিহঙ্গ, পাইখ, পাখী / পঙ্খী ('বনেলা পংখীর কথায় কে কন্যা দিছে বনে'-মৈগী)।

পানকৌড়ি—মৎস্যাশী ডুবুরী পাখি বিঃ। এই পাখিকে পরিষ্কার জলে বার বার ডুবিতে ভাসিতে ও মাছ ধরিতে দেখা যায়। তৎপর্যায় :—পানপায়রা -দচ, পানিকামড়ি-খু, পানি খাউরি-ম (যে পানি খায়)।

পায়রা [স° পারাবত]—কপোত, pigeon (কবুতর দ্র)। পায়রার জাত অনেক : কাগজি, গেরোবাজ, গোলা / জাগ / জালালী, মুক্কি, মেতি, লক্কা (চেওড়া লেজবিশিষ্ট), লোটন / নোটন (আকাশে লুটাপুটি খায়), সিরাজ, হুমায়ুন ইঃ। জালালী পায়রা (এক শ্রেণীর কালো রঙের পায়রা) সম্বন্ধে কিংবদন্তী এই যে, কোনও জালাল ফকির কর্তৃক ইহা প্রথম এদেশে আনীত হয়।....বক্‌বকুম—পায়রার ডাক।....খোপ—পায়রার বাসা।

পিড়িলা-শ্রী—বাবুই পাখি (পিড়িলার বাদা=বাবুইয়ের বাসা)।

পেঁচা / প্যাঁচা [স° পেচক, হি° উল্লু]—নিশাচর পাখি বিঃ, উলূক, owl. কুক্কিয়া / কুইক্যা-চট্ট, কালো পেঁচা (কুক্ কুক্ করিয়া ইহারা ডাকে), যমকুলি / শ্মশানকুলি (ইহাদের ডাক বিকট 'কু'-এর মত শোনায়)।....লক্ষ্মীপেঁচা—

বড়জাতের পেঁচা, barn owl. ইহারা রাত্রিতে শস্যক্ষেত্রের ইঁদুর ইঃ মরিয়া চাষীকে শস্যরক্ষায় সাহায্য করে। হয়তো এই কারণেই পেঁচাকে লক্ষ্মীর বাহন মনে করা হয়। লক্ষ্মীও ধনৈশ্বর্যের তথা শস্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী (হুতোম দ্র)। পেঁচাকে লক্ষ্মীর বাহন মনে করা হইলেও ইহার ডাক (বিশেষ করিয়া দিনের বেলায়) অনেকেই বরদাস্ত করিতে পারে না, অমঙ্গলসূচক মনে করে।

ফিঙ্গা / ফিঙে [স° ফিঙ্গক]—অনেকটা দোয়েলপাখির মত, তবে লেজ উহার চেয়ে লম্বা এবং চেরা। উড়িবার সময় সাঁ করিয়া উপর দিকে উঠিয়া যায়, আবার নীচে নামিয়া আসে। তৎপর্যায় :—ফেচ্‌কা / ফেঁচু-মু, ফেচকুন্দা-শ্রী, ফেচ্যুয়া-ম, ফেউচ্‌কা-ফ. ব, ফেইচা-ঢা, ফেউচ্যা / হেচ্যা-নো ('ফ'-এর স্থলে 'হ')। পূর্ববঙ্গে একটি কথা আছে, 'সাজতে পরতে ফেচ্যুয়া রাজা'। অন্য পাখির রাজা হইবার কথা ছিল, কিন্তু তাহার আর সাজাপরা হয় না ; ইত্যবসরে চট্‌পটে ফিঙে গিয়া সিংহাসনে বসিয়া পড়িল। টিমা চালের জন্য ন্যায্য পাওনা হইতে কেহ বঞ্চিত হইলে, তাহার প্রতি এই কথাটি প্রযুক্ত হয়।

বউ-কথা-কও—এই পাখির অপর নাম 'চৈতার বউ-'পূব। ইহার ডাকে যেন একটা বিরহ বেদনার সুর কানে বাজে ('শাউনিয়া ধারা শিরে বজ্র ধরি মাথে। বউ কথা কও বলি কান্দি ফিরে পথে'।।-মৈগী)।

বক—বগ, বগা, লম্বা পা ও লম্বা ঠোঁটওয়ালা পাখি বিঃ। বকের জাত অনেক : কাস্তেবক, কুঁচবক, কোরচেবক, গোবক, জলপিপি, সারস (বড়জাতের বক), সোনাজঙ্ঘা। ইহারা চুনোমাছ, ব্যাং, গেঁড়ি, কেঁচো, জোঁকপোক ইঃ খায়।....বকধার্মিক—ভণ্ড।

বাজ [ফা°]—বড় জাতের শিকারী পাখি, শ্যেন, ই° hawk। তৎপর্যায় :—কুর্গাল-চট্ট. নো, কুরল / কুরাল, বাজকুরাল-ফ. ব, কুরুয়া / কুর‍্যায়া-ম, কুল্লো-য, শিকরা / শিকরে, সাচান। এই পাখিকে কোথাও কোথাও (নো) রামের 'বনঘড়ি' বলা হয়। রাম যখন বনে ছিলেন, তখন নাকি এই পাখি প্রহরে প্রহরে ডাকিয়া সময় জানাইত।

বাদুড় [স° বাদুলি]—কলাচোরা, কলাচোষা, রাতচরা, বোগডোল-জ. কো, ই° bat. ইহারা স্তন্যপায়ী নিশাচর প্রাণী (পাখি ?) বিঃ। আকাশচারী হইলেও পাখির ন্যায় ডিম পাড়ে না, একেবারে বাচ্চা প্রসব করে। শরীরের তুলনায় বাদুড়ের ডানা দুইটি খুব বড়, পা দুইটি ছোট। দিনের বেলায় গাছের ডালে, পড়ো বাড়িতে মাথা নীচু করিয়া দলবদ্ধ হইয়া ঝুলিয়া থাকে।

ইহারা ফলফুল ইঃর রস খাইয়া ছিবড়া ফেলিয়া দেয়। কীটপতঙ্গ এবং অন্য ক্ষুদ্র প্রাণীভুক্ বাদুড়ও আছে।

বাবুই [হিং বয়া]—ছোট পাখি বিঃ, weaver bird. ইহারা তাল ইঃ উঁচুগাছে তৃণাদি বুনিয়া বাসা তৈয়ার করে ('তালগাছেতে বাবুইর বাসা')। তৎপর্যায় :—বাউই / বায়ই-পূব, বালুই-দচ, পিড়িলা-শ্রী, দরজি পাখি-মে, বাইল্যা-নো।

বাবুই—তুলসীভেদ (বাবুই তুলসী)। ঘাসভেদ (বাবুই ঘাসের দড়ি)।

বালিহাঁস—ছোটজাতের হাঁস বিঃ ; শিকারীদের হাতে সহজেই ধরা পড়ে।

বুলবুল, বুলবুলি, বুলবুলিয়া—সুগায়ক ছোট পাখি বিঃ, মাথায় সামান্য ঝুঁটি আছে। ইহারা নরম খোসাযুক্ত ফল (কলা, পেয়ারা ইঃ), আধপাকা ধান ইঃ খাইতে ভালবাসে ('খোকা ঘুমাল পাড়া জুড়াল, বর্গী এল দেশে। বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দিব কিসে ॥'—ছড়া)। ময়মনসিংহের কোথাও কোথাও বুলবুলির '**লেটেরা**' নামও শুনা যায়।

বেনেবউ—কুটুমপাখি, হলদে পাখি।

ভগদত্ত—এই পাখির সঙ্গে প্রাগজ্যোতিষপুরের রাজা ভগদত্তের সম্বন্ধসূচক কিংবদন্তী প্রচলিত আছে।

ভারুই, ভুরুল-মে—ভরদ্বাজ। **ভুতুম**—হুতোম দ্র।

মদনটাক—সাপ, মাছ, কেঁচো ইঃ খায়। **মধুচুষ্কি**—টুনটুনি।

ময়ুর—স্বনামপ্রসিদ্ধ পাখি, peacock। মউর, মোর—ময়ূরের অপভ্রংশ। বর্তমানে ইহা ভারতের জাতীয় পক্ষী।....কেকা—ময়ূরের ডাক।

মাছরাঙা [সং মৎস্যরঙ্গ]—লম্বা ছুঁচালো চঞ্চুযুক্ত মৎস্যাশী পক্ষী বিঃ, ইং king-fisher। কথায় বলে, 'সকল পক্ষী মৎস্যভক্ষী, মৎস্যরঙ্গী কলঙ্কিনী।' (সকল পাখিই মাছ খায়, দুর্নাম কেবল মাছরাঙার)। তৎপর্যায় :—মাছুয়ারাঙ্গা / মাছ্যায়রাঙ্গা-পূব, ঘড়েল-দচ, চৌশিঙ্গা।

মানিকজোড়—বকজাতীয় পাখি, দুইটি একসঙ্গে বিচরণ করে। কোনও দুইব্যক্তি সর্বদা একত্র চলাফেরা করিলে ব্যঙ্গ করিয়া তাহাদের প্রতি এই কথাটি প্রযুক্ত হয়।

মোরগ [ফাং মুর্গ্]—কুক্কুট > কুঁকড়া / কুঁকড়ো, মুরগা, রামপাখি, সাঁরা-বাঁ. বী। স্ত্রী. মুরগী। সাধারণ অর্থে মুরগি / -গী বলিতে স্ত্রীপুরুষ উভয়কেই বুঝায় (মুরগি পালন, মুরগির চাষ)।...বাক্, বাঙ্—মুরগির ডাক।

লেজঝোলা—দীর্ঘপুচ্ছ কর্কশকণ্ঠ পক্ষী বিঃ। তৎপর্যায়:—কেচকেচিয়া / কেচকেইচ্যা-ম. তাড়ুয়া-ফ. ব. নো। এই পাখিকে অনেকে ঝগড়ার দূত মনে করে।

শকুন, শকুনি—তীক্ষ্ণচঞ্চু সুবৃহৎ পক্ষী, vulture। অক্কুম-চট্ট, শুকনি-বাঁ, শগুন / হগুন / হকিন-পূব—শকুনের রূপভেদ। জলপাইগুড়ি অঞ্চলে ইহার 'হোকোশ' নামও শুনা যায়। ইহা অতি উচ্চে উড়ে ঘুরে, কিন্তু দৃষ্টি রাখে নীচে ভূপৃষ্ঠে মৃত প্রাণীর সন্ধানে (জনপদ কল্যাণে ?)।

শঙ্খচিল—এই পাখির বুক শাঁখের মত সাদা।

শামুকখোল-দচ—ইহার ঠোঁট খানিকটা চেপ্টা, দলবদ্ধ হইয়া বাস করে।

শালিক, হালিক-পূব [স° শারিকা]—বহুপরিচিত পাখি; উঠানে বাগানে জোড়ায় জোড়ায় চলে, কীটপতঙ্গ ধরিয়া খায়। শালিকের জাত অনেক:—টিকিয়া ময়না (মাথায় সামান্য ঝুঁটি), ভাতাশালিক-ম (বড়), চন্নাশালিক-ম (ধূসর)।

শুক, শুয়া—টিয়া।....স্ত্রী, শারী ('পিঞ্জিরাতে শারীশুক গান করে বৈসে।' মৈগী)।

সাচান—বাজপাখি। **সাতভাইয়া**—ছাতারে। **সোনাজঙ্ঘা**—বকভেদ।

হরিয়াল—ঘুঘুজাতীয় পাখি, green pigeon. **হলদেপাখি**—কুটুম পাখি।

হাঁ টুটি—টিট্টিভ, এই পাখি উড়িতে উড়িতে 'টি টি' শব্দ করে।

হাড়গিলা [ই° adjutant stork]—গৃধিনীর ধরন দীর্ঘকণ্ঠ লম্বিত কর্ণ পক্ষী বিঃ। এই পাখিকে দেখিয়া ছেলেমেয়েরা নানারূপ ছড়া কাটে: 'হাড়গিলা লো ভাই, চিড়া কুইট্যা খাই / একটা চিড়া বেশ কম হইলে দাদার কাছে যাই।' -চট্ট। 'হাড়গিলেরে ভাই চিড়ে কোট খাই / একটা চিড়ে কম পড়েছে বাবার কাছে যাই।'-খু। 'হাড়গিলারে ভাই চিড়া কুট খাই, একটা চিড়া কম পড়েছে মামার বাড়ি যাই।'-ম।

হাঁড়িচাঁচা—কানকুয়া দ্র। **হাঁসা**—পুংহাঁস। **হাঁসী**—স্ত্রীহাঁস।

হুতোম, হুতুম—বড় জাতের পেঁচা, ভুতুম, লক্ষীপেঁচা ('হুতুম ভুতুম রাইত ওজাগর দিনে ঘুম'-ছড়া)। ইহারা ইঁদুর মারিতে ওস্তাদ, ইহাদের দিনের বেলা বড় দেখা যায় না।

৪। সরীসৃপ ও কীটপতঙ্গাদি

আংকাপোকা—পাটের চারার অনিষ্টকারী পোকা বিঃ।

আঁচা-ন. পা—শুঁয়াপোকা।

আজনাই, আঞ্জনি, আঞ্জুনি [সং আঞ্জিনেয়]—টিকটিকির গড়ন তামাটে রঙের জীব বিঃ। বাগবাগিচায় চরিয়া বেড়ায়। তৎপর্যায়ঃ—আঞ্জিন-ম. টা. পা, আজিনা-ত্রি, আর্জিনা-ঢা. ফ, আচিনা-নো। কেহ কেহ ইহাকে সাপের মাসী বলিয়া থাকে।....আঞ্জনি, আজনাই [সং অঞ্জনিকা]—নেত্র রোগ বিঃ।

আফরা [ফা°]—ধানের (বৃদ্ধির মুখে) অনিষ্টকারী পোকা বিঃ।

আরশুলা / -শোলা—তেলাপোকা < তৈলপায়িকা, ই° cockroach. তৎপর্যায় ঃ—আইশরাল-রা, আশুরাল-মা. দি, আশর‍্যাল / আরশোল-মু, তেলচোরা-ম. শ্রী. ত্রি, তেলাচোরা / ত্যালাচোরা-ঢা. ফ. ব. নো, তেলচাটা-রা. বগু, তেল্লেচোরা-চট্ট।

উই [সং উপদিকা]—পিপীলিকা জাতীয় অতি অনিষ্টকারী কীট বিঃ। তৎপর্যায় ঃ—উইপোকা, রুই / রুইপোকা (আদ্যস্বরে 'র্'এর আগম)-চ. মু, উলি / উলু-পূব, white ant. কথায় বলে, 'উইয়ের পাখা হয় মরতে, জামিন হয় ভরতে।'....উইঢিবি—ঢিবির মত করিয়া তৈয়ারি উইপোকার বাসা।

উকুন [সং উৎকুণ]—উইন্-চট্ট, কেশকীট বিঃ, ই° louse।....বড় উকুন—ডেঙ্গর-বাঁ, ঢেলা-ম, টোলা-ত্রি।....ছোট উকুন—মেথি উকুন-মু, নিকি-বাঁ, লিক / নিক-ম [হি° লীখ]।

উঙানি / উঁয়ানি-রাঢ়—মশক জাতীয় অতি ক্ষুদ্র পোকা। তৎপর্যায় ঃ—উগানি -ফ, উনানি-নো. ত্রি, উনিপোক-ম. শ্রী। ইহার কামড়ে ভীষণ জ্বালা; বর্ষাকালেই ইহাদের প্রাদুর্ভাব বেশি ঘটে। চাষীরা শরীরে তেল মাখিয়া কিংবা ঘোলেন্ উকা ইঃ জ্বালাইয়া ধোঁয়া করিয়া ইহাদের আক্রমণ রোধ করিতে চেষ্টা করে।

উচরুঙ্গা, উৎরুঙ্গা—ঘুরঘুরে দ্র।

উচ্চিংড়া, উচ্চিঙ্গা, উইচিংড়া [সং উৎচিঙ্গট]—পতঙ্গ বিঃ, ঠিকড়ে-মে, তরুল্যা-নো; ইহা লাফাইয়া লাফাইয়া জিনিসপত্রের উপর পড়ে।

উবি-ন—ছোটজাতের কচ্ছপ, কাকভি-বাঁ।

উরশ [সং উদ্দংশ, হি° উড়ুশ, খটমল]—ছারপোকা, লচ্ছার-বাঁ, ডাঁশ-মে। উরাশ-ফ. য, উরুশ-ন. মে. টা. ঢা, উলশ / উলুশ-ঢা. নো. ত্রি. শ্রী—উরশের বিভিন্ন আঞ্চলিক রূপ।

উরুলি-চট্ট—লালরঙের বিষাক্ত পিঁপড়া বিঃ।

এঁটুলি-ক, এঁটেলি-বাঁ, ওঁঠলি-বী. মু—রক্তশোষক পোকা বিঃ; জীবজন্তুর

গায়ে লোমের নীচে সংলগ্ন থাকিয়া রক্ত খায় ও বৃদ্ধি পায়। পর্যায়শব্দ :—আটালি / আটাইল-ম. নো, আটালু-শ্রী, আটুলি-পূব, আঁটল-উব।

কয়া—সবুজ রঙের ফড়িং বিঃ। **কাকত্তি**—কাছিম দ্র।

কাঁকলাস, কাঁয়ালিস [স° কৃকলাস]—গিরগিটি।

কাছিম < কচ্ছপ—উভচর জন্তু বিঃ। কাছিমের খোলা (পৃষ্ঠদেশ) অনেকটা গোল এবং চেপটা ধরনের।····**কামঠ**<কমঠ, **কাঠুয়া**—কচ্ছপের প্রকারভেদ ; ইহার পৃষ্ঠদেশ নৌকা বা গরুর গাড়ির ছই-এর মত অর্ধবৃত্তাকার এবং লম্বাটে। ইহার অপর আঞ্চলিক নাম কাঠা, কাউঠা, কেঠো। ছোট জাতের কেঠো—কড়ি কাউঠা-ম, কাকত্তি-বাঁ, কুরি-বর্ধ. মু, তুরা-উব। শ্রীহট্টে কাছিমের আর এক নাম 'দইন' ; ইহাকে 'জলথাসি'ও বলা হয়। যে ব্যক্তি কিছু জানিয়াও না জানার ভান করে, তাহার প্রতি অনেক সময় এই কথাটি প্রযুক্ত হয় : 'জলে থাকি কাছিম, না চিনি পূব পশচিম'। যাত্রাকালে কেহ কাছিমের নাম লয় না বা ইহার মাংস খায় না; ইহাকে অশুভ মনে করা হয়।

কাঠপিঁপড়া—মাজালি, বিষডাইয়া-নো। শুকনা কাঠেই বেশি থাকে, কামড়ে ভীষণ ব্যথা হয়।

কাথরি পোকা—পাটের অনিষ্টকারী পোকা বিঃ।

কীড়া—কীট বিঃ (ধানে কীড়া ধরেছে। ঘায়ে কীড়া জন্মেছে।

কানকোটারি—নিশাচর পতঙ্গ বিঃ। **কুড়কুট**-রাঢ়—বড় লাল পিঁপড়া।

কুমীর [স° কুম্ভীর]—কুঁইর, কুমইর, কুমুইর—কুমীরের আঞ্চলিক রূপভেদ। সচরাচর দৃষ্ট কুমীরের মাথা টিকটিকির মাথার মত অনেকটা চেপটা। আর এক শ্রেণীর কুমীর আছে, যাহার মুখ লম্বা ; উহাকে ঘড়িয়াল বলা হয়। কুমীর বাংলার অন্যতম লৌকিক দেবতা কালুরায়ের বাহন। বাংলার স্থানে স্থানে মাটির মূর্তি গড়িয়া কুমীর পূজারও প্রচলন আছে। **কেঁকো**—কাঁকড়া, কাঁথুরিয়া-বী।

কেঁচো [স° কিঞ্চুলুক, হি° কেঁচুআ]—মহীলতা, সরু লতার মত একপ্রকার ভূমিজ কীট। তৎপর্যায় :—কেইছা-টা, কেউচা-ঢা. ফ, কেউচ্যা-ব. ত্রি, কেঁছ্যা নো, কঁ্যাছা-পা, কঁ্যাছো-ব, চ্যারা-উব, জির-ম. শ্রী, ই° earthworm.

কেঁড়ি, কেন্নো—বহুপদবিশিষ্ট কীট বিঃ, স্পর্শকরামাত্র বৃত্তাকারে সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। তৎপর্যায় :—কেন্না / কেন্নো-চ. ব. খু, কেন্নাই-রাঢ়, কেউড়ি-মু, কেঁড়ি-মে, কান্না-ম, কেন্না- টা. ঢা. ফ. শ্রী. ত্রি. নো, কেওরা-ব।

খাত্তা—ধানের অনিষ্টকারী পোকা বিঃ।

গরল-চ—এক জাতের বিষাক্ত কীট, গর-ম।....গরল লাগা—গরলের ছোঁয়াচ লাগিয়া শরীরে ঘা হওয়া। **গহুমা**—গোক্ষুর সাপ। ৯

গিরগিটি—[হি° গিরগিট]—টিকটিকি বা আঞ্জনি ধরনের লম্বা সরু লেজ ওয়ালা প্রাণী বিঃ। তৎপর্যায় :—কাঁকলাস, কাঁয়ালিস-নো, বহুরূপী (বহুবার রং পালটায়), রক্তচোষা (সময় সময় ইহাদের গলদেশ ঘোর রক্তবর্ণ হইয়া উঠে। অনেকের ধারণা ইহারা চাহনি দ্বারা অন্য প্রাণী হইতে রক্ত শুষিয়া লয়)।

গুগলি—ছোট জাতের শামুক; টোপরাই / গুজুরি-জ. কো. রং, গেঁড়ি-পব, দুর্গাবড়ি। হাঁসের অতি প্রিয় আধার (খাদ্য)।

গোমা-পা. বগু, **গহমা**-মু—বিষধর সর্প, গোখুরা।

ঘুণ—কাষ্ঠকীট বিঃ।....ঘুণাক্ষর—ঘুণের আক্রমণে কাঠ বাঁশ ইঃতে যে গর্ত হয় তাহা অতি ক্ষুদ্র অক্ষরের মত দেখায়। ঘুণাক্ষরেও টের না পাওয়া—কোনও বিষয়ে আভাস মাত্রও না পাওয়া।

ঘুরঘুরে-পব—ভুঁইপোকা বিঃ। ঘুরিয়া ঘুরিয়া মাটি খোঁড়ে। তৎপর্যায় :—ঘুংড়া পোকা, ঘুগরা / ঘুগরো-য. টা, উচরুগা-রং. কো, উচুঙ্গা-রা, উর্চুঙ্গা-ঢা. ফ. ব, উৎরুঙ্গা-ম. শ্রী, উরতাঙ্গা-ত্রি।

ঘোড়াপোকা—এই পোকা পাটগাছের খুব অনিষ্ট করে। ইহাকে 'ছটকাপোকা' বলিতেও শুনা যায়।

চাটা, চাটুয়া / চাটুয়া—এঁটুলি জাতীয় পোকা বিঃ। সাধারণত আঁইশ বিহীন মাছের (বোয়াল শিং মাগুর) গায়েই ইহারা বেশি থাকে।

চিতি-উব—প্রজাপতি। -চ—সর্প বিঃ।—ঘামে ভেজা জামাকাপড়ের বিন্দু বিন্দু কালো দাগ (জামায় চিতি পড়া)।

চিনা জেঁাক, ছিনা জেঁাক [তা° চিন্ন (ক্ষুদ্র), স° শীর্ণ (কৃশকায়)]—শীর্ণকায় ক্ষুদ্রজাতের জেঁাক। ইহারা ডাঙ্গায় জঙ্গলে স্থানে থাকে (জেঁাক দ্র)।

চুলচুল্যা-বর্ধ—দংশনকারী কীট বিশেষ।

চেউটি-উব, **চাঁটি**-মে [হি° চীওটি]—পিঁপড়া বিঃ।

চেলা-পূব. শ্রী. ত্রি—বিষমুখ বহুপদ কীট বিঃ। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, রাঢ় এবং গাঙ্গেয় অঞ্চলে যাহাকে বিছা (সরস্বতী বিছা ও তেঁতুলে বিছা) বলা হয়, বাংলাদেশের বহু অঞ্চলে তাহা চেলা বা সাপচেলা নামে পরিচিত (বিছা ও বিচ্ছু দ্র)। চেলা—শিষ্য।—মৎস্য বিঃ।—জ্বালানি ফাড়া কাঠ।

চ্যারা—কেঁচো (চ্যারার মাটি)। **ছলম**-ম—সাপের খোলস।

ছারপোকা—উরশ দ্র। **ছেঙ্গা**-শুঁয়াপোকা।

জিঁয়া-বাঁ—কালো বিষাক্ত পিঁপড়া। **জির-**ম—কেঁচো।

জোঁক [সং জলৌকা]—রক্তপায়ী কৃমি বিঃ, জলক্-দি, ইং leech. জোঁক প্রধানত দুই শ্রেণীর : এক শ্রেণীর জোঁক জলে থাকে ; ইহাদের কোথাও কোথাও হাতিয়া জোঁক (হাইত্যা), মইষা জোঁক বলা হয়। আর এক শ্রেণীর জোঁক (চিনা বা ছিনা জোঁক) ডাঙ্গায় ঘাসে জঙ্গলে থাকে। হুঁকার জল, লবণ এবং চুন প্রয়োগে জোঁক মারা যায়। কথায় বলে, 'জোঁকের মুখে চুন / নুন'।

জোনাকি [হিং জগন, জগনূ]—খদ্যোত, জনপুকি-বাঁ, জোত্সাপোকা-বর্ধ, জুনি / জুনিপোক-পূব. নো. চট্ট. পা, জুনিক-য, ইং firefly.

ঝিঁঝিপোকা [সং ঝিল্লী, হিং ঝীঙ্গুর]—ঝিঁ ঝিঁ শব্দকারী পোকা বিঃ, ঝিঞ্জিপোক-পুব, ইং cricket.

ঝিনই / ঝিনুই-পূব, **ঝিনুক**—শুক্তি, oyster. ইহাকে 'দোপাটি মাছ' বলিতেও শুনা যায়। –ঝিনুকাকার পাত্র বিঃ (শিশুকে দুধ খাওয়াইবার—)।

টিকটিকি, টুকটুকি-চট্ট. নো—জেঠী <জ্যেষ্ঠী, ইং lizard. তৎপর্যায় :— হারুল-পূব, হালি-শ্রী। অনেক সময় গোয়েন্দা পুলিশকে ব্যঙ্গ করিয়া 'টিকটিকি' বলা হয় ('ওর পেছনে টিকটিকি লেগেছে')। টিকটিকি সম্পর্কে নানা গল্প উপকথা প্রচলিত আছে।

টোপরাই-জ. কো—গুগলি (টোপরাইর হাট)। **ডাকুর**-বাঁ—মাকড়সা।

ডাঁশ / দাঁশ, ডাঁয়শ-নো [সং দংশ, হিং মচ্ছড়]—বড়জাতের মাছি বিঃ, ইং gnat. ইহার দংশন-জ্বালা অতি তীব্র।

ডিয়া, ডেয়া / ডেয়ে / ডেয়ো-পব—বড় কালো পিঁপড়া। তৎপর্যায় :— ডেঙ্গরা-বাঁ, ডাই-উব, ডাইয়া-ব, ডোমা-ত্রি. নো, ডেঁয়া-না, মাদাইল / মান্দাইল / ডুরুরা-ম, ওল্লা-ফ।

ড্যাঁকা-মু, **ড্যাঁপা**-ন—সাপের ছানা, সোলুই-হু. হা. বর্ধ।

ঢনঢনে—বড় জাতের মাছি। এইগুলি মিষ্টান্নে, আম কাঁঠালের রসে, জীবজন্তুর গলিত শবে, বিষ্ঠাদিতে বসে ; ভন্‌ভন্ শব্দ করে।

তেলচোরা [<তৈলচৌরিকা], **তেলাপোকা** [<তৈলপায়িকা]—আরশুলা।

নেঙ্গুস-বাঁ—বিষাক্ত কীট ; গরল-চ।

পিঁপড়া / পিঁপড়ে [<পিপীড়া <পিপীলিকা]—কীট বিঃ, ant. পিঁপড়ে-

বগু, পেঁপড়-পা, প্যাঁৎড়া-চট্ট, পেঁপুড়-মে—পিঁপড়ার রূপভেদ।

পোক্ <পোকা—কীট। **ফণা**—hood.

ফাত্‌রা-ম—ধানের অনিষ্টকারী পতঙ্গ বিঃ। (উদ্ভিদ দ্র)।

বাজনা—মাছির ডিম, চাট-পূব, মাছতা। **বারকোর, বারকোল**—বৃহৎ কূর্ম।

বিচ্ছু [স° বৃশ্চিক, হি° বিচ্ছু]—কাঁকড়া বিছা-পব, ই° scorpion.

বিছা-পব. রাঢ়—বিষমুখ বহুপদ কীট বিঃ, ই° centipede। বিছা নানাপ্রকার: কাঁকড়া বিছা (কাঁকড়ার পায়ের মত দুইটি বড় পা থাকে), তেঁতুলে বিছা (যেন একসূত্রে গাঁথা কতকগুলি তেঁতুলের বীচি), সরস্বতী বিছা (সাধারণ ছোট জাতের বিছা; বিদ্যাদেবীর নামের সঙ্গে যুক্ত বলিয়া ছেলেমেয়েরা মারিতে চায় না)। রাঢ় ও পশ্চিমবঙ্গের কাঁকড়াবিছা পূর্ববঙ্গে বিচ্ছু এবং তেঁতুলে ও সরস্বতী বিছা যথাক্রমে সাপচেলা ও চেলা-নামে পরিচিত। হিন্দীভাষীরাও কাঁকড়া বিছাকে (বৃশ্চিক) 'বিচ্ছু' বলিয়া থাকে। বাংলার উত্তরাঞ্চলে ইহা 'চিয়াড়ি' নামেও অভিহিত হয়।

বিছা-পূব—পূর্ববঙ্গের বহু অঞ্চলে শুঁয়াপোকাকে 'বিছা', ত্রিপুরায় 'ছেঙ্গা' এবং রাজসাহী ও পাবনায় 'আঁচা' বলা হয়। কাজেই গাঙ্গেয় অঞ্চলের বিছা এবং ময়মনসিংহের বিছা এক প্রাণী নয়; একটিতে কামড়ায়, ব্যথায় শরীর অবসন্ন হয়; অপরটিতে কামড়ায় না, উহার ছোঁয়াচ লাগিলে গা জ্বালা করে।

বোলতা [স° বরটা]—পতঙ্গ বিঃ, wasp. ইহার কামড়ে আক্রান্তস্থান ফুলিয়া উঠে এবং ভীষণ জ্বালা করে। ইহারা চক্রের মত করিয়া বহু ছিদ্রযুক্ত বাসা বাঁধে এবং প্রত্যেক ছিদ্রে একটি ডিম পাড়ে। বোলতার বাসাকে 'বোলতার চাক' বলা হয়। ছিপে যাহারা মাছ ধরে, বোলতার ডিম তাহারা টোপ হিসাবে বা টোপে ব্যবহার করে। বলা, বল্লা, বোলা, বোল্লা—বোলতার বিভিন্ন আঞ্চলিক রূপ।

মাকড়, মাকড়সা, মাকসা [স° মর্কট]—উর্ণনাভ, মেড়কুটি-নো, ডাকুর-বাঁ, ই° spider. মাকড়—বানর ('মাকড়ের হাথে যেহ্ন ঝুনা নারীকল।'—শ্রীকৃ)।

মাজালি-ন. য, মাজুল-বগু, মাজুলি-খু—বিষাক্ত পিঁপড়া বিঃ, কাঠপিঁপড়া; কামড়ে ভীষণ ব্যথা করে।

মান্দারুয়া—ধানের অনিষ্টকারী পোকা বিঃ

রুইপোকা—উইপোকা, ant, **লচ্ছার-বাঁ**—ছারপোকা।

লেদা পোকা—পাটের অনিষ্টকারী পোকা বিঃ।

লোহাগেড়ে-মে—ধানের অনিষ্টকারী পোকা বিঃ।

শাঁকি—ধানের পোকা বিঃ।

শুঁয়াপোকা—অসংখ্য শুঁয়াযুক্ত কীট বিঃ, আঁচা-ন. পা. রা, ছেঙ্গা-ত্রি, শোনকা-খু, বিছা-ম. চা, ই° caterpillar.

সাপ<সর্প—নাগ, ফণী, snake. সাপের নাম ও জাতের অন্ত নাই। এখানে বিভিন্ন অঞ্চলের লোকমুখ হইতে শুনা কতকগুলি সাপের নাম বর্ণানুক্রমে উল্লেখ করা হইল: আটাশি-শ্রী (গোক্ষুর), আলাদ<অলিগর্দ (কেউটে), আলান-বী (কেউটে), উদয়নাগ / উদয়কাল, কালনাগিনী-দচ (আঙ্গুলের মত সরু, সবুজ, লম্বা). কেউটিয়া / কেউটে, খইয়া গোখরো-দচ, খরিশ-বাঁ. বী (গোখরো), খরিশ কেউটে-দচ (খুব রাগী), গহমা-মু. মা (গোখরো), গোখরো / গোখুর (গোক্ষুর), গোনস-বর্ধ, গোমা-উব (গোক্ষুর), গোঁমুড়া-মে, ঘরচিতে-য, চন্দ্রবোড়া, চামরকোষো-চ (ভয়ঙ্কর), চিতি, চ্যাংবোড়া-চ (লাফ দিয়া কামড়ায়), চ্যালো-য, জলঢোঁড়া / কালীঢোঁড়া, জলবোড়া, জাত কেউটে, জাতসাপ (বিষধর সর্প), ঢেমনা, ঢোঁড়া [স° ডুণ্ডুভ], দাঁড়াস, দুধে রোড়া, পদ্মগোখরা, পুঁয়ে-য (কেঁচোর মত), বরাচিতে, বিঘুতে বোড়া (লাফ দিয়া কামড়ায়), বেত আছড়া, বোড়া [<বোড্র], ভ্যাপটা-মা (হেলে), ময়াল, মাছুয়াসাপ-ম / মেঁছ্যা আলাদ-মু (কালোরঙের গোক্ষুর), মেটে সাপ (পুঁয়ে), রক্তবোড়া-দচ, লবডঙ্ক-মু / লাউডগা-ম (লতার মত সরু), শঙ্খচূড়, শঙ্খিনী, শাঁখাবাটি, শাঁখামুটি, শিয়রচাঁদা (ভয়ঙ্কর), শিয়ালচাঁদী-মে, হেলে-ক। ....বাস্তুসাপ—বহুকাল ধরিয়া বাস্তুতে অবস্থানকারী বৃহদাকার সর্প বিঃ; ইহাকে কেহ মারিতে চায় না, বরং বাড়ির রক্ষক বলিয়াই মনে করে। কথায় বলে, 'সাপের লেখা, বাঘের দেখা' (কপালে লেখা না থাকিলে নাকি সাপে কামড়ায় না, কিন্তু বাঘে দেখামাত্রই আক্রমণ করে)। কুসংস্কার বশত অনেকে রাত্রিতে সাপকে সাপ বলে না, বলে,—'লতা', 'কাঠি', 'দড়ি' বা এইরূপ অন্য কিছু। রাত্রিতে সর্পদংশনকে 'কাঠির ঘা' বলা হয়। কথিত হয়, সর্পদংশনে কাহারও মৃত্যু ঘটিলে মৃতদেহ দাহ বা সমাধিস্থ না করিয়া এককালে তাহা কলার ভেলায় নদীর স্রোতে ভাসাইয়া দেওয়া হইত। উদ্দেশ্য, কোনও ওঝা যদিইবা প্রাণ সঞ্চার করিতে পারে। বর্তমানে অনেক হাসপাতালে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সর্পাঘাতের চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। তৎসত্ত্বেও

গ্রামাঞ্চলে প্রথমেই ওঝাদের (বিষবৈদ্য) ডাক পড়ে। কিন্তু তেমন ধন্বন্তরি ওঝার বড় সন্ধান পাওয়া যায় না। সর্পদষ্ট ব্যক্তির দষ্টস্থানের কঞ্চিৎ উপরে শক্ত করিয়া তাগা বাঁধিতে এবং তাহাকে পুরানো ঘি খাওয়াইতেও দেখা যায়।

পূর্ব ময়মনসিংহে প্রচলিত মনসার ব্রতকথায় গৃহস্থবধূর নিয়মিত সর্পপোষণের উল্লেখ আছে (বর্তমান কোষকার লিখিত 'বাংলার মনসা', মাসিক বসুমতী, শ্রাবণ, ১৩৫৬ দ্র)।

বর্তমানে বাঙালীদের মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে জীবিত সর্পের পূজা প্রচলিত না থাকিলেও বিশেষ বিশেষ তিথিতে এবং মনসাপূজার দিনে সাপের উদ্দেশে দুধ কলার নৈবেদ্য দিবার রীতি আছে। মনসা সর্পের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। বিভিন্ন প্রতীকে—সর্পফণায়, ঘটে, পটে, মূর্তিতে, মাটির ঢিবিতে, পাথরে, মনসাগাছে তাঁহার পূজা হইয়া থাকে। মহাসমারোহে বাৎসরিক পূজা ছাড়াও বহুগ্রামে, বহু পরিবারে সর্পদেবতার নিত্যপূজারও ব্যবস্থা আছে।

ঢোঁড়া সাপ নির্বিষ কেন, সাপের জিহ্বা দ্বিখণ্ডিত কেন ইত্যাদি সম্পর্কে সাধারণের মধ্যে অনেক কথাকাহিনী প্রচলিত আছে। লোকবিশ্বাস (-ম), চৈত্রসংক্রান্তির পূর্বদিন মেঘ ডাকিলে সাপের ডিম নষ্ট হয় এবং সাপের উপদ্রব হ্রাস পায়।

সোড়ম-চট্ট—সাপের খোলস, slough। **সোলই**-হু—সাপের বাচ্চা।

হারুল-ম, **হালি**-শ্রী—টিকটিকি। **হিমড়া**-নো—পিঁপড়া।

ষষ্ঠ অধ্যায়

আত্মীয়-কুটুম্ব

আই, আইমা, আয়ি / আয়ী [স° আর্যিকা]—মাতামহী। তৎপর্যায় :— বড়াই / বড়ায়ি (বড় আই দ্রুত উচ্চারণে বড়াই), বড়মা, দিদিমা / দিদা আজী / আজীমা, আবো (সম্বোধনে আবোগে)-উব, দুদু-ম (প্রায় অ প্র), নানী-মুস। উত্তরবঙ্গে রাজবংশীদের মধ্যে মা, শাশুড়ী এবং পুত্রবধূকেও আই সম্বোধন করা হয়। অসমীয়াতেও আই শব্দ মাতৃবাচক। আই—মাতা, ঈশ্বরী, দেবী (বিষহরী আই, বাসলী আই, দুর্গামাই) [মাই=মা+আই]। আই—যে কোনও স্ত্রীলোক।

আই—আয়ু (অল্লাই, পরমাই)। আই—'আসি' ক্রিয়াপদের আঞ্চলিক অপভ্রংশ। আই আই, আইমা—ছি ছি (আই আই ! কি লাজের কথা !)।

আই—বিভিন্ন অর্থসূচক প্রত্যয় বিশেষ। যেমন, বোনাই—বোনের স্বামী; আবার জেঠাই—জেঠার স্ত্রী। কানাই, গনাই, সূর্যাই যথাক্রমে কৃষ্ণ (কান) গণেশ ও সূর্যের আদরসূচক নাম ('তোমার দেশে যাব সূর্যাই মা বলিব কারে')। বস্তু অর্থে—নাটাই, কড়াই, মিঠাই। চোরাই—চুরির সহিত সম্বন্ধযুক্ত (চোরাই মাল)। ঢাকাই—ঢাকায় উৎপন্ন (ঢাকাই শাড়ি)। ঝাড়াই—ঝাড়ার কাজ। জনাই—গ্রামের নাম।

আইয়া-জ. কো—মাতৃবাচক আই শব্দের রূপভেদ, মা।

আওরৎ [আ° ঔরৎ]-মুস—মহিলা। স্ত্রী ('আওরতের লাগ্যা কান্দে দেওয়ান সোনাফর'—মৈগী)।

আজা, আজাই / আজু [স° আর্যক]-উব—মাতামহ।

আজী / আজীমা [আর্যিকা]—মাতামহী (আই দ্র)।

আঁটকুড়া / -কুড়ো—সন্তানহীন ব্যক্তি।....স্ত্রী.—কুড়ী।

আনু / আনো-জ. মা. কো—ভগিনীপতি।

আবু / আবুয়া-ম—শিশু (বালক কি বালিকা)। [আ° অবু=পিতা]।

আবুইধ্যা / আবুধিয়া [<আবুদ্ধিয়া]—অবোধ শিশু।

আবুই / আঁবুই মা [স° আবুকী]—ভ্রাতা বা ভগ্নীর শাশুড়ী, মাউই / মাউই মা।

আবো—মাতামহী (আই দ্র)।

আব্বা [আ°]-মুস—বাবা।....আব্বাজান (সমাদরে)।

আমসোস-মা—শাশুড়ীর মাতা। তুঃ **বড়সোস**—শ্বশুরের মাতা।

আম্মা [আ° উম্ম, স° অম্বা]-মুস—মাতা, মা।

ইষ্টি—কুটুম।....ইষ্টিকুটুম—আত্মীয়স্বজন।

এই-দচ—কোন কোন সম্প্রদায়মধ্যে স্ত্রীকে স্বামীর সম্বোধন (এই, শোন)। স্বামীকে স্ত্রীর সম্বোধন (রাজবংশীদের মধ্যে)। তাচ্ছিল্যে সম্বোধন (এই, এখানে বসে কেন, কিছু নেবার মতলব বুঝি ?)। গোরু বাছুরকে সম্বোধন (এই, আয় আয়। এই, পিছো পিছো)। এই শব্দটির স্থানীয় অর্থ না জানায় অনেক সময় কাহাকেও 'এই' সম্বোধন করার ফলে ঝগড়ার সৃষ্টি হয়। তবে পূর্ববঙ্গে কাহাকেও 'এই' বলিয়া আহ্বান করিলে, তাহা দোষের মধ্যে গণ্য হয় না (এই, শুনুন)।

এয়ো [<অবিধবা]—সধবা, এয়োস্ত্রী, আয়তী, আইয়ো—পূব, ভাতাভ্তী-কো. জ. রং, ভাতারাউলী-মা।....আয়তি, এয়োতি—সধবার লক্ষণ। বাঙালী হিন্দু সধবার লক্ষণ—শাঁখা, সিঁদুর, নোয়া।

কন্যা / কইন্যা—পুত্রী, তনয়া, daughter. তৎপর্যায় :—মেয়ে, ঝি, বিটি / বেটী, ছেরী-পূব।....কন্যাদান—কন্যার বিবাহ দেওয়া। পণ গ্রহণ না করিয়া উপযুক্ত পাত্রে কন্যা সম্প্রদান।....কন্যাদায়—কন্যার বিবাহ দেওয়া রূপ কঠোর কর্তব্য (কথায় বলে, 'কন্যা দায় বড় দায়')।....কন্যাযাত্র / -যাত্রী—কন্যাতি, বিবাহ উপলক্ষে কন্যার সহগামী কন্যাপক্ষীয় লোকজন ('কন্যাতি বর‍্যাতি পথে হইল হুড়াহুড়ি। কন্দন করিল পথে নিভাল দেউটী'-কেক্ষেমা)।....

কনে, কইনা—(কন্যার অপভ্রংশ) বিবাহের পাত্রী (কনে দেখা)। নববধূ (বর-কনে এসেছে)। বাড়ির সকলের ছোট বা নূতন বউ (কনে বউ)।

কর্তা—গৃহস্বামী, পরিবারের প্রধান ব্যক্তি, গিন্নি-উব, Head of the family. ....কর্তাবাবু / কত্তাবাবু—কর্তাকে চাকরবাকরের বা চাষাভুষার সম্বোধন।

কাকা [ফা°]—(খুড়া দ্র)।.... স্ত্রী, কাকী, কাকীমা (সম্বোধনে)।

কুটুম<কুটুম্ব—আত্মীয়। বাংলায়'কুটুম' বলিতে সাধারণত শ্বশুরবাড়ির দিকের আত্মীয়কে বুঝায়। তৎপর্যায় :—ইষ্টি, গুতিয়া / সাগাই-উব, মেমান-মুস, খেস / খেসী-মুস, দশ ঠাকুর।....বড় কুটুম—বড় শ্যালক।

কুদী-টা. ঢা. ফ.ম—শিশু বালিকা। তৎপর্যায় :—আবু-ম,খুকী, খুকু, (আদরে), নসী-ফ. ব, পুরী-পূব (পোলাপুরী), মাইও -জ. কো. রং।

কোদা [ফা° কোদক,তে° কোডুকু]-টা. ঢা. ফ.ব—শিশু বালক। তৎপর্যায় :—আবু-ম, খোকা, খোকন (আদরে), ছাওয়াল, নন্দু-ফ. ব, পোয়া / পোলা-পূব, বোপাই-জ. কো. বং।

খসম [আ°]-মুস—স্বামী। **খালা** [আ° খালহ]-মুস—মাসী।

খালু—মেসো।....খালাত ভাই—মাসতুত ভাই।

খুড়া / খুড়ো [স° ক্ষুদ্র > খুল্ল]—খুল্লতাত, পিতার কনিষ্ঠ ভ্রাতা, কাকা, কাকু (আদরে), চাচা-মুস, পুতি-ফ।....স্ত্রী. খুড়ী—খুড়ার পত্নী। তৎপর্যায় :—কাকী, চাচী-মুস, খুড়ন-শ্রী, খুড়াই-জ. কো।.. খুড়তুত, খুড়ুত, খুড়াত্ত-পূব—খুড়ার বা খুড়শ্বশুরের সন্তান সম্পর্কে (খুড়তুত ভাই,—বোন,—শালী)।....খুড়শ্বশুর—স্বামীর বা স্ত্রীর খুড়া।....খুড়শাশুড়ী—স্বামীর বা স্ত্রীর খুড়ী, খুড়াইশাশুড়ী-পূব।

গনাগোষ্ঠী / গনাগুষ্টি—পরিবারবর্গ, আত্মীয়স্বজন।

গিন্নী—গৃহিণী, গৃহকর্ত্রী, female head of a household. আঞ্চলিক সমনাম : গিথান / গিথাইন, গির্থাইন-ম, গিথানী / গির্থানী-জ. কো। ভিখারী, ঝি-চাকর, অনাত্মীয় পোষ্য প্রভৃতির নিকট ইনি গিন্নীমা, মা, মাঠাকরুণ; বাড়ির কর্তার নিকট বড়বউ। স্ত্রী, wife (গিন্নীর আঁচলধরা)।....গিন্নীপনা—গৃহিণীর আচরণ বা কাজকর্ম (তাঁর গিন্নীপনায় পরিবারের সকলেই সন্তুষ্ট)। গিন্নী না হইয়াও গিন্নীর ভাব দেখানো, পাকামি (যাও, গিন্নীপনা করতে হবে না)।....গিন্নীবান্নী—পাকা গৃহিণী (শাশুড়ীর মৃত্যুর পর মিত্রবউ এর মধ্যেই গিন্নীবান্নী হয়ে উঠেছে)।

গিরি [গৃহী ?]-উব—গৃহস্বামী, বাড়ির কর্তা। হিমালয়।

গুরু—শিক্ষাগুরু, যাঁহার নিকট বিদ্যাশিক্ষা করা হয়। দীক্ষাগুরু—যাঁহার নিকট দীক্ষা অর্থাৎ ইষ্টমন্ত্র গ্রহণ করা হয়, মন্ত্রদাতা, ইষ্টদেব। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কুলগুরুই দীক্ষাগুরুরূপে বৃত হন। গুরুপূজা (শ্রাদ্ধাদি কৃত্যে), গুরুমন্ত্রজপ (আহ্নিক), গুরুর প্রসাদভক্ষণ, সাধারণত এই কুলগুরু সম্পর্কেই প্রযুক্ত হয়। ইঁহার মৃত্যুতে শিষ্যকে অশৌচ পালন এবং হবিষ্যান্ন গ্রহণ করিতেও দেখা যায়। কুলগুরুর এই সম্মান এবং প্রভাব-প্রতিপত্তি ক্রমে হ্রাস পাইতেছে। বর্তমানে দীক্ষার ক্ষেত্রে কুলগুরু-প্রথা তেমন আর অনুসরণ করা হয় না।....গুরু—গুরুজন, পূজনীয় ব্যক্তি।....গুরুকুল—গুরুর আশ্রম। গুরুর বংশ।...গুরুগিরি—শিষ্যকে মন্ত্রদীক্ষাদানরূপ ব্যবসায়।....গুরুর দশা—মাতাপিতার

বিয়োগ জনিত অবস্থা। (জ্যোতিষে) বৃহস্পতির দশা।....গুরুভাই—একই গুরুর শিষ্য এই সম্পর্কে ভাই।....গুরুমা—গুরুপত্নী।....গুরুমারাবিদ্যা—যে বিদ্যা গুরুর নিকট হইতে আয়ত্ত করা হইয়াছে, তাহাই গুরুর বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা। ....গুরুবাদ—ভারতীয় সমাজে গুরুর (বিশেষ করিয়া দীক্ষাগুরুর) স্থান অতি উচ্চে। শিষ্যদের বিশ্বাস, গুরুর কৃপাবল ছাড়া এই ভব-সাগর উত্তীর্ণ হইবার আর কোনও উপায় নাই। তাই তাহারা গুরুর শরণ লয়, বলে, 'গুরু গুরু ভজরে মন, গুরুর কৃপায় জীবন ধারণ।'

চেলা—শিষ্য, শাগরেদ, disciple. -ম—সরস্বতী বিদ্যা। ছোট মাছ বিঃ। ফাড়া কাঠ (জ্বালানি)।

ছাওয়াল, ছাবাল—অল্পবয়স্ক বালক, শিশুপুত্র (দুধের ছাওয়াল)। বলিকর, যে পূজায় পাঁঠা ইঃ বলি দেয়।

ছেঁওড় / ছেঁওড়ে-পব, **ছেউড়্যা**-পূব [ছমণ্ড]—অভিভাবকহীন / -না। যে শিশুর দেখিবার কেহ নাই।

ছেমরা-পূব—বালক। পুত্র। স্ত্রী. ছেমরী।....ছেমরাইন—ছেরার বহুবচন।

ছেরা-পূব—ছেলে। স্ত্রী. ছেরী।....ছেরাইন্—ছেরার বহুবচন।

ছেলে [ও° ছেলা]—(ছালিয়া / ছাইলা / ছেলিয়া / ছেইলা—ছেলের আঞ্চলিক রূপভেদ) পুত্র (রামবাবুর পাঁচ ছেলে)। বালক। যুবক। (বর্তমানে ইস্কুল কলেজে মেয়েদের সংখ্যা ছেলেদের সমান হতে চলেছে)। বিবাহের পাত্র (ছেলে দেখা)। মানুষ (বেটাছেলে, মেয়েছেলে)।.... ছেলেমানুষ—অল্পবয়স্ক বালক বা বালিকা, যাহার বুদ্ধি এখনও পরিপক্ব হয় নাই ('খুকি তোমার ভারি ছেলেমানুষ'-র)।....ছেলেমানুষি, ছেলেমি, ছেলেমো—শিশুসুলভ আচরণ।....ছেলেখেলা—অপরিণত বুদ্ধি বালকদের মত আচরণ; মনোযোগ না দিয়া হালকাভাবে কোনও কাজ করা।...ছেলেবেলা —বাল্যকাল, boyhood days.....ছেলেধরা—শিশুদের যে ব্যক্তি নানা উদ্দেশ্যে চুরি করিয়া লইয়া যায়। দুরন্ত শিশুদের ভয় দেখাইয়া নিরস্ত করিবার কাল্পনিক জীব বা জুজু বিঃ (চুপ্! চুপ্!! ছেলেধরায় নিয়ে যাবে)।

ছেলেপিলে / -পুলে / -পেলে—অল্পবয়স্ক বালকবালিকা (এটা ছেলে-পিলের কাণ্ড)। তৎপর্যায়ঃ—ছইলপইল, ছালপাল, চেলাবেলা, চেংড়া-ফেংড়া, পোলাপান, ছুইট্কা (ছুইট্কার দল), বায়াবায়ানি। পুত্রকন্যা (আপনার ছেলেপিলে কয়টি)?

ছোক্‌রা—ছেলে, অল্পবয়স্ক বালক (ঘাটু ছোকরা-ম)।…স্ত্রী. ছুক্‌রী
ছোঁড়া—ছোকরা, ছেলে। …স্ত্রী. ছুঁড়ী। …ছোড়া, ছোঁড়া—নিক্ষেপ করা।

জা, যা [স° যাতা]—স্বামীর ভ্রাতার পত্নী। পূর্ববঙ্গের বহু অঞ্চলে জা-এর স্থলে 'জাল', 'জাক' এবং জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার অঞ্চলে 'জাও' শব্দের প্রয়োগ শুনা যায় ('ইনি আমার বড় জাল'-ম। 'ইনি আমার জাও'-জ)। সম্বোধনে বড় জাকে অঞ্চলভেদে দিদি, আপা-মে, বাই-জ. কো. দি এবং ছোট জাকে নাম ধরিয়া, কখনো বা 'অমুকের মা' বলিয়া ডাকা হয়।

জামাতা / জামাই [স° জামাতৃক]—কন্যা তথা পুত্রীর স্বামী। তৎপর্যায় :—জাঁঅই / জায়োই-জ. কো. মা. দি, দামাদ / দামান-মুস, হি° দামাদ, ই° son-in-law. শ্বশুর শাশুড়ীর নিকট জামাতা পুত্রতুল্য,—জামাতাবাবাজী, বাবাজীবন। ছোট শালাশালীর নিকট জামাইবাবু (বর্তমানে দাদা)। পূর্ববঙ্গে 'জামাই' কথাটি অনেক সময় স্বামী (husband) অর্থেও ব্যবহৃত হয় (খাঁদির জামাই এসেছে। এখানে 'খাঁদির জামাই'—খাঁদির বর)।

…**ঘরজামাই**—যে জামাই স্থায়ীভাবে শ্বশুর শাশুড়ীর গৃহে বাস করে। আদিবাসী সমাজেই ঘরজামাই প্রথা অধিক প্রচলিত। উচ্চকোটি সমাজে শ্বশুরান্নে প্রতিপালিত জামাতাকে কেহই খুব সুনজরে দেখে না ('করিয়া শ্যালক সেবা শ্বশুরান্নে থাকে যেবা, তাহার জীবনে থাক ধিক'-রারচ। 'ঘরের জামাই মাধো, বাইরের জামাই মধুসূদন'-প্র)। ঘরজামাই ছাড়া অন্য জামাতার প্রতিও অনেক ছড়ায় এবং কথায় যেন একটা বিরূপ মনোভাবই প্রকাশ পাইয়াছে। যেমন, 'যম, জামাই, ভাগিনা, তিন নয় আপনা।' 'আশি টেহার থাসি দিলাম নব্বই টেহার ভইষ। তেওত জামাই খায় না, বিদায় দিলে যায় না'-ম। 'শ্বশুরবাড়ী না 'মথুরাপুরী, দিন দুই চারি। তারপর মিলে—বাড়ি।' আবার 'জামাইর আদর', 'জামাতা দেবতা', 'শ্বশুর অসুর' কথাগুলিও শুনা যায়।…**জামাই ঠকানো**—শ্বশুর বাড়িতে শালাশালীদের ঠাট্টাচাতুরীর ভিতর দিয়া নূতন জামাইকে নানাভাবে জব্দ করিবার প্রথা।…**জামাইষষ্ঠী**—অরণ্যষষ্ঠী, জ্যৈষ্ঠের শুক্লাষষ্ঠীতে কন্যা ও জামাতার কল্যাণ কামনা করিয়া যে অনুষ্ঠান করা হয়। এই অনুষ্ঠানে জামাতাকে তত্ত্বাদি পাঠাইবার (কোন কোন অঞ্চলে) এবং ভূরিভোজনে আপ্যায়িত করিবার রীতি আছে।

জেওয়াস-পূব—স্ত্রীর বড় বোন, বড়শালী-পব, জেইঠানী / জেঠানী-উব, জেসাহু

(উত্তর আসাম)। বড়শালীকে বহু অঞ্চলে দিদি বলিয়া এবং ছোটশালীকে নাম ধরিয়া ডাকা হয়।

জেঁওচ, জেঁয়চ—সন্তানবতী, যে স্ত্রীলোকের সব সন্তানই জীবিত আছে। তুঃ মড়ুঞ্চে।

জেঠা, জ্যাঠা—পিতার বড় ভাই, জ্যেষ্ঠতাত, জেঠো-জ. কো. বং। সম্বোধনে জেঠামশায়, জেঠু (আদরে), বড় জেঠো-কো। বাচাল, অকালপক্ক (জ্যাঠা ছেলে)।....জেঠামি—বাচালতা।....জেঠার পত্নী—জেঠী, জেঠাই-উব, জেঠন-শ্রী, জেঠুই-বী (সম্বোধনে জেঠীমা, জেঠাইমা)।

....জেঠতুত /-তা /-তো, জাঠতুত /-তা /-তো, জেঠাত, জেঠাত্ত—নিজের জেঠার অথবা জেঠশ্বশুরের সন্তান এই সম্পর্কে (জেঠতুতো ভাই,—শালী,—দেওর)।....জেঠশ্বশুর, জাঠশ্বশুর—স্বামীর পক্ষে পত্নীর জেঠা এবং স্ত্রীর পক্ষে স্বামীর জেঠা।....স্ত্রী. জেঠশাশুড়ী, জাঠশাশুড়ী। [জেঠ, জাঠ<জ্যেষ্ঠ]।

ঝি—দুহিতা, কন্যা (ঝি-জামাই। 'বড়ার ঝি তোর ভাল নহে মতী'-শ্রীকৃ)। চাকরানী (ঠিকা ঝি, ঝি-চাকর)।

ঝিয়ারী [ঝি+আরী (আকার)]—মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে 'দুহিতা' অর্থে ঝিয়ারী, ঝিউড়ী শব্দের প্রয়োগ আছে ('বড়ার বহুআরী আহ্মে বড়ার ঝিআরী'- শ্রীকৃ)। কিন্তু পূর্ববঙ্গের বহু অঞ্চলে পুত্রবধূর বা জামাতার ভগিনীকে 'ঝিয়ারী' এবং ভ্রাতাকে 'পুত্রা' বলা হয়। চট্টগ্রামে 'ঝিয়রা' কথাটিও প্রচলিত আছে।

ঠাকুর—দেবতা (ঠাকুর তোমার মঙ্গল করুন। ঠাকুরের কৃপা)। দেবতার মূর্তি (ঠাকুর ভাসান)। ব্রাহ্মণ, পুরোহিত (ঠাকুর পূজোয় বসেছেন)। পূজনীয় ব্যক্তি (পিতাঠাকুর, ভাশুর ঠাকুর, দাদাঠাকুর)। পাচক ব্রাহ্মণ (ঠাকুর, ভাত দিয়ে যাও)। পদবী বিঃ। বাঙালীর সংসার-সমাজে পূজনীয় এবং ঘনিষ্ঠ আত্মীয় অনেককেই 'ঠাকুর' আখ্যায় ভূষিত করা হয়। যেমন, পিতাঠাকুর, ভাশুরঠাকুর / বটঠাকুর, দাদাঠাকুর। ঠাকুরদাদা / ঠাকুরদা—পিতামহ। ঠাকুরমা / ঠাকুমা—পিতামহী। পূর্ববঙ্গের বহু অঞ্চলে সকলের বড় ভাই, কাকা, মামা এবং দিদিও যথাক্রমে ঠাকুরদাদা, ঠাকুরকাকা, ঠাকুরমামা, ঠাকুরদিদি। কল্যাণীয় দেবরও ঠাকুরপো, ঠাকুরকুমার। ঠাকুর-জামাই—নন্দাই। ঠাকুরঝি, ঠাকুরকন্যা—ননদ।...স্ত্রী. ঠাকুরাণী। ঠাকরুন, ঠাঁকরান, ঠাকরুন, ঠাকুরন, ঠাকুরান, ঠাইরন, ঠান, ঠাউকরাইন, ঠাগরাইন—

ঠাকুরাণীর রূপভেদ। ঠাকুরের ন্যায় ঠাকুরাণীও ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা, হৃদ্যতা এবং মর্যাদাজ্ঞাপক। যেমন, মা—মাতাঠাকুরাণী ; গৃহকর্ত্রী—মা ঠাকরুন ; বউদিদি—বউঠান। বড় জা—ঠানদি। পাড়ার অনাত্মীয়া বয়স্কা মহিলাকেও প্রায়ই ঠানদি ডাকা হয়।

ঠাকুর দাদা / ঠাকুরদা—পিতামহ। পিতামহকে সম্বোধন। তৎপর্যায় :—ঠাকুরবাবা, দাদামশাই, দাদাবাবু, দাদু, বুড়াবাপু / আজু-রং, বড়াপু-মা, বড় বাপু / আজা / দাদো-জ. কো, আজাই-বগু, নানা-মুস।

ঠাকুরমা / ঠাকুমা / ঠাগমা / ঠাম্মা—পিতামহী, বড়মা-জ. কো, কর্তামা-ন, দাদী-মুস। পূর্ববঙ্গে কোন কোন সমাজে দুদু / ঠাকুরদু ডাকও শুনা যায়।

তাউই-ক, তালুই-চ [সং তাতগু]—ভ্রাতা বা ভগিনীর শ্বশুর। পিতার মিত্র বা মাতার সখীর স্বামী (সইয়া) বা তৎতুল্য ব্যক্তি। তৎপর্যায়ঃ—তাঐ / তালই -পুব. ত্রি. চট্ট, তাহই-উব. মু।....তাউইর পত্নী—মাউই-রাঢ়, মাঐ-পুব, মাহই-উব. মু, আঁবুই / আঁবুইমা-পব।

দাদা—জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, অগ্রজ (সকলের বড়—ঠাকুরদা, বড়দা। দ্বিতীয়—মেজদা, মাইতোদা-বী. মু। তৃতীয়—সেজদা। চতুর্থ—নদা। পঞ্চম—ফুলদা। সকলের ছোট—ছোড়দা)। দ্বিতীয় দাদাকে 'ভাইটি' বলিতেও শুনা যায়। স্বামীর দাদা এবং স্ত্রীর দাদাকেও বর্তমানে 'দাদা' ডাকা হয়। পিতামহ বা মাতামহ (ঠাকুর দাদা দ্র)। দাদা, দাদাভাই / দাদু / (আদরে)—পৌত্র, দৌহিত্র বা তত্তুল্য ব্যক্তিকে স্নেহ সম্বোধন। অনাত্মীয় সমবয়স্ক বা বয়োজ্যেষ্ঠকেও অনেক সময় 'দাদা' বলিয়া সম্বোধন করা হয় (দাদা, কয়টা বাজে ?)।....দাদাঠাকুর, দাদাবাবু, ঠাকুরদা / ঠাউরদা—বৃদ্ধ ভদ্র ব্যক্তিকে, বিশেষ করিয়া ব্রাহ্মণকে সাধারণ লোকের সম্বোধন।

দাদী [হিং]—পিতামহী বা মাতামহী।

দিদি—জ্যেষ্ঠা ভগিনী। বিভিন্ন বয়সের জ্যেষ্ঠা ভগিনীদের সম্বোধন—বড়দি, মেজদি, সেজদি, নদি, ফুলদি, ছোড়দি। বড় জা, বড় ননদ, সখী, সখীস্থানীয় প্রতিবেশিনী, বড় শালী এবং তত্তুল্যাদেরও 'দিদি' ডাকা হয়। দিদি ঠাকরুন, দিদিমণি—মনিবকন্যাকে গৃহভৃত্য প্রভৃতির সম্বোধন। বর্তমানে শিক্ষিকাদেরও ছাত্রীরা 'দিদিমণি' সম্বোধন করে। পৌত্রী, দৌহিত্রী এবং তত্তুল্যাদেরও আদরে 'দিদি' বলিয়া সম্বোধন করা হয়। দিদিমা, দিদা (আদরে)—মাতামহী (আই দ্র)।

দুলা [হি° দুল্‌হা]—বর, bridegroom. **দুলাইন** [হি° দুল্‌হিন]—কনে, bride. **দুলাভাই**-মুস—ভগিনীপতি।

দেবর—স্বামীর ছোট ভাই। তৎপর্যায়—দেওর, দেওরা-মে, দেওরিয়া (আদরে), ছোজন্নু-মা, ছোটজন / ছোটমিয়া-মুস, ঠাকুরপো / ঠাকুর কুমার (সম্বোধনে)।

দোস্ত, দোস্ত [ফা° দূসৎ]—বন্ধু, মিত্র। **নদারী**-উব—নববধূ।

ননদ [স° ননন্দা, নন্দা]—স্বামীর ভগিনী, নন্দ / ননদী-উব, ননদিনী (প্রায় পদ্যে), ননন-শ্রী। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, কোন কোন অঞ্চলে স্বামীর ছোট বোনকে 'ননদ' এবং বড় ভগিনীকে 'ননাস' বলা হয়।....নন্দাই, নন্দু-মা—ননদের স্বামী, ঠাকুরজামাই (নন্দাইকে সম্বোধন)। ....জেঠ পোইত-উব—বড় ননদের স্বামী।....শাল পোইত-উব—ছোট ননদের স্বামী।....দিদি—ননাসকে (বড় ননদ) সম্বোধন।...ঠাকুরঝি—ছোট ননদকে সম্বোধন।

নাতি [স° নপ্তা]—পৌত্র বা দৌহিত্র, নাতিপোতা-মুস

নাতনী / নাতিনী [স° নপ্ত্রী]—পৌত্রী বা দৌহিত্রী, নাতিন, নাতন-শ্রী। ....নাতিনাতকুড়—নাতি-নাতনী।....নাতবউ—নাতির স্ত্রী।....নাতজামাই—নাতনীর স্বামী।....নাতিপুতি—পুত্র ও পৌত্র।

নানা-মুস—মাতামহ।....স্ত্রী. নানী।

পাহান-মে—পুরোহিত (আদিবাসী সমাজে)। গুণীন, তন্ত্রমন্ত্রজ্ঞ।

পিসা / পিসে—পিসীর স্বামী, পিয়া-শ্রী, ফুফা-মুস।

পিসী [স° পিতুঃ স্বসা]—পিতার ভগিনী, পি-শ্রী, পিসাই-উব, ফুফু/ঝিমা-মুস।

পিসশ্বশুর—স্বামীর পক্ষে স্ত্রীর এবং স্ত্রীর পক্ষে স্বামীর পিসা। ....স্ত্রী. পিস শাশুড়ী। তৎপর্যায়:—পিসাই শাশুড়ী-পূব, পিসাস, পিসোস-মা।....পিসতুত /-তুতো, পিসাত / পিসাত্ত-পূব—নিজের পিসীর বা পিসশাশুড়ীর সন্তান এই সম্পর্কে (পিসতুতো ভাই,—বোন,—শালী)।

পুত—পুত্র। পুং নামক নরক।....পুতন্তী—পুত্রবতী। তুঃ ভাতন্তী।....পুতুপুতু—পুত্রতুল্য আদরযত্ন (পুতুপুতু করা)।

পুত্র—আত্মজ, তনয়, ছেলে। তৎপর্যায় :—পুত, পো (ঘোষের পো), পোলা, পোয়া, বেটা (ছেলে দ্র)।....পুত্রা-পূব—জামাতা বা পুত্রবধূর ভাই।

পুরী-পূব—খুকী।....পোলাপুরী—ছোট ছেলেমেয়ে।

পুরী—ভবন (রাজপুরী)। নগরী (অলকাপুরী)। শ্রীক্ষেত্র। খাবার বিঃ (লুচিপুরী)। উপাধি বিঃ (অমুক পুরী)।

পুরোহিত—যজমানের কল্যাণার্থে তাহার প্রতিনিধি স্বরূপ যিনি ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি করেন, পুরুত-ক, পুরুইত / পুরুইতঠাকুর-পূব, ঠাকুর মশাই।

বউ, বৌ [সং বধূ]—পুত্রবধূ বা তত্তুল্যানারী। (স্নেহে)....বউমা / বৌমা। **বউ**—কুলবধূ (মিত্র বউ)। নববধূ (বউ দেখা)। তৎপর্যায় :—বউড়া, বোয়ারী -কো, নদারী-মা। পত্নী (সতীশের বউ। 'দরবারে হেরে ঘরে এসে বউ ঠেঙানো'-প্র)।....বড়বউ—বড় ছেলের স্ত্রী। আবার অনেক পরিবারে গৃহকর্তা নিজের স্ত্রীকেও 'বড়বউ'সম্বোধন করেন। উত্তরবঙ্গে সাধারণত বউকে 'বহু' এবং ছেলের বউকে 'বেটার বহু' বলিতে শুনা যায়।....নারীর ভাষায় বড়বউ—বড়কী; মেজবউ—মেজকী; সেজবউ—সেজকী; ছোট বউ—ছোটকী। ....বউকাঁটকী—যে শাশুড়ী বউকে পীড়ন করে। ....বউভাত—পাকস্পর্শ, বিবাহের পর স্বামীগৃহে নববধূর প্রথম রান্না স্পর্শ এবং সেই স্পৃষ্ট অন্ন বর ও বরের জ্ঞাতিকুটুম্বদের ভোজনরূপ অনুষ্ঠান বিঃ। ইহাকে বরের বাড়ির প্রীতিভোজও বলা হয়। ইহাতে শুধু জ্ঞাতি-কুটুম্বকেই নহে, বরের বন্ধুবান্ধব পাড়াপ্রতিবেশী অনেককেই নিমন্ত্রণ করা হয়। তাহারা নানাবিধ উপঢৌকন দিয়া নবদম্পতিকে আশীর্বাদ করে।....বউয়া—স্ত্রৈণ।

বউদিদি, বউদি, বৌদি—বড় ভাইয়ের স্ত্রী। বড় ভাইএর স্ত্রীকে ছোট ভাই বোনদের সম্বোধন। তৎপর্যায় :—ভাজ, ভাজবৌ-রাঢ়, ভদি-মা. পু, ভানী-মা, ভাবী-মুস। বউদিদিকে বউঠাকুরাণী, সম্বোধনে বউঠাকরুন, বউঠাকরান, বউঠান বলিতেও শুনা যায়।

বন্ধানী-ঢা. ফ. ব, **বন্ধাইন**-ম—বন্ধুর স্ত্রী বা স্ত্রীবন্ধু।

বর—বিবাহের পাত্র; যে সদ্য বিবাহ করিয়াছে বা বিবাহ করিতে যাইতেছে, bridegroom (ঘরবর দেখা। বরবরণ। বরদক্ষিণা)। স্বামী (খেঁদীর বর এসেছে)।....মিতবর, নিতবর, কোলবর—বরের সহগামী মিত্র বিঃ। 'মিত্রাভিষেক' অনুষ্ঠানে বধূর অভিষেক ক্রিয়ায় ইহার ডাক পড়ে। বর্তমানে এই অনুষ্ঠান প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। গাঙ্গেয় অঞ্চলে বরের যাত্রাকালে অনেক ক্ষেত্রে তাহার পার্শ্বে একটি অল্পবয়স্ক বালককে (ভ্রাতৃস্থানীয়) মিতবর নামে বসাইয়া দেওয়া হয়।....দোজবর—যে দ্বিতীয়বার বিবাহ করে।....তেজবর—যে তৃতীয়বার বিবাহ করে। **বর**—আশীর্বাদ। ঈপ্সিত বস্তু (বর প্রার্থনা)।

বরধনা-জ. কো—রাজবংশীদের মধ্যে 'বরধনা' শব্দটি দ্ব্যর্থক, ইহার একটি অর্থ 'ভাশুর', অপর অর্থ 'বড়শালা'।

বাই—কোচবিহার এবং জলপাইগুড়ি অঞ্চলে দিদি, বড়জা এবং বড় ননদ অর্থে 'বাই' বহু প্রচলিত।

বাই—বাইজী। স্ত্রীলোকের উপাধি (মীরাবাঈ)। বাতিক (শুচিবাই)। বায়ুরোগ। সখ, নেশা (ডাক টিকিট জমানোর বাই)।

বাজান / বাজি-মুস—বাবা [বাপজান]।

বাপ [স° বপ্র]—বাবা, পিতা। পুত্র বা পুত্রস্থানীয়কে সম্বোধন (অত্যধিক আদরে বাপধন, বাপজান-মুস; অনাদরে বাপু)।....বাপুজী / বাবুজী—পিতৃস্থানীয়কে সশ্রদ্ধ সম্বোধন।

বাবা—পিতা, বাআ-চট্ট। পিতাকে বা আদরে পুত্র বা পুত্রস্থানীয়কে সম্বোধন। শিব, পঞ্চানন্দ প্রভৃতি অনেক রোগাপহারী দেবতাকেও বাবা বলা হয় (বাবা বৈদ্যনাথ, বাবা পঞ্চানন্দ, বাবা তারকনাথের দোরে হত্যা দেওয়া)। সাধু সন্ন্যাসীরাও 'বাবা'র সম্মান পাইয়া থাকেন (সাধুবাবা, পাহাড়ী বাবা, সাঁইবাবা)। ....বাবাজী—বৈষ্ণব সাধু (সন্তদাস বাবাজী)। পুত্রস্থানীয়দের সম্পর্কে স্নেহসূচক উক্তি বা সম্বোধন (জামাতা বাবাজী)। ....বাবাজীবন—বিবাহাদি নিমন্ত্রণ পত্রে প্রাচীনপন্থী কেহ কেহ পাত্রের নামের পরে বা আগে স্নেহসূচক 'বাবা-জীবন' লিখিয়া থাকেন (আমার পুত্র অমুক বাবাজীবনের সহিত....)।

বাবু—ব্যক্তিবাচক শব্দের পর ব্যবহৃত সম্মান সূচক আখ্যা (হরিবাবু, কাকাবাবু, ডাক্তারবাবু, উকিলবাবু, রায়বাবু, ঘোষবাবু, কেরানীবাবু)। বর্তমানে যেমন হিন্দু জীবিত ব্যক্তিদের নামের পূর্বে সৌভাগ্য বা সম্মানসূচক 'শ্রী' ব্যবহার করা হয়, এককালে তেমনই 'বাবু' ব্যবহৃত হইত (বাবু অমলকৃষ্ণ রায়, বাবু সুধামাধব চট্টোপাধ্যায়)। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এর কোনও দলিলে রবীন্দ্রনাথকে 'বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর' রূপে সহি করিতে দেখিয়াছি। ভদ্রলোককে সাধারণ লোকের সম্বোধন (এখন টাইম কত বাবু? এত সস্তায় পাবেন না বাবু)। ভদ্র পরিবারের কর্তা এবং অন্য পুরুষও ঝি-চাকর প্রভৃতির নিকট বাবু আখ্যা লাভ করে (বাবু / কর্তাবাবু ঘুমুচ্ছেন। ছোটবাবু। খোকাবাবু)। কোন কোন পরিবারে অল্পবয়স্ক ছেলেমেয়েরা বাবাকেও 'বাবু' বলে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, 'বাবু' আখ্যাটি কোনও মুসলমান বা বিদেশীর উদ্দেশে বা তাঁহাদের নামের সঙ্গে প্রয়োগ করা হয় না। সেসব ক্ষেত্রে সাহেব / সাব, মিঞা / মিয়াঁ, মিয়াজী ব্যবহৃত হয়। ....বড়বাবু—আপিসের কেরানীদের প্রধান, Head clerk. বাবু—বিলাসী, সৌখিন।....বাবুগিরি বাবুয়ানা,

বাবুয়ানি—বিলাসিতা, বাবুসুলভ কার্য। প্রসঙ্গক্রমে বলা যাইতে পারে, 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' গ্রন্থে শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় কলিকাতা শহরের 'সম্পন্ন মধ্যবিত্ত ভদ্র গৃহস্থদিগের গৃহে' উনবিংশ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত 'বাবু' নামে যে শ্রেণীর মানুষের কথা লিখিয়াছেন, তাহার সঙ্গে উল্লিখিত নানার্থক আধুনিক 'বাবুর' সম্পর্ক সামান্যই।

কলিকাতার সেই বাবুদের সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন, 'তাহারা পারসী ও স্বল্প ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে প্রাচীন ধর্মে আস্থাবিহীন হইয়া ভোগসুখেই দিন কাটাইত। ইহাদের মুখে, ভ্রূপার্শ্বে ও নেত্রকোলে নৈশ অত্যাচারের চিহ্ন স্বরূপ কালিমা রেখা, শিরে তরঙ্গায়িত বাউরি চুল, দাঁতে মিশি, পরিধানে ফিনফিনে কালাপেড়ে ধুতি, অঙ্গে উৎকৃষ্ট মসলিন বা কেমব্রিকের বেনিয়ান, গলদেশে উত্তমরূপে চুনট করা উড়ানী ও পায়ে পুরু বগ্লস সমন্বিত চিনে বাড়ীর জুতা। এই বাবুরা দিনে ঘুমাইয়া, ঘুড়ি উড়াইয়া, বুলবুলির লড়াই দেখিয়া, সেতার, এসরাজ, বীণ প্রভৃতি বাজাইয়া, কবি, হাপ আকড়াই, পাঁচালি প্রভৃতি শুনিয়া, রাত্রে বারাঙ্গনাদিগের আলয়ে আলয়ে গীতবাদ্য ও আমোদ করিয়া কাল কাটাইত ;....।' কলিকাতার বাবু কালচার ইহাদেরই সৃষ্টি।

বালা-উব—বর। বালক।....বালী—কনে। বালিকা।

বিধবা—পতিহীনা। তৎপর্যায় :—বিধুয়া-মা, রাড়ি-পূব, আড়ি-জ. কো. রং, বেওয়া-মুস, ই° widow.

বিবি [ফা°, হি° বীবী]—মহিলা। স্ত্রী (সাধারণত মুসলমান বা ইউরোপীয়)। বিবিছবিযুক্ত তাস বিঃ।....বিবিজান—সাদর সম্বোধন।....বিবিয়ানা—বিবির মত আচরণ। বিলাসিতা।

বুবু-মুস—দিদি।

বেগম—নবাব বাদশাহের স্ত্রী। মুসলমান সম্ভ্রান্ত মহিলা।....বেগম সাহেবা—বেগম সম্পর্কে সম্মানসূচক উল্লেখ বা সম্মানসূচক সম্বোধন।

বেটা, বিটা, বেডা-পূব [স° বটু]—পুত্র (তোমার বেটাকে ডাক। 'বাপের বেটা')। পুরুষ, আদমী (পাঁচ বেটা এসে উপস্থিত। বেটার মত কথা বলিস্)। অবজ্ঞাসূচক সম্বোধন (পাজি বেটা। কিরে বেডা-পূব)।....স্ত্রী. বেটী, বিটি, বেডী-পূব। বহুবচনে—বেটাইন / বেডাইন-পূব।....বেটাছেলে—পুরুষমানুষ (তুমি বেটা ছেলে নও? এত ভয় কিসের?)। অনেক সময় গালি অর্থে 'বেটাচ্ছেলে' প্রয়োগ করা হয় (বেটাচ্ছেলে কোথাকার)।

বেহাই / বেয়াই—বৈবাহিক, পুত্রের বা কন্যার শ্বশুর (আপন শ্বশুর, জেঠ—, খুড়—, মাস—, পিস—, মামা—)। তৎপর্যায় :—বিয়াই-পূব, বিহাই-মু. মা. দি, বিয়ায়-ম, বিয়ৈ-জ. কো. রং, বেই- নো. ত্রি।

বেহান / বেয়ান—বৈবাহিকা, পুত্রের বা কন্যার শাশুড়ী (আপন শাশুড়ী এবং সম্পর্কে শাশুড়ী)। তৎপর্যায় :—বেহাইন / বিয়াইন-পূব, বিহান-মু, বেইন-নো. ত্রি, বেহানী / বিয়নী-মা. জ. কো. রং।

বোন [হি° বহিন]—ভগিনী, সহোদরা বা তত্তুল্যা। পর্যায়শব্দ :—বোহিন-মু. উব, ভইন / বোইন-পূব. শ্রী, ভনী-কামরূপ। বাংলায় সাধারণত ছোট ভগিনীকে 'বোন' এবং বড় ভগিনীকে বোনদি, দিদি, বাই, বুবু / বু বলা হয়। নারীর নিকট ভগিনীর পুত্র—বোনপো এবং ভগিনীর কন্যা—বোনঝি। পুরুষের নিকট ভগিনীর পুত্র—ভাগিনেয়, ভাগিনা / ভাগনে এবং ভগিনীর কন্যা—ভাগিনেয়ী, ভাগিনী, ভাগ্‌নী।

বোনাই—ভগিনীপতি। তৎপর্যায় :—বোহোনু-মু, বোহনাই / বোইনা / বোনু / আনু /আনো-জ. কো. রং, বনো-ত্রি, বুনুই, ভিনসি-কো, দুলাভাই-মুস।....বোইনজামাই-পূব, বোইনজাঁআই-জ. কো (ছোট বোনের স্বামী)। সাধারণত বড় বোনের স্বামীকে জামাইবাবু, দাদা, ভাইসাব (ভাইসাহেব)-মুস এবং ছোটবোনের স্বামীকে নাম ধরিয়া ডাকা হয়।

ভগিনী—বোন ও দিদি দ্র।....ভগিনীপতি—বোনাই দ্র।

ভাই—ভ্রাতা, সহোদর (সোদর ভাই) brother।....সৎভাই, সতালো ভাই-পূব. উব—বিমাতার পুত্র, step brother।....জেঠতুতো ভাই—জেঠার পুত্র সম্পর্কে ভাই।—খুড়তুতো ভাই—খুড়ার পুত্র সম্পর্কে ভাই। এইরূপ মাসতুতো ভাই, পিসতুতো ভাই, মামাতুতো ভাই। ইহাদিগকে ইংরাজীতে cousin brother বলা হয়। বাংলায় সাধারণত ছোট ভাইকে (অনুজ) 'ভাই' এবং বড় ভাইকে (অগ্রজ) 'দাদা' বলা হয়। তবে সমাজভেদে অগ্রজকেও ভাই ডাকিতে শুনা যায়। বন্ধু, অনাত্মীয় সমবয়স্ক বা বয়ঃকনিষ্ঠ, নাতি প্রভৃতিকেও 'ভাই' সম্বোধন করা হয়। মেয়েরা মেয়ে বন্ধুকে, ক্লাসের অন্য ছাত্রীকে প্রায়ই ভাই বলিয়া ডাকে। অনেক বক্তার নিকট শ্রোতৃমণ্ডলীও 'ভাইসব'।.... ভাইবেরাদর, ভাইভায়াদ—ভ্রাতা ও তত্তুল্য ব্যক্তিগণ, brethren.

ভাইঝি—ভ্রাতার কন্যা, ভ্রাতুষ্পুত্রী। তৎপর্যায় :—ভাইবেটী, ভাতিজী-উব, ভাস্তী / ভাইস্তী-পূব।

ভাইপো—ভ্রাতার পুত্র, ভ্রাতুষ্পুত্র। তৎপর্যায় :—ভাইবেটা-ঢা. ফ. ব, ভাইস্তা-ম, ভাতিজা-জ. কো, ভাতিজ্যা-মু. পা। রাঢ় অঞ্চলে ঠকানো অর্থে 'ভাইপো সাজানো' কথাটি প্রায়ই শুনা যায়।

ভাইরাভাই, ভায়রাভাই [ভাই+রা (সাদৃশ্যে)=ভাইরা / ভায়রা]—স্ত্রীর ভগিনীপতি, শ্যালিকার স্বামী, সাঁঢ়ুভাই-বাঁ. উব। সাধারণত বড়শালীর স্বামীকে দাদা এবং ছোট শালীর স্বামীকে নাম ধরিয়া ডাকা হয়।

ভাইস্তা—ভাইপো।....ভাইস্তী—ভাইঝি।

ভাউই—ছোট ভাইয়ের স্ত্রী, ভাদ্রবধূ।

ভাগিনা / ভাইগনা / ভাগনে—ভাগিনেয় (বোন দ্র)।

ভাজ [স° ভ্রাতৃজায়া]—ভাইএর স্ত্রী। তৎপর্যায় :—ভাইজ-বাঁ. বী, ভাউজ-পুব, ভাউজী-মা. দি, ভোইজী-কো, ভেজী-পু।....ভাজবৌ-রাঢ়—বউদিদি।

ভাতার—ভর্তা, স্বামী। শব্দটি প্রায়ই অবজ্ঞাচ্ছলে প্রযুক্ত হয় (মাগ-ভাতার)। ভাতারী, ভাতাত্তী-জ. কো—যাহার স্বামী বর্তমান, সধবা।

ভাতিজা—ভাইপো।....ভাতিজী—ভাইঝি।

ভাদ্রবধূ / ভান্দরবউ—ছোট ভাইএর স্ত্রী। তৎপর্যায় :—ভাউই / ভোয়াসিন -রাঢ়, ভাউসানী-জ. কো, বোয়াসিনী ফ. ব।

ভালাতভাই-চট্ট—ভাজের ভাই। (বউদিদি দ্র)।

ভাশুর—স্বামীর বড়ভাই। তৎপর্যায় :—ভাউর-শ্রী. ত্রি, ভোশুর / বরধনা-জ. কো. রং।....ভাউরকর-শ্রী—ভাশুরপো।....ভাশুর ভাদ্রবধূ সম্পর্ক—দুইজনের মধ্যে এরূপ মনোমালিন্য ঘটিয়াছে যে, একজন আর একজনের মুখ পর্যন্ত দেখে না। রক্ষণশীল সমাজে এককালে ভাশুরের সঙ্গে ভাদ্রবধূর সরাসরি কথা না বলা, ভাশুরের মুখ না দেখা, নাম না বলা,—ইহাই রীতি ছিল। বর্তমানে ইহার কড়াকড়ি হ্রাস পাইয়াছে, শিক্ষিত পরিবারে একেবারে উঠিয়াই গিয়াছে এবং ভাশুরকে দাদা ডাকার রীতি প্রচলিত হইয়াছে।

ভোয়াসিন—ভাদ্রবধূ দ্র।

মড়ুঞ্চে—যে পোয়াতীর সন্তান বাঁচে না, মৃতবৎসা (মড়ুঞ্চে পোয়াতী)।

মা—মাতা, ই° mother / mamma. তৎপর্যায় :—মাও ('মাও ছাড়ছি বাপ ছাড়ছি ছাড়ছি জাতিকুল'—মৈগী), মাই (মাইয়া), মাওজান / আম্মা -মুস, আই / আইয়া-জ. কো (আই দ্র)। বাঙালীর সমাজে মায়ের স্থান ও সম্মান সকলের উপরে। একটি বহু প্রচলিত ছড়া : 'মাসী বল পিসী বল

মায়ের সমান নাই। চিড়া বল মুড়ি বল ভাতের সমান নাই।' আত্মীয়সূচক অনেক শব্দের সঙ্গে 'মা' যুক্ত হইয়া সেই সকল শব্দকে আরও হৃদ্য ও শুচিতা-মণ্ডিত করিয়া তোলে। যেমন, কাকীমা, জেঠাইমা, মাসীমা, পিসীমা, মামীমা, ঠাকুরমা, দিদিমা, বউমা। বাঙালী তাহার কন্যা, কন্যাস্থানীয়া এবং অনাত্মীয়াকেও 'মা', 'মাই' সম্বোধন করে। হাটে বাজারে পণ্যবিক্রেতা অপরিচিতা রমণীদেরও 'মা'-এর সম্মান দেওয়া হয়। দিনাজপুর মালদহে তাঁহাদিগকে প্রায়ই 'হাঁ মাই' বলিয়া ডাকা হয়। শুধু সমাজেই নহে, বাঙালীর ধর্মেও মাতৃ-দেবতারই প্রাধান্য, মাতৃপূজাই তাহার শ্রেষ্ঠ পূজা। দুর্গা, কালী, মনসা, মঙ্গলচণ্ডী শীতলা, ষষ্ঠী সকলেই তাহার 'মা'।

মাউই, মাঐ—তাউই দ্র।

মাগ, মাইগ / মাউগ-পূব—পত্নী (অবজ্ঞায়: 'যেমন মাগ তেমনি ভাতার')।
....মাউগা—স্ত্রৈণ।

মাগী—স্ত্রীলোক (অবজ্ঞায়: মাগী মিনসে)। অবজ্ঞাভরে স্ত্রীকেও অনেক সময় 'মাগী' বলা হয় ('জন খাট্যা মুনসা মরে মাগী মাগে শাঁখা'—রারচ), মগী-মা. দি।

মামা—মা-এর ভাই, মাতুল, ইং maternal uncle. মামু—মামা (মামাকে আদরসূচক সম্বোধন)। তেলুগু ভাষায় মামাকে 'মাম' বলা হয় এবং ইহা দ্ব্যর্থক; এক অর্থ মামা (maternal uncle), আর এক অর্থ শ্বশুর (father-in-law). তেলুগুভাষী অঞ্চলে মামার মেয়েকে বিবাহ করার রীতি আছে বলিয়াই মামার এক অর্থ দাঁড়াইয়াছে শ্বশুর। বাংলার হিন্দু সমাজে আত্মীয় হিসাবে মামার স্থান এবং সম্মান অতি উচ্চে। বিবাহাদি ব্যাপারে মামার বংশ, বংশ-মর্যাদা ইত্যাদি বিশেষভাবে বিবেচনা করা হয়। অনেক সমাজে মামার অনুমতি ছাড়া ভাগিনেয়ীর বিবাহ হইতে পারে না এবং মামাই শ্রেষ্ঠ সম্প্রদাতা বলিয়া গণ্য হয়। 'মামার সমান কুটুম নাই', 'ধানের মধ্যে খামা, কুটুমের মধ্যে মামা', 'মামা ভাগ্নে যেখানে আপদ নাই সেখানে', 'নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল', 'মামার জয়েই জয়,' 'মামার ভাতে আছি', 'মামাবাড়ির আব্দার' ইত্যাদি প্রবাদ বাক্য এবং—

'তাই তাই তাই মামা বাড়ি যাই।
মামা বাড়ি ভারি মজা কিল চড় নাই।।'

ইত্যাদি ছড়া মামার সঙ্গে ভাগিনেয় ভাগিনেয়ীদের নিবিড় সম্পর্কের কথা স্মরণ

করাইয়া দেয়। অবশ্য বিরূপ মন্তব্যও আছে :—'মামা শালা যে সংসারে, / সে সংসার যায় ছারেখারে।'

'কুঞ্জরে দেশ নাশায় গ্রাম নাশায় ঘোটকে
শ্যালকে গৃহ নাশায় সর্বনাশায় মাতুলে'।—পব।

....মামাতুতো, মামাত, মামাত্ত-পুব (হি° মামেরা)—নিজের বা সম্পর্কিত মামার পুত্র বা কন্যা সম্পর্কে (মামাতুতো ভাই,—বোন)।...মামাশ্বশুর—স্বামীর পক্ষে স্ত্রীর মামা এবং স্ত্রীর পক্ষে স্বামীর মামা।....স্ত্রী. মামীশাশুড়ী, মাশোস।

মামী—মামার স্ত্রী, মাতুলানী। কিন্তু মাতৃস্থানীয়া হইলেও তাহার সঙ্গে অনেক সমাজে ভাগিনারা অনেক সময় ঠাট্টার সুরে কথা বলে।

মাসী [স° মাতুঃস্বসা]—মাতার ভগিনী। মাতার ভগিনীতুল্যা মহিলাদেরও মাসী, মাসীমা ডাকিতে শুনা যায়। বর্তমানে ভ্রাতা বা ভগিনীর শাশুড়ী, তথা 'আঁবুই' 'মাউই'কেও মাসী / মাসীমা ডাকা হয়। মসী, মই, মাউসী—মাসীর আঞ্চলিক রূপভেদ।...মাসশ্বশুর—স্বামী বা স্ত্রীর মেসো।....স্ত্রী. মাস-শাশুড়ী, মাসাস।....মাসতুতো, মাইসাত-টা. ঢা, মসাত্ত / মসাত-পুব—নিজের মাসীর বা তত্তুল্যার সন্তান সম্পর্কে (—ভাই,—বোন,—দেওর, —শালী)।

মিঞা, মিয়া—মুসলমান ভদ্রলোক, বাবু, মহাশয়। মুসলমান ভদ্রলোককে সম্বোধন (বয়োজ্যেষ্ঠের ক্ষেত্রে মিয়াসাহেব / মিয়াসাব)।....মিয়াজি—শ্বশুর।....বড়মিয়া—বড়শালা (সম্বন্ধী)। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বা তত্তুল্য মুসলমান ভদ্রলোক।

মিনসা / মিনসে—পুরুষমানুষ (অবজ্ঞাভরে কথিত হয় : মিনসের আক্কেল দেখ!)। কখনো কখনো অবজ্ঞায় স্বামী অর্থেও ব্যবহৃত হয় (মাগী দ্র)।

মিতা / মিতে—মিত্র। এক বন্ধুর প্রতি আর এক বন্ধুর সম্বোধন। বাংলার বহু অঞ্চলে পাতানো বন্ধু না হইলেও যদি দুই ব্যক্তির একই নাম হয়, তবে একজন আর একজনকে মিতা / মিতে বলিয়া সম্বোধন করে।...মিতিন, মিতাইন-ম—মিতার স্ত্রী। স্ত্রীবন্ধু ; মেয়েদের পাতানো সখী।

মেমান / মেহমান-মুস—কুটুম্ব, আত্মীয়স্বজন।

মেয়ে—কন্যা, পুত্রী, daughter. (রামবাবুর তিন মেয়ে)। বালিকা, girl (মেয়েদের ইস্কুল)। বিবাহের পাত্রী (মেয়ে দেখা)। স্ত্রীলোক (মেয়েদের শিল্প প্রতিষ্ঠান)। কোচবিহার অঞ্চলে বয়সে ছোট স্ত্রীলোককে 'মাই', খুঁকীকে 'মাইও' এবং জলপাইগুড়ি ও রংপুরে স্ত্রীকে (wife) 'মাইয়া', মেদিনীপুর ও

বাঁকুড়ায় 'মেয়্যা' বলা হয় ('অভাগার ঘরে আইস্তে অলক্ষণা মেয়্যা। শয়েকের পারি দেয় পঞ্চাশে উড়ায়্যা ॥'-রায়চ)। পণ্যবিক্রেতা সাধারণ স্ত্রীলোককেও পশ্চিমবঙ্গের বহু অঞ্চলে হাটেবাজারে 'মেয়ে' সম্বোধন করা হয়।....মেয়েলি [<মাইয়ালি (মাইয়া+আলি)]—স্ত্রীসুলভ, মেয়েদের মধ্যে প্রচলিত বা মেয়েদের দ্বারা আচরিত (মেয়েলি ব্রতকথা)।

মেসো—মাসীর স্বামী। তৎপর্যায়ঃ—মউসা-ম. চা, মউয়া-শ্রী, মাউসা-ফ. ব, খালু-মুস। বর্তমানে বয়োজ্যেষ্ঠ অনাত্মীয় পাড়াপড়শীকেও 'মেসো মশায়' ডাকা হয়।

শালা [স° শ্যালক, হি° সালা]—পত্নীর ভ্রাতা, brother-in-law. বাংলার বহু অঞ্চলে স্ত্রীর বড় ভাইকে 'সম্বন্ধী' (সুম্মুন্দী, সুমুন্দী, হুমুন্দী) এবং ছোট ভাইকে 'শালা' বলা হয়। কোচবিহার ও জলপাইগুড়িতে স্ত্রীর বড় ভাই—সইকাত, বরধনা এবং বাংলার অপর বহু অঞ্চলে 'বড়শালা', 'বড়কুটুম', বড়গিরি-মুস।....শালপত-শ্রী—শ্যালকপুত্র।....শালাজ—শ্যালক পত্নী।

শালী [স° শ্যালিকা, হি° সালী]—পত্নীর ভগিনী, sister-in-law. পূর্ব-বঙ্গের কোন কোন অঞ্চলে স্ত্রীর জ্যেষ্ঠা ভগিনীকে 'জেওয়াস' এবং উত্তরবঙ্গে (রাজবংশীদের মধ্যে) 'জেইঠানী', 'জেঠানী', আর কনিষ্ঠা ভগিনীকে 'শালী' বলা হয়। আত্মীয়তা স্থলে শালা শালী কথা দুইটি যেমন আনন্দদায়ক, অনাত্মীয়তা স্থলে তেমনি অপমানজনক এবং ক্রোধউদ্দীপক। আত্মীয়তার বাহিরে কাহারো প্রতি 'শালা' কি 'শালী' উক্তি গালিরূপে গণ্য হয়।

শাশুড়ী [স° শ্বশ্রূ, হি° সাস]—স্বামীর বা স্ত্রীর মাতা, mother-in-law. শাশ, শাশু-মে, শউরী, শাউরী, হাউরী, হউরী, হরী—শাশুড়ীর বিভিন্ন আঞ্চলিক রূপ। শাশুড়ীকে বাংলার প্রায় সর্বত্রই 'মা' সম্বোধন করা হয়। তবে দূর পাড়াগাঁয়ে প্রৌঢ়া বধূদের মুখে (ঠাকুরাণী) ঠাকরন / ঠাকরুন / ঠাউকরাইন / ঠাইগরাইন / ঠাইরন সম্বোধনগুলিও শুনা যায়।

শ্বশুর [হি° সসুর]—স্বামীর বা স্ত্রীর পিতা, father-in-law. (জাঠশ্বশুর —স্বামী বা স্ত্রীর জেঠা। খুড়শ্বশুর—স্বামী বা স্ত্রীর খুড়া। এইরূপ পিসশ্বশুর, মাসশ্বশুর, মামাশ্বশুর)। শউর, হউর, শাউর, হাউর—শ্বশুরের বিভিন্ন আঞ্চলিক রূপ। যেমন শাশুড়ীকে 'মা' তেমনি শ্বশুরকে বর্তমানে অনেক সময়েই 'বাবা' সম্বোধন করা হয়। রাজবংশীদের মধ্যে 'ঠাকুর', 'বাপু' ডাকও প্রচলিত আছে। কোন কোন মুসলমান পরিবারে 'মিয়াজি' ডাকও শুনা যায়।

সই—সখী, নারীর নারীবন্ধু।

সহেলা / সইয়ালা / সয়ালা / সয়ালি—এক নারীর সহিত অন্য নারীর আনুষ্ঠানিকভাবে সখিত্ব স্থাপন। এককালে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে, বিশেষ করিয়া রাঢ়ে বিশেষ দিনে বিশেষ ঘটা করিয়া বহুজন একত্র হইয়া উৎসবের আকারে এই 'সহেলা' অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিত। সহেলার ভিতর দিয়া দুইটি নারীর মধ্যে যেন জ্ঞাতিসম্বন্ধ স্থাপিত হয়। বহু ক্ষেত্রে দেখা যায়, এক সই -এর মৃত্যুতে অপর সই এবং তাহার সন্তানেরা অন্তত চারদিন অশৌচ পালন করে। ....সয়া, সইয়া-ম, বেনারী -শ্রী—সইএর স্বামী।

সতীন, সতিন—সপত্নী, সতাই / হতাই-পূব (সতা সতীনের ঘর)। ...সৎমা —বিমাতা।....সৎভাই, সতাতোভাই, সতালো ভাই [হি° সৌতেলা-]— বৈমাত্র ভাই।

সধবা—যে রমণীর স্বামী বর্তমান (এয়ো দ্র)।

সম্বন্ধী—বড়শালা (শালা দ্র)।

সাগাই-উব—আত্মীয়। ....সাগাই সোদর—আত্মীয় কুটুম্ব।

সাহেব / সায়েব / সাব [আ° সাহিব]—সম্ভ্রান্তব্যক্তি। সম্মানসূচক সম্বোধন, মহাশয়, বাবু (রায় সাহেব, জজ সাহেব, সিরাজ সাহেব)। এক সময়ে ইউরোপীয়দেরই সাহেব বলা হইত। কালক্রমে তাহাদের সাজসজ্জায়, আদবকায়দায় অভ্যস্ত এদেশীয় সম্ভ্রান্ত এবং উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের প্রতিও সাহেব আখ্যাটি প্রযুক্ত হইতে থাকে।... সাহেব—সাহেব ছবিযুক্ত তাস বিঃ।.... সাহেবিয়ানা—সাহেবদের মত আচরণ।

স্ত্রী—পত্নী, wife. তৎপর্যায়ঃ—জরু / আউরত / আওরত / কবিলা-মুস, ('আওরতের লাগ্যা কান্দে দেওয়ান সোনাফর'-মৈগী); মাইয়া-জ. কো. রং, মেয়্যা-বাঁ. মে ('লঙ্কার বাণিজ্য আগ্যা দেই ঘরে। মেয়্যা হল্যে উল্বই উড়ায় আঁখি ঠারে'-রাবচ), পরিবার (তার পরিবার মারা গেছে), মাগ / মাগী / মগী (অবজ্ঞায়)। নারী, স্ত্রীলোক, woman (স্ত্রীশিক্ষা, স্ত্রীপাঠ্য, স্ত্রীআচার) , স্ত্রীজাতীয়, female (স্ত্রীপশু)।

স্বামী—পতি, husband। সোয়ামী, সাঁই, হাই-শ্রী—স্বামীর উচ্চারণভেদ। তৎপর্যায়ঃ—খসম-মুস, ভাতার (প্রায় অবজ্ঞায়), মুনসা / মিনসা / মিনসে (অবজ্ঞায়ঃ 'এত করে করি ঘর, তবু মিনসে বাসে পর')।...স্বামী—প্রভু (জীবন স্বামী)। মালিক (গৃহস্বামী)। সাধু সন্ন্যাসীর উপাধি (স্বামী বিবেকানন্দ, ত্রৈলঙ্গ স্বামী)।

সপ্তম অধ্যায়

নামাবলী

১ ব্যক্তিগত নাম

আমাদের ব্যক্তিনামগুলি (Proper nouns) ব্যক্তির তেমন কোন পরিচয় বহন করে না। উহারা বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিকে নির্দেশ করে মাত্র। এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "বস্তুত নামটা পরিচয়ের জন্যে নয় ব্যক্তি নির্দেশের জন্যে। পদ্মলোচন নাম নিয়ে আমরা কারো লোচন সম্পর্কীয় পরিচয় খুঁজিনে একজন বিশেষ ব্যক্তিকেই খুঁজি।" বাস্তবিক ব্যক্তিনামের মধ্যে সেই নামধারীর পরিচয়ের চেয়ে নামদাতারই ইচ্ছা, ধ্যানধারণা, শিক্ষা-সংস্কার ইঃ অধিক প্রতিফলিত হয়।

সন্তানসন্ততির নামকরণে সাধারণ মানুষ প্রায়ই সংস্কারলব্ধ কতগুলি প্রথা অনুসরণ করিয়া থাকে। সেই প্রথাগুলির মধ্যে একটি হইতেছে, দেবতার নামে নাম রাখা। ইহা দ্বারা দুইটি কার্য সিদ্ধ হয় বলিয়া তাহারা মনে করে। হিন্দুদের মতে ভগবানের নামজপ সাধন-মার্গের একটি প্রধান সোপান। সন্তানকে দেবতার নামে ডাকার ভিতর দিয়া একদিকে যেমন পরোক্ষভাবে ভগবানের নামকীর্তন করা হয়, অপরদিকে তেমনই সন্তানকে কোনও দেবতার নামাশ্রিত বা পদাশ্রিত করিয়া রাখিলে তাহাকে বিপদে আপদে রক্ষার দায়িত্ব সেই দেবতার উপরই বর্তে।

(১) দেবতার নামে মানুষের নাম অসংখ্য। যেমন,

অন্নদাশঙ্কর, ঈশান, উমা, উমাপদ, কালীকিঙ্কর, কালীকৃষ্ণ, গণেশ, গোপাল, গোপালকৃষ্ণ, চণ্ডীচরণ, জয়দুর্গা, তারাশঙ্কর, দয়াময়ী, দুর্গা, পঞ্চানন, পশুপতি, বিষ্ণুপদ, ভজহরি, মনসাচরণ, হরিনারায়ণ, হরিমাধব, হরিহর।

উল্লিখিত নামের কতকগুলিতে দেবতার একটি মাত্র নাম গ্রহণ করা হইয়াছে। যেমন, উমা, গোপাল, পশুপতি। আবার কতকগুলি নামে একই দেবতার দুইটি নামের সমন্বয় ঘটিয়াছে। ইহাতে নামদাতারা সন্তানকে ডাকার ভিতর দিয়া দেবতার একাধিক নাম একসঙ্গে কীর্তন করিতে পারে। গোপালকৃষ্ণ, হরিমাধব, হরিনারায়ণ নাম তাহারই প্রমাণ। আবার এক দেবতার শরণ লইতে গিয়া পাছে অন্য দেবতার বিরাগভাজন হইতে হয়, তাই অনেক নামে বিভিন্ন প্রকৃতির দুই দেবতার সহাবস্থান দেখা যায়। যেমন, অন্নদাশঙ্কর, কালীকৃষ্ণ, হরিহর।

(২) শুধু দেবতার নামে নহে, তাঁহাদের ভক্তের নামেও অনেকে সন্তানের নাম রাখে। যেমন অদ্বৈতচরণ, গোপীপদরেণু, গৌরচরণ, নিত্যানন্দ, মীরা। দেবতা ভক্তবৎসল। ভক্তের নামাশ্রিত বা পদাশ্রিত সন্তানও দেবতার কৃপালাভ হইতে বঞ্চিত হইবে না—নামদাতা হয়ত সেইরূপই মনে করে।

(৩) মহাপুরুষ, দেশনেতা, দেশবরেণ্য জ্ঞানীগুণী এবং পুরাণ-ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের নামেও নবজাতকের নাম রাখা হয়। যেমন, অরুন্ধতী, অশোক, ঈশ্বরচন্দ্র কালিদাস, ক্ষুদিরাম, খনা, চিত্তরঞ্জন, চৈতন্য, বঙ্কিমচন্দ্র, বশিষ্ঠ, বিবেকানন্দ, বুদ্ধ, যতীন্দ্রমোহন, যুধিষ্ঠির, রবীন্দ্রনাথ, রামকৃষ্ণ, রামমোহন, সাবিত্রী, সুভাষচন্দ্র, সুরেন্দ্রনাথ। এই সকল নামরাখার মধ্যে নামদাতাদের এই ইচ্ছাই হয়ত বলবতী থাকে যে, সন্তান ইঁহাদেরই মত বরণীয় এবং স্মরণীয় হইবে।

(৪) গুরুবাদীরা আত্মোৎকর্ষের জন্য গুরুর কৃপাবলের উপর নির্ভরশীল। সন্তানকেও তাহারা যেন গুরুর চরণাশ্রিত করিয়া রাখিতে চায়। গুরুচরণ, গুরুদাস, গুরুপদ নাম তাহারই প্রমাণ। আমাদের পাড়ায় একব্যক্তির নাম গান্ধীপদ মণ্ডল।

(৫) দেশ বা প্রসিদ্ধ স্থানের নামেও মানুষের নামের অন্ত নাই। যেমন, অযোধ্যানাথ, কাশীনাথ, দ্বারকানাথ, নবদ্বীপচন্দ্র, নেপালচন্দ্র, বঙ্গচন্দ্র, বঙ্গবালা, বৃন্দাবনচন্দ্র, ভূপালচন্দ্র. মথুরানাথ।

(৬) পবিত্র ধর্মগ্রন্থাদির নামেও নবজাতকের নাম রাখা হয়। যেমন, গায়ত্রী, গীতা, বেদবালা, ভাগবত, মহাভারত।

(৭) বৃক্ষলতা, ফলফুল ইঃর নামেও সন্তানের নাম অনেক। যেমন, অতসী, অশোক, আঙুর, কমলা, কেয়া, কেতকী, চন্দন, জয়া, জয়ন্তী, তুলসী, বকুল, মহুয়া, মাধবী।

(৮) নদনদী, সাগর, ভূধর ইঃও সন্তানের নাম যোগায়। যেমন, কাবেরী, কৃষ্ণা, কৈলাস, গঙ্গা, চন্দ্রনাথ, দামোদর, ভৈরব, যমুনা, সিন্ধু, হিমাদ্রি, হৈমী।

(৯) পশুপাখির নামে নবজাতকের নাম। যেমন,

কেশরী, টুনি < টুনটুনি, ফড়িঙ্গা (ডাকনাম) < ফড়িং, পাপিয়া, বাঘা (ডাকনাম) <বাঘ, বুলবুল, বেঙা (ডাকনাম) <বেঙ, ভরদ্বাজ।

(১০) গ্রহ-তারা, আকাশ, বাতাস, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ ইঃও সন্তানের নামে স্থান পায়। যেমন,

অনুরাধা, অরুণ, অশ্বিনী, কুহু, গগন, চন্দ্র, জ্যোৎস্না, তনিমা, তপন, তারা,

ধ্রুব, নীলিমা, পিউ, বিজলী, রবি, রসময়, রসরাজ, রোহিণী, শ্যামলী, সমীরণ, সাহানা (রাগিণী), সুবাস, সুহাস, হিমাংশু।

(১১) বসনভূষণ, মণিমাণিক্য, প্রসাধনদ্রব্য, সৌখিন জিনিসপত্র প্রভৃতিও সন্তানের নাম হইতে বাদ যায় না। যেমন,

অনন্ত (বাহুর অলঙ্কার), নূপুর, মুকুট, দুলী < দুল, আলতা, কাজল, কুমকুম, তিলক, বেণী, হীরা, পান্না, চুনি, মণি, মানিক, বেণু, বীণা, বংশী, বাঁশরী, বানারসী।

(১২) নবজাতকের জন্মক্ষণ, জন্মবার, জন্মতিথি, জন্মমাস বা ঋতু, জন্মকালীন ঘটনা ইঃ অনুসারেও অনেকে সন্তানের নাম রাখে। যেমন,

আকালী (জন্মের সময় দেশে আকাল বা দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে)।
উচ্ছবী (কোনও উৎসবের সময় কোনও বালিকা জন্মগ্রহণ করিলে)।
গাজলু (ডাকনাম, ঘোর বর্ষায় জন্মিলে)।
পূর্ণচন্দ্র (নবজাতকের জন্মতিথি পূর্ণিমা হইলে)।
প্রভাত (প্রাতঃকালে জন্মগ্রহণ করিলে)।
বাদল (বাদলার দিনে ভূমিষ্ঠ হইলে)।
বিপ্লব (জন্মকালে দেশে কোনও দাঙ্গাহাঙ্গামা বা বিপ্লব ঘটিলে)।
বুধু (ডাকনাম, বুধবার জন্মবার হইলে)।
ভদ্রা, ভাদু (ভাদ্রমাসে বা ভাদুপূজার দিনে জন্মগ্রহণ করিলে)।
লক্ষ্মী (লক্ষ্মীপূজার রাত্রিতে জন্মিলে)।

অবশ্য নামের এইসব ব্যাখ্যা অনুমান মাত্র। কারণ, অনুসন্ধানে জানা যাইবে, অনেক প্রভাতনামা জাতক রাত্রিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

(১৩) কতগুলি নামের উৎপত্তির মূলে আছে অন্ধ সংস্কার। মৃতবৎসা জননীরা একটির পর একটি সন্তান হারাইয়া মনে করে যে, নিজের সন্তান পরকে বিলাইয়া দিয়া কিংবা পরের কাছে বেচিয়া দিয়া তাহার নিকট হইতে যদি আবার তাহাকে দান হিসাবে গ্রহণ করে বা কিনিয়া লয়, তবে সেই দানলব্ধ বা ক্রীত সন্তানের উপর যমের দৃষ্টি পড়িবে না। এইরূপ মনোভাব হইতে মৃতবৎসাদের সন্তানকে ধাত্রী বা কোনও সন্তানবতীকে বেচিয়া বা দান করিয়া দিবার এবং পরে তাহার নিকট হইতে কড়ি, ক্ষুদ, কুঁড়া ইত্যাদি সামান্য কিছুর বিনিময়ে কিনিয়া লইবার প্রথা প্রবর্তিত হইয়াছে। এককড়ি, সাতকড়ি,

ক্ষুদিরাম, বেচারাম, কেনারাম, প্রভৃতি নামের উদ্ভবের মূলে হয়ত আছে উক্ত অন্ধসংস্কারপ্রসূত প্রচলিত প্রথা।

এককড়ি—যে সন্তানকে এককড়ি দিয়া কেনা হয়, তাহার নাম দেওয়া হয় এককড়ি। পাঁচকড়ি দিয়া কিনিলে নাম হয় পাঁচকড়ি। এখানে উল্লেখযোগ্য যে বিজোড় সংখ্যা কড়ি মূল্য হিসাবে দিতে হয়, জোড় সংখ্যায় কাজ হয় না।

কুড়োরাম—যাহাকে ফেলিয়া দিয়া আবার কুড়াইয়া আনা হয়।

কেনারাম—যাহাকে বিলাইয়া দিয়া আবার কিনিয়া লওয়া হয়, অথবা দেবদেবীর পূজা-অর্চনা করিয়া যাহাকে লাভ করা যায় ('দেবীর পূজায় কিনা তাই কেনারাম।' —মৈত্রী)।

ক্ষুদিরাম—যে শিশুপুত্রকে ক্ষুদ দিয়া কেনা হয়। বালিকার ক্ষেত্রে নাম শুনা যায়, 'ক্ষুদী।'

দানধন—যে সন্তানকে দান হিসাবে গ্রহণ করা হয়।

বেচারাম—যে পুত্রকে ঐরূপ বেচাকেনার ভিতর দিয়া পাওয়া যায়।

(১৪) অমর, থাকপ্রসাদ, থাকমণি, মৃত্যুঞ্জয়, রাখহরি, হরিরাখাল—এই ধরনের নামগুলির মধ্যেও সন্তানকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য নামদাতা মাতাপিতার তীব্র আকুতিই যেন প্রকাশ পায়:

অমর—'তুমি অমর হইয়া থাক, মাতাপিতার কোল শূন্য করিয়া যাইও না।' অমর নামটির ভিতর দিয়া নামদাতার এই ইচ্ছাই যেন প্রতিফলিত হয়। 'মৃত্যুঞ্জয়' নামটির তাৎপর্যও তাহাই।

থাকপ্রসাদ, থাকমণি—'দেবতার প্রসাদে তোমাকে পাইয়াছি, চিরজীবী হইয়া থাক, ফাঁকি দিয়া চলিয়া যাইও না।'

রাখহরি—'হে হরি, ছেলেটিকে রক্ষা করিও'—রাখহরি নামটিতে নামদাতার এই প্রার্থনাই যেন রূপ পায়।

হরিরাখাল—যে সন্তানের রাখাল (রক্ষক) স্বয়ং হরি, তাহার আবার বিপদের ভাবনা কি?

(১৫) সন্তান যতই কাম্য হউক, অধিক কন্যা সন্তানের জনক-জননী হইতে কেহই বড় চায় না; কন্যাদায় বড় দায়। সেকালেও ইহা যেরূপ ছিল, আজও প্রায় তেমনই আছে। তাই কোনও পরিবারে অধিক সংখ্যায় কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করিতে থাকিলে, পিতামাতা হয়ত মনেপ্রাণে প্রার্থনা করেন, 'আর না, আর দিও না মা কালী।' নামও রাখেন তদ্রূপ। যেমন,

আন্না (আর না), আন্নাকালী (আর দিও না মা কালী), ইতি (এইশেষ, মেয়ে যেন আর হয় না), ক্ষান্তি / ক্ষান্তমণি (জন্মে ক্ষান্ত হও), চায়না (আর চাই না)।

ডাকনাম

ডাকনাম—যে নামে জাতককে ঘরোয়াভাবে ডাকা হয়। এই নাম স্বভাবতই সরল এবং সংক্ষিপ্ত হয় এবং মাতাপিতা আত্মীয়স্বজন পাড়াপড়শীরাই ইহা অধিক ব্যবহার করে। ডাকনাম জাতকের প্রকৃত নামকে অনেকদিন, কখনো বা জীবনভর কোণঠাসা করিয়া রাখে। পাড়ার অমিতাভকে অনেকেই চেনে না, কিন্তু বাচ্চু বলিলে সকলেই চেনে। ষাট বছরের অধ্যাপক নিশীথরঞ্জন মা-বাপের কাছে বরাবরই 'খোকা' এবং পাড়াপড়শী ছোটদের কাছে 'খোকাবাবু' রহিয়া গেলেন।

(১) বাঙালীর অধিকাংশ ডাকনামই তাহার লোকপ্রসিদ্ধ নামের বিকার। এখানে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে ঃ
(প্রথম নামটি বন্ধনী মধ্যস্থ লোক-প্রসিদ্ধ নামের বিকার বা ডাকনাম)। অজু (অজয়), আনি / আনু (আন্না), উদো (উদ্ধব), কনি (কণা), কানু (কৃষ্ণ, কানাই), কেলো (কালী, কালাচাঁদ), কেষ্টা (কৃষ্ণ), ক্যাবলা (কেবলরাম), খেমী (ক্ষমা), গজা (গজেন্দ্র), গণশা (গণেশ), গবু (গোবিন্দ), গোপলা (গোপাল), নিপু (নৃপেন্দ্র), নেপা / নেপলা (নেপাল), পঞ্চা (পঞ্চানন, পঞ্চানন্দ), পাঁচু (পাঁচকড়ি, পঞ্চানন, পঞ্চানন্দ), পানু (পান্না), ফটকে (ফটিক), বরি (বরদা), বিজু (বিজয়, বিজন), বিশু / বিশে (বিশ্বনাথ), বেজ (ব্রজ), ভুলু (ভোলানাথ), মাধু (মাধব), মানি (মানদা), মীরি (মীরা), যাদু (যাদব), মাধো (মধুসূদন), রাসু (রাসবিহারী), রাজু (রাজেন্দ্র), রামু / রামা (রাম), লতি (লতা), শিবু / শিবে (শিব), সরলি (সরলা), হরু / হরে (হরি), হারু (হারান)।
এখানে উল্লেখযোগ্য যে, 'ই' এবং 'উ' প্রত্যয়ান্ত নামগুলি অনেকটা স্নেহব্যঞ্জক। পক্ষান্তরে 'আ' 'এ' এবং 'ও' প্রত্যয়ান্ত নামগুলি যেন একটা অনাদরের বা খুব নিকট সম্পর্কের ভাব প্রকাশ করে।

(২) কতকগুলি ডাকনাম যদৃচ্ছাক্রমে রাখা হয়। সেগুলি নামদাতার স্নেহাতিশয্য ছাড়া কোনও সুচিন্তিত অভিপ্রায় বা অর্থ প্রকাশ করে না। যেমন,
অন্তু, ঘন্তু, ঝুনু, টিপলু, টুকটুক, টুটুল, টুলটুল, টেবলু, পিকলু, বাবলু, হাবলু।

(৩) আবার কতকগুলি ডাকনামের পশ্চাতে থাকে বিশেষ উদ্দেশ্য,—যমকে, কুদৃষ্টি সম্পন্ন অপদেবতাকে বিভ্রান্ত করিবার আদিম মনোভাব—বিশ্রী নাম শুনিয়াই যাহাতে মৃত্যু-দেবতার অরুচি হয়, তিনি অতি তুচ্ছ নগণ্য জ্ঞানে জননীর বুকের ধনে হাত না বাড়ান।

কাঙালী, কালা, খাঁদা, খাঁদী, গুয়ে, গোঙা, গোদা, গোবরা, গোবা, ডোম, পেঁচা, পাগলা, ফালা, ফেলি, বুঁচি, বোঁচা, ভিখারী, ভোদা, মেথরা, হাবলা, হাবা, হ্যাঁদা।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই সকল ডাকনামের আড়ালে থাকে ভিন্ন আকৃতি প্রকৃতির জাতক, ধনী মানী সুন্দর সুবুদ্ধি মানুষ। যাহাকে খাঁদা বলিয়া ডাকা হয়, অনুসন্ধানে হয়ত দেখা যাইবে তাহার নাসিকাটি খগরাজের নাসিকার তুল্য; কাঙ্গালীর পিতা হয়ত লক্ষপতি। যাহাকে ডোম বলিয়া ডাকা হয়, তিনি ভট্টাচার্য ব্রাহ্মণ।

নামের ভূষণ বা অলঙ্কার

বাঙালীর নামের মধ্যাংশটিকে অর্থাৎ প্রকৃত নাম ও পদবীর সংযোজক শব্দটিকে তাহার নামের ভূষণ বা অলঙ্কার বলা যাইতে পারে। বর্তমানে এই ভূষণ পরিত্যাগের দিকে একটা ঝোঁক দেখা গেলেও পল্লীগ্রামের প্রাচীনপন্থী সাধারণ মানুষকে তাহাদের নামের কান্ত কান্তি কিশোর কুমার চন্দ্র চাঁদ তারণ তোষ নাথ প্রসন্ন প্রসাদ বরণ ভঞ্জন ভূষণ মোহন রঞ্জন রমণ হরণ প্রভৃতি মধ্যাংশগুলি কদাচিৎ পরিত্যাগ করিতে দেখা যায়। পরিত্যাগ করাটা তাহারা নামের সৌন্দর্যহানি তথা অঙ্গহানি মনে করে।

২ ব্যক্তিগত নামের পদবী

পদবী বংশপরিচায়ক নাম (surname); সম্মানসূচক অর্জিত নামকেও (title) পদবী বা উপাধি বলা হয়। বাঙালী হিন্দুমাত্রই ব্যক্তিগত নামের সঙ্গে পদবী ব্যবহার করে। কতকগুলির মূলে আমরা পৌঁছিতে পারি। আর কতকগুলি যে কোন্ ভাষা বা উপভাষার শব্দ, কি সূত্রে বাঙালীর বংশনামে পরিগণিত হইল, তাহা নির্ণয় করা এক অতি দুরূহ ব্যাপার। আশ কুইতি কুইলা কোলে গড়গড়ি গাঁতাইত গুছাইত জানা তা দিন্দা দেই ধাড়া নামহাতা পাঁড়া পাখিরা পাড়ুই পেনুয়া পোড়েল পিরি বাউর বাঁহুড়ী বাপুলী ভোল কীৈ সাঁপুই হুই হেশ—এইরূপ আরও কতশত পদবী বাঙালীরা পুরুষানুক্রমে বহন করিয়া

আসিতেছে, যেগুলির যথার্থ তাৎপর্য সহজে হৃদয়ঙ্গম হয় না। অথচ এইগুলির মূল নিশ্চয়ই একদিন সকলের জানা ছিল।

১। ব্রাহ্মণদের নামের শেষে উপাধি ব্যবহার সম্পর্কে ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁহার 'বাঙ্গলা দেশের ইতিহাস': ৫ম সংস্করণ, ১ম খণ্ড গ্রন্থে লিখিয়াছেন, 'রাজা অথবা ধনী লোক ব্রাহ্মণদিগকে ভূমি, কখনও বা সমস্ত গ্রাম দান করিয়া প্রতিষ্ঠা করিতেন, এই সমুদয় গ্রামের নাম হইতে ব্রাহ্মণদের গাঁঞীর সৃষ্টি হয় এবং ইহা তাঁহাদের নামের শেষে উপাধি স্বরূপে ব্যবহৃত হয়। এইরূপে বন্দ্যঘটী, মুখটী. গাঙ্গুলী প্রভৃতি গ্রামের নাম বা গাঁঞী হইতে বন্দ্যোপাধ্যায় মুখোপাধ্যায়, গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি সুপরিচিত উপাধির সৃষ্টি হইয়াছে।.... আদিশূরের পৌত্র ক্ষিতিশূরের সময় রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের মোট সংখ্যা হয় উনষাট। ক্ষিতিশূর তাঁহাদের বাসের জন্য উনষাটটি গ্রাম দান করেন। এই সমুদয় গ্রামের নাম হইতেই রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদের গাঁঞীর উৎপত্তি হইয়াছে।' ডঃ নীহার রঞ্জন রায়ও তাঁহার 'বাঙালীর ইতিতাস' গ্রন্থে লিখিয়াছেন, 'ব্রাহ্মণেরা....ভট্ট, চট্ট, বন্দ্য প্রভৃতি গাঞি পরিচয় গ্রহণ করতেন, এইরূপ সিদ্ধান্ত বোধ হয় করা যায়।' এখানে ঐরূপ কয়েকটি গাঞী উপাধির উল্লেখ করা হইল :

কাঞ্জিলাল—কাঞ্জিল গ্রামের নাম হইতে।

গঙ্গোপাধ্যায় / গাঙ্গুলী—গাঙ্গুর গ্রামের নাম হইতে।

ঘোষাল—ঘোষ গ্রামের নামানুসারে।

চট্টোপাধ্যায় / চাটুয্যে / চাটুজ্জে—চাটুতি গ্রামের নাম হইতে।

পুতিতুণ্ড—পুতিতুণ্ড গ্রামের নামানুসারে।

বন্দ্যোপাধ্যায় / বাঁড়ুয্যে / বাঁড়ুজ্জে—বন্দ্য, বাড়ব বা বাড়বি গ্রামের নামে।

মুখোপাধ্যায় / মুখুয্যে / মুখুজ্জে—মুখটী গ্রামের নামানুসারে।

২। বাঙালী হিন্দুরা সাধারণত তাহাদের পিতা বা পূর্বপুরুষের পদবী ব্যবহার করে। এই সমস্ত পদবী নানা ধরনের ; তন্মধ্যে কতকগুলি বৃত্তি বা পেশামূলক, কতকগুলি রাজারাজড়া, নবাববাদশা, বা কোনও প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত খেতাব, কতকগুলি বিভিন্ন কর্মদ্যোতক পদ (denoting Post)। অনুমান করা যায়, এই সকল পদবী বা উপাধি যাহা এককালে ব্যক্তিগত ছিল, তাহাই কালক্রমে বংশানুক্রমিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পূর্বপুরুষের কাহারও অবলম্বিত বৃত্তি বা প্রাপ্ত পদের সহিত অণুমাত্র সংস্রব না থাকিলেও বর্তমান বংশধরেরা

পূর্বের উপাধিই ব্যবহার করিয়া আসিতেছে। অবশ্য বর্তমানে অনেকে Affidavit করিয়া বংশনামের তথা উপাধির পরিবর্তন ঘটাইতেছে। এখানে উক্ত নানা শ্রেণীর পদবীর কতকগুলির আভিধানিক অর্থ দেওয়া হইল :

উকিল [আ° রকীল]—আইনব্যবসায়ী।

উপাধ্যায়—শিক্ষক, অধ্যাপক।

ওঝা <উপাধ্যায় (কৃত্তিবাস ওঝা)। রোজা। বিষবৈদ্য। যে মন্ত্রবলে ভূত বা সাপের বিষ নামায়।

কয়াল [আ° কাইল]—আড়তে বা বড় বড় দোকানে যে পণ্যাদি ওজন করে এবং ওজনের পরিমাণ হিসাবলেখককে ডাকিয়া বলে।

কর্মকার—লৌহকার, যে লোহার জিনিসপত্র তৈয়ার করে। স্বর্ণকার।

কারকুন [ফা°]—জমিদারি কাজের তত্ত্বাবধায়ক।

কীর্তনিয়া—কীর্তনগানে পারদর্শী। যে কীর্তন গাহিয়া জীবিকা অর্জন করে।

খাটুয়া-চ. মে—সাধারণ অর্থ যে খাটিয়া খায়। শ্রমিক।

খাসনবীশ—একান্ত সচিব, Private Secretary.

গায়েন-চ. মে—গায়ক। সাধারণত রামায়ণ মনসামঙ্গল ইঃ গাহিয়া যে জীবিকা অর্জন করে।

ঘটক—বিবাহে যে দুই পক্ষের মধ্যে মিলন ঘটায় বা বিবাহের সম্বন্ধ আনে।

ঢাকী—যে ঢাক বাজায়। ঢাকের মালিক।

দুয়ারী—সাধারণ অর্থ দ্বাররক্ষক, দ্বারবান্।

তরফদার—[আ°]—জমিদারির কোনও তরফের (অংশের) খাজনা আদায়কারী।

নাইয়া—যে নৌকা চালায়। নৌকার মালিক।

পত্রনবীশ—যে চিঠিপত্র লেখার কাজ করে, correspondence clerk.

পাণ্ডা—তীর্থস্থানের পুরোহিত।

পোদ্দার [ফা° ফোতাহদার]—যে সোনারূপা ইঃ বন্ধক রাখিয়া টাকাধার দেয়।

ভট্ট—স্তুতিপাঠক। বিভিন্ন বংশের পরিচয় দাতা। ভট্টাচার্য।

ভট্টাচার্য / ভট্টাচার্যি—অধ্যাপক। যজন যাজন অধ্যয়ন অধ্যাপনা যে করে।

বকশী—কেরানি, clerk,

বণিক—ব্যবসায়ী (সাধারণত গন্ধবণিক), merchant.

বৈদ্য—চিকিৎসক। কবিরাজ। জাতি বিঃ।

মজুমদার [ফা°], মজ্মুআদার—মুসলমান রাজত্বকালে খাজনাদির হিসাবরক্ষক মজুমদার নামে অভিহিত হইত।

মহলানবীশ [আ° মহল]—তালুকের খাজনা আদায়কারী।

মাঝি—কর্ণধার, নৌকাচালক। আদিবাসী সমাজে 'মাঝি' গ্রামপ্রধান।

মালাকার—মালা, সোলার বিবিধ সাজ, চাঁদমালা ইঃ যে তৈয়ার করে।

মুচ্ছুদ্দী [আ° মুতসদ্দী]—জিম্মাদার, Custodian.

মুন্সী [আ°]—দলিলপত্রাদি লেখক, কেরানি।

মুস্তফী [আ° মুসতর ফী]—প্রধান কেরানি, বড়বাবু, Head clerk.

মোদক [<মদক]—ময়রা। মিষ্টান্ন প্রস্তুতকারী বা মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী।

লস্কর [ফা° লশকর]—সৈন্য। রাজকর্মচারী বিঃ।

লাহা / লায়া<লাক্ষা ? —ব্যবসায়ী।

শিকদার [ফা°]—শান্তিরক্ষক। শিকবন্দুকধারী সৈন্য।

সরকার [ফা°]—মুল অর্থ প্রধান কার্যনির্বাহক। পল্লীগ্রামে যাহারা দলিল পত্র লেখে, হিসাবাদি করে, সাধারণ লোক তাহাদিগকেই 'সরকার' বলে ('বিবিধ শব্দ' দ্র)।

সাধু—সওদাগর, merchant.

সেহানবীশ [ফা° সিয়াহা]—দৈনিক আয়ব্যয়ের হিসাবরক্ষক, Accountant.

হোতা—যে যজ্ঞ হোমাদি করে।

৩। নানাপ্রকার শিল্পসামগ্রী, যন্ত্রপাতি, অস্ত্রশস্ত্র ইঃ র নামেও অনেক পদবী বা বংশনাম আছে। হয়ত প্রস্তুতকারী বা ব্যবহারকারী হিসাবে বা অন্য কোনও সূত্রে এই সব সামগ্রীর সহিত এই সব উপাধিধারীর বর্তমান বা পূর্বপুরুষের ঘনিষ্ঠ সংস্রব আছে কিংবা ছিল।

কপাট, কাঁড়ার (নৌকারহাল, rudder), খাঁড়া, খাণ্ডার, (খড়্গ), খিল, ঘড়া, ঘর, চাকি। (যাঁতা , লুচি বেলিবার পিঁড়া। কর্ণভূষণ), ঢাক, ঢাল, ঢেঁকি, ঢোল, ধনু, বাণ, বেলুন, ভড়. (মালবাহী বৃহৎ নৌকা বিঃ), রথ (chariot), লোহ (লৌহ ?), শান (অস্ত্রাদিতে ধার দিবার পাথর বা যন্ত্র বিঃ), শানা (তাঁতের অংশ বিঃ)।

৪। জীবজন্তুর নামেও অনেক পদবী ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। টোটেম বিশ্বাস ইহার মূলে আছে বলিয়া অনেকে অনুমান করেন ঃ

গড়ুই (কোথাও লেটা মাছকে গড়ুই বলা হয়), ঘুঘু, ঘোড়া, নাগ, পিল (হাতী), বাগ (<বাঘ ?), বোয়াল, সিংহ, হাইত (<হাতী ?), হাতী।

৫। বৃক্ষলতা, সাগরপর্বত, গ্রহতারা ইঃর নামেও অনেক উপাধি শুনা যায় : অঙ্কুর, অর্ণব, করঞ্জ, কাঁঠাল, চন্দ্র, পর্বত, পান, পুঁই, লোধ (<লোধ্র), সোম।

৬। উপাস্য দেবতা এবং তদনুচরদের নামেও অসংখ্য বংশনাম আছে : আইচ, আদিত্য, ইন্দ্র, গণ (শিবানুচর), গনাই (<গণেশ), গুহ (কার্তিক) দেব, নন্দী (শিবানুচর), বিষ্ণু, ব্রহ্মা, ভূত, মিত্র, রুদ্র, সুর।

৭। পূর্বপুরুষের সুযশ সুকৃতি, বিশেষ জ্ঞানগুণ, ধনৈশ্বর্য, সামাজিক প্রভাব-প্রতিপত্তি, আভিজাত্য ইঃ সূচক পদবীরও অভাব নাই। ইহাদের মধ্যে বহু রাজদত্ত ব্যক্তিগত খেতাব বা পদ আছে, যেগুলি কালক্রমে বংশনাম হইয়া দাঁড়াইয়াছে :

অধিকারী, আঢ্য, কীর্তি, কুণ্ডু, কুমার, কোঙার, খাঁ, গুণ, চক্রবর্তী, চাকলাদার, চূড়ামণি, চৌধুরী, ঠাকুর, তালুকদার, তেজ, দাঁ, দাম, পট্টনায়ক, পণ্ডিত, পতি, প্রধান, বেদ, ভদ্র, ভুঁইয়া, ভৌমিক, মণ্ডল, মতিলাল, মল্লিক, মহান্তি, মহাপাত্র, যশ, রাউত, রায়, রায়চৌধুরী, শীল, শেঠ, সমাজপতি, সর্দার, সাঁতরা, সাম, সামন্ত, সাহানা, সেনাপতি, হাজরা।........

৮। বাঙালীর পদবীর মধ্যে ভিন্নরাজ্যবাসীদেরও অনেক পদবী আছে। যেমন, পাত্র, মহাপাত্র, মহান্তি, মাইতি, মতিলাল, ঝা, শেঠ নাহার, রথ, পাণ্ডা, বড়ুয়া ইঃ। অনুসন্ধানে জানা যাইবে, এই সব পদবীধারীরা নানা কারণে, নানা অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন রাজ্য হইতে বাংলায় আসিয়া সেসব রাজ্যে আর ফিরিয়া যায় নাই। এখানেই বাঙালী হইয়া, বাঙালী সমাজের সঙ্গে মিশিয়া পুরুষানুক্রমে বসবাস করিতেছে। পদবীটুকু শুধু রাখিয়াছে পূর্ব-পুরুষের জাতের বিভাগ নির্দেশক হিসাবে।

৩ গ্রাম বা লোকালয় অর্থদ্যোতক প্রত্যয়

আই—জনাই-হু, আমড়াই-বর্ধ, বেলকুলাই-হা, খিরাই-মে, জগাই-বী, বেতাই-ন, বোদাই-চ, বড়াই-মা, সুখাই-ম।

আবাদ—মুর্শিদাবাদ, সৈদাবাদ (সৈয়দ+আবাদ)-মু, বাহাদুরাবাদ-টা, ছিলিমাবাদ-ম, নশিরাবাদ-ম।

আইল—(গাঙ্গাইল, নান্দাইল, পুবাইল, সুন্দাইল, ঘোড়াইল, মঙ্গাইল)-ম টাঙ্গাইল, শাঁকরাইল।

ইআ—(ইয়া)—ধুলুলিয়া-হু, চিঁচুড়িয়া-বর্ধ, বাউরিয়া-হা, হলদিয়া-মে জামুড়িয়া-বী, পুরুলিয়া, নদীয়া, গিরিয়া-মু, করটিয়া-টা, কোদালিয়া-চ।

উআ—(উয়া)—পাণ্ডুয়া-হু. মে. পু, কচুয়া-চ, হেরুয়া-বী, চেতুয়া-মে, কেন্দুয়া-বী. ম. টা, মণ্ডয়া-ম, রাতুয়া-মা, ছয়ুয়া-চট্ট।

ওআ (ওয়া)—কাটোয়া, হাড়োয়া-চ, কাঁদোয়া, সাঁকোয়া-মে।

কাঠি—(কলসকাঠি, ঝালকাঠি, স্বরূপকাঠি)-ব।

কান্দা—আলিসাকান্দা-টা, বামুনকান্দা-ম। (কান্দা=ডাঙ্গা)।

কান্দি—কান্দি-মু, দীঘলকান্দি-ন, (তারাকান্দি, শিমূলকান্দি)-ম।

কুড়া—মণিকুড়া-হা, পাঁশকুড়া-মে, কেঁজাকুড়া-বাঁ, ধনকুড়া-ম।

কুড়ি, কুঁড়ি—(কুষ্টিকুড়ি, খয়রাকুঁড়ি)-বী।

কোনা—কোনা-হা, চন্দ্রকোনা-মে, তিজলকোনা-হু, ভুয়াকোনা-বাঁ, নেত্রকোনা-ম।

কোন্দা—(নাগরাকোন্দা, বাগরাকোন্দা)-বী।

খলা, খোলা—হাটখোলা-ক, হরিণখোলা-হা, শিয়াখলা-হু; ডোহাখলা-ম, নারায়ণখলা-টা, কন্দখোলা-ন।

খালি—(বকখালি, সন্দেশখালি)-চ, হাঁসখালি-ন, ধনিয়াখালি / ধনেখালি-হু, গেঁওখালি-মে, পটুয়াখালি, নোয়াখালি, মশাখালি-ম, সুবর্ণখালি-টা, (ইচাখালি বাঁশখালি)-চট্ট।

গঞ্জ—(জিয়াগঞ্জ, রঘুনাথগঞ্জ,)-মু. রাজগঞ্জ-বী, কুমারগঞ্জ-হু, পদি, রায়গঞ্জ-পদি, তুফানগঞ্জ-কো, জগন্নাথগঞ্জ-টা, ঈশ্বরগঞ্জ-ম, (বালিগঞ্জ, টালিগঞ্জ)-ক।

গড়—(টিটাগড়, ভরতগড়)-চ, বলাগড়-হু. রামগড়-চট্ট।

(কর্ণগড়, চিলকিগড়)-মে, ভীমগড়-বী, বিজয়গড়-ক, পানাগড়-বর্ধ।

গড়িয়া (গড়+ইআ)—বেলিগড়িয়া-মে, কেন্দ্রগড়িয়া-বী, কুকুরগড়িয়া-পু, গড়িয়া-চ।

গাছা—মুড়াগাছা-ন, জগাছা-হা, হাটগাছা-চ, ইন্দ্রগাছা-বী, সুলতানগাছা-হু, ঝিকরগাছা-য, মুক্তাগাছা-ম।

গাছি—কাঁকুড়গাছি-চ, ঘেঁটুগাছি-ন, (কুলগাছি, দোগাছি)-মু, দলুইগাছি-হু, গুলালগাছি-বী; সাঁতরাগাছি-হা।

গাত্তি, গাঁত্তি—কামারগাঁত্তি-চ, (দত্তগাত্তি, হাজরাগাত্তি)-ম।

গুড়ি—জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি, কামাখ্যাগুড়ি, ময়নাগুড়ি, (দোমড়াগুড়ি, শেওলাগুড়ি)-হু, কেউগুড়ি-বর্ধ, পইরাগুড়ি-বাঁ।

গ্রাম, গাঁও, গাঁ,—সপ্তগ্রাম-হু, কেতুগ্রাম-বর্ধ, ঝাড়গ্রাম-মে, বারাগ্রাম-বী, রাজগ্রাম-বাঁ, মুনিগ্রাম-মু, চট্টগ্রাম / চাটগাঁ, সোনারগাঁও-ঢা, বোরগাঁও-ম (কবি নারায়ণদেবের জন্মস্থান), হাইদগাঁও <ষাইটগাঁও <ষষ্টিগ্রাম-চট্ট।

ঘাট—কালীঘাট-ক, গোঘাট-হু, কোলাঘাট-মে, ধর্মঘাট-বাঁ, রানাঘাট-ন, লাল গোলাঘাট-মু, বালুরঘাট-পদি, হালুয়াঘাট-ম।

ঘাটা—পাথুরিয়াঘাটা-ক, হরিণঘাটা-চ, আড়ংঘাটা-ন, গোঘাটা-মু, ধেড়েঘাটা-ষ হোজাঘাটা-হু, পাথরঘাটা-টা, বালুঘাটা-ম।

চক—(নারায়ণচক, দুর্গাচক, কুমারচক)-মে, (ঠাকুরাণীচক, হরিশচক)-হু, (বালিচক, রায়চক)-হা। **ছড়ি**—ফুলছড়ি-রং, ফটিকছড়ি-চট্ট।

জান, জানি—রাউজান-চট্ট, (দেওজান, বাঘজান)-টা, (সিংজানি, পুঁটিজানি, মাদারজানি)-টা।

জুড়ি—কইজুড়ি-হা, তামাজুড়ি-মে, জামজুড়ি-বাঁ, সোনাইজুড়ি-পু, খালিয়াজুড়ি-ম

জোড়—ডোঙ্গাজোড়-চ, ডোমজুড়-হা, কলমিজোড়-মে, (বড়জোড়, কচুজোড়) -বী, কুকড়াজোড়-বাঁ, মামুরজোড়-পু, পাটজোড়-সাঁপর।

জোড়া—শালজোড়া-মে, শুকজোড়া-সাঁপর, বাকলজোড়া-ম।

জোল—নাড়াজোল-মে, বড়জোল-বী, কাঁকড়াজোল-হু, কুমারজোল-চ।

টি—(আশুটি, বিরাটি, সিঁড়িটি)-চ, (আকুটি, বিঘাটি)-হু, দেউলটি-হা, কুলটি -বর্ধ, থরটি-মু, (পাকাটি, বেতাটি, তারাটি)-ম।

টিকরি, টিকুরি—সোনাটিকরি-চ. হু, বলটিকরি-হা, কুলটিকরি-মে, গঙ্গাটিকরি -বর্ধ, মহিষটিকরি-হু, কাপাসটিকরি-বী।

টোলা, টুলি—(আহিরীটোলা, কুমারটুলি)-ক, (কুর্মিটোলা, মমিনটোলা)-মু, সন্ধটোলা-হু, আমড়াটোলা-মে, (মহানন্দটোলা, শুকদেবটোলা)-মা।

ডাঙ্গা—(গোরবডাঙ্গা, বেদেডাঙ্গা)-চ, (পায়রাডাঙ্গা, শণডাঙ্গা)-ন, (কেশেডাঙ্গা, বেলডাঙ্গা)-মু, (কদমডাঙ্গা, পাতাডাঙ্গা)-বী, (শিমুলিয়া ডাঙ্গা, দরবারডাঙ্গা) -বর্ধ, নলডাঙ্গা-হু. ষ, (গোপডাঙ্গা, তালডাঙ্গা, ফরাসডাঙ্গা)-হু, শিয়ালডাঙ্গা-হা, দেওডাঙ্গা-কো, (খপাইডাঙ্গা, রশিডাঙ্গা)-জ, যাত্রাডাঙ্গা-মা, বেকিডাঙ্গা-পদি, তারাডাঙ্গা-টা, চুয়াডাঙ্গা।

ডিহি—দক্ষিণডিহি-হু, (খাজুরডিহি, ভাণ্ডারডিহি)-বধ´, (গোপডিহি, বামুন ডিহি)-বী, (গোঁসাই ডিহি, বাঁশডিহি)-বাঁ, বিজয়ডিহি-পু, মানিকডিহি-ন।

ড়া, রা—হাওড়া, বাঁটরা, ঝিকড়া, (ইঙ্কুড়া, চুঁচুড়া, ভাস্তাড়া, রিষড়া)-হু, (পাতড়া, বাঁশড়া)-বী, (আগড়া, বাঁকুড়া, চাঁদড়া)-বাঁ, (দেশড়া, ডুবড়া, সাকড়া)-পু, (এগড়া, ডেবরা)-মে, (উখড়া, জামড়া)-বর্ধ, হাবড়া-চ, খাগড়া-মু, মাগুরা-য, বগুড়া, (ঘাগড়া, দাদরা)-ম, ভাতড়া-বাঁ. টা, মানড়া-টা।

তলা—(কেওড়াতলা, নিমতলা, ধর্মতলা, মানিকতলা)-ক, (আমতলা, মহেশতলা) -চ, খেদাইতলা-ন, (রামরাজাতলা, কদমতলা)-হ', রামহাতিতলা-হু, (লাউসেন তলা, ভুঁইফোড়তলা)-বী, আগড়তলা-ত্রি, পলাশতলা-টা, গাঅরিতলা <গান্তারীতলা-চট্ট।

তলী—(বটতলী, গাবতলী)-ম, (পাহাড়তলী, সরোয়াতলী)-চট্ট।

দল—মহিষাদল-মে, শিমদল-বর্ধ´, মইসাদল-সাঁপর, জগদ্দল-চ, যশোদল-ম।

দহ—শিলাইদহ, শিয়ালদহ, মালদহ, খড়দহ-চ, চাকদহ-ন. চ, গীতালদহ-কো, বাঁকদহ-বাঁ, কুমড়াদহ-মু, ডুমুরদহ-হু, মাকড়দহ-হা, (লালদহ, শালদহ)-বী।

দি—(আড়ালদি, কচিদি)-বাঁ, (কাঁটাদি, ডুমুরদি)-পু, ঈশ্বরদি-পা, (নরুন্দি, রামদি)-ম মহেশ্বরদি-ঢা।

দীঘি—(বল্লালদীঘি, সুলতানদীঘি)-হু, চকদীঘি-বর্ধ´, গোপদীঘি-বী, সাগরদীঘি-মু, করণদীঘি-পদি, নাজিরদীঘি-ম।

নগর—কৃষ্ণনগর-ন, জয়নগর-চ, চন্দননগর-হু, কাশেমনগর-বর্ধ´, গৌরনগর-বী, ধর্মনগর-ত্রি, জাহাঙ্গীরনগর-ঢা, হয়বতনগর-ম, মালখানগর-ব, (বাউনঅর <বাবুনগর, মরিয়মনগর)-চট্ট।

পাড়—[কোডর পাড়, শুদিরপাড় (আ° গদীরা=নৌকা)]-চট্ট, দীঘির পাড়-ম, (হ্রদের পাড়, বানারের পাড়)-টা।

পাশা—(অরণ্যপাশা, চণ্ডীপাশা, তারপাশা, দেওপাশা, রায়পাশা)-ম।

পাহাড়ী—(বাঁশপাহাড়ী, বেলপাহাড়ী)-মে, কালীপাহাড়ী-বর্ধ, ঝণ্টিপাহাড়ী -বাঁ, চৌপাহাড়ী-পু।

পুকুর—(কেওড়াপুকুর, ঠাকুরপুকুর, দত্তপুকুর)-চ, (শ্যামপুকুর, বেনেপুকুর)-ক, বেলপুকুর-ন, তালপুকুর-মু, কামারপুকুর-হু, (শাঁখারিপুকুর, রাজারপুকুর)-বী।

পুর—(আলিপুর, বারুইপুর, নরেন্দ্রপুর)-চ. ভবানীপুর-ক. ম, শান্তিপুর-ন, বহরমপুর-মু, শিবপুর-হা, শ্রীরামপুর-হু, দেবানন্দপুর (শরৎচন্দ্রের জন্মস্থান),

মেদিনীপুর, দুর্গাপুর-বর্ধ, (লাবপুর, দুবরাজপুর)-বী, বিষ্ণুপুর-বাঁ. চ, রামচন্দ্রপুর -পু, দিনাজপুর, হরিশ্চন্দ্রপুর-মা, রংপুর, ধরমপুর-জ, শিকারপুর-কো, নাগ্রিশপুর-দা, জয়দেবপুর-ঢা, গৌরীপুর-ম, ফরিদপুর, পিরোজপুর, দৌলতপুর, বখ্‌তপুর-চট্ট।

বাজার—কশিমবাজার-মু, মহম্মদবাজার-বী, পোড়াবাজার-হু, (বাগবাজার, শ্যামবাজার)-ক, ভৈরববাজার-ম, কক্সবাজার-চট্ট।

বাটী—বলরামবাটী-হা, বৈষ্ণবাটী-হু, জয়রামবাটী, রতিবাটী-বর্ধ, দামোদরবাটী-বাঁ, বুঁইচবাটী-চ, মোহনবাটী-পদি।

বাড়ি—(নকশালবাড়ি, পাঙ্খাবাড়ি)-দা, (বেরুবাড়ি, মরিচবাড়ি)-জ, অশোক বাড়ি-কো, বেগুনবাড়ি-মু. ম, গোলাবাড়ি-হা, আকন্দবাড়ি-মে, গোরাবাড়ি-বাঁ, পাতাবাড়ি-সাঁপর, ভুরকুণ্ডাবাড়ি-পু, হরিণবাড়ি-চ, পটিকাবাড়ি-ন, পলাশবাড়ি-মু, সরিষাবাড়ি-টা, জঙ্গলবাড়ি-ম, মাদারবাড়ি-চট্ট।

বেড়িয়া / বেড়ে—(উলুবেড়িয়া, সিজবেড়িয়া)-হা, (অনলবেড়িয়া, হাতীবেড়িয়া) -মে, তেলেবেড়িয়া-বাঁ, (লাউবেড়িয়া, মালাবেড়িয়া)-বী, শরবেড়িয়া-পু, আন্দুল বেড়িয়া-মু, (পিপুলবেড়িয়া, হোগলবেড়িয়া)-ন, (চালতাবেড়িয়া, চৌবেড়িয়া) -চ, ফুলবেড়িয়া-মা. বী. মে।

মারি—(কুমীরমারি, বাঘমারি)-চ, শোলমারি-জ, হাতীমারি-মা, নীলফা-মারি-রং, চাঁদমারি-হা, তেঁতুলমারি-হু, মুণ্ডমারি-মে, কাতলামারি-মু।

শাল—চৌশাল-বাঁ, শালবনী-মে, শালদহ-বী, বরিশাল, উখড়াশাল-ম।

শোল—আসানশোল, (পায়রাশোল, ভেদুয়াশোল)-বাঁ, ধানশোল-মে, খয়রাশোল -বী, সিয়ারশোল-বর্ধ, মাশোল-মু।

হাট—বসিরহাট, মগরাহাট, রাজবলহাট-হু, মঙ্গলাহাট-হা, দাঁইহাট-বর্ধ, রামপুরহাট-বী, গড়িয়াহাট-ক।

হাটা—চিনপাটা-কো, (গয়হাটা, দেওহাটা)-টা, (গচিহাটা, বাঘহাটা)-ম।

হাটি—নৈহাটি-চ. ম, কামারহাটি-চ. বী, নলহাটি-বী, কুঁকড়াহাটি-মে, (গৌরহাটি, ভাণ্ডারহাটি)-হু, কাঁকনহাটি-ম, পিঙ্গলহাটি-টা।

অষ্টম অধ্যায়

বিবাহের খুঁটিনাটি

অধিবাস—বিবাহ, উপনয়ন, যাগ, পূজা ইত্যাদির পূর্বে গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা করণীয় দেহ-সংস্কার বিশেষ। বৈবাহিক অধিবাস সাধারণত বিবাহের পূর্বদিন হয়; বিশেষক্ষেত্রে কার্যদিনেও হইতে দেখা যায়। এই উপলক্ষে একটি বরণডালা (কুলা) ধান্য, দূর্বা, মহী, চন্দন, হরিদ্রা, সিন্দুর, কজ্জল, দীপ, কার্পাসসূত্র, স্বস্তিক, দর্পণ, লৌহ, শিলা, আলতা, ফল, পুষ্প, ঘৃত, স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, শঙ্খ, চামর, গোরোচনা প্রভৃতি দ্রব্যে সাজানো হয় এবং পৃথক একটি থালায় আতপ চাউল ও মাষকলাই বাটিয়া 'শ্রী' বা 'ছিরি' নামক একটি দ্রব্যও তৈয়ার করিয়া রাখা হয়। যথাসময় পুরোহিত আসিয়া বরের বাড়িতে বরকে ও কন্যার বাড়িতে কন্যাকে চন্দনের টিপ পরাইয়া দেন এবং অধিবাস-দ্রব্যগুলি একটি একটি করিয়া বর-কন্যার কপালে ছোঁয়ান; সমস্ত ছোঁয়াইয়া বরণডালাটি এবং 'শ্রী'র থালাটিও একবার তাহাদের মাথায় তুলিয়া ধরেন। অতঃপর একগোছা দূর্বা তৈল-হরিদ্রাসিক্ত নূতন কার্পাস সূত্রে বরের দক্ষিণ ও কন্যার বাম মণিবন্ধে বাঁধিয়া দেওয়া হয়। ইহাকে '**মঙ্গলসূত্র**' বা '**কঙ্কণ**' বলে।

অষ্টমঙ্গল, অষ্টমঙ্গলা—বিবাহের অষ্টমদিনে কন্যার বাড়িতে অনুষ্ঠেয় একটি লোকাচার বিঃ। সেদিন এয়োস্ত্রীরা দুধ ও আলতা গোলা থালায় বর-কন্যার হাত রাখিয়া 'মঙ্গলসূত্র' খুলিয়া দেন; গ্রন্থিবন্ধনও (গাঁটছড়া) সঙ্গে সঙ্গেই খোলা হয়। কোথাও দশমদিনে এই আচার পালিত হয় এবং তদঞ্চলে ইহাকে '**দশমঙ্গল**' বলে। এত দীর্ঘদিন অপেক্ষা করিবার অবকাশ না থাকিলে বিবাহের চতুর্থদিনেও মঙ্গলসূত্র এবং গ্রন্থিবন্ধন খুলিবার অনুষ্ঠান হইতে দেখা যায়। চতুর্থদিনের অনুষ্ঠান '**চতুর্থমঙ্গল**' নামে অভিহিত হয়।

বিবাহের অষ্টম, অঞ্চলভেদে দশম দিন পর্যন্ত সময়কে শুভসময় মনে করা হয়। এজন্য জ্যোতিষের মতে শীঘ্র দ্বিরাগমনের কোনও শুভদিন না থাকিলে ঐ সময়ের মধ্যেই নববধূ স্বামীর সহিত পিত্রালয়ে আসিয়া আবার (দ্বিতীয়বার) জোড়ে স্বামীগৃহে চলিয়া যায় (ধুলাপায়ে গমন দ্র)।

আইবড় পথ ভাঁড়ানো-পর্ব—কুলোক বা কুদেবতাদের বিভ্রান্ত করিবার

উদ্দেশ্যে গ্রামের যে পথ দিয়া বিবাহ করিতে যাওয়া, বিবাহ করিয়া অন্যপথে ফিরিয়া আসা। ভাঁড়ানো—ঠকানো।

আইবড় ভাত, আইবুড় ভাত—গায়েহলুদের পর পিতৃগৃহে কন্যার বিবিধ উপকরণ ও পিষ্টকাদিসহ অন্নগ্রহণরূপ সংস্কার বিশেষ। বাংলার সর্বত্র সকল সমাজে ইহার রেওয়াজ নাই। কোথাও কোথাও আবার পাত্র-পাত্রী দুইজন-কেই 'আইবুড় ভাত' খাওয়ানো হয়।

আইভাঁড়-বর্ধ—নানারঙে চিত্রিত বিবাহের মাঙ্গলিক হাঁড়ি। ইহাতে হলুদ-মাখা চাল ও একুশটি কড়ি একটি সরা দিয়া ঢাকা থাকে। তৎপর্যায়:—আইহাঁড়ি-চ. ন. মু. য, আইঘট-ঢা, আঁওহাঁড়ি-রাঢ়, আশকোর-খু, ছাউনি হাঁড়ি-ন, মুঙ্গলী হাঁড়ি-চ।

আগোদ-পড়ানো-মুস—বিবাহের শপথ-বাক্য (মন্ত্র ?) পাঠ করানো।

আটোরা-দি—বিবাহের অষ্টম দিনে নববধূর স্বামীসহ পিত্রালয়ে আসা।

আভ্যুদয়িক—বিবাহাদি শুভকর্মের পূর্বে অভ্যুদয় অর্থাৎ সমৃদ্ধির জন্য পিতৃপুরুষের উদ্দেশে যে শ্রাদ্ধকার্যাদি করা হয়, তাহাকে আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ, বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ বা নান্দীমুখ বলা হয়। আব্যদিক—আভ্যুদয়িক-এর প্রাদেশিক রূপভেদ।

আশীর্বাদ—সাধারণ অর্থ গুরুজন কর্তৃক মঙ্গলপ্রার্থনা। বিবাহের কথাবার্তা পাকা হইলে বরপক্ষ হইতে কন্যাকে বা কন্যাপক্ষ হইতে বরকে 'আশীর্বাদ' করা হয়। ইহাই বিবাহের প্রাথমিক অনুষ্ঠান। সাধারণত বরপক্ষের আশীর্বাদে বরের কোনও গুরুজন পুরোহিতকে সঙ্গে লইয়া কন্যার বাড়ি যান। প্রথমে পুরোহিত স্বস্তিবাচন উচ্চারণ করিয়া কন্যার মস্তকে ধান্য-দূর্বা ও কপালে চন্দনের ফোঁটা দেন; পরে বরপক্ষীয় ব্যক্তি কোনও স্বর্ণালঙ্কার (বা টাকা-গিনি) দিয়া কন্যাকে আশীর্বাদ করেন। পশ্চিমবঙ্গে শুধু বরপক্ষ হইতে কন্যাকে নয়, কন্যাপক্ষ হইতেও বরকে কোনও সোনার জিনিস দিয়া আশীর্বাদ করা হয়।

উকীল-মুস—মুসলমানী বিবাহে 'কনে রাজি' বলিয়া যিনি কন্যাপক্ষ সমর্থন করেন। আইন-ব্যবসায়ী।

উঠে আসা-মুস—কন্যাকে উঠাইয়া আনিয়া বরের বাড়িতে বিবাহের প্রথা। চোড়ে যাওয়া—কন্যার বাড়িতে যাইয়া বিবাহের প্রথা। হিন্দুসমাজে দ্বিতীয় প্রথাটিকে 'বরাহ্বানে বিবাহ' বলা হয়।

উলু [<হুলু]—উলু-লু, স্ত্রীলোকদের মঙ্গলসূচক মুখধ্বনি বি৹। তৎপর্যায়:—জোকার (জয় জয়কার), উরুলি, জজ্‌কা-মা।

কড়িখেলা—বাসরঘরে বর-বধূর একপ্রকার আনন্দঘন খেলা বা খেলার প্রহসন (farce)। হলুদমাখা চাল এবং ২১টি কড়িসহ একটি সুচিত্রিত হাঁড়ি (আইহাঁড়ি) সরা দিয়া ঢাকিয়া বধূর সমুখে রাখা হয়। ঢাকনিটি উঠাইয়া একবার বর সেগুলি ছড়াইয়া ফেলে, বধূ কুড়াইয়া রাখে; আবার বধূ ছড়াইয়া দেয়, বর কুড়াইয়া তোলে। এইরূপ তিনবার, কি সাতবার করিবার পর রায় দেওয়া হয়—'বধূর জিত, বরের হার।' রায় দেয় বধূর বান্ধবীরাই, তাহাদেরই সেখানে পূর্ণ আধিপত্য। এই খেলায় অঞ্চলভেদে আচার-নিয়মের পার্থক্য থাকিলেও রায় সর্বত্রই বধূর অনুকূলে যায়। খেলার শেষে পরাজিত বরের দক্ষিণ হস্ত একটি নোড়ায় চাপিয়া ধরা হয় এবং বধূর জন্য কোনও যৌতুকের প্রতিশ্রুতি না পাওয়া পর্যন্ত তাহাকে মুক্তি দেওয়া হয় না। কড়িখেলা পর্যায়ের অপর খেলা:—যৌতুকখেলা, ভাঁড়কুলো খেলা, পাশাখেলা। এই সকল স্ত্রী-আচার কন্যার পিত্রালয় হইতে প্রেরিত একটি পাটির উপর বসিয়া পালন করা হয়। কথায় বলে, 'বেটীর সঙ্গে পাটি।'

কণ্ঠিবদল—বৈষ্ণবদের কণ্ঠি (তুলসীমালা) বদল করিয়া বিবাহ।

কনকাঞ্জলি—বিবাহে যাত্রা করিবার পূর্বে পুত্র কর্তৃক মাতাকে সতণ্ডুল স্বর্ণ কি রৌপ্যমুদ্রা দানের আঞ্চলিক প্রথা; মা এই দান আঁচল পাতিয়া গ্রহণ করেন। উত্তরবঙ্গে সমাজভেদে বরবরণের সময় বর শাশুড়ীর আঁচলে এক মুষ্টি পানসুপারি ও একটি টাকা ফেলিয়া দেয়,—ইহারও স্থানীয় নাম কনকাঞ্জলি। বিসর্জনের পূর্বে প্রতিমার (বিশেষ করিয়া দুর্গাপ্রতিমার) চরণেও গৃহস্থ স্বর্ণ ছোঁয়াইয়া কনকাঞ্জলি দানের প্রথা পালন করে। মধ্যযুগের বাংলা-সাহিত্যে মঙ্গলসূচক কৃত্য হিসাবে কনকাঞ্জলি দানের অনেক উল্লেখ আছে।

কনে, কইনা [<কন্যা]—বিবাহের পাত্রী (আত্মীয়-কুটুম্ব কন্যা দ্র)।

কন্যাকর্তা—কন্যাসম্প্রদাতা, কন্যা-সম্প্রদানে অধিকারী ব্যক্তি। অনেক সমাজে কন্যার বিবাহে মামাকেই শ্রেষ্ঠ সম্প্রদানকর্তা বলিয়া মনে করা হয়।

কন্যাতি, কন্যাযাত্র, কন্যাযাত্রী—বিবাহে কন্যাপক্ষীয় নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ। বিবাহের সময় যাহারা কন্যার সঙ্গে বরের গৃহে যায়। কোন কোন সমাজে বর কন্যাকে নিজের বাড়িতে আনিয়া বিবাহ করে। বর্তমানে উচ্চকোটি সমাজে এই প্রথা কদাচিৎ দেখা যায়; নিম্নকোটি সমাজেও ক্রমে উঠিয়া যাইতেছে।

করমী—ঘটক ('মাঘ মাসে করমী আইল হীরাধরের বাড়ী'—মৈগী)।

কলাতল, কলাতলা—একটি সমচতুর্ভুজ স্থানের চারকোণে চারিটি কলাগাছ

পুঁতিয়া এবং সেগুলি সাতপাক সুতায় বেষ্টন করিয়া বৈবাহিক কলাতল তৈয়ার করা হয়। সমাজভেদে কোথাও কোথাও এই কলাতলে একটি শিল পাতা থাকে এবং তাহার উপর বসিয়া বর বা কন্যা বিবাহকালীন স্নান করে। এই স্নানকে বলা হয়—'কলাতলায় স্নান'। আবার কোথাও (ম. শ্রী. ত্রি) কলাতল —বিবাহ-স্থান, যে স্থানে সম্প্রদানাদি ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, অর্থাৎ গাঙ্গেয় অঞ্চলের 'ছাঁদনাতলা'। কিন্তু কোথাও কোথাও ছাঁদনাতলায় কলাগাছ পোঁতা হয় না, সেখানে সুরম্য চাঁদোয়া বা শামিয়ানা টানাইয়া বিবাহ হয়। ঢাকা অঞ্চলেও মূল বিবাহ কলাতলে হয় না, কিন্তু বাসিবিবাহ রীতিমত কলাগাছ পুঁতিয়া, পুকুর খুঁড়িয়া, তাহার চারিদিকে সাতপাক ঘুরিয়া নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। কাজেই 'কলাতলে'র অর্থ সমাজ ও অঞ্চলভেদে বিভিন্ন।

কাজায়ী-মুস —বরপক্ষের নিকট হইতে কন্যাপক্ষীয় লোকেরা তাহাদের স্থানীয় প্রতিষ্ঠানাদির (ইস্কুল, মসজিদ) জন্য যাহা আদায় করে।

কাজী—বিচারক শ্রেণীর মুসলমান। মুসলমানদের বিবাহের কাবিননামা যাঁহার নিকট রেজেষ্ট্রী করা হয়।

কাবিন / কাবিননামা-মুস—বিবাহের চুক্তিপত্র।

কালরাত্রি—বাংলার বহু অঞ্চলেই বিবাহের দ্বিতীয় দিনের রাত্রিকে 'কালরাত্রি' বলা হয়। আবার সমাজভেদে বাসি-বিবাহের পরদিনের রাত্রিকে, অর্থাৎ বিবাহের তৃতীয় রাত্রিকে 'কালরাত্রি' ধরা হয়। মনসামঙ্গলে কালরাত্রি বলা হইয়াছে বিবাহের প্রথম রাত্রিকে,—যে-রাত্রিতে সর্পদংশনে লখাইর মৃত্যু ঘটিয়াছিল। লোকমতে কালরাত্রিতে বর-কন্যার সাক্ষাৎকার নিষিদ্ধ।

কালরাত্রি—ভয়ঙ্কর রাত্রি, যে রাত্রিতে মৃত্যু বা তদ্রূপ কোনও বিপদ ঘটে, ঘটিয়াছে বা ঘটিতে পারে। জ্যোতিষে কালরাত্রি বলা হয়—শুভকার্যের অযোগ্য রাত্রির বিশেষ বিশেষ যামার্ধকে।

কুঞ্জ-শ্রী—শ্রীহট্টে বিবাহ-স্থানকে বলা হয় 'কুঞ্জ'। সেই স্থানটিতে বহু কলাগাছ পুঁতিয়া রীতিমত একটি কদলীকুঞ্জই করা হয়। তদঞ্চলে বাঁশের কঞ্চি পোঁতার প্রথাও আছে। কুঞ্জ—কুঞ্জবন। বৈষ্ণবদের আখড়া।

কুশণ্ডিকা—বিবাহের রাত্রে বা পরদিবসে অনুষ্ঠেয় শাস্ত্রীয় হোমাদি সংস্কার।

খাত্‌তা ভাজানো-ম্রা. বগু. রং—মাতাপিতার অভিভাবকত্বে ভরণ-পোষণের সমাপ্তিসূচক বৈবাহিক প্রথা বিঃ। এই প্রথা কন্যার গায়েহলুদের পর পালিত হয়।

খোত্‌বা-মুস—বিবাহ পড়ানোর (আগোদ পড়ান দ্র) পর পবিত্র কোরান হইতে কিছু পাঠ।

গওয়া-মুস—বিবাহের সাক্ষী, যে-পাত্রের সঙ্গে বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে, কন্যা তাহাকে বিবাহ করিতে রাজী আছে,—এই বিষয়ের সাক্ষী।

গন্ধতৈল—বিবাহকালীন স্নানে, বিশেষ করিয়া অধিবাসে ও গায়েহলুদে বরকন্যার ব্যবহারের জন্য মেথি ইত্যাদি মশলা সহযোগে সুভগা নারীরা আনুষ্ঠানিকভাবে যে সুগন্ধি তৈল পাক করেন। সমাজভেদে বরের বাড়ির বরস্পৃষ্ট গন্ধতৈল কন্যার বাড়িতে পাঠাইতে হয় এবং কন্যাকে নাওয়াইবার কালে উহা তাহার গায়ে ছিটাইয়া দেওয়া হয়।

গাওকুশী-মুস—বিবাহের পূর্বদিনের ভোজ। **গাওনা-মুস**—দ্বিরাগমন।

গাছবেড়া, গাছমঙ্গলা—কোন কোন সম্প্রদায় মধ্যে বিবাহের পূর্বে কোনও গাছকে সাত পাক সুতায় বেষ্টন করিয়া উহাকে বর বা কন্যার সাতবার প্রদক্ষিণ করার প্রথা আছে। অনেক সময় সম্প্রদায় নির্বিশেষেও দোজবর তেজবরকে বিবাহের প্রাক্কালে কোনও গাছের (প্রায়ই কলাগাছ) সঙ্গে মালাবদল ইঃ বিবাহের অভিনয় করিতে দেখা যায়। বারবার স্ত্রীবিয়োগের দোষ স্খালনের উদ্দেশ্যেই নাকি এইরূপ করা হয়। রাঢ়ে কোন কোন গ্রামের ধর্মপূজায় ধর্মঠাকুর ও তাঁহার কামিন্যা মনসাদেবীকে লইয়াও 'গাছমঙ্গলা' তথা কোন গাছকে সুতায় জড়াইয়া সাতবার প্রদক্ষিণ করা হয়।

গাঁটছড়া—সম্প্রদানের পর বরের উত্তরীয়ের সহিত কন্যার বস্ত্রাঞ্চলের গ্রন্থিবন্ধন। হলুদ-ছোপানো নূতন গামছায় হরিতকী, আমলকী, বহেরা, জায়ফল, সুপারি—এই পাঁচটি ফলের একটি পুঁটলি করিয়া উহার একপ্রান্ত বরের উত্তরীয়ের এবং অপর প্রান্ত কন্যার বস্ত্রাঞ্চলের সহিত বাঁধিয়া দেওয়া হয়। ইহারই নাম গ্রন্থিবন্ধন, চলিত কথায় 'গাঁটছড়া'

গায়েহলুদ, গায়হলুদ—গাত্র-হরিদ্রা, বিবাহের একটি প্রধান স্ত্রী-আচার। ইহাতে বরকন্যাকে কাঁচা হলুদবাটা মাখাইয়া আনুষ্ঠানিকভাবে স্নান করানো হয়। কন্যার স্নানে বরস্পৃষ্ট হলুদ বাটার প্রয়োজন হয়। বাংলাদেশে অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, চূড়াকরণ প্রভৃতি উপলক্ষেও ছেলেদের কাঁচা হলুদবাটা মাখাইয়া নাওয়াইবার রীতি আছে। বৈবাহিক গাত্রহরিদ্রা সর্বত্র সর্বসমাজে একই দিনে একই নিয়মে সম্পন্ন হয় না। পশ্চিমবঙ্গে দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ সমাজে বিবাহ-দিনে অথবা দুই একদিন পূর্বে কোনও শুভ সময়ে বর-কন্যার গাত্রহরিদ্রা হইয়া থাকে।

এয়োস্ত্রীরা বর কি কন্যাকে নূতন কাপড় পরাইয়া, আলপনাযুক্ত পিঁড়িতে বসাইয়া কাঁচা হলুদবাটা ও গন্ধতৈল মাখাইয়া স্নান করান। এই উপলক্ষে বরের বাড়ি হইতে কন্যার বাড়িতে গায়েহলুদের তত্ত্ব—বরস্পৃষ্ট কাঁচা হলুদ-বাটা, বস্ত্রালঙ্কার, মাছ, দই, সন্দেশ ইত্যাদি পাঠানো হয়। কোনও সমাজে আবার বরের গায়েহলুদ না হওয়া পর্যন্ত কন্যার গায়েহলুদ হইবার প্রথা নাই। পূর্ববঙ্গে 'গায়েহলুদ' কথাটি খুব প্রচলিত নহে। সেখানে ও উত্তরবঙ্গে 'হলদিকোটা' 'হলুদ কোটা' শুনা যায়।

গৌরবচন—এককালে যজ্ঞে, শ্রাদ্ধে এবং বিশেষ বিশেষ অতিথির সেবায় গোবধ করা হইত। বিবাহার্থী বর বিশেষ অতিথির মধ্যে একজন। কন্যাদাতা তাঁহাকে মধুপর্কের সহিত গোমাংসে আপ্যায়িত করিতেন। কালক্রমে গোবধ অপ্রচলিত বা নিষিদ্ধ হয় এবং সমাংস মধুপর্কের অনুকল্প—বিবাহস্থানে একটি গোরু বাঁধিয়া রাখিয়া কন্যাদাতার বা নাপিতের (যাহার হেপাজতে গোরু থাকিত) গোঃ গোঃ গোঃ উচ্চারণ করিবার ও খড়্গাহস্তে দাঁড়াইবার এবং বর কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া (ঋগ্‌বেদীয় গোসূক্ত দ্র) নিরপরাধ গোরুটি ছাড়িয়া দিবার প্রথা প্রবর্তিত হয়। ইদানীং এই প্রথাও উঠিয়া গিয়াছে। আছে শুধু বরার্চনার সময়ে নাপিতের 'গৌর গৌর' (গোঁ গোঁ) শব্দ উচ্চারণ বা বৈদিক মন্ত্রের বিষয়বস্তুর সহিত কোনও সম্পর্ক নাই, এইরূপ কতকগুলি হাস্যকর ছড়া কাটা। এই সকল ছড়াই 'গৌরবচন' নামে অভিহিত হয়। এখানে 'আসাম ও বঙ্গদেশের বিবাহ-পদ্ধতি' গ্রন্থ হইতে একটি বচন উদ্ধৃত হইল :—

'শুন সবে, এবে আমি করি নিবেদন।
ছাঁদনাতলায় এসেছে বর বৃষভ বাহন॥
মন্দলোক থাক যদি, যাও সরে যাও।
ছাউনি নাড়ার সময় হ'ল, এয়োরা দাঁড়াও॥
খুঁটিথাটা ছেড়ে দাও, ভাতার পুতের মাথা খাও।
যে ধরবে চালের বাতা, সে খাবে ভাতারের মাথা।
যে জন করবেক কু, তার বাপের মুখে গু।'

লোকবিশ্বাস এই যে, শুভদৃষ্টির কালে কেহ যদি ঘরের খুঁটি বা চালের বাতা ধরিয়া থাকে, তাহা হইলে নবদম্পতির জীবন সুখের হয় না। এজন্য নাপিত পূর্বেই সকলকে সাবধান করিয়া দেয়, যাহাতে কেহ কোনও প্রকারে 'কু' না করে, দুষ্ট লোক সরিয়া যায়।

গ্রন্থিবন্ধন—বিবাহকালে বরের উত্তরীয়ের সঙ্গে কন্যার বস্ত্রাঞ্চলের বন্ধনরূপ স্ত্রী-আচার। (গাঁটছড়া দ্র)।

গ্রন্থিমোচন—গাঁটছড়া খোলা,—যাহা সাধারণত বিবাহের চতুর্থ, অষ্টম বা দশম দিনে কন্যার পিত্রালয়ে অনুষ্ঠিত হয়।

গ্রামদর্শনী-পূব—সেকালে বিবাহ উপলক্ষে কুলীনরা 'বাঙ্গাল' গ্রামে (অকুলীনদের গ্রামে) প্রবেশ করিলে তাহাদিগকে দর্শনী (টাকা) দিতে হইত। তাহারা ঠাকুর চাকর নিয়া যাইত, সিধা পাইত, নূতন চুলা খোদাইয়া রান্নাবান্নার ব্যবস্থা করিত। চুলা খোদানোর জন্যও তাহারা টাকা পাইত, উহা **'চুলাখোদানি'** নামে কথিত হইত।

গ্রামভাটি—কাজায়ী-মুস। বিবাহকালে বরপক্ষের নিকট হইতে কন্যাপক্ষীয় লোকেরা স্থানীয় প্রতিষ্ঠানাদির জন্য যে অর্থ আদায় করে।

ঘটক—বিবাহ ব্যাপারে যিনি পাত্রপক্ষ ও পাত্রীপক্ষের যোগ ঘটান, বিবাহের সম্বন্ধ আনেন। তৎপর্যায়ঃ—কাড়োয়া-দি, কেড়েয়া-জ. কো, করমী-ম। ঘটকালি [ঘটক+আলি]—ঘটকের কাজ; বিবাহের সম্বন্ধ আনা, দুই পক্ষের সঙ্গে কথাবার্তা চালানো ইত্যাদি। কোন কোন অঞ্চলে 'ঘটকতালি' কথাটিও শুনা যায়।

ঘরপুকুর-বগু—বাসর ঘর।

ঘরবর চাওয়া—বিবাহের কথাবার্তা পাকা করিবার পূর্বে কন্যাকর্তা বা তৎপক্ষীয় লোকের সাক্ষাৎভাবে বর ও বর-গৃহের অবস্থা দেখা ('বাপের নাই সে উঠে মন হইল বিষম লেঠা। ঘরবর পছন্দ হইল বংশে আছে খুটা।'—মৈগী)।

চুমানো-মে—বরকন্যাকে আশীর্বাদ করা। পূজা, বন্দনা (গোরু চুমানো)।

চোরপানি, চোরপানি ভরা—বিবাহের দিন অতি প্রত্যূষে পূর্বময়মনসিংহ, ত্রিপুরা, শ্রীহট্ট প্রভৃতি অঞ্চলে কন্যার বাড়িতে 'চোরপানি ভরা' নামক এক স্ত্রী-আচার অনুষ্ঠিত হয় ('চোরপানি ভইরা আইসা দধিচিড়া খাও'-ম)। ভোর না হইতে কন্যার মাতা ও পিতা একসঙ্গে বস্ত্রাঞ্চলে গিঁট দিয়া এয়োদের লইয়া কোনও জলাশয়ে জল ভরিতে যায়। পিতার হস্তে থাকে খাঁড়া বা কোনও লৌহাস্ত্র এবং মাতার কক্ষে থাকে কলসী। কন্যার মাতা কি পিতা জীবিত না থাকিলে অপর কোনও স্বামী-স্ত্রী দ্বারা এই কাজ হইতে পারে। জলে নামিয়া স্বামী খাঁড়া দিয়া যোগচিহ্নের আকারে দুইবার জল কাটিয়া দেয়, স্ত্রী তৎক্ষণাৎ সেখান হইতে তাহার কলসী ভরিয়া লয়। বাড়িতে আসিয়া কলসীতে পাঁচটি ফল ও এক ছড়া মালা রাখিয়া নূতন কাপড়ে উহার মুখ

বাঁধিয়া রাখা হয়। কলসীটি যে ঘরে থাকে, রাত্রিতে বরকে সেই ঘরে নিয়া নানা রকম কৌতুকাবহ স্ত্রী-আচার পালন করা হয় ('বিবাহে লোকাচার ও মেয়েলী সঙ্গীত', মাসিক বসুমতী, কার্তিক, ১৩৫৯ দ্র)। ঢাকায় এই অনুষ্ঠানকে 'নিদ্রাকলসে জলভরা' বলা হয়।

ছন্দ-ন—বংশের প্রথা। তৎপর্যায় ঃ—আইর-ঢা. ত্রি, পদ্দি-ম, পাট, রীত।

ছাঁদনাতলা (ছাঁদলাতলা, ছানলাতলা, ছাননাতলা, ছলনাতলা)-পব. রাঢ়—ছায়ামণ্ডপ, বিবাহ-স্থান। তৎপর্যায় ঃ—বিবাহ-বাসর-পুব, মাড়োয়ারতল-কো. জ. গো. কা, কলাতল-ম. ত্রি, কুঞ্জ-শ্রী। গোয়ালপাড়া এবং কামরূপ অঞ্চলে ছায়নারতল / ছায়নরতল এবং আসামের অপর কোথাও কোথাও রভাতল (রম্ভা) কথাগুলিও শুনা যায়। বাংলার বহু অঞ্চলেই বাড়ির আঙ্গিনায় চাঁদোয়া খাটাইয়া তাহার নীচে বিবাহ-কার্য সম্পন্ন করা হয়। আবার কোথাও কোথাও চাঁদোয়া না টানাইয়া উন্মুক্ত আকাশতলে চারটি কলাগাছ, অথবা বাঁশের কঞ্চি পুঁতিয়া, তাহার বেষ্টনীর মধ্যে বিবাহানুষ্ঠান সম্পন্ন হয় ('কলাতল' দ্র)।

ছামনি—শুভদৃষ্টি।

জলভরন, জলভরা-পূব—বিবাহ-দিনে বর-কন্যাকে স্নান করাইবার জন্য এয়োস্ত্রীরা বিশেষ ঘটা করিয়া নদী বা পুকুর হইতে জল ভরিয়া আনে। একসময়ে 'জলভরা'র গীতে চারিদিক মুখরিত হইয়া উঠিত, বর্তমানে শুধু শঙ্খধ্বনি ও উলুধ্বনি শুনা যায়। 'জলভরা' একটি আনন্দঘন স্ত্রী-আচার। উত্তরবঙ্গের কোথাও কোথাও এই প্রথাকে '**ফুরুলভরন**' বলে।

জলসহা, জলসাওয়া, জলসাধা—বর-কন্যাকে স্নান করাইবার জন্য দেবমন্দির এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত পাড়াপড়শীর বাড়ি হইতে সোহাগ জল প্রার্থনা করিয়া আনিবার প্রথা বিশেষ। এয়োরা 'জলসহা'র জল লইতে প্রথমেই দেবমন্দিরে যায় এবং সেখান হইতে জল লইয়া কোনও প্রতিবেশীর বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হয়। গৃহকর্ত্রী তখন তাহাদের ঘটগুলিতে অল্প অল্প জল ঢালিয়া দেন ; এয়োরা তাঁহাকে পানসুপারি ও মিষ্টি দিয়া অন্য বাড়িতে যায়। এইরূপে বাড়ি-বাড়ি ঘুরিয়া ঘটগুলি পূর্ণ করিয়া তাহারা বিবাহ-বাড়িতে ফিরিয়া আসে। এই শুভেচ্ছাপূত জলে বরের বাড়িতে বরকে এবং কন্যার বাড়িতে কন্যাকে কলাতলে শিলের উপর বসাইয়া স্নান করানো হয়।

জুলুয়া-মুস—শুভদৃষ্টি, বরকন্যার পরস্পরকে প্রথম দর্শন।

জোকার—উলু দ্র।

জোড়ভাঙা—বিবাহের পর পতিসহ কন্যার পিত্রালয়ে গমন এবং সেখানে গিয়া গাঁটছড়া ও হাতের সুতা (মঙ্গলসূত্র) খুলিবার প্রথা (অষ্টমঙ্গল দ্র)।

জোড়ে যাওয়া—বিবাহের পর বরের সহিত কন্যার একত্রে পিত্রালয়ে গমন।

তত্ত্ব—বাংলায় তত্ত্ব বলিতে প্রধানত বুঝায় উপঢৌকন; বিবাহের বিবিধ আচার-অনুষ্ঠান এবং পূজাপার্বণ উপলক্ষে বরের বাড়ি হইতে কন্যার বাড়িতে কিংবা কন্যার বাড়ি হইতে বরের বাড়িতে বস্ত্রালঙ্কার, ফলফুল, দধি-সন্দেশ, মৎস্য ইত্যাদি যেসব দ্রব্য পাঠানো হয় (অধিবাসের তত্ত্ব, গায়েহলুদের তত্ত্ব, ফুলশয্যার তত্ত্ব, পূজার তত্ত্ব)। বৈবাহিক তত্ত্বকে সাধারণ লোক 'ডালা / বিবাহের ডালা'ও বলিয়া থাকে।

তালাক [আ°]—মুস—শরিয়ত অনুযায়ী মুসলমান-দম্পতির বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করা।....তালাক দেওয়া—ত্যাগ করা।

তৈল কাপড়—পূর্ববঙ্গের বহু অঞ্চলে বিবাহের পূর্বদিন বরের বাড়ি হইতে কন্যার বাড়িতে তত্ত্ব পাঠানো হয়; পূর্ব ময়মনসিংহে ইহাকে 'তৈল কাপড়' বা 'তেলকাপড়' এবং কামরূপে 'তেলের ভার' (তেলের ভাঁড়) বলিতে শুনা যায় ('দেইখা ভুলে ঝিয়ারী বহুরী। তৈলকাপড় আইসাছে ঋষির বাড়ী')। তৈল-কাপড়ের দ্রব্যাদির মধ্যে বরস্পৃষ্ট গন্ধতৈল এবং কাঁচা হলুদবাটা অবশ্যই পাঠাইতে হয়।

মুসলমান সমাজে কোথাও কোথাও গায়েহলুদ বা গায়েহলুদের তত্ত্বকে 'তেলৈ' বলে। বিবাহের কয়েকদিন পূর্বে কন্যাপক্ষ হইতে বরের বাড়িতে একটি 'পানের ঝাড়' সহ উপঢৌকনাদি প্রেরণের প্রথাকে চট্টগ্রাম অঞ্চলে 'তেলোয়াই' বলা হয়।

দইমাছ-মা—বিবাহের কথাবার্তা পাকা হইবার পর কোন কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে পাত্রপক্ষ কর্তৃক পাত্রীপক্ষের বাড়িতে দই ও মাছ পাঠাইবার প্রথা আছে।

দধিমঙ্গল—বিবাহের দিন অতি প্রত্যুষে কন্যার মাতা কন্যাকে এয়োস্ত্রীদের সঙ্গে দধি-চিড়া খাওয়ান এবং তাহার কপালে দধি ও চন্দনের ফোঁটা দেন। কোথাও ফোঁটার পরিবর্তে দধি-চন্দন মিশ্রিত জল একটি পান দিয়া কন্যার শরীরে ছিটাইয়া দেওয়া হয়। কোথাও কোথাও শুধু কন্যার বাড়িতেই নয়, বরের বাড়িতেও একই সময়ে বরকে লইয়া দধি-চিড়া খাইবারএবং বরের কপালে দধি-চন্দনের ফোঁটা দিবার প্রথা আছে। বহু অঞ্চলে বহু সমাজে কন্যাগৃহে যাত্রা করিবার কালে বরের কপালে দধি ও চন্দনের ফোঁটা দেওয়া হয়।

শ্রীহট্টে বর যখন (বিবাহের প্রাক্কালে) 'কুঞ্জে' গিয়া দাঁড়ায়' তখন কন্যার মা একটি পর্দার আড়ালে থাকিয়া পিছন হইতে তাহার হাত দুইটি দধি দ্বারা ধুইয়া দেন। বিভিন্ন অঞ্চলের এই সকল মঙ্গল-আচার প্রত্যেকটি 'দধিমঙ্গল' নামে অভিহিত হয়। যাত্রাদি শুভকর্মে দধি ভক্ষণ, স্পর্শন বা দর্শনকেও 'দধিমঙ্গল' বলিতে শুনা যায়।

দরগুয়া—বিবাহের পাকা কথাকে উত্তরবঙ্গের রাজবংশীরা 'দরগুয়া' বলে। তাহারা গুয়া কাটিয়া বিশেষ এক প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়া প্রস্তাবিত বিবাহের শুভাশুভ নির্ণয় করে ('গুয়া পান কাটিয়া শুভাশুভ বুঝিল। বিবাহের দিন তখনই করিল'—মারাগা)। 'দরগুয়া হওয়া'র মূল অর্থ হইতেছে—গুয়া (সুপারি) দৃঢ় হওয়া (দর=দড়=দৃঢ়)।

দামান—মুস—এক নারী অপর নারীর স্বামী সম্পর্কে কিছু বলিতে যাইয়া 'দামান' কথাটি প্রয়োগ করে ('তোমার দামান কুটি' ?-বগু)। কুটি=কোথায়।

দুধের ধার শোধা—বিবাহের প্রাক্কালে মেয়েকে মাতৃঋণ হইতে কিছুটা মুক্তি দিবার মেয়েলী প্রথা বিঃ।

দুল্‌হা / দুলা-মুস—বর। সদ্যবিবাহিত।

দুলহিন / দুলাইন-মুস—কনে। সদ্যবিবাহিতা।

দুলাউশনি-মুস—কনের বাড়িতে উপস্থিত বরকে অভ্যর্থনা করিয়া মজলিসে আনা। বরবরণ।

দেনমোহর [আ° দয়নমহর]-মুস—মুসলমান বিবাহে স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে দেয় যৌতুক (যৌতুকস্বরূপ অর্থ, বিষয়সম্পত্তি, স্বর্ণ, রৌপ্য ইঃ)। সাধারণত এই যৌতুকের কিছুটা বিবাহের সময় এবং অবশিষ্টাংশ বিবাহের পর দেওয়া হয়। যৌতুকের টাকার পরিমাণ কাবিননামায় উল্লেখ থাকে।

দোপড়া মেয়ে—যে মেয়ের একস্থানে বিবাহের কথাবার্তা পাকা হওয়ার পর কোনও কারণে অন্য পাত্রে বিবাহ হয়।

দ্বিরাগমন—বিবাহের পর পিত্রালয় হইতে কন্যার দ্বিতীয়বার পতিগৃহে আগমন। তৎপর্যায় :—গাওনা-মু (মুস), ঘরবসত-চ (মুস), নবসত / নয়াবসত-ন. মে।

ধুতুরাকাটাইল-শ্রী—শ্রীহট্টে বিবাহের দিন আনুষ্ঠানিক স্নানের পর বর ও কন্যার হাতে ধুতুরাকাটাইল দেওয়া হয়। ইহা কলার মাজ, ধুতুরী, লোহার পেরেক ইত্যাদি সাতটি দ্রব্যের একটি গুচ্ছ। তদঞ্চলে কাটারিকে কাটাইল

বলে ; হয়ত এককালে ঐ দ্রব্যসমষ্টির মধ্যে ধুতুরা এবং কাটাইল-এর উপরই অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইত বলিয়া এইরূপ নামকরণ হইয়াছে। বর্তমানে কাটাইলের পরিবর্তে একটি পেরেক বা লোহার কাঠি দেওয়া হয়। 'কুঞ্জে' মালা বদলের সময় বর-কন্যা ধুতুরা-কাটাইলও বদল করে।

পূর্ববঙ্গের বহু অঞ্চলে বর-কন্যাকে **মাজদর্পণ** (কলার মাজ পাতা এবং পিতলের বা লোহার দর্পণাকার দ্রব্য বিশেষ) এবং পশ্চিমবঙ্গের বহু অঞ্চলে বরকে **রূপার জাঁতি** ও কন্যাকে **কাজললতা** ধারণ করিতে দেখা যায়। বিবাহের যাবতীয় অনুষ্ঠান শেষ না হওয়া পর্যন্ত এইগুলি হাতে রাখিতে হয়। ধুতুরাকাটাইল-এর ন্যায় মাজদর্পণও বর-কন্যা বিবাহ-বাসরে বদল করিয়া লয়।

ধুতুরা পিদ্দিম—বরবরণের কালে ধুতুরার শুখনা খোলায় সরিষার তেলের যে প্রদীপ জ্বালা হয়।

ধুলপায়ে গমন—বিবাহের আটদিনের মধ্যে পতিসহ বধূর পিত্রালয়ে গমন এবং সন্ত্বই বা তিনরাত্র বাস করিবার পূর্বেই পতিগৃহে প্রত্যাগমন। লোকমত এই যে, বিবাহের আটদিন (কাহারো মতে দশ দিন) বর-কন্যার পক্ষে সর্বকার্যে শুভ। তাই অনেকে জ্যোতিষ শাস্ত্রানুসারে দ্বিরাগমনের শুভদিনের জন্য অপেক্ষা না করিয়া 'ধুলা-পায়েগমন' বা 'ধুলা-পা' স্ত্রী-আচার পালন করে।

নওশাহ-মুস—বর (দুলা দ্র)।

নাইয়র, নাইহর, নৈহর—পিত্রালয়। পতিগৃহ হইতে বধূর পিত্রালয়ে বা তৎসম্পর্কীয় আত্মীয়ের বাড়ি গমন ('বাঁট ন বাঁট শাসু ছুটি ছুটি ভাত গ, আপন মনে নৈহর চলি যাব'—মে)। অঞ্চলভেদে 'ন' 'ল' রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন, লায়র, লাইয়র।

নান্দীমুখ—বিবাহাদি শুভকার্যের পূবে অনুষ্ঠিত পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ-ক্রিয়াকে অভ্যুদয় বা কল্যাণের হেতু মনে করা হয় বলিয়া ইহাকে নান্দীমুখ বা নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ বলা হয়। ইহার অপর নাম আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ, বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ।

নিকা-মুস—বিধবা বিবাহ, সাঙ্গা।

নিছনিডালা—বরণডালা, যে ডালায় বরকে নির্মঞ্ছন করিয়া অর্থাৎ তাহার অঙ্গ মুছিয়া যাবতীয় বালাই দূর করিবার উদ্দেশ্যে বিবিধ মাঙ্গলিক দ্রব্য সাজানো থাকে।

নিদ্রাকলস, নিদ্রাকলসে জলভরা—বিবাহের দিন অতি প্রত্যুষে কন্যার মাতা

ও পিতা কর্তৃক একসঙ্গে বস্ত্রাঞ্চলে গিঁট দিয়া জল ভরিবার অনুষ্ঠান। তৎপর্যায়ঃ—চোরপানি ভরা। 'নিদ্রাকলসে জলভরা' এবং 'চোরপানি ভরা' অনুষ্ঠান বিভিন্ন অঞ্চলের হইলেও এবং ইহাদের নামে পার্থক্য থাকিলেও, ইহারা মূলত এক এবং প্রায় একই পদ্ধতিতে উদযাপিত হয়। হয়ত সকলের নিদ্রিত থাকা অবস্থায় জলভরা হয় বলিয়া আধারটির নাম 'নিদ্রাকলস' হইয়াছে। আবার চোরের মত চুপি চুপি জল ভরিয়া আনা হয় বলিয়া অঞ্চলভেদে ঐ একই অনুষ্ঠানের'চোরপানি' নামকরণ হইয়া থাকিবে। ('চোরপানি' দ্র)।

নিমন্ত্রণ—ভোজন বা অন্য কোনও অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ। তৎপর্যায়ঃ—জিয়াফত / জেফত / দাওয়াত-মুস, নিতা / নিতে-ফ. ব. খু, নি'ম্ত্রণ-চট্ট, নিমন্তন / নিমন্তন্ন / নেমন্তন / নেমন্তন্ন-পূব. শ্রী. ত্রি। বৈবাহিক নিমন্ত্রণে স্থান ও সমাজভেদে নানারূপ বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। পূর্ববঙ্গ ও উত্তরবঙ্গের অনেক সমাজে পাকস্পর্শ বা বৌভাতের নিমন্ত্রণ সাধারণত পান দিয়া করা হয়। নিমন্ত্রিত ব্যক্তি যদি পান গ্রহণ করেন, তবেই তিনি নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন; আর যদি পান প্রত্যাখ্যান করেন, তবে নিমন্ত্রণও প্রত্যাখ্যান করিলেন, বুঝা গেল। আসামেও এইরূপ প্রথা প্রচলিত আছে। কোথাও কোথাও বিবাহ-ভোজে স্ত্রীলোকের নিমন্ত্রণ স্ত্রীলোক দ্বারা করাইতে হয়, নতুবা মহিলারা যোগদান করেন না। প্রথমেই প্রজাপতিকে নমস্কার করিয়া (শ্রীশ্রীপ্রজাপতয়ে নমঃ) বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র আরম্ভ করা হয় এবং প্রায়ই উহা লাল কালিতে কিংবা কালো রং ছাড়া অন্য কালিতে লেখা হয়। শুধু বিবাহের নয়, সামাজিক অন্যসব নিমন্ত্রণ চিঠিতেও 'পত্র দ্বারা নিমন্ত্রণের ত্রুটি মার্জনা করিবেন'—এইরূপ একটি কথা লেখা থাকে। ইহাতে বুঝা যায়, এককালে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া নিমন্ত্রণ করাই শিষ্ট রীতি ছিল।

পণ—বিবাহে কন্যাপক্ষ কর্তৃক বরপক্ষকে বা বরপক্ষ কর্তৃক কন্যাপক্ষকে বাধ্যতামূলকভাবে অর্থাদি যাহা দিতে হয়। এই পণপ্রথা নানা ভাবে নানা আকারে প্রায় সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই প্রচলিত আছে। বর্তমানে ইহার উচ্ছেদসাধনে কি সরকার, কি জনগণ সকলেই সোচ্চার এবং সচেষ্ট।

পত্রকরণ, পয়নামা-পত্র—(আশীর্বাদ ও পাকাদেখা দ্র)।

পাকস্পর্শ—পতিগৃহে নববধূর প্রথম পাক (রন্ধন) স্পর্শ এবং স্পৃষ্ট অন্ন বর ও জ্ঞাতি-কুটুম্বকে পরিবেশন রূপ শুভ আচার বিঃ (বউভাত দ্র)।

পাকা দেখা—বিবাহের কথাবার্তা পাকা হইলে পাত্র-পাত্রীকে আশীর্বাদ

এবং বিবাহের তারিখ লগ্ন ইত্যাদি স্থিরকরারূপ মাঙ্গলিক আচার বিশেষ। স্থান এবং সমাজ ভেদে 'পাকাদেখা' অনুষ্ঠান 'আশীর্বাদ', 'মঙ্গলাচরণ', 'লগ্নপত্র', 'পত্রনামাপত্র', 'পত্রকরণ', 'পাটিপত্র', 'পানচিনি', 'কন্যা-জোড়া' ইঃ নানা নামে অভিহিত হয়। সাধারণত কন্যাকে আশীর্বাদের (আশীর্বাদ দ্র) পর পুরোহিত একখণ্ড কাগজে লালকালিতে বর-কন্যার ও তাহাদের পিতার নাম-গোত্র, বিবাহের দিন, লগ্ন ইত্যাদি লেখেন এবং বরপক্ষীয় ব্যক্তি উহা স্বাক্ষর করিয়া কন্যার পিতা বা অভিভাবকের হস্তে অর্পণ করেন।

পাটিপত্র-চা. ব—বিবাহের প্রস্তাব পাকাকরণ রূপ অনুষ্ঠান বিঃ। এই অনুষ্ঠানে দুই পক্ষের স্বাক্ষরিত দুই খণ্ড কাগজে পাত্র-পাত্রীর শুধু নামধাম এবং বিবাহের লগ্ন তারিখই লেখা থাকে না, কোন্ পক্ষ প্রধান কি কি অলঙ্কার ও দানসামগ্রী দিবে, তাহারও উল্লেখ থাকে। অগ্রসর পল্লীসমাজে এইরূপ লেখালেখির প্রথা তত নাই, ইহা ক্রমে উঠিয়া যাইতেছে।

পাত্র—বর, বিবাহার্থী (পাত্রনির্বাচন, পাত্রদেখা)। স্ত্রী. পাত্রী (পাত্রীদেখা)। ....পাত্রস্থ করা—কন্যার বিবাহ দেওয়া।

পানখিল—ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা, শ্রীহট্ট প্রভৃতি অঞ্চলে আশীর্বাদ বা লগ্নপত্রের কয়েকদিন পর প্রথমে বরের বাড়িতে এবং পরে কন্যার বাড়িতে সমাজের এয়োগণ একত্র হইয়া 'পানখিলি' বা 'পানভাঙ্গানি' নামে এক আচার পালন করে।

এয়োগণকে পূর্বেই যথারীতি নিমন্ত্রণ করা হয়। তাহারা আসিয়া কেহ আলপনা দেয়, কেহ মঙ্গলঘট বসায়, কেহ বা ধূপ-দীপ জ্বালে। তারপর সকলে বসিয়া এক একটি গোটা পান হাতে লইয়া উহাতে খিলি দেয় (পানটি ভাঁজ করিয়া খড়িকা দিয়া গাঁথিয়া রাখে)। সঙ্গে সঙ্গে গীত, জোকার, আমোদ-আহ্লাদ চলিতে থাকে। গৃহকর্ত্রী সকলকে পান-সুপারি ও মিষ্টি দিয়া আপ্যায়িত করেন। বলিতে কি, তৎ তৎ অঞ্চলে এই 'পানখিল' হইতেই বিবাহোৎসব আরম্ভ হয়।

পানচিনি-ম—বৈবাহিক মঙ্গলাচরণ, পাকাদেখা। কথাটি পল্লীর নিম্নকোটি সমাজেই অধিক শুনা যায়। এক সময়ে কন্যার আশীর্বাদ উপলক্ষে নিমন্ত্রিত সকলের মধ্যে বরপক্ষ-প্রদত্ত পান-সুপারি ও চিনি-বাতাসা বিতরণ করা হইত। বর্তমানে এই প্রথা প্রায় উঠিয়া গিয়াছে।

পান দেওয়া, পান লওয়া—স্থান ও অনুষ্ঠান বিশেষে কথা দুইটির অর্থ দাঁড়ায় 'যথাক্রমে নিমন্ত্রণ করা ও নিমন্ত্রণ গ্রহণ করা (নিমন্ত্রণ দ্র)।

পালটি ঘর—যে বংশের সহিত বৈবাহিক আদান-প্রদান হইতে পারে। যেমন, চাটুয্যে বাঁড়ুয্যে একে অন্যের পালটি ঘর।

পাশাখেলা—বিবাহের পর কোন কোন সমাজে বর-কন্যার মধ্যে বাসরঘরে যে কড়িখেলা হয়, তাহাকে 'পাশাখেলা' বলিতেও শুনা যায়,—যদিও এই খেলায় ছক ঘুঁটি কিছুই থাকে না (কড়িখেলা দ্র)।

প্রণামী—বিবাহের পর শ্বশুরশাশুড়ী প্রমুখ গুরুজনকে প্রণাম কালে বর ও নববধূর প্রদেয় অর্থ বস্ত্র ইঃ।

ফুলছিটানো—কোন কোন সমাজে বরকে সাতবার প্রদক্ষিণ করিবার কালে কন্যাকে প্রত্যেকবার বরের মুখোমুখি করা হয়; সেই সময়ে কনে সুন্দর ভঙ্গিতে হাত দুইখানি কাঁপাইয়া কাঁপাইয়া বরের দিকে ফুল ছুঁড়িয়া দেয় এবং করজোড়ে প্রণাম করে।

ফুলশয্যা—বিবাহের পর নবদম্পতির প্রথম একত্র শয়নরূপ আচার। হিন্দু-সমাজে সাধারণত বিবাহের তৃতীয় রাত্রিতে (বিবাহ-রাত্রির পর একরাত্রি বাদ দিয়া) এই আচার পালিত হইতে দেখা যায়। 'ফুলশয্যা'র রাত্রিকে 'শুভরাত্রি' বলা হয়; অঞ্চলভেদে অনুষ্ঠানটিও 'শুভরাত্রি' নামে অভিহিত হয়। এই উপলক্ষে কন্যাপক্ষ হইতে যে তত্ত্ব আসে, তাহাতে ফুল এবং ফুলের তৈয়ারি শিল্পবস্তুই প্রাধান্য লাভ করে। ফুলের কৃত্রিম অলঙ্কার, ফুলের কৃত্রিম খাবার, ফুলের রকমারি মালা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তদুপরি নানারকম মিষ্টির থালা, বস্ত্রালঙ্কার অনেক কিছুই ফুলশয্যার তত্ত্বে স্থান পায়। বরবধূকে সে রাত্রিতে আবার নূতন করিয়া বসন-ভূষণে মালা-চন্দনে সাজানো হয়।

বউঘরা—বধূবরণ অনুষ্ঠান বিশেষ। পতিসহ নববধূ শ্বশুরগৃহে পদার্পণ করিলে তাহাকে নানাবিধ মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়া বরণ করিয়া ঘরে তোলা হয় ['বউগড়া (বউঘরা) লইল মায় পিড়িতে বসিয়া। ঘরের লক্ষ্মী ঘরে মায় লইল তুলিয়া ॥'—মৈগী]। ময়মনসিংহে বধূবরণকে 'বউঘরা' এবং ফরিদপুরে 'বউপুছা' বলা হয়।

বউভাত—(পাকস্পর্শ দ্র)। বিবাহের পর বর নববধূকে লইয়া স্বগৃহে আসিলে বরপক্ষ হইতে একদিন সমাজের সকলকে ভোজ দিতে হয়। এইদিন নববধূ স্বামীগৃহে রন্ধনশালায় প্রবেশ করিয়া রান্নায় প্রথম হাত দেয় এবং তাহার স্পৃষ্ট অন্নব্যঞ্জনাদি গ্রহণ করিয়া বরের আত্মীয়বান্ধব ও সমাজভুক্ত ব্যক্তিগণ তাহাকে নিজেদের সমাজে তুলিয়া লয়। সেকালে 'হীন' ঘর হইতে কন্যা আনিলে

কিংবা বংশে কোনও খোঁটা থাকিলে সমাজপতিরা বরের নিকট হইতে উপযুক্ত 'বিদায়' না পাইয়া আহার করিতেন না। 'বউভাত' এর ভোজে অনেক পারিবারিক 'কেচ্ছা' উত্থাপিত হইত ; তর্কে বিতর্কে ভাতব্যঞ্জন বাসি হইয়া যাইত। **বউহাজরি, বোহাজরি-মুস**—বউভাত বিশেষ।

বধূবরণ—ইহা একটি আনন্দঘন অনুষ্ঠান। বর যখন নববধূকে লইয়া স্বগৃহে আসিয়া পৌছয়, তখন তাহাদিগকে দেখিতে ও সাদর সম্ভাষণ জানাইতে সমস্ত পাড়া ভাঙ্গিয়া পড়ে। শাঁখ বাজায়, উলু দেয়, গীত গায়, কলকোলাহলে চারিদিক মুখরিত হইয়া উঠে। কিন্তু বধূবরণের বিচিত্র আচার-পদ্ধতি সর্বত্র সকল সমাজে একরূপ নহে। কোথাও নববধূ দুধ ও আলতা গোলা পাথরের থালায়, কাঁখে জলের কলস, মাথায় ধানের কুনকে এবং হাতে একটি মাছ বা মাছের ডোলা লইয়া দাঁড়ায়। তখন বরের মাতা বা মাতৃস্থানীয়া কেহ এয়োস্ত্রীদের সঙ্গে লইয়া বরণ-কুলায় সজ্জিত বিবিধ মঙ্গলদ্রব্য দ্বারা বধূকে বরণ করিয়া ঘরে লইয়া যান। ঘরে উঠিবার মুখে কোথাও নববধূকে 'আওটা হইতে দুধ উথলাইয়া পড়িতেছে' দেখানো হয়। কোথাও তাহাকে রান্নাঘরে লইয়া গিয়া হাঁড়িভরতি এবং হাঁড়িচালা ভাত দেখাইবারও রীতি আছে। নববধূর আগমনে সর্বত্র পূর্ণতা বিরাজ করুক, সংসারে সুখসচ্ছলতা উপচাইয়া পড়ুক, উল্লিখিত স্ত্রী-আচারগুলির ইহাই হয়ত উদ্দেশ্য। কোথাও কোথাও বধূর কানে ও জিবে মধু ছোঁয়ানো হয়, যাহাতে শ্বশুরগৃহের সকলের কথা তাহার কানে এবং তাহার কথা সকলের কানে মধু বর্ষণ করে। কোথাও ননদ বা তৎস্থানীয়ারা কনেবউকে ঘরে উঠিতে বাধা দেয় এবং ভাইয়ের (বরের) নিকট হইতে কিছু অর্থ বা পারিতোষিক পাইয়া তবেই পথ ছাড়ে। অঞ্চল ও সমাজভেদে বধূবরণের এইরূপ নানারকম প্রথা প্রচলিত আছে।

বর—বিবাহের পাত্র। বিবাহার্থী। সদ্য বিবাহিত। পতি। প্রার্থিত বস্তু, অভীষ্ট, boon (বরলাভ)। শ্রেষ্ঠ (কবিবর)।

বরকর্তা—বরযাত্রীদের সঙ্গে বরপক্ষের প্রধান হইয়া যিনি কন্যাগৃহে যান। বরপক্ষের প্রধান ব্যক্তি।

বরণডালা—যে পাত্রে (প্রায়ই কুলা) বরণ করিবার বিবিধ মঙ্গল-দ্রব্য —গঙ্গামৃত্তিকা, গন্ধ, শিলা (নুড়ি), ধান্য. দূর্বা, পুষ্প, ফল, দধি, ঘৃত, স্বস্তিক (পিটুলি নির্মিত), শঙ্খ, সিন্দূর, কজ্জল, গোরোচনা, কাঞ্চন, রৌপ্য, তাম্র, আমার, শ্বেত সর্ষপ, দর্পণ, হরিদ্রাসূত্র, অলক্ত, চামর, দীপ থাকে।

বরবরণ—বরবরণ দুই মতে হয়ঃ শাস্ত্রমতে এবং স্ত্রী-আচারমতে। বিভিন্ন সমাজে স্ত্রী-আচারে বিভিন্নতা আছে। পূর্ববঙ্গের কোথাও কোথাও বর বিবাহ বাড়িতে আসা মাত্রই পুরস্ত্রীরা বরণডালায় সজ্জিত যাবতীয় মাঙ্গলিক দ্রব্য দ্বারা তাহাকে বরণ করেন, তাহার মাথার উপর দিয়া ডিম ছুঁড়িয়া মারেন ইত্যাদি। পশ্চিমবঙ্গের বহু স্থানে মেয়েলী প্রথায় বরবরণ সাধারণত সম্প্রদানের পূর্ব মুহূর্তে ছাঁদনাতলায় সম্পন্ন হয়। কন্যাদাতা কর্তৃক বর শাস্ত্রীয় বিধিমতে বৃত হইবার পর, এয়োরা মেয়েলী আচার মতে আবার তাহাকে বরণ করেন। পাঁচজন কি সাতজন এয়োস্ত্রী বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিত হইয়া শঙ্খধ্বনি করিতে করিতে বরকে সাতবার প্রদক্ষিণ করেন এবং বরণডালার দ্রব্যগুলি হাতের বিশেষ ভঙ্গিতে একে একে তাহার শরীরে ছোঁয়াইয়া, 'ধুতুরা পিদ্দিম' জ্বালাইয়া, নানারকমে বরণ-কার্য শেষ করেন। বরণ করিবার সময় কিছুটা তুকতাকও করা হয়। যেমন, সম্ভাব্য অমঙ্গল দূরে ঠেকাইয়া রাখিবার উদ্দেশ্যে বরের অঙ্গে বুলানো পান, ডিম, গুড় চাউলি ইঃ তাহার মাথার উপর দিয়া পিছন দিকে ছুঁড়িয়া মারা হয়।

বরভোজন—শ্বশুরবাড়িতে বরের প্রথম অন্নগ্রহণরূপ অনুষ্ঠান। পূর্ববঙ্গের বহু সমাজে বর বিবাহের রাত্রিতে শ্বশুরবাড়ির অন্ন গ্রহণ করে না, নিজের বাড়ি হইতে আনীত ডালচাল রন্ধন করাইয়া খায়, কিংবা শ্বশুরের কোনও আত্মীয় বা প্রতিবেশীর বাড়িতে ভোজন করে; কোথাও বা কন্যাগৃহে সে রাত্রিতে বরভোজনের একটা অভিনয়মাত্র করা হয়ঃ—বরের সম্মুখে অন্ন ব্যঞ্জনের একটি থালা রাখা হয়, বর তাহা হইতে পঞ্চ গ্রাস অন্ন (ভাত) শুঁকিয়া ফেলিয়া দেয়, শাশুড়ী আঁচল পাতিয়া সেই অন্ন গ্রহণ করেন। এজন্য বরপক্ষ হইতে তাঁহাকে কাপড় দেওয়া হয়। তদঞ্চলে প্রকৃত বরভোজন হয় পরদিন। আবার কোন কোন সমাজে বরভোজনের কোন বাঁধাধরা রীতি নাই, বিবাহের রাত্রিতেই বরকে বরযাত্রীদের সঙ্গে একত্র বসিয়া আহার করিতে দেখা যায়।

বরযাত্র, বরযাত্রী—বিবাহের সময় বরের সঙ্গে যাহারা কন্যার গৃহে যায়। তৎপর্যায়ঃ—বৈয়াতি, বরাত, ম্যামান-মুস।

বরযাত্রা—কন্যাপক্ষের আহ্বানে বিবাহার্থী বরের সাড়ম্বর কন্যা-গৃহে গমন। এই ব্যাপারে স্থান ও সমাজভেদে বিভিন্ন রীতি অনুসরণ করা হয়। বর্তমানে বাঙালী বরের মস্তকে শুধু মুকুট (শোলার টোপর), ললাটে চন্দনের ফোঁটা,

কণ্ঠে ফুলের মালা, মণিবন্ধে মঙ্গলসূত্র, হস্তে জাঁতি বা মাজ-দর্পণ দেখা যায়। আসামের কোথাও কোথাও বরের মস্তকে উষ্ণীষ পরাইবার এবং ললাটে বটের আটা ও সোহাগার ফোঁটা দিবারও প্রথা আছে।

বাদগোস্তী-মুস—বিবাহের পর জামাতার দ্বিতীয়বার শ্বশুরবাড়ি গিয়া কয়েকদিন অবস্থান।

বাসর, বাসরঘর—যে ঘরে বর-কন্যা বিবাহ-রাত্রিতে শয়ন করে, অর্থাৎ পুরস্ত্রীদের সহিত আমোদ আহ্লাদে জাগিয়া বিবাহরাত্রি অতিবাহিত করে। ....বাসর জাগা—বাসরে বর-কন্যাকে লইয়া পুরনারীদের আমোদ আহ্লাদে রাত জাগার সুপ্রচলিত রীতি ....বাসর জাগানি—বাসরে যাহারা বর-কন্যার সহিত রাত জাগে তাহাদিগকে বরপক্ষ কর্তৃক প্রদেয় অর্থ।

বাসিবিবাহ—সাধারণত বিবাহের পরদিন পূর্বাহ্ণে কন্যার বাড়িতে বাসিবিবাহ অনুষ্ঠান হয়। ইহা প্রধানত স্ত্রী-আচার। সর্বত্র সকল সমাজে এই প্রথার প্রচলন নাই। কোথাও বা বিবাহের রাত্রিতেই কুশণ্ডিকার পর এই আচার পালিত হয় এবং তখনই বধূর কপালে সিঁদুর পরাইয়া দেওয়া হয়। পরদিনের বাসিবিবাহে অনেক সমাজে বর-বধূকে 'সোহাগ জলে' একত্রে কলাতলে নাওয়ানো হয়; গাঁটছড়া বাঁধা অবস্থায় তাহারা পাশাপাশি বসিয়া সূর্যার্ঘ্য প্রদান করে এবং পুরোহিতকে অগ্রগামী করিয়া সাতবার ছাঁদনাতলা প্রদক্ষিণ করে। প্রদক্ষিণ করিবার সময় পুরোহিত প্রত্যেকবার কলাতলে খনিত একটি পুকুরে (গর্তে) গাড়ু হইতে কিছুটা জল ঢালিয়া দেন। এইরূপে গর্ত ভরিয়া উঠে এবং পুরোহিত আশীর্বাদ করিয়া বিদায় গ্রহণ করেন। অতঃপর বর-কন্যার মধ্যে সেই পুকুরে আংটি লুকানো ও খুঁজিয়া বাহির করা ইত্যাদি নানা রকম খেলার অভিনয় হয় এবং বর বধূর কপালে সিঁদুর পরাইয়া দেয়। স্থান এবং সমাজভেদে আচার-নিয়মের অবশ্যই পার্থক্য আছে।

বিবাহ-বাসর—বিবাহ-স্থান, ছাঁদনাতলা, যেখানে সম্প্রদানাদি কার্য সম্পন্ন হয়।

বিয়া/বিয়ে, বিভা, বেহা, বে [< বিবাহ]—বিবাহের বিভিন্ন লৌকিক রূপ।

বৃদ্ধির বারা—অভ্যুদয় বা সমৃদ্ধির জন্য বিবাহাদি শুভকার্যের পূর্বে পিতৃপুরুষের উদ্দেশে যে শ্রাদ্ধকৃত্য করা হয়, তাহারই একনাম **বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ**। গ্রামে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধের চাউল বাড়ির এবং পাড়ার এয়োস্ত্রীরা ঢেঁকিতে বা উদূখলে ভানিয়া তৈয়ার করে। এই ধান ভানাকে বলা হয় 'বৃদ্ধির বারা' ('আন এয়োগণ যত ছানার সন্দেশ তত। তৈল সিন্দুর দিয়ে ধান্য ভানে রানী।'-ম)।

ভাত-কাপড়-পূব—বিবাহের পর (সাধারণত বিবাহের তৃতীয় দিবসে দ্বিপ্রহরে) স্বামী কর্তৃক নববধূকে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রথম অন্ন-বস্ত্র প্রদান এবং তাহার সমস্ত জীবনের ভারগ্রহণ। ইহা একটি মনোজ্ঞ স্ত্রী-আচার। সুভগা কোনও এয়ো এই 'ভাতকাপড়ে'র রান্না রাঁধেন। উপকরণের (menu) মধ্যে মাছ, মাংস, ডিম, দধি, দুগ্ধ, পিষ্টক, পরমান্ন কিছুই বাদ যায় না। শুভক্ষণে নববধূ শঙ্খধ্বনি ও উলুধ্বনির মধ্যে একটি পিঁড়িতে বসে এবং থালায় ও বাটিতে সব কিছু সাজাইয়া তাহার সমুখে আনিয়া রাখা হয়। স্বামী আসিয়া অন্নের থালাটি এবং শঙ্খ সিন্দূর ও শাড়িখানি বধূর হাতে তুলিয়া দেয়। স্বামীদত্ত অন্ন-ব্যঞ্জনাদি বধূ উপস্থিত ছেলেমেয়েদিগকে কিছু কিছু দিয়া পরে নিজে গ্রহণ করে।

মঙ্গলসূত্র—(অধিবাস দ্র)। **মঙ্গলাচরণ**—পাকাদেখা, পাকাদেখার দিন আচরিত অনুষ্ঠান (পাকাদেখা দ্র)।

মাজদর্পণ—(ধুতুরা কাটাইল দ্র)। **মাড়োয়ারতলা**—ছাঁদনাতলা, বিবাহ-মণ্ডপ। মাড়ো—মণ্ডপ।

মালাবদল—শুভদৃষ্টির সময় বর-কন্যার পরস্পরের মালা বদলের সুপ্রচলিত প্রথা। ছাঁদনাতলায় সাতবার প্রদক্ষিণ করিবার পর কন্যা নিজের গলার মালা বরকে এবং বর নিজের গলার মালা কন্যাকে পরাইয়া দেয়। এইরূপ ক্রমান্বয়ে তিনবার করা হয়। ইহাই বৈবাহিক মালাবদল এবং লোকমতে বিবাহ-সিদ্ধির অন্যতম প্রধান অঙ্গ।

মিতবর, নিতবর, কোলবর—বিবাহ করিতে যাত্রা করিবার-কালে অনেক সমাজে একটি সুবেশ বালক বরের পার্শ্বে থাকে এবং বিবাহ-সভায় গিয়াও তাহার পার্শ্বে বসে। ইংরেজীতে এইরূপ সহচরকে best man বলা হয়। মেয়ে মজলিসে কন্যার পার্শ্বেও মিতকনে / নিতকনে (bridesmaid) নামে একটি সুবেশা বালিকাকে সর্বদা থাকিতে দেখা যায়।

মুকুট, মটুক—শিরোভূষণ। টোপর, বিবাহকালে বরের পরিবার শোলা ও জরির মুকুট (সিঁথি মউর দ্র)।

মধুপর্ক—কাংস্যপাত্রে একত্র মিশ্রিত ঘৃত, মধু, দধি, জল ও শর্করা। প্রথমোক্ত তিনটি বস্তুর মিশ্রণও মধুপর্ক বলিয়া গণ্য হয়।

মুখচন্দ্রিকা—বিবাহের শুভলগ্নে বর-কন্যার পরস্পর মুখাবলোকন বা দৃষ্টি বিনিময়। তৎপর্যায়ঃ—শুভদৃষ্টি, ছামনি, জুলুয়া-মুস। অঞ্চল ও সমাজভেদে

এই ব্যাপারে বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। কোথাও ছাঁদনাতলায় দণ্ডায়মান বা উপবিষ্ট বরকে দক্ষিণাবর্তে কন্যার সাতবার প্রদক্ষিণের পর উভয়কে মুখোমুখি করিয়া তাহাদের উপর একটি কাপড় ঢাকা দেওয়া হয়। সেই অবসরে জোর শঙ্খধ্বনি ও উলুধ্বনির মধ্যে বর-কন্যার শুভ দৃষ্টি-বিনিময় ও মালাবদল হয়। কোথাও প্রদক্ষিণকালে বরের মুখ বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া রাখা হয়, কন্যাও দুই হাতে দুইটি পান লইয়া মুখ ঢাকিয়া রাখে। অবশ্য, যথাসময়ে উভয়ের আচ্ছাদন সরাইয়া নেওয়া হয়। আবার কোনও সমাজে প্রত্যেকবার প্রদক্ষিণের পর দৃষ্টি-বিনিময় হয় ('ফুলছিটান' দ্র)। কোনও সমাজে কন্যাকে যখন পিঁড়িতে বসাইয়া ঘুরানো হয়, তখন বরকেও পিঁড়িতে করিয়া তুলিয়া ধরা হয়। সাধারণ লোক এই প্রথাকে বলে, 'পাটে পাটে বিবাহ'। আবার কোথাও বর ছাঁদনাতলায় একটি বাঁশের খুঁটি ধরিয়া অথবা খুঁটিতে বাঁধা কাপড়ের একপ্রান্তে পা দিয়া দাঁড়াইয়া থাকে এবং সেই অবস্থায় কন্যাকে পিঁড়িতে তুলিয়া বরকে প্রদক্ষিণ করানো হয়। ইহাকে বলে 'শালে পাটে বিবাহ'। একসময়ে বিশেষ একশ্রেণীর পরিচারকেরাই কন্যাকে পাটে তুলিয়া ঘুরাইত, বর্তমানে কন্যার আত্মীয়স্বজন বা ভ্রাতারাই এই কাজ করিয়া থাকে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উচ্চকোটি সমাজে শিক্ষিতা যৌবনপ্রাপ্তা কন্যা হাঁটিয়াই বরকে প্রদক্ষিণ করে, কাহারো সাহায্য তাহার আবশ্যক হয় না।

মোনামুনি ভাসানো-পব—স্ত্রী-আচার বিশেষ। বিবাহের দিন সন্ধ্যায় কন্যাকে নাওয়াইয়া এয়োরা একটি জলের গামলায় দুইটি 'মোনামুনি' বা বর-কন্যার মুকুটের দুই টুকরা শোলা ছাড়িয়া দেয়; ঐগুলি ভাসিতে ভাসিতে যদি মিলিত হয়, (অনেক সময় মিলাইয়া দেওয়া হয়) তবে ধরিয়া লওয়া হয় যে, বর-বধূর দাম্পত্য-জীবন সুখের হইবে।

এই আচার উত্তরবঙ্গের '**প্রদীপভাসানো**'র মতই। তদঞ্চলে বর ও কন্যার নামে সন্ধ্যায় নদী, পুকুর বা গামলা ভরতি জলে মোচার খোলায় করিয়া দুইটি প্রদীপ ভাসাইয়া দেওয়া হয়। উহারা ভাসিতে ভাসিতে একত্র ঠেকিলে শুভ, পৃথক থাকিলে অশুভ মনে করা হয়; কোনওটি ডুবিয়া গেলে আশঙ্কার সীমা থাকে না।

মোল্লা-মুস—ধর্মযাজক শ্রেণীর মুসলমান (বিবাহে ইঁহারা 'শরা' পড়ান)।

রামডাল্লি-কো,ময়ং—বরণডালা।

রায়বার—ঘটক।····**রায়বারি**—ঘটকালি (ঘটক দ্র)।

রীতরস্সুন-মুস—বিবাহাদিতে যেসব প্রথা বহুদিন পালিত হইয়া আসিতেছে।

লগ্নপত্র—বিবাহ প্রস্তাবকে পাকা করিবার শেষ ধাপ বিঃ (পাকাদেখা দ্র)।

লগ্নাচার্য-পূব—গ্রহাচার্য, গ্রহবিপ্র, দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণ। গ্রহার্চনা, কোষ্ঠী তৈয়ারি, বরকন্যার যোটক বিচার, বিবাহের লগ্ন নিরূপণ, শান্তিস্বস্ত্যয়ন ইঃ ইঁহাদের প্রধান কাজ।

লৌকিকতা—লৌকিত্যা-মু. রা, লৌকতা-ন. চ, লোকুতা-ফ, বিবাহাদি শুভানুষ্ঠানে নিমন্ত্রিত আত্মীয়বান্ধব কর্তৃক উপহারাদি প্রদান। সামাজিক শিষ্টাচার বিঃ।

শরাই / শরাপড়ানো-মুস—মুসলমান শরিয়ত অনুযায়ী বিবাহের মন্ত্র পাঠ করানো।

শাদি, সাদি-মুস—বিবাহ।

শা'নজর-মুস—বিবাহের পর বর কর্তৃক কন্যার প্রথম মুখদর্শন।

শালে পাটে বিবাহ—মুখচন্দ্রিকা দ্র।

শিয়ারা / শেহেরা-মুস—শামলা বিঃ। বর বা নওশাহের বিবাহকালীন মস্তকাবরণ বিঃ।

শুভদৃষ্টি—বিবাহের শুভলগ্নে বর-কন্যার দৃষ্টিবিনিময়, পরস্পরের মুখাবলোকন। (মুখচন্দ্রিকা দ্র)।

শুভরাত্রি—শুভরাত / শুভরাইত, যে রাত্রিতে বর-বধূ প্রথম একত্র শয়ন করে (ফুলশয্যা দ্র)।

শুভাশুভ (রাজবংশীদের মধ্যে প্রচলিত)-উব—বিবাহের প্রাথমিক কথাবার্তা।

শেজতুলনি—বাসরঘরে বর-কন্যা যে শয্যায় শয়ন করে, সেই শয্যা তোলার জন্য কন্যার ছোট বোন বা বান্ধবীরা বরপক্ষের নিকট হইতে যে-অর্থ আদায় করে।....শেজতুলনী—যাহারা বরকন্যার শয্যা তোলে।

শ্যামাপূজা—পূর্ববঙ্গে বহু সমাজেই বিবাহের পূর্বদিন শ্যামাপূজা অনুষ্ঠিত হয় এবং নিমন্ত্রণ-লিপিতে প্রথমেই শ্রীশ্রীশ্যামাপূজার এবং পরে বিবাহের উল্লেখ করিয়া উভয় অনুষ্ঠানে যথাসময়ে যোগদানের জন্য আহ্বান করা হয়। উত্তরবঙ্গে রাজবংশী এবং রাঢ় অঞ্চলে নবশাখ সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহের পূর্বে বিষহরী তথা মনসাদেবীর পূজার প্রথা আছে।

সাত পাকে বাঁধা—বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ। বিবাহকালে (সাধারণত শুভদৃষ্টি এবং মালাবদলের পূর্ব মুহূর্তে) ছাঁদনাতলায় বরকে নিজের দক্ষিণে রাখিয়া কন্যাকে তাহার চারদিকে সাতপাক দিতে হয়। আবার 'বাসিবিবাহে' বরও

কন্যার সহিত ছাঁদনাতলা সাতবার প্রদক্ষিণ করে। এই সাতপাক ছাড়া নাকি বাঙালী হিন্দুর বিবাহ সিদ্ধ হয় না।....সাতপাকের সম্পর্ক—স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক।

সিঁথি মউড় [মউড় <মুকুট]—বিবাহকালে পরিবার কন্যার শোলার মুকুট বিঃ, কপালি-পুব।

সিঁদুরদান—বিবাহের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্ত্রী-আচার। হোমাদির শেষেই বহু অঞ্চলে বর কর্তৃক বধূর সীমন্তে সিন্দূর পরানো হয়। কোথাও কোথাও পরদিন বাসিবিবাহের সময় এই প্রথা পালিত হইতে দেখা যায়। আবার কোথাও বা বিবাহের তৃতীয় দিন মধ্যাহ্নে বধূকে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রথম অন্নবস্ত্র (ভাত-কাপড় দ্র) দিবার কালে সিন্দুরও পরানো হয়। বহুস্থানেই বর তাহার আংটির সাহায্যে বধূর সীমন্তে সিঁদুর দিয়া থাকে। পশ্চিমবঙ্গের কোথাও কোথাও কুন্‌কের পিঠে সিঁদুর মাখাইয়া বর উহা এক হাতে বধূর কপাল হইতে মাথার দিকে টানিয়া নেয় এবং অন্য হাতে তাহার ঘোমটা পরাইয়া দেয়।

সোহাগজল—পাঁচজন কি সাতজন সুভগা স্ত্রীর আঁচল ভিজানো জল। এই জল দ্বারা বাসিবিবাহের সময় বর-কন্যাকে একত্রে নাওয়ানো হয়।

সোহাগ বাতি—বাসর ঘরের প্রদীপ। ইহা সারারাত্রি জ্বালা রাখিতে হয়।

সোহাগ মাগা—পূর্ববঙ্গের বহু সমাজে বিবাহের দিন অপরাহ্নে কন্যার বাড়িতে 'সোহাগ মাগা' নামক এক হৃদয়গ্রাহী স্ত্রী-আচার অনুষ্ঠিত হয়। ময়মনসিংহে কন্যার মাতা বা মাতৃ-স্থানীয়া কেহ জা কিংবা ননদ এবং অপর কয়েকজন এয়োকে সঙ্গে লইয়া প্রতিবেশীদের দ্বারে দ্বারে তাহাদের সোহাগ অর্থাৎ শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ প্রার্থনা করিতে যান। তাঁহার মাথায় থাকে একটি কুলা এবং উহার উপর থাকে বিভিন্ন আধারে অল্প অল্প করিয়া ডাল, চাল, মশলা, তেল, লবণ ইত্যাদি। জা বা ননদ কাঁখে একটি জলের কলসীও বহন করে এবং তাহার আঁচলের সহিত কুলা-বহন-কারিণীর আঁচল বাঁধা থাকে। তাঁহারা বাড়ি বাড়ি উপস্থিত হইয়া উলুধ্বনির মধ্যে কুলাটি গৃহদ্বারে নামাইয়া রাখেন এবং সেখান হইতে তিন চিমটি মাটি তুলিয়া লন। গৃহকর্ত্রী তখন কুলায় যে আধারে যে জিনিস থাকে, সেই আধারে সেই জিনিস অল্প অল্প করিয়া দেন, জলের কলসীতে একটু জল ঢালেন এবং শুভেচ্ছা জানাইয়া সকলকে হাসিমুখে বিদায় করেন (জলসহা দ্র)।

সোহাগী মাপী—বিবাহের দিন কন্যার স্নানের পর তাহার সমুখে এক হাঁড়ি জল রাখা হয়। এই জল পাঁচ এয়োতে মিলিয়া পূর্বেই ভরিয়া আনে। কন্যা

একটি খুরি দিয়া মধ্যে মধ্যে জল আওটায়—একবার ভরিয়া তোলে, একবার ঢালে, আর মনে মনে বলে,—আমি যেন শ্বশুর শাশুড়ী স্বামীভাশুর সকলের সোহাগ পাই, সকলের আদরিণী হই।

হলুদকোটা—বিবাহের একটি মঙ্গলাচার বিঃ। বিবাহের কয়েকদিন পূর্বে পাঁচসাত এয়ো মিলিয়া ঢেঁকিতে বা উখুলে আনুষ্ঠানিকভাবে হলুদ কুটিয়া রাখে এবং যথাসময়ে বরকন্যাকে তাহা মাখাইয়া কলাতলে নাওয়ায়।

হস্তবন্ধন, হস্তলেপ—এই দুইটি বৈবাহিক ক্রিয়া অনেকটা শাস্ত্রবিধি অনুসারে সম্পন্ন হয়। সম্প্রদানের সময় কন্যা আপনার ডান হাতখানি বরের ডান হাতের উপর রাখিলে পুরোহিত মন্ত্র পড়িতে পড়িতে কুশ ও মাল্য দ্বারা সেই হাত দুইটি বাঁধিয়া দেন। কখনো বা কন্যাদাতা নিজে কিংবা কোনও পতিপুত্রবতী নারী এই কাজ করিয়া থাকেন। পূর্বে এই সময়ে বিবিধ ভেষজ দ্রব্যে বর কন্যার হস্ত লেপন করা হইত, বর্তমানে শুধু দধি ঢালিয়াই নিয়ম রক্ষা করা হয়। সম্প্রদানের পর হস্তবন্ধন খুলিয়া বরের উত্তরীয়ের সহিত কন্যার বস্ত্রাঞ্চল বাঁধিয়া দেওয়া হয় (গাঁটছড়া দ্র)।

হাই আমলা বাটা—দুইজন সুভগা নারী উড়নির নীচে বসিয়া একত্রে নোড়া ধরিয়া হাই-আমলা (আমলকী ও মেথী ?) বাটে এবং তাহা পানে লেপিয়া বরণ-কুলায় রাখিয়া দেয়। বর-বরণের সময় এই পান বরের বুকে ও পিঠে ছোঁয়ানো হয়।

হাজরি-মুস—কন্যাপক্ষ হইতে বরপক্ষকে যে ভোজ দেওয়া হয়।

নবম অধ্যায়

লোক-উৎসব ও সংস্কার

অক্ষয় কুমারী—অক্ষয় তৃতীয়ার দিনে সধবাদের কুমারী-পরিচর্যারূপ অনুষ্ঠান বিশেষ।

অক্ষয় সিঁদুর—অক্ষয় তৃতীয়ার দিনে এক সধবার অপর সধবাকে সিঁদুর, আলতা, নোয়া, কাপড় ইত্যাদি দিয়া এবং ভোজন করাইয়া সন্তুষ্ট করিবার ব্রত বিশেষ।

অরন্ধন, আরন্দ—বিশেষ বিশেষ দিনে রন্ধনবর্জনের প্রথা। পশ্চিমবঙ্গের বহু পরিবারে ভাদ্রের সংক্রান্তিতে এবং শীতলষষ্ঠীর দিনে (শ্রীপঞ্চমীর পরদিন) রান্না করা হয় না; দশহরা এবং শ্রাবণ মাসের শেষ দিনেও এই প্রথা স্থানে স্থানে পালিত হইতে দেখা যায়। অরন্ধন উপলক্ষে পূর্বরাত্রে রান্না করা ভাজাব্যঞ্জনাদিসহ বাসিভাত কি পান্তাভাত খাওয়া হয়। শ্রাবণ সংক্রান্তির অরন্ধন অঞ্চলভেদে নানা নামে অভিহিত হয়। যেমন, হাওড়ায় 'ঢেলাফেলা', বাঁকুড়ায় 'খইধারা', বর্ধমানে 'খইদই', নদীয়ায় 'পাতালফোঁড়'। ভাদ্র-সংক্রান্তির অরন্ধনের অন্য নাম 'রান্নাপূজা', হুগলীতে 'বুড়ি আরন্দ'। এদিন গৃহিণীরা উনানের চারদিকে ও ভিতরে আলপনা আঁকিয়া, সিজমনসার ডাল পুঁতিয়া, রন্ধিত দ্রব্যাদি সাজাইয়া দিয়া মনসা পূজা করেন। এই উপলক্ষে পাড়াগাঁয়ে একজন অপরজনের বাড়ি নিমন্ত্রণ খায়। শীতলষষ্ঠীর অরন্ধন 'গোটাসিদ্ধ খাওয়া'। রাঢ়ে এই দুইদিনের অনুষ্ঠানকে বলে 'পান্ত পালা'। বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় রাজনৈতিক কারণে (বঙ্গভঙ্গ) আশ্বিনের সংক্রান্তিও অরন্ধন এবং রাখীবন্ধন দিবসরূপে ঘোষিত হয়।

অলক্ষ্মী বিদায়—দীপালীর রাত্রিতে (সন্ধ্যায়) বাংলার বহু স্থানে, বিশেষ করিয়া পশ্চিমবঙ্গে, যশোহর ও খুলনা জেলায় গোবর দিয়া অলক্ষ্মীর এবং পিটুলি দিয়া লক্ষ্মী, কুবের ও নারায়ণের মূর্তি গড়া হয়। অলক্ষ্মীর মূর্তিটি ঘরের বাহিরে কলার খোলে বসাইয়া প্রথমে তাঁহার পূজা ও ধ্যান করা হয়। ধ্যানে অলক্ষ্মী কৃষ্ণবর্ণা, ক্রোধী, এলোকেশী; তাঁহার এক হাতে কুলা, অন্য হাতে ঝাঁটা। পূজান্তে ছেলেমেয়েরা কুলা পিটাইতে পিটাইতে তাঁহার মূর্তিটি তেমাথায় লইয়া যায় এবং ফেলিয়া দিয়া বলে, 'লক্ষ্মী ঘরে আয়, অলক্ষ্মী

দূর হ।' এইরূপে 'অলক্ষ্মী-বিদায়'-এর পর গৃহিণীরা ঘরে আসিয়া আবার যথারীতি লক্ষ্মীপূজা করেন।

রাঢ়ে অলক্ষ্মী-বিতাড়ন সম্পর্কে ডঃ অমলেন্দু মিত্র তাঁহার 'রাঢ়ের সংস্কৃতি ও ধর্মঠাকুর' গ্রন্থে লিখিয়াছেন, '....ভাঁড়ার ঝাঁট দিয়ে জঞ্জাল জড়ো করা হয়। একজন ভাঙ্গা টোকার মধ্যে সেই জঞ্জালের কিয়দংশ নিয়ে একটি কাঠি দিয়ে টোকাটিকে পিটতে পিটতে নিকটস্থ ধানমাঠের দিকে যায়। মুখে বলতে থাকে, "অলক্ষ্মী যাও ছারেখারে...."। ধানমাঠে গিয়ে সেই জঞ্জালগুলি নিক্ষেপ করে সবুজ ধান অথবা শিষ টোকায় নিয়ে আবার পিটাতে পিটাতে ফিরে আসে ভাঁড়ার ঘরে। তখন সে অবিরত জপতে থাকে, "লক্ষ্মী এসো সোনার ভারে।" এইভাবে সাতবার আনাগোনার পর সংবৎসরের ব্যবহৃত চালুনী, ঝুড়ি, টোকা, কুলো, ভাঙ্গা দ্রব্যাদি জড়ো করে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় প্যাকাটির সাহায্যে। প্রতিটি লোককে অগ্নিসংকারে অংশ গ্রহণ করতে হয়।' দেওয়ালীর রাত্রিতে (মতান্তরে প্রত্যূষে) অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া অলক্ষ্মী-বিদায় এবং লক্ষ্মী-আবাহনের পালা পূর্ববঙ্গেও কোথাও কোথাও (ঢাকা, ময়মনসিংহ) অভিনীত হয়। গৃহিণীরা পাটকাটিতে আগুন ধরাইয়া এ-ঘর সে-ঘর যান এবং বলেন,—

'জোঁক পোক কি কর
ঘর তনে / থুনে (ঘর হইতে) নিকাল,
লক্ষ্মী ঘরে আয়, অলক্ষ্মী দূর হ'।

এই সকল লৌকিক অনুষ্ঠানের ভিতর একটি পুরাতন বৎসরের বিদায় এবং আর একটি নূতন বৎসরের সূচনারও আভাস পাওয়া যায়। (ভুলা পোড়ান দ্র)।

অশৌচতোলা বা নাওয়ান—পূর্ব ময়মনসিংহের কোথাও কোথাও গাই প্রসব করিলে পর পঞ্চম, সপ্তম, কি নবম দিনে প্রথম দুধ দোহন করা হয়। প্রথমে গাই বাছুরকে স্নান করাইয়া বাছুরটিকে মাথা হইতে লেজের আগা পর্যন্ত দুধ দিয়া তিনবার মুছিয়া দেওয়া হয়। এইরূপ আরও কয়েকটি আচার পালন করিয়া উপস্থিত ছেলেমেয়েদের একটু একটু দুধ খাইতে দেওয়া হয়। এই অনুষ্ঠানের স্থানীয় নাম, 'অশুজ তোলা' বা 'নাওয়ানি।'

আওনি বাওনি—পশ্চিম বঙ্গের গৃহিণীরা পৌষ-সংক্রান্তির পূর্বদিন সযত্নে এক মুঠা ধানগাছ পূজা করিয়া এক একটি শীষ বাক্স, সিন্দুক, খাট-চৌকি,

গোলা, গোশালা ইত্যাদি সংসারের যাবতীয় জিনিসপত্রের সঙ্গে বাঁধিয়া দেন এবং বলেন,—

'আওনি বাওনি চাওনি।
তিন দিন পিঠা খাওনি॥
তিন দিন না কোথা যেও।
ঘরে বসে পিঠা খেও॥'

অনেকে এই ছড়াটির এইরূপ অর্থ করেন : 'আওনি'—লক্ষ্মীর আগমন, 'বাওনি' —লক্ষ্মীর বন্ধন বা স্থিতি, আর 'চাওনি'—তাঁহার নিকট প্রার্থনা। উত্তরবঙ্গেও প্রায় অনুরূপ 'আওরি বাওরি' প্রথা প্রচলিত আছে। রাঢ়ের কোথাও কোথাও প্রায় তুল্য অনুষ্ঠানকে 'চাউরি বাউরি' এবং বর্ধমানে 'বউনি বাঁধা' বলা হয়।

আইট ভাঙা-পা—মুখে ভাত।

আকাশবাতি—আশ্বিনের সংক্রান্তি হইতে আরম্ভ করিয়া কার্তিকের সংক্রান্তি পর্যন্ত প্রতি সন্ধ্যায় বাঁশের বা কাঠের লম্বা খুঁটির আগায় যে প্রদীপ দেওয়া হয়।

আঁকিকা [আ°]—ইসলাম ধর্মশাস্ত্রানুসারে সন্তানজন্মের ষষ্ঠদিনে মস্তকমুণ্ডন, নামকরণ ইঃ।

আখ্যান দিন / আখ্যেন- / আক্ষেণ—রাঢ় অঞ্চলে তপশীল সম্প্রদায় ১লা মাঘকে আখ্যান দিন বলে। এদিনটি তাহাদের উৎসবের দিন। এদিন তাহারা নানা লৌকিক দেবতা এবং অপদেবতার পূজা করে, ছাগ মেষ শূকর ইঃ বলি দেয়, ভোজ হয়, ঢাক ঢোল মাদল বাজায়, গান গায়, সর্বক্ষণ আনন্দে কাটায়। এই প্রসঙ্গে মেদিনীপুরের মাহাতো সম্প্রদায়ের 'আইখান যাত্রা' স্মরণীয় (চাষ-আবাদ দ্র)। যশোহরে মাসের প্রথম দিনকে 'অখ্যান দিন' (আখ্যানের রূপভেদ ?) বলে।

আক্ষেণ—ত্রিপুরা ঢাকা ময়মনসিংহ প্রভৃতি অঞ্চলে কিন্তু গ্রামের নারীদের মুখে অশুভক্ষণ অর্থে প্রায়ই 'আক্ষেণ', কখনো বা 'আক্ষেণ কুক্ষেণ' কথাটি শুনা যায়।

আক্ষেণ—১লা মাঘ বাউরীদের দ্বারা পূজিত বীরভূমের (রাজনগর) লৌকিক দেবতা বিঃ।

আটকড়াই, আটকলাই, আটকৌড়ে—সন্তান জন্মের আটদিনের অনুষ্ঠান বিঃ। সেদিন পড়শী ছেলের দল কুলা পিটাইয়া ছড়া গাহিয়া শিশুর মঙ্গল কামনা করে এবং বিনিময়ে মুগ, ছোলা, কলাই, খেসারি ও মটর ভাজা এবং মুড়ি চিড়া খই খাইতে পায়। অনেক সময় তৎসঙ্গে মিষ্টিও দেওয়া হয়।

আদর সিংহাসন—শ্বশুর-গৃহে আদরিণী হইবার উদ্দেশ্যে নববধূর অনুষ্ঠের ব্রত বিশেষ। এই ব্রতে মহাবিষুব সংক্রান্তিতে একজন সুভগা নারীকে ও একজন ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করিয়া বসনভূষণে ও আহারে পরিতুষ্ট করিতে হয়। চার বৎসর এইরূপ করিবার পর বৈশাখের সংক্রান্তিতে আরব্ধ ব্রত উদ্‌যাপিত হয়।

আদা-হলুদ—ইহাও এয়ো-পরিচর্যারূপ অনুষ্ঠান বিশেষ। চৈত্র সংক্রান্তি হইতে আরম্ভ করিয়া বৈশাখ মাস ভোর একজন সুভগা নারীকে প্রতিদিন পাঁচ টুকরা আদা, পাঁচ টুকরা হলুদ, এক মুঠা ধনে, কিছু মিষ্টি ও একটি পয়সা দিতে হয়। চার বৎসর নিয়মিত এইরূপ করা হয়। ইহার উদ্দেশ্য শঙ্খে সিন্দূরে বাঁচিয়া থাকা।

আমলে পাওয়া—ভূতাবিষ্ট হওয়া; কাহাকেও (প্রায়ই স্ত্রীলোক) সহসা আবোল-তাবোল বকিতে, কখনো হাসিতে, কখনো বা বিকট ভঙ্গি করিতে দেখিলে বলা হয়, উহাকে আমলে পাইয়াছে, অর্থাৎ উহার শরীরে অপ-দেবতার অধিষ্ঠান হইয়াছে। তখন ঝাড়ফুঁকের জন্য রোজা ডাকা হয়।

ইঁদপরব—ইন্দ্রের পূজোৎসব। পুরুলিয়ায় ইহা 'ছাতাপরব্' নামেও অভিহিত হয়। সাঁওতালদের 'ছত্তাবোঙ্গা' বা 'ছাতম্‌পরব'ও ইঁদপরবের নামান্তর। ভাদ্রমাসের শুক্লা দ্বাদশীতে ঝাড়গ্রামের রাজবাড়ির আঙিনায় এবং রাঢ়বাংলা ও দক্ষিণ পশ্চিম সীমান্তবাংলার অপর বহুস্থানে, ঘাটশিলা, ময়ূরভঞ্জ, দ্বারভাঙ্গা প্রভৃতি অঞ্চলে বিশেষ ঘটা করিয়া এই পরব অনুষ্ঠিত হয়। একটি ঋজু শালগাছ মাটিতে পুঁতিয়া তাহার মাথায় বাঁশের একটি ছাতা নূতন কাপড় দিয়া ঢাকিয়া বাঁধিয়া দেওয়া হয়। গাছটির প্রায় মাঝখানে থাকে একটা উল্টোকরা ঝুড়ি, যাহার স্থানীয় নাম শাঁখা। দণ্ডায়মান শালগাছটিই ইন্দ্রের মূর্তি; ইহা ইঁদগাছ, ইন্দ্‌ডাং, ইন্দ্রধ্বজ প্রভৃতি নামে কথিত হয়। পূজার শেষে ইহার উপর খই দই ফুল ইত্যাদি বর্ষণ করা হয়। কোথাও কোথাও পশুবলি দিবার রীতিও আছে। চাষীরা সেদিন নিজ নিজ জমিতে একটি করিয়া শালের ডাল পুঁতিয়া দেয় এবং নানা রকম শস্যের অঙ্কুর (জাওয়া ডালি দ্র) ইন্দ্‌ডাং এর উপর ছড়াইয়া দেয়। বর্ণহিন্দু, আদিবাসী, ভূমিজ, মাহাতো প্রভৃতি সকলেই এই উৎসবে যোগ দেয়।

উঠানি—সূতিকাগৃহ হইতে নির্দিষ্ট কয়দিন পর স্নানাদি করিয়া নবজাতকসহ প্রসূতির বাসগৃহে আসা। তৎপর্যায়:—আঁতুড় তোলা-ম, আঁতুড় বেরেন-মু।

একাচুরার বেড়ি—একাচুরা বা একাচোরা নবজাতকের ইষ্টানিষ্টকারী দেবতা

বিশেষ। অশৌচান্ত দিবসে কিংবা অন্নপ্রাশনে ইঁহার ব্রত করা হয়। কোন কোন মৃতবৎসা জননীকে একচুরার নামে সন্তানের একপায়ে একটি লোহার বেড়ি (ডাঁড়ুকা) বা সুতার দড়ি বাঁধিয়া রাখিতে দেখা যায়। শিশুর বয়স আঠার মাস উত্তীর্ণ হইলে যথারীতি একাচুরার ব্রত করিয়া ঐ বেড়ি খুলিয়া ফেলা হয়। বেড়ি পরানোর সঙ্গে কখনো কখনো শিশুর চুল লম্বা রাখিতে এবং নাক-কান বিঁধাইতেও দেখা যায়। আনকের বিশ্বাস, শিশুকে এইরূপে চিহ্নিত বা খুঁত করিয়া রাখিলে সে অপদেবতার আক্রমণ হইতে রক্ষা পায়।

এয়ো সংক্রান্তি—সধবাদের ব্রত। এই ব্রত তাহারা বিবাহের বৎসর কিংবা পর বৎসর মহাবিষুব সংক্রান্তিতে লইয়া থাকে। এয়োর পা ধোয়ানো, এয়োকে আলতা পরানো, তেল মাখানো, এয়োর হাতে নোয়া দেওয়া, এয়োকে সর্বতোভাবে সন্তুষ্ট করা এই ব্রতের প্রধান করণীয়।

কমলে কামিনী—সিংহলে যাইবার পথে প্রথমে ধনপতি এবং পরে তাঁহার পুত্র শ্রীমন্ত সমুদ্রে (কালীদহে) এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখিয়াছিলেন। কমলবনে এক সুন্দরী রমণী প্রস্ফুটিত কমলের উপর বসিয়া একটি হাতী গিলিতেছে আর উগরাইয়া দিতেছে। এই রমণীই তথা দেবীই চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের 'কমলে কামিনী',—মঙ্গলচণ্ডীর মায়া-মূর্তি।

করমপরব-মে. রাঢ়—ভাদ্রের শুক্লা একাদশীতে উঠানে করমগাছের ডাল পুঁতিয়া সারারাত্রি নাচগানের ভিতর দিয়া করমউৎসব পালিত হয়। ইহা মূলত কৃষিবিষয়ক অনুষ্ঠান এবং মাহাতো, ওঁরাও, মুণ্ডা, মহালী, বীরহোড় প্রভৃতির মধ্যেই অধিক প্রচলিত (দেবদেবীর নাম দ্র)।

কলাবউ—নব-পত্রিকা। দুর্গাপূজা উপলক্ষে ইহারও পূজা হইয়া থাকে। নব-পত্রিকা—কদলী, হরিদ্রা, ধান্য, কচু, মান, জয়ন্তী, দাড়িম্ব, অশোক ও বিল্ব এই নয়টি গাছের (কোন কোনটির মাত্র ডালপালার) একটি আটি লালপাড় কাপড়ে আচ্ছাদিত করিয়া নব-বধূর ন্যায় গণেশের পার্শ্বে রাখা হয়। ইহার মধ্যে কলাগাছটিই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলিয়া সাধারণ লোক ইহাঁকে 'কলাবউ' বলিয়া থাকে। না জানিয়া কেহ কেহ আবার ইহাকে গণেশের পত্নী বলিয়াও মনে করে। পূজার পূর্বে এই 'কলাবউকে' নদী বা পুষ্করিণীর জলে শোভাযাত্রা সহকারে স্নান করানো হয়।

কলা বিবাহ—পূর্ববঙ্গের বসন্ত-ব্রতের তথা 'বসনয়া' ব্রতের একটি প্রধান অঙ্গ

ঐ ব্রত বা পূজা উপলক্ষে পূর্বদিন দুইটি কলার তেউড়কে বর-কন্যা সাজাইয়া বিবাহের যাবতীয় আচর-অনুষ্ঠানের অভিনয় করা হয়। কয়েকজন এয়োস্ত্রী বরবেশী গাছটিকে লইয়া দাঁড়ান, আর কয়েকজন বধূবেশী গাছটিকে লইয়া চারদিকে সাতবার ঘুরেন, সামনাসামনি হইয়া উহাদের শুভদৃষ্টি করান, ফুল-ছিটান, মালাবদল করেন, শাঁখ বাজান, উলু দেন, গীত গান ইত্যাদি।

কাকবলি, কাকবইল—(জীবজন্তু অধ্যায়ে 'কাক' দ্র)।

কাদামাটি—নবমী পূজার পর বলির রক্ত ও হাড়িকাঠের মাটি লইয়া কাদা করিয়া তাহাতে গড়াগড়ি দেওয়া দুর্গোৎসবের একটি আনুষঙ্গিক আচাররূপে গণ্য হয়। বহু পূর্বে শুধু ছাগ-মহিষই বলি দেওয়া হইত না, দেবীর প্রীত্যর্থে এবং শত্রুক্ষয় মানসে মনুষ্য বলিরও প্রথা ছিল। শত্রুপক্ষের কাহাকেও পাইলে সর্বোত্তম, নতুবা যবচূর্ণ বা মৃত্তিকা দ্বারা শত্রুমূর্তি তৈয়ার করিয়া বলি দেওয়া হইত। শত্রুর এইরূপ প্রতীক বলি দেওয়ার প্রথা আজও কোন কোন পরিবারে বর্তমান আছে।

কুলাইর মাগন-ব, **কুলের মাগন**-ঢা—পৌষমাসে আমনধান গোলাজাত হইলে গ্রামের বালকেরা (প্রায়ই নিম্নকোটি সমাজের) বাড়ি বাড়ি যায় এবং নানারূপ ছড়া আবৃত্তি করিয়া ধান-চাল ইত্যাদি মাগিয়া আনে ও পৌষ-সংক্রান্তির দিনে চড়ুইভাতি করে। এক সময়ে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে কুলাই ঠাকুরের বেশ নামডাক ছিল এবং তাঁহার নামে মাগা হইত বলিয়াই হয়ত স্থানভেদে পৌষ-মাগনের এক নাম হইয়াছে 'কুলাইর মাগন'।

কোয়াট-মে—(নিশির ডাক দ্র)। **গণ্ডি**—রেখাবেষ্টিত মন্ত্রপূত স্থান,—যেখানে কোন অপদেবতা বা ভূত প্রেতের প্রবেশের আশঙ্কা থাকে না।

গম্ভীরা—গম্ভীর নামক দেবগৃহে শিবাদি দেবতার যে পূজা-উৎসব হইয়া থাকে, বাংলার কোন কোন অঞ্চলে (রং. দি. মা. রা. মু) তাহারই নাম গম্ভীরা। মালদহের গম্ভীরা বা আদ্যের গম্ভীরা সমধিক প্রসিদ্ধ। বাংলার অপর বহু অঞ্চলে (চ. ন. খু. য. ফ. হা. হু. মে. বাঁ. বর্ধ. বী) গম্ভীরা উৎসব বর্তমানে 'গাজন' নামে পরিচিত। উৎকল এবং মেদিনীপুরে 'সাহীযাত্রা' এবং ময়মনসিংহে 'চড়কপূজা' নামও শুনা যায়। এই সকল অনুষ্ঠান মূলত এক হইলেও ইহাদের আচার-নিয়মে কিছু কিছু তারতম্য আছে ('আদ্যের গম্ভীরা'-পালিত দ্র)।

গরণাকাটা-পূব—লোকমত এই যে, সূর্য বা চন্দ্রগ্রহণের সময় কোনও অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীলোক যদি কাটাকাটির কাজ করে, তাহা হইলে ভ্রূণের কোনও অঙ্গহানি

ঘটে (প্রায়ই উপরের ঠোঁটে এই দোষ অর্শায়)। এইরূপ অঙ্গহানিকে গরণাকাটা (গ্রহণের প্রভাবহেতু কাটা ?) বলা হয়।

গাছ জাগান—চড়কপূজা বা শিবের গাজনের একটি আনুষঙ্গিক প্রথা। চৈত্রসংক্রান্তির পূর্বদিন চড়কগাছকে জাগাইতে হয়। একটি গাছকে বহু বৎসর, এমন কি বহু পুরুষ ধরিয়া পূজা করা চলে। যে জলাশয়ে উক্তরূপ পূজিত চড়কগাছ নিমগ্ন থাকে, সন্ন্যাসীরা নৃত্য গীত এবং বাদ্যসহকারে তাহার পাড়ে যাইয়া সমবেত হয় এবং মহাদেবের নাম করিয়া গাছ অন্বেষণে নামিয়া পড়ে। জনশ্রুতি এই যে, চড়কগাছ সহজে ধরা দেয় না, ভক্তদের মনপরীক্ষার জন্য বা তাহাদের কোনও অন্যায়ের জন্য আত্মগোপন করিয়া থাকে। যাহা হউক, অনেক অনুসন্ধানের পর গাছটির সন্ধান পাওয়া যায় এবং উহাকে উঠাইয়া উহার সর্বাঙ্গে তেল-ঘি মাখাইয়া চড়কতলায় আনিয়া যথারীতি পোঁতা হয়। এই অনুষ্ঠানেরই নাম 'গাছ জাগান।' গাছটি শাল বা গজারির ২০-২৫ ফুট লম্বা একটি খুঁটি হইলেও সকলে ইহাকে 'জাগ্রত' মনে করে।

ধর্মঠাকুরের পূজা উপলক্ষেও রাঢ়ের কোন কোন গ্রামে অনুরূপভাবে গাছ জাগানো এবং পুকুর হইতে চড়কগাছ তুলিয়া আনিয়া পূজা করা হয়। মেটেল্যা গ্রামে পূজার পূর্বদিন চড়কগাছের উদ্দেশে পানসুপারি দিয়া নিমন্ত্রণ জানাইবারও প্রথা আছে (রাঢ়ের সংস্কৃতি ও ধর্মঠাকুর দ্র)।

গাজন—গাজন বলিতে প্রথমেই চৈত্রসংক্রান্তিতে অনুষ্ঠিত শিবের উৎসব এবং চড়কপূজার কথা মনে আসে। কিন্তু চৈত্রসংক্রান্তি ছাড়াও আরও কয়েকটি দিনে এবং তিথিতে গাজন-উৎসব হইতে দেখা যায় এবং শুধু শিবেরই নহে, অপর কোনও কোনও দেবতার পূজা-উৎসবেরও লোকপ্রসিদ্ধ নাম গাজন। যেমন, ধর্মের গাজন, নীলের গাজন। অনেকে বলেন, সংস্কৃত 'গর্জন' শব্দ হইতে 'গাজন' শব্দ আসিয়াছে। ইহা একেবারে অস্বীকার করা যায় না। কেননা, সন্ন্যাসী (ভক্ত্যা) এবং অপর বহুলোকের উচ্চধ্বনি, কোলাহল, নৃত্য, গীত ও ঢক্কানিনাদের মধ্যেই গাজন-উৎসব সুসম্পন্ন হয়।

গোজন্মে মুক্তি—পল্লীগ্রামের অনেক নিষ্ঠাবতী বর্ষীয়সী মহিলার মুখে এই কথাটি শুনা যায়। তাঁহাদের বিশ্বাস, গোজন্মের পর জীবকে আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না; জন্মমৃত্যুর বহুস্তর অতিক্রম করিয়া সর্বশেষে সে গোরু হইয়া জন্মায় এবং পূর্ব পূর্ব জন্মজাত তাহার সমস্ত কর্মফল-ভোগের অবসান ঘটে; গোজীবন অন্তে সে পরমাত্মায় লীন হইয়া যায়।

ঘট ওলানো—পশ্চিমবঙ্গের বহু অঞ্চলে বারোয়ারি শীতলাপূজা উপলক্ষে মেয়েরা কুলার উপর শীতলার ঘট স্থাপন করিয়া বাড়ি বাড়ি যায় এবং গোবরজলে নিকানো উঠানে ঘট-কুলা নামাইয়া হাততালি দিতে দিতে উহার চারিদিকে ঘুরে (বৃদ্ধারা বলেন, পূর্বে এই উপলক্ষে গীত ও নৃত্য হইত, বর্তমানে এই প্রথা প্রায় উঠিয়া গিয়াছে)। গৃহকর্ত্রী তখন চাল-পয়সা, ফলমূল মাগন দিয়া তাহাদিগকে বিদায় করেন। এই প্রথার নাম 'ঘটওলানো।' ওলানো, ওলা-ষ. ন. খু, উলে ফেলা-মে—নামানো।

চৈতলা দেওয়া-ম—ফাল্গুনের সংক্রান্তিতে খুব ভোরে প্রত্যেক ঘরের দুয়ারে এবং বাড়ি হইতে বাহির হইবার প্রত্যেক পথে কয়েকটি করিয়া গোবরের পিণ্ড ফুল ও দূর্বাসহ সারিবদ্ধ ভাবে দেওয়া হয় ; ইহারই স্থানীয় নাম 'চৈতলা দেওয়া।' যদি কেহ প্রবাসে থাকে তাহা হইলে বাড়ির একটি পথ খোলা রাখা হয়। 'চৈতলা'র এই গোবর শুকাইয়া চৈত্রসংক্রান্তিতে গোয়ালে সাঁজাল দেওয়া হয়।

চোদ্দশাক খাওয়া—দীপান্বিতা অমাবস্যার পূর্বদিন ভূত চতুর্দশীতে চৌদ্দ রকম শাক (কালকাসুন্দে, ওল, কেঁউ, গুলঞ্চ, জয়ন্তী, নিম, পলতা, বেতো, ভাঁট, শাঞ্চে, শুষনী, শোলফা, সরিষা, হেলঞ্চ) খাইবার যে রীতি প্রচলিত আছে, তাহাকে 'চোদ্দশাক খাওয়া' বলে।

ছলন-পব—ছলনমূর্তি। মন্দিরে বা 'থানে' প্রতিষ্ঠিত বৃহদাকার মূর্তির অনুরূপ ক্ষুদ্রাকৃতি মূর্তি বিশেষ। অনেকে মানত করেন, সফলকাম হইলে তিনি দেবতার থানে 'ছলন' দিবেন। সাধারণত লৌকিক দেবতার বাৎসরিক পূজার দিনেই (জাঁতাল) মানতকারীরা এইরূপ ক্ষুদ্রাকৃতি মূর্তি গড়াইয়া দেন। অনেক সময় ছলনমূর্তি হিসাবে ছোট ছোট হাতিঘোড়াও দেওয়া হয়।

ছইট-ম (মুস)—সন্তান জন্মের ষষ্ঠদিনের অনুষ্ঠান (ষেটেরা দ্র)।

ছাতু উড়ানি—ছাতু উড়ানো। ইহা চৈত্রসংক্রান্তিতে অনুষ্ঠেয় পূর্ববঙ্গের বহু অঞ্চলের একটি লোকাচার বিশেষ। সংক্রান্তি-দিন স্নান করিয়া আসিয়া পরিবারের প্রত্যেক পুরুষ দুই মুঠা ছাতু লইয়া তেমাথায় যায় এবং উপুড় হইয়া দুই পায়ের ফাঁক দিয়া তাহা ছুঁড়িতে ছুঁড়িতে তিনবার বলে, 'ছাতু যায় উইড়া, দুষমন বাদী মরে পুইড়া।' কোথাও (ব) শুনা যায়, 'শত্রু উড়াইলাম, শত্রু উড়াইলাম'। কোথাও বা (ফ) বলে, 'শত্রুর মুখে ছাই, মিত্রের মুখে ছাতু'।

জলপড়া—ওঝাদের মন্ত্রপূত জল যাহা সাধারণ লোক বিষ-ব্যথা ইত্যাদি নানা রোগের ঔষধরূপে ব্যবহার করে।

জাওয়াডালা / -ডালি-মে—ভাদ্রমাসে করমপরবের কয়েক দিন পূর্বে আদিবাসী ও মাহাতো সম্প্রদায়ের আইবুড়ো মেয়েরা বাঁশের ছোট ঝুড়িতে বা ডালায় মাটি ভরত্তি করিয়া নানা রকম শস্যের (ভুট্টা, মুগ, বিরি, সরিষা ইঃ) বীজ বুনে এবং প্রতিদিন সেগুলিতে হলুদজল ছিটাইয়া অঙ্কুরিত করে। বীজাঙ্কুরের তথা নবোদ্‌গত উদ্ভিদের এই পাত্রকে ঝাড়গ্রামের আঞ্চলিক ভাষায় জাওয়াডালা / -ডালি বলে। করমপূজায় করমশাখার গোড়ায় এই জাওয়া ডালি রাখিয়া নাচ গান চলে ; ইঁদপরবেও 'ইন্দডাং'-এর উপর বীজাঙ্কুরগুলি ছড়াইয়া দেওয়া হয়। বাংলাদেশের বরিশাল এবং ফরিদপুর অঞ্চলে কার্তিক পূজা উপলক্ষে একটি পাত্রে ধানের চারা জন্মাইয়া তাহা পূজাস্থানে রাখা হয় কিংবা ধান্যাঙ্কুরিত স্থানে প্রতিমা বসাইয়া পূজা করা হয়। ধান্যাঙ্কুরের ঐ পাত্রের স্থানীয় নাম 'হালা।'....জাওয়া—বীজাঙ্কুর, নবোদ্‌গত উদ্ভিদ। কোথাও কোথাও ধান্যাঙ্কুর বা ধানের চারাকে জাওলা, জাওয়ালি, জালা বলা হয় (চাষ-আবাদ দ্র)

জাতাল, জাঁতাল—লৌকিক দেবতার বাৎসরিক পূজা-উৎসব। তৎপর্যায় :—জাতের পূজা। এই পূজার দিন দূর দূরান্তর হইতে মানতকারীরা নানা অর্ঘ্য লইয়া পূজার থানে আসে ; এই উপলক্ষে বহুস্থানে মেলাও বসে। শনি ও মঙ্গলবারের পূজাকে বলা হয় 'বারের পূজা'।

জামাইষষ্ঠী—জ্যৈষ্ঠের শুক্লা ষষ্ঠীতে পুরনারীরা যে ষষ্ঠীব্রত করেন তাহার শাস্ত্রীয় নাম 'অরণ্য ষষ্ঠী', লোকপ্রসিদ্ধ নাম 'জামাইষষ্ঠী'। এই ব্রত উপলক্ষে শাশুড়ী জামাতাকে নিমন্ত্রণ করেন, ষষ্ঠীর বাটা দেন, চর্ব্য, চূষ্য, লেহ্য, পেয় দ্বারা তাহাকে আপ্যায়িত করেন। অবশ্য, সর্বত্র সকল সমাজে এই রীতির প্রচলন নাই।

ঝাঁপান [সং যাপ্যযান]—ঝাঁপানের মূল অর্থ নরবাহিত যান। যতদূর জানা যায়, এক সময়ে সাপের প্রধান প্রধান ওঝা শিষ্যদের দ্বারা বাহিত যানে চড়িয়া শোভাযাত্রা সহকারে সর্পক্রীড়া এবং সর্পদ্বারা অঙ্গসজ্জা প্রদর্শন-প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে যাইত। বর্তমানে ঝাঁপান আর সেই 'যান' অর্থে ব্যবহৃত হয় না, উহা এখন—মনসা পূজা উপলক্ষে বিশেষ বিশেষ স্থানে সাপের ওঝাদের বার্ষিক সম্মেলন, সাপখেলা প্রদর্শন, গুণীতে গুণীতে প্রতিযোগিতা ইত্যাদি।

ডাঁড়ুকা—দেবতার নামে মানত করিয়া শিশুদের হাতে বা পায়ে লোহার বা তামার যে বেড়ি (বালা) পরানো হয় (একাচুরার বেড়ি দ্র)।

ঢেঁকিচুমান-মা, **ঢেঁকিমঙ্গলা**-রাঢ়—গাজন এবং গম্ভীরা উৎসবে, বিবাহ, অন্নপ্রাশন, উপনয়ন ইত্যাদি অনুষ্ঠানে হরিদ্রা, সিন্দূর এবং পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা ঢেঁকি বরণের এবং ঢেঁকি পূজার রীতি বাংলার বহু অঞ্চলেই দেখা যায়। গাজনে এবং গম্ভীরায় একজনকে ঢেঁকির উপর বসাইয়া নারদের অভিনয় এবং শিবমন্দির প্রদক্ষিণ করানো হয়। **চুমান**—পূজা, বন্দনা। আশীর্বাদ।

ঢেলাবাঁধা—কোনও কিছু কামনা করিয়া বিভিন্ন দেবতার বা পীরের থানে ঢেলা বাঁধিবার রীতি বাংলার এবং বাংলার বাহিরে সকল সমাজের মধ্যেই আছে। সাধারণত একখণ্ড নেকড়া কি একগাছা সুতা বা খড় দিয়া মাটির একটি ছোট ঢেলা বা ইটের টুকরা বাঁধিয়া থানের কোনও বৃক্ষশাখায় ঝুলাইয়া রাখা হয়। সতীমার প্রাঙ্গণে (ঘোষপাড়া), রামপ্রসাদের সাধনপীঠে (হালিশহর), জয়চণ্ডীর মন্দিরে (কাঁকিনাড়া) এবং অনেক মসজিদের গরাদেও ঐরূপ ঢেলাবাঁধা দেখা যায়। কামনা সিদ্ধ হইলে মানতকারী একদিন যাইয়া পূজা বা শিরনি দিয়া আসে। চিনিতে পারিলে আপনার বাঁধা ঢেলাটিও তখন খুলিয়া দেয়।

তুলসীঝারা—চৈত্রসংক্রান্তি হইতে আরম্ভ করিয়া বৈশাখের সংক্রান্তি পর্যন্ত তুলসীমঞ্চের উপর একটি সচ্ছিদ্র সতৃণ হাঁড়ি বাঁধিয়া উহাতে প্রতিদিন যে জলধারা দেওয়া হয়, তাহাকে কোথাও 'তুলসী ঝারা', কোথাও বা 'তুলসী ধারা' বলা হয়।

তুঁষ-তুষলী—কুমারীব্রত বিশেষ। পৌষমাসভোর কুমারীরা নূতন ধানের তুঁষ, গোবর, সরিষার ফুল বা মুলার ফুল দিয়া লাড়ু পাকাইয়া, সেই লাড়ুতে হাত রাখিয়া ছড়া বলিয়া এই ব্রত করে। ছড়াগুলির মধ্যে নারীজীবনের নানা আশা-আকাঙ্খা ব্যক্ত হয়।

তেজ-দর্পণ—এই ব্রতে চৈত্রসংক্রান্তি হইতে আরম্ভ করিয়া বৈশাখমাসভোর ব্রাহ্মণকে তেজপাতা, সুপারি, পৈতা, পয়সা, মিষ্টি ইত্যাদি দান করা হয়। এই ব্রত করিলে তেজের সহিত স্বামীর ঘর করা যায়।

তেলপড়া—সরিষার তেল মন্ত্রপূত করিয়া ভূতপ্রেত বা রোগাদি দূর করিবার প্রক্রিয়া বিশেষ।

দণ্ডীকাটা—কোনও দেবতার (যেমন শীতলা, ধর্মঠাকুর) পূজায় ভক্তদের স্নান করিয়া আর্দ্রবস্ত্রে স্নানের ঘাট হইতে দণ্ডবৎ মাটিতে পড়িয়া পড়িয়া প্রণাম করিতে করিতে মন্দির পর্যন্ত আসা।

দরবেশের সেবা—পূর্ববঙ্গের কোথাও কোথাও এক সময়ে নিম্নকোটি সমাজের মধ্যে 'দরবেশের সেবা' নামে তামাকের এক ব্রত প্রচলিত ছিল। সাধারণত তামাকপায়ী বিধবা স্ত্রীলোকেরাই এই অনুষ্ঠান করিত। কোনও একদিন বিকালে উঠানে কতক জায়গা লেপিয়া পুঁছিয়া সেখানে কোনও দরবেশের উদ্দেশে একাধিক হুঁকা কল্কিতে তামাক সাজাইয়া দিয়া 'কথা' বলা হইত এবং শেষে সকলে মিলিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া হুঁকা টানিত। (দেবদেবীর নাম দ্র)।

দাঁতে কুটা করা—বাঁধা অবস্থায় যদি আগুনে পুড়িয়া গোরু মরে তাহা হইলে হিন্দুকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। তাহাকে গলায় একটা দড়ি ঝুলাইয়া, মুখে কুটা লইয়া, গোরুর মত শব্দ করিয়া চাউল পয়সা মাগিয়া আনিতে দেখা যায়।

দেইলপাট-ম—শিবের গাজন উপলক্ষে নিমকাঠ কি বেলকাঠ দিয়া বঁটিদা-এর পাটার মত করিয়া 'দেইলপাট' বা 'পাট' তৈয়ার করা হয়। পাটের মাথার দিকে কয়েকটি বঁড়শি ও একটি ত্রিশূল বিদ্ধ করা থাকে। পাটটি নূতন লাল গামছা দিয়া ঢাকিয়া মাথায় করিয়া গীত বাদ্য ও নৃত্য সহকারে মণ্ডপে আনিয়া যথারীতি পূজা করা হয়। সন্ন্যাসীরা এই পাট মাথায় করিয়া প্রত্যহ বাড়ি বাড়ি যায় এবং ঢাকের বাদ্য ও নৃত্যসহযোগে শিবদুর্গাবিষয়ক বিবিধ গান গাহিয়া বিস্তর চাল পয়সা সংগ্রহ করে।

দেয়াশী [<দেবাংশী]-রাঢ়—যিনি ধর্মমন্দিরের দেখাশুনা এবং ধর্মঠাকুরের পূজা-অনুষ্ঠানাদি পরিচালনা করেন।

দেহুরী-মে—লৌকিক দেবতার পুরোহিতদের চলতি কথায় কোথাও কোথাও 'দেহুরী' বলা হয়।

দোয়াতপূজা—সরস্বতী পূজার নামান্তর। বর্তমানে প্রায় সর্বত্রই মূর্তিতে সরস্বতী পূজা হয়। কোন কোন পরিবারে শুধু দোয়াতে পূজা হইতেও দেখা যায়। একাধিক দোয়াত কালিশূন্য করিয়া, উত্তমরূপে ধুইয়া দুধে ভরতি করিয়া আসনের উপর স্থাপন করা হয়। প্রত্যেকটি দোয়াতের মুখে একটি ফুল ও পাশে খাগের কলম থাকে।

দোর ধরা—সন্তানকে কোনও দেবতার আশ্রিত করিয়া রাখা। অনেকের বিশ্বাস, দেবতার কৃপা ছাড়া সন্তানলাভ ঘটে না। এজন্য নিঃসন্তান দম্পতিদের কেহ কেহ দেবতার দুয়ারে ধরনা দেয়, মানত করে এবং সন্তান হইলে তাহাকে আরাধিত দেবতার 'দোরধরা' করিয়া রাখে। এইরূপ করিলে নাকি সন্তানের

সমস্ত ফাঁড়া কাটিয়া যায় এবং যে-দেবতার (প্রায়ই বাবাঠাকুরের বা পঞ্চানন্দের) দোরধরা, তিনিই তাহাকে রক্ষা করেন।

ধরনা দেওয়া, ধন্না দেওয়া—কোনও অভীষ্টলাভের জন্ম মন্দিরদ্বারে বা কাহারো গৃহদ্বারে আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া পড়িয়া থাকা। তৎপর্যায় :—হত্যা দেওয়া। অনেক দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিকে বাবাঠাকুরের (শিব, পঞ্চানন্দ) মন্দির প্রাঙ্গণে ধরনা বা হত্যা দিতে দেখা যায়। দীর্ঘদিন পড়িয়া থাকার পর কাহারো কাহারো উপর নাকি ঠাকুরের প্রত্যাদেশ হয় এবং তাহারা তদনুরূপ নিয়ম পালন করিয়া নিরাময় হয়,—এইরূপ শুনা যায়।

ধর্মসভা—হালকা মেঘের উপর সূর্যরশ্মি পড়িয়া সূর্যের চারিদিকে নানা রঙের একটি চক্রের সৃষ্টি হয়। মণ্ডলাকার সেই স্থানকে নিরক্ষর সাধারণ লোক ধর্মসভা বা দেবসভা বলিয়া থাকে। তাহারা সূর্যকে ধর্ম বলিয়া জানে, ধর্ম বলিয়া নমস্কার করে, ধর্মকে সকল কার্যের সাক্ষী রাখে ; ধর্মের নামে উপবাস করিয়া সূর্যের উদ্দেশে নৈবেদ্য দেয়।

মেঘের উপর চন্দ্রকিরণ পড়িয়াও ঐরূপ যে-মণ্ডলের সৃষ্টি করে, তাহাকেও সাধারণ লোক 'চাঁদের সভা' / 'চাঁদে সভা বসেছে' বলিয়া থাকে।

ধর্মের পিঠা-ম—পৌষসংক্রান্তির সকালে উঠানে গোবরজলে কতক জায়গা লেপিয়া ধর্মের (সূর্যের) উদ্দেশে পিটুলির পাঁচটি গোলাকার ছাপ দেওয়া হয়। তারপর গোরুর কপালে ও সর্বশরীরে, গাছগাছড়ায়, ঘরেদুয়ারে, ঢেঁকশালে, গোলায়, গোয়ালে এই ছাপ দেওয়ার ধুম চলে। এই অনুষ্ঠান 'ধর্মের পিঠা খাওয়া' নামে অভিহিত হয়। হিন্দুদের মধ্যেই ইহা প্রচলিত।

ধুলট—দোলের পর নগরসংকীর্তন এবং ভাবাবেশে ধূলায় গড়াগড়ি বা পরস্পরের গায় ধূলা নিক্ষেপ অনুষ্ঠান।

ধুলবাড়ানো-মে—নূতন হাঁড়ি (রান্নার) ব্যবহার করা।

নগর সংকীর্তন—গ্রামের পথে পথে ঘুরিয়া খোলকর্তালসহ ভগবানের নাম গান। সাধারণত দোল বা মহোৎসব (মচ্ছব) উপলক্ষে অথবা গ্রামে কোনও সংক্রামক ব্যাধি দেখা দিলে গ্রামবাসীরা নগর সংকীর্তনে বাহির হয়।

নজর—দৃষ্টি, মনোযোগ, লক্ষ্য, ভেট, সেলামি ইত্যাদি সাধারণ অর্থ ছাড়াও নজরের একটি বিশেষ অর্থ আছে। তাহা হইতেছে, বিশেষ কোনও ব্যক্তি, অপদেবতা প্রভৃতির কুদৃষ্টি। পল্লীগ্রামে প্রায়ই শুনা যায়, 'ঐ লোকটা ভারী নজুরে', 'ঐ লোকটার ভারী নজর লাগে'। কথিত হয়, প্রায় সর্বত্রই এমন দুই

একজন কুদৃষ্টিসম্পন্ন লোক আছে (দেবতার মধ্যে যেমন শনি), যাহাদের দৃষ্টি সোজাসুজি কোন বস্তু বা ব্যক্তির উপর পড়িলে উহার কিছু না কিছু বিকৃতি ঘটে। (চাষ-আবাদ 'কাকতাড়ুয়া' দ্র)।

নিশির ডাক—কোয়াট-মে। কথিত হয়, অপদেবতারা নাকি কখনো কখনো গভীর রাত্রিতে নিদ্রিত ব্যক্তিকে তাহার অতি পরিচিত গলায় ডাকে; এই ডাকের প্রধান বৈশিষ্ট্য, ইহা একবারমাত্রই উচ্চারিত হয়। এই বিশ্বাস এতই বদ্ধমূল যে, পল্লীগ্রামে রাত্রিতে কেহ পরিচিত ব্যক্তির ডাকেও এক ডাকের মাথায় সাড়া দেয় না, তিন ডাকের পর কথা বলে। অনেকক্ষেত্রে কাহাকেও এক ডাক দিয়া চুপ করিয়া থাকা দোষের মধ্যে গণ্য হয়। নিশির ডাকে মানুষ নাকি অনেক সময় ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া পড়ে, পথ ভুল করে, আপথে চলিয়া যায়, এমন কি মরণোন্মুখ হয়। রাঢ় অঞ্চলে ইহাকে 'ভুলো লাগা' বলে। ইহার প্রতিবিধানের জন্য সাধারণ লোক নানারূপ প্রক্রিয়ার আশ্রয় গ্রহণ করে।

নুন খাওয়া—কাহারো দ্বারা উপকৃত হওয়া,—সে উপকার যতই সামান্য (নুনের মত) হউক ('নুন খাই যার, গুণ গাই তার')। নিমকহারাম—নুন খাইয়াও অর্থাৎ উপকার পাইয়াও যে অপকার করে।

নুনপালা-রাঢ়—চৈত্রমাসের কোনও একদিন (সাধারণত তপশীল সম্প্রদায়ের মধ্যে) লবণ না খাওয়ার প্রথা।

পাঁচটি, পাঁচুটি, পাঁচউঠানি—সন্তানজন্মের পঞ্চমদিনের অনুষ্ঠান বিঃ। কোথাও কোথাও সেদিন প্রসূতিকে আঁতুড়ঘর হইতে বসতঘরে লইয়া আসা হয়। নাপিত আসিয়া নখ কাটে, ধোপার ক্ষার দিয়া প্রসূতিকে নাওয়ানো হয়।

পাঁতানামা-উব, **আগোসান**-রাঢ়—ভর হওয়া। কাহারো দেহে সাময়িকভাবে কোন দেবতার বা অপদেবতার অধিষ্ঠান হওয়া। যাহার উপর পাঁতানামে বা ভর হয়, সে নানারূপ অঙ্গভঙ্গি ও চীৎকার করিতে থাকে, যেন বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া ফেলে। তখন অনেকে অনেক রকম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে, কেহবা আপনার দুরারোগ্য ব্যাধি কিসে দূর হইবে জানিতে চাহে। আবিষ্ট ব্যক্তি কখনো উত্তর দেয়, কখনো দেয় না। যাহাদের উপর ভর হয়, উত্তরবঙ্গে (জ. কো)· তাহাদিগকে বলা হয় 'ত্তাওধা'।

পানপড়া—এককালে বশীকরণের একটি প্রধান ঔষধরূপে গণ্য হইত। সেকালে পুরুষ-স্ত্রী-নির্বিশেষে দুষ্টপ্রকৃতির যে কেহ ঈপ্সিতজনকে করায়ত্ত করিবার জন্য অনেকসময় বশীকরণ ঔষধাদি প্রয়োগ করিত। পান অতি লোকপ্রিয় এবং

পান দিয়া আদর-আপ্যায়নের প্রথা বহুপ্রচলিত বলিয়াই পানের ভিতর ঔষধ পুরিয়া কিংবা পান মন্ত্রপূত করিয়া কাহাকেও খাওয়ানো এবং বশীভূত করা সহজ মনে হইত।

পুঁটুলি বাঁধা—দেবতার নামে মানত করিয়া একটি নেকড়ায় কয়েকটি পয়সা (প্রায়ই পাঁচটি) বাঁধিয়া তুলিয়া রাখা। সাধারণত পরিবারস্থ কেহ দীর্ঘকাল রোগে ভুগিতে থাকিলে তাহার আরোগ্য কামনায় গৃহকর্ত্রী লৌকিক দেবতার থানে যাইয়া এইরূপ পুঁটুলি বাঁধেন এবং অভীষ্ট সিদ্ধ হইলে ঐ পয়সা পূজায় দেন। তৎপর্যায় :—মুদাবাঁধা, আগতোলা।

পেঁচোয় পাওয়া—শিশুদের ধনুষ্টঙ্কার বা খেঁচুনি রোগবিশেষ। লোকবিশ্বাস এই যে, পাঁচু বা পেঁচো নামক এক অপদেবতার আক্রমণ হইতেই নাকি শিশুদের এই রোগ জন্মে। পাঁচু পঞ্চানন্দের সহচর, তাঁহার মূর্তির পার্শ্বে ইহারও এক বিকৃতবদন মূর্তি প্রায়ই দেখা যায়। ইহার আকৃতি প্রকৃতি সম্পর্কে হাওড়া ও সন্নিহিত অঞ্চলে অনেক ছড়া প্রচলিত আছে ('হাওড়ার লোক-উৎসব' দ্র)।

পৌষপার্বণ—পোষড়া, বাঙালী হিন্দুর পিঠা পরব। পৌষ সংক্রান্তির পূর্বদিন হইতেই এক সময়ে বাড়ি বাড়ি নানা উপকরণে নানা জাতের পিঠা তৈয়ারির ধুম পড়িয়া যাইত এবং ১লা মাঘ পর্যন্ত তাহার জের চলিত। এই প্রসঙ্গে গুপ্তকবির পৌষপার্বণ সম্পর্কে কবিতাটির অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে :—

তাজা তাজা ভাজাপুলি ভেজে ভেজে তোলে
সারি সারি হাঁড়ি হাঁড়ি কাঁড়ি করে কোলে।
আলু তিল গুড় ক্ষীর নারিকেল আর,
গড়িতেছে পিঠে পুলি অশেষ প্রকার।
পায়েসের পুটুলি দিয়া করিয়াছে চুষি
গৃহিণীর অনুরোধে তাই শুধু চুষি।

'এই পিঠা সেকালে শুধু নিজের ঘরে খাওয়া হইত না; পাড়াপ্রতিবেশী, আত্মীয় স্বজন প্রত্যেকে প্রত্যেকের বাড়ি যাইয়া হাস্যকৌতুক, গালগল্পের ভিতর দিয়া খাইত। তাই বহুজনের ক্রিয়াযোগে পৌষ সংক্রান্তির পিঠা তৈয়ারি এবং পিঠা খাওয়া গ্রামে গ্রামে উৎসবের আকার ধারণ করিত। বর্তমানে ইহা প্রাণহীন প্রথারক্ষামাত্রে পর্যবসিত হইয়াছে।

পৌষালী—পৌষমাসের সন্ধ্যাগুলি এক সময়ে গ্রামের বালকদের আনন্দ-কোলাহলে মুখরিত হইয়া উঠিত। তাহারা দল বাঁধিয়া লাঠিসোঁটা হাতে লইয়া বাড়ি বাড়ি যাইত এবং নানাপ্রকার (অধিকাংশই ব্যাঘ্রবিষয়ক) ছড়া আবৃত্তি করিয়া বা গান গাহিয়া ধান চাল পয়সা ইঃ সংগ্রহ করিত। মাসের শেষ দিনে সংগৃহীত সেই সকল দিয়া ব্যাঘ্রদেবতার পূজা বা শিরনির এবং নিজেদের বনভোজনের ব্যবস্থা হইত। বর্তমানে সেসব উৎসব-অনুষ্ঠান প্রায় লোপ পাইয়াছে। বালকদের পৌষোল্লাসের ঐ সকল ছড়া বা গান বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন নামে পরিচিত। যেমন, মুর্শিদাবাদে পোষালো / পোষালী, ভাঁড়বোল, নদীয়ায় হোলবোল / হলুই, ময়মনসিংহে বাঘাইর বয়াত, ফরিদপুর বরিশালে কুলাইর মাগন / কুলাই ঠাকুরের ছড়া, রংপুরে সোনারায়ের গীত।

বাটি চালনা—চোর ধরিবার প্রক্রিয়া বিশেষ। জনশ্রুতি এই যে, গুণীদের মন্ত্রশক্তি বলে বাটি চোরের বাড়িতে গিয়া উপস্থিত হয়।

বাটি পোঁতা—বৃষ্টি নামানোর প্রক্রিয়া বিশেষ। প্রতিবেশীর বাড়ি হইতে বাটি চুরি করিয়া আনিয়া যদি কোথাও পুঁতিয়া রাখা যায়, তাহা হইলে বৃষ্টি হয়—এইরূপ বিশ্বাস। অতিবৃষ্টি দমনের উদ্দেশ্যেও উঠানে গোপনে বাটি পুঁতিবার প্রথা আছে। রাঢ় অঞ্চলে পিতামাতার একমাত্র সন্তান কোনও বালিকা উলঙ্গ হইয়া এই কাজ করে। ডঃ অমলেন্দু মিত্র হইতে আরও একটি প্রক্রিয়ার কথা জানিতে পারিয়াছি ; ঘরের চালে ভাসুর ও ভাদ্রবধূর কুশ-পুত্তলিকা বাঁধিয়া রাখিলে অতিবৃষ্টি নিবারিত হয়। এই প্রক্রিয়ার নাম **'ভাসুর-ভৌসিন'**।

বাঁধনা [<বন্দনা, সাঁ° সহেরা]—গোবন্দনা উৎসব। ইহা দক্ষিণ পশ্চিম সীমান্ত বাংলার একটি প্রধান উৎসব। আদিবাসী এবং বর্ণহিন্দুদের অনেকেই ইহাতে যোগ দেয়। দেওয়ালী অমাবস্যার কয়েকদিন পূর্ব হইতে আরম্ভ হইয়া দ্বিতীয়া পর্যন্ত এই উৎসব চলে। এই কয়দিনই প্রতিটি গোরুর শিঙে ও কপালে সরিষার তেল মাখানো হয়, উহাদিগকে উদর পূর্ণ করিয়া খাইতে দেওয়া হয়। গৃহস্থের সেরা গোরুগুলির গলায় শালুকফুলের মালা ও মাথায় ধানের শীষের মুকুট শোভা পায়। অমাবস্যার দিন বিকালে 'দেহুরী' গঠপূজা করে ; রাত্রিতে গোয়ালে গোয়ালে প্রদীপ জ্বলে ; ঢাক ধামসা বাজে, নাচগান চলে, বাড়ি বাড়ি 'কপিলা মঙ্গল' কীর্তিত হয়। (২৮৪ পৃ দ্র)

বারোবান মারা-ম— কার্ত্তিক পূজার রাত্রিতে পূজার শেষে ব্রতিনীরা 'বারো বান মারা' নামে এক আচার পালন করেন। তাঁহারা প্রত্যেকে একগাছা পাট কি একগাছা লম্বা দড়ি হাতে লন এবং গানের ভিতর দিয়া মশা, মাছি, উলু, ইঁদুর, বাদুড়, পিঁপড়া ইত্যাদি বারোটি বানের (শত্রুর) নাম করিয়া উহাতে বারোটি গিঁট দেন।

'উলু বান্ধুম উলু বান্ধুম,
এক এক উলু মারে উষা কামানে দাগিয়া।'

—এই ধরনের গানের ভিতর দিয়া 'বারো বান মারা' উদ্‌যাপিত হয়।

বারান—বৎসরের যে কোনও নূতন খাদ্যবস্তু আগে গ্রামদেবতাকে নিবেদন করিয়া পরে গৃহকর্ত্রীর নিজের এবং পরিবারস্থ সকলের গ্রহণরূপ অনুষ্ঠান। পূর্ববঙ্গের কোন কোন অঞ্চলের প্রধান গ্রামদেবতা বনদুর্গা। সেখানে 'বনদুর্গার বারান'ই সমধিক প্রচলিত। নূতন ধানের চিড়া-গুঁড়া, নূতন ফলমূল, কখনো বা নূতনের ভাত-ব্যঞ্জন, কলার আগপাতায় করিয়া শেওড়া তলায় কি বটতলায় বনদুর্গার উদ্দেশে দিয়া আসা হয়। সাধারণের বিশ্বাস, বনদুর্গা কাকরূপে এই ভোগ গ্রহণ করেন।

বারের পূজা—শনি ও মঙ্গলবারে লৌকিক দেবতাদের যে পূজা হয়। নিত্য-পূজা—প্রতিদিনের পূজা।

বালু বাঁধা-ম—সন্তান কামনা করিয়া নিঃসন্তান দম্পতির বস্ত্রাঞ্চলে গিঁট দিয়া অষ্টমী-স্নান করা (ব্রহ্মপুত্র নদে) এবং স্ত্রীর আঁচলে বালি-বাঁধার অনুষ্ঠান বিঃ।

বেঙের বিবাহ—বৃষ্টি কামনা করিয়া দুইটি বেঙের মধ্যে গ্রামের কুমারীরা বিবাহের যে অভিনয় করে।

ভক্ত, ভক্তা, ভক্ত্যা—গাজন-সন্ন্যাসী; গাজনাদি উপলক্ষে যাহারা সাময়িক ভাবে সন্ন্যাসীর ব্রত গ্রহণ করে। সাধারণত উৎসবের কয়দিন ইহারা হবিষ্যান্ন ও ফল ভক্ষণ করে, গলায় মালার মত করিয়া সূত্রগুচ্ছ (উত্তরি) পরে এবং হাতে বেত রাখে। ইহাদের বালক ভক্তদিগকে 'বালাভক্ত' বলা হয়। লৌকিক দেবতার পূজারীদেরও কোথাও কোথাও 'ভক্ত্যা' বলিতে শুনা যায়।

ভর হওয়া—(পাঁতা নামা দ্র)।

ভাই ফোঁটা—ভ্রাতৃদ্বিতীয়া, অতীব মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান। কার্তিক মাসের শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে এই অনুষ্ঠান হয়। এইদিনে ভগিনী ভাইয়ের দীর্ঘজীবন কামনা করিয়া তাহার কপালে তিনবার চন্দনাদির ফোঁটা দেয় এবং তাহাকে বস্ত্র,

উপাদেয় আহার্য ইত্যাদি দ্বারা আপ্যায়িত করে। ফোঁটা দিবার সময় প্রত্যেকবার একরূপ মন্ত্র বা ছড়া বলিয়া মাটিতে × পূরণ চিহ্নের মত একটি দাগ কাটা হয়। আবৃত্ত ছড়ার নমুনা :

'যমুনা দেয় যমকে ফোঁটা, আমি দেই আমার ভাইয়ের কপালে ফোঁটা।
ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা,
যমের দুয়ারে পড়লো কাঁটা।'

কথিত হয়, যমের ভগিনী যমুনা এই দিনে যমকে ভাইফোঁটা দিয়াছিল। তাই ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার আর এক নাম 'যম দ্বিতীয়া।'

ভাঙন,ভাওন—ইহার সাধারণ অর্থ (১) ধস,নদ্যাদির পাড়ের মাটির স্থানচ্যুতি। (২) বাটা জাতীয় মৎস্য। কিন্তু আচার-অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে উত্তরবঙ্গে 'ভাঙন' বলিতে বুঝায়,—গম্ভীরা-উৎসবের বাজেট,—কত টাকা চাঁদা উঠিবে, কত খরচ হইবে ইত্যাদির আনুমানিক হিসাব।

ভাঁড়বোল-মু—"...সংবৎসরের প্রশংসনীয় ও নিন্দনীয় ঘটনাসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি-বর্গের কেচ্ছা সুর করিয়া গাওয়ার নাম "ভাঁড়বোল।" এক সময়ে পৌষমাসে এইসব গান গাওয়া হইত :

"ভাঁড়বোল ভাঁড়বোল...
উজিরেরা দুই ভাই
খায় মোরগের খানা।
কোয়া (রেশমের গুটি) চুরি ক'রে
উজির দিলে জরিমানা।"
(দ্র জঙ্গিপুর সংবাদ, ২৭ পৌষ, ১৩৬৫)।

ভাদু উৎসব—('দেবদেবীর নাম' ২য় খণ্ড দ্র)।

ভুঁজোন-মুস—অন্নপ্রাশন বিশেষ।

ভুলা পোড়ানি (পোড়ানো)—খড়কুটার একটি মূর্তি পোড়াইয়া গ্রাম হইতে আপদ-বালাই দূর করিবার অনুষ্ঠান বিশেষ। পূর্ব বাংলার বহু অঞ্চলে (ম. ত্রি. ঢা. ফ. ব.) কার্তিক সংক্রান্তির সন্ধ্যায় খড়কুটা দিয়া মানুষের মত একটা মূর্তি তৈয়ার করিয়া উহার মাথায় ধূপ, সরিষা, শুকনা পাটপাতা ও কয়েকটা মশা-মাছি রাখিয়া আগুন ধরাইয়া দেওয়া হয়। অতঃপর একজন সেই জলন্ত মূর্তিটিকে লইয়া চতুর্দিকে দৌড়ায়, আর চীৎকার করিয়া বলে—

'ভালা আইয়ে বুড়া যায়
মশা-মাছির মুখ পোড়া যায়।
দো! দো!! দো!!!'

ঐ সময় আর কয়েকজন কুলা পিটাইতে পিটাইতে তাহার পিছনে পিছনে ছুটে এবং 'দো দো' বলিতে থাকে। ঐরূপে পথে-প্রান্তরে আনাচে কানাচে অনেকক্ষণ ছুটিয়া দগ্ধপ্রায় মূর্তিটি মাঠে দাঁড়া করিয়া রাখা হয়। ইহার তাৎপর্য এই যে, 'আজ হইতে সুদিন সুমঙ্গল আসিতেছে, আপদবালাই সব দূর হইয়া যাইতেছে। অতএব আনন্দ কর, আনন্দ কর।' অবনীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন (বাংলার ব্রত), সুদূর Bohemia তেও এক সময় এইরূপ অনুষ্ঠান হইত। ঝড়ের একটি মূর্তি পোড়াইয়া ছেলেরা বলিত, আমরা আজ মৃত্যু ও অমঙ্গলকে গ্রাম হইতে বাহির করিয়া দিতেছি (বর্তমান 'লৌকিক শব্দকোষ' -কার লিখিত 'বসন্তোৎসব', মাসিক বসুমতী, ফাল্গুন, ১৩৬১ দ্র)।....ভুলা—ছোটনাগপুরের আদিবাসীদের ভাষায় 'ভুলা' অপদেবতা বিঃ (জ্ঞা. মো. দা.)।

ভেড়ার ঘর পোড়ানো—দোলপূর্ণিমার পূর্বদিন সন্ধ্যায় পশ্চিমবঙ্গ, বাংলাদেশ, ওড়িষা এবং আসামে যে চাঁচর (স° চর্চরী) বা বহ্ন্যুৎসব হয়, চলিত কথায় তাহাকে 'ভেড়ার ঘর পোড়ানো', কোথাও 'মেড়ার ঘর—', কোথাও বা 'বুড়ীর ঘর—' বলে (দ্র 'বসন্তোৎসব, মাসিক বসুমতী, ফাল্গুন, ১৩৬১)।

মল্লিদোষ—কাহারো সন্তান হইয়া না বাঁচিলে বলা হয়, উহাকে 'মল্লিদোষে' পাইয়াছে।

মাগন, মাঙন—আচার অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে 'মাগন' বলিতে বুঝায়, উদ্দিষ্ট অনুষ্ঠান সম্পাদনের জন্য পাড়া-পড়শীর বাড়ি হইতে চাল, পয়সা ইত্যাদি মাগিয়া (ভিক্ষা করিয়া) আনা (শীতলার মাগন, কুলের মাগন, বসন্‌রার মাগন)।

মানত, মানসিক—দেবতার কৃপায় অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে, এইরূপ আশা করিয়া তাঁহাকে কিছু দিবার সঙ্কল্প। মানত অনুসারে কেহ প্রতিমার চোখ সোনা দিয়া গড়াইয়া দেয়, কেহ বা 'ছলন' দেয়, কেহ বা সাড়ম্বর পূজার ব্যবস্থা করে।

মায়ের দয়া—বসন্ত রোগ। মায়ের দয়া হওয়া—বসন্ত রোগে আক্রান্ত হওয়া।

মাসীমার দৃষ্টি-ব—অলক্ষ্মীর দৃষ্টি। ইহার ফলে সংসারে সর্বদা খাই খাই, নাই নাই অবস্থার সৃষ্টি হয়।

মুখেভাত—অন্নপ্রাশন। তৎপর্যায়:—ভাত, ভাত খাওনি, ভুঁজোন-মু, ভাতছোঁয়ানি-মা, আইট ভাঙা-পা।

মুদাবাঁধা-পব—পুঁটুলি বাঁধা দ্র।

যাচাপান—ব্রত বিশেষ। এই ব্রতে দুই খিলি পান ভালভাবে সাজাইয়া পিতাকে খাইতে দিতে হয়।

যাত্রাপাতা—বিজয়া দশমীতে অনুষ্ঠেয় স্ত্রী-আচার বিশেষ। সেদিন ঘরদুয়ার, যাবতীয় জিনিসপত্র, বাসনকোসন, ধামাকুলা, ডেক্সবাক্স, খাট-আলমারি, অস্ত্র-শস্ত্র, যন্ত্রপাতি সমস্ত ধুইয়া-মুছিয়া পরিষ্কার করা হয় এবং প্রত্যেকটির গায়ে সিঁদুরের ফোঁটা দেওয়া হয়। গৃহিণীরা সেদিন বহুকালের সঞ্চিত সিঁদুর মাখানো টাকা-গিনি বাহির করেন এবং সেগুলির সঙ্গে আরও দুই চারিটি যোগ করিয়া সিঁদুরের ফোঁটা দিয়া মধ্যমপালার গোড়ায় অন্যান্য জিনিসপত্রের সঙ্গে সাজাইয়া রাখেন, ধূপদীপ জ্বালেন, সুখ সমৃদ্ধি কামনা করিয়া ভগবতীর উদ্দেশে প্রণাম করেন। এই অনুষ্ঠানকে পূর্ববঙ্গের বহু অঞ্চলে 'যাত্রাপাতা' বলে। কোথাও কোথাও ইহাতে দুইটি সিন্দূরলিপ্ত পুঁটি মাছও দেওয়া হয়।

রাম—ওজনের ক্ষেত্রে রাম অর্থ এক। ধান্যাদি মাপিবার সময় প্রায়ই এক সংখ্যা উল্লেখ না করিয়া তৎস্থলে 'রাম' বা 'লাভ' বলিতে শুনা যায়।

রামরামি—সাক্ষাৎকার ('দুই দলে বাঘে হইল রাম-রামি'-রায়মঙ্গল)।

রূপ হলুদ—পশ্চিমবঙ্গের একটি মেয়েলী ব্রতের নাম। এই ব্রতে একজন এয়োকে কপালে হলুদ বাটা ছোঁয়াইয়া চুল আঁচড়াইয়া ও সিঁদুর পরাইয়া দিতে এবং বিকালে ডাকিয়া আনিয়া খাওয়াইতে হয়। এই ব্রত করিলে ব্রতিনীর রূপ-লাবণ্য বৃদ্ধি পায়।

রোগচালনা—এই কথাটি পল্লীগ্রামে প্রায়ই শুনা যায়। গ্রামে কলেরা কি বসন্ত যখন মহামারীরূপে দেখা দেয়, তখন অনেককে ফকির-ওঝাদের শরণাপন্ন হইতে দেখা যায়। তাহারা নাকি নানা প্রক্রিয়ার সাহায্যে এক স্থানের রোগ অন্য স্থানে পাচার করিয়া দিতে পারে।

লখাডাক—('চাষ-আবাদ' দ্র)

লোটন—দেবতার প্রীত্যর্থে 'ভক্ত্যাদের' মাটির উপর গড়াগড়ি।

শনির দৃষ্টি—যখনই কোন পরিবারে অকারণ নানা বিপৎপাত ঘটে, অনাচার উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা দেয়, সাধুসজ্জন ব্যক্তিও কুরুচি কুনেশায় মত্ত হয়, পদে পদে দুঃখ বিড়ম্বনা ভোগ করে, তখনই সাধারণ লোক সেখানে, সেই ব্যক্তির উপরে শনির দৃষ্টি পড়িয়াছে মনে করে। 'শনির দৃষ্টি', 'রন্ধ্রগত শনি', 'কপালে শনি', 'শনির দশা' কথাগুলি লোক-সমাজে বহুপ্রচলিত।

শিথ্‌লানো, শিথ্‌লে দেওয়া, শিথ্‌লে রাখা [<শিথিল করা]—সধবা নারীর শাঁখা চুড়ি ইঃ সাময়িকভাবে খুলিয়া রাখিতে হইলে তাহারা 'খোলা' না বলিয়া 'শিথলানো' ইঃ কথা ব্যবহার করে। 'খোলা' শব্দ উচ্চারণের মধ্যে হয়ত তাহাদের মনে বৈধব্যের আশঙ্কা উঁকি দেয়, তাই বিষয়টি ঘুরাইয়া বলে। শিবায়নে 'শীতলিয়া রাখা' তথা ঠাণ্ডা করিয়া রাখা কথাটিও পাওয়া যায়: 'কঙ্কণাদি আভরণ শীতলিয়া রাখে' (বাগর্থ-ভট্টাচার্য দ্র)।

শিরনি, শিন্নি—পীরের দরগায় তথা পীরের উদ্দেশে নিবেদিত মিষ্টান্নাদি। সত্যনারায়ণের সেবায় বা পূজায় আটা ময়দা দুধ চিনি কলা ইত্যাদির যে মিশ্র-নৈবেদ্য দেওয়া হয়, তাহাকেও শিরণি বলা হয় ('শিন্নি দেইখ্যা আগুয়ায়, কুত্তা দেইখ্যা পাছায়'—প্রবাদ)।

শীতল দেওয়া—দেবতাকে সন্ধ্যাকালীন ভোগ দেওয়া। সাধারণত সন্ধ্যারতির পরই এই ভোগ (শীতল) দেওয়া হয়।

ষাট ষাট—ষষ্ঠীদেবী সন্তানকে রক্ষা করুন, সন্তানের যেন কোনও বিপদ না ঘটে—এইরূপ কামনাসূচক উক্তি; সন্তানের আপদবালাই নিবারণার্থ ষষ্ঠী-দেবীর নাম উচ্চারণ। সন্তান সম্পর্কে কোনও অমঙ্গলসূচক কথা উচ্চারিত হইলে, বিদেশস্থ সন্তানের নাম হঠাৎ মুখে আসিলে, সন্তান বিষম খাইলে বা হাঁচি দিলে মা অমনি বলিয়া উঠেন, 'ষাট ষাট'। বাংলার বহু অঞ্চলেই ব্রতিনীরা ষষ্ঠীর দূর্বা বা বাঁশের পাতা জলে ডুবাইয়া ঘটে ছিটা দেন এবং বারো মাসের বারো ষষ্ঠীর নাম বলিয়া পরিবারের সকলের উদ্দেশে 'ষাট ষাট' বলেন। এখানে পশ্চিমবঙ্গের অরণ্যষষ্ঠী ব্রতের একটি 'ষাট-মন্ত্র' উল্লেখ করিতেছি:— 'জ্যৈষ্ঠ মাসে অরণ্য ষাট। ফিরে ঘুরে এলো ষাট বার মাসে তের ষাট। ষাট ষাট ষাট॥ ঝি-চাকর, গোরুবাছুর, পশুপাখি, কর্তাছেলে, মেয়েবউ, নাতি-নাতনী, ষাট ষাট ষাট'॥ ....ষাট বাঁচানো—সন্তানাদির আপদবালাই নিবারণার্থ ষষ্ঠীদেবীর নাম উচ্চারণ করা। ষাট—ষষ্ঠীদেবী। ষষ্টি, ৬০ সংখ্যা।

ষেটের কোলে—ষষ্ঠীদেবীর কৃপায় (ষেটের কোলে বাচার আমার তিন বছর)।

ষেটেরা—সন্তানের জন্মের ষষ্ঠদিন রাত্রিতে সূতিকাষষ্ঠী বা জন্মষষ্ঠীর পূজা ইত্যাদি যেসব আচার অনুষ্ঠান পালন করা হয়। সে রাত্রিতে নাকি ভাগ্যবিধাতা সন্তানের কপালে তাহার ভাগ্যলিপি (জীবনে ভালমন্দ যাহা কিছু ঘটিবে তাহার বর্ণনা) লিখিয়া যান। এজন্য তাহার শিয়রে দোয়াতকলম রাখা হয়। রাঢ়ের কোথাও কোথাও আঁতুড়ঘরে গোমুণ্ডে ষষ্ঠীপূজা হইয়া থাকে।

সত্য সত্য—টিকটিকির শব্দের প্রত্যুক্তি। টিকটিকির ডাক শুনিয়া অনেক বৃদ্ধা মাটিতে টোকা দিয়া বলেন, 'সত্য সত্য।'

সহেলা, সয়লা, সইলায়া—স্ত্রীলোকদের মধ্যে সখিত্ব স্থাপনের উৎসব বিঃ (ষষ্ঠ অধ্যায়ে সই দ্র)।

সহলা>হয়লা>হ'লা-চট্ট (মুস)—বিবাহে কন্যাকে স্নান করাইবার সময় মেয়েরা অন্তঃপুরে যে সকল গান গায়।

সাঁজপূজনী ব্রত, সাঞ্জাব্রত—বালিকারা কার্তিক কিংবা অগ্রহায়ণের সংক্রান্তিতে সন্ধ্যাকালে নানারূপ ছড়া আবৃত্তি করিয়া বা গান গাহিয়া এই ব্রত উদ্‌যাপন করে। অনেক ছড়া ও গানের ভিতর দিয়া নারী জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হয়।....সাঁজ / সাঁঝ<সন্ধ্যা

সাধদেওয়া—দোহদদান, আসন্নপ্রসবাকে কোনও শুভদিনে আনুষ্ঠানিকভাবে অভিলষিত চর্ব্য চূষ্য লেহ্য পেয় এবং নববস্ত্রাদি দান। বাংলার বহু অঞ্চলে আশ্বিন সংক্রান্তিতে নানা উপকরণে পূর্ণগর্ভা ধানগাছকেও সাধ দিবার প্রথা আছে।

সিঁদুরখেলা [সিঁদুর<সিন্দুর]—বিজয়া দশমীর অপরাহ্নে মন্দির প্রাঙ্গণে, বা বারোয়ারি তলায় সম্মিলিত সধবাদের মধ্যে পরস্পরের কপালে ও সীমন্তে সিঁদুর লেপন।

সুন্নৎ [আ°]-মুস—লিঙ্গাগ্রের ত্বকছেদন অনুষ্ঠান। তৎপর্যায় :—খতনা, মুসলমানি।

সেঁজুতি—ছড়া ও আলপনাপ্রধান একটি কুমারীব্রত। অগ্রহায়ণ মাসভোর প্রত্যহ বিকালে নিকানো উঠানে এই ব্রত করা হয়। পিটুলি দিয়া শিব, কোঁড়া গুয়াগাছ, অশ্বত্থগাছ, কুলগাছ, পিঁড়ি, সিঁদুরচুপড়ি, ঢেঁকি, গোয়ালঘর ইত্যাদির ৪০-৫০ রকম চিত্র আঁকিয়া এক একটি চিত্রে দূর্বা ধরিয়া ছড়া বলা হয়। ছড়াগুলির ভিতর দিয়া নারীজীবনের নানা আশা আকাঙ্ক্ষা কামনা বাসনা ব্যক্ত হয়।

হত্যা দেওয়া—(ধরনা দেওয়া দ্র)।

হাড়বিষু-পূব—চৈত্র সংক্রান্তির পূর্বদিনকে বহু অঞ্চলে 'হাড়বিষু' বলা হয়। বৃদ্ধারা বলেন, এইদিন বর্ষাকালীন শাকসবজির বীজ পুঁতিলে হাড়ে হাড়ে ফল ধরে অর্থাৎ পর্যাপ্ত ফসল পাওয়া যায়। লোকবিশ্বাস, এইদিন মেঘ ডাকিলে সাপের ডিম নষ্ট হয় এবং নালিতা, নিম, নিসিন্দা, গিমা প্রভৃতি তিতো জিনিস খাইলে বিষবেদনার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়।

হোলবোল-ন, হোইলবইল-ব—এক প্রকার গ্রাম্য ছড়া ; ইহার আর এক নাম 'হলুই গান'। পৌষসংক্রান্তির কয়েকদিন পূর্ব হইতে কৃষাণ বালকেরা বেল বা বাবলা কাঁটার ডালে গাঁদা ফুল বিঁধাইয়া বাড়ি বাড়ি যায় এবং এই ছড়া আবৃত্তি করিয়া ডাল চাল পয়সা ইঃ সংগ্রহ করে। তদ্দ্বারা সংক্রান্তি দিন মহোল্লাসে চড়ুইভাতি হয়। গৃহস্থের বাড়িতে উপস্থিত হইয়াই সকলে সমস্বরে বলিয়া উঠে, 'হোলবোল'। তারপর মূলগায়েন ছড়ার পদগুলি আবৃত্তি করিয়া যায়, আর দোহার সকলে 'হোলবোল' বলিয়া সায় দেয়।

হোলির সঙ—বাংলার কোথাও কোথাও পঞ্চম দোলের দিন একটি বালককে গাধার টুপি পরাইয়া এবং সর্বাঙ্গে কাদা মাখাইয়া বাড়ি বাড়ি লইয়া যাওয়া হয়। বালক বৃদ্ধ অনেকেই ইহাতে যোগ দেয় এবং প্রতিবাড়ির বাহির আঙ্গিনায় জল ঢালিয়া কাদা করিয়া সকলে হোলিগানে মত্ত হয়, কাদা ছড়ায়, কাদায় গড়াগড়ি দেয়। গানগুলি অনেকক্ষেত্রে শালীনতার গণ্ডি অতিক্রম করিয়া আদিরসাত্মক হইয়া উঠে। হোলি সম্পর্কিত এইরূপ আচার-আচরণের একনাম 'হোলির সঙ'। যে বালকটি সং সাজে, তাহাকে হোলির রাজা বলা হয়। গুজরাট এবং মধ্যভারতের স্থানে স্থানেও 'হোলির সঙ' বাহির করিবার প্রথা আছে।

[**বাঁধনা**—২৭৭ পৃ দ্র]

গোরু ঘুটানো বা **নাচানো** বাঁধনার শেষ পর্ব। দ্বিতীয়াতে উহা অনুষ্ঠিত হয়। গোরুগুলিকে শক্ত খুঁটিতে বাঁধিয়া গোরু বা ছাগলের চামড়া গায় দিয়া পাচনবাড়ি হাতে উহাদিগকে ভয় দেখানো হয়। তৎসঙ্গে চলে ঢাক ঢোল মাদল ইঃর বাজনা, নানা বিষয়ক গান। ভয়ে গোরুগুলি তখন ছুটিয়া পলাইবার জন্য লাফালাফি শুরু করে ; ইহাতে সমবেত দর্শকমণ্ডলীর উল্লাসের সীমা থাকে না।

দশম অধ্যায়

বাংলা ক্রিয়াপদ

[ধাতু রূপান্তরিত হইয়া ক্রিয়াপদ উৎপন্ন করে। এই অধ্যায়ে ক্রিয়াপদের সহিত তাহাদের উৎপাদক ধাতুগুলি কদাচিৎ দেওয়া হইয়াছে। "আচার্য্য যোগেশচন্দ্র ধাতুনির্ণয়ের সরল উপায় দিয়াছেন—উত্তমপুরুষের বর্তমান কালের ধাতুরূপ হইতে শেষের ই বাদ দিলে যাহা থাকে তাহা ধাতু। যথা—'আমি করি (√কর্), আমি করাই (√করা)।" আশা করি **'চলন্তিকা'** হইতে উদ্ধৃত এই কথা কয়টি স্মরণ রাখিলে অতঃপর বিবৃত ক্রিয়াপদগুলির ধাতুনির্ণয়ে অসুবিধা হইবে না]।

অকলানো, অকটানো—ওয়াক তোলা, বমির ভাব প্রকাশ করা।

অর্শা, অর্শানো—বর্তা, বর্তানো। উত্তরাধিকার কিংবা অন্য কোনও সূত্রে প্রাপ্য হওয়া (পিতার সম্পত্তি পুত্রকন্যাকে অর্শে)। স্পর্শ করা, লাগা (গরীবের অভিশাপ নিশ্চয়ই অর্শিবে)।

অলকরানো, অলছানো—ওলানো, নামানো, অলান-ম।

আউলানো—আলুলায়িত করা বা হওয়া ('আউলাইল কুন্তল মোর সত্বর গমনে'-শ্রীকৃ)। অব্যবস্থ করা ('বাশীর শবদেঁ মো আউলাইলোঁ রান্ধন'-শ্রীকৃ)।

আঁউসানো-মে—হাত বুলাইয়া দেওয়া।

আউজানো, আওজানো—ভেজানো, বন্ধকরা (কপাট—)।

আউটানো, আওটানো—তরল পদার্থ জ্বাল দিয়া নাড়িয়া-নাড়িয়া ঘন করা (দুধ—)।

আওড়ানো—আবৃত্তি করা। বারবার পাঠ করা।

আওরানো—টন্ টন্ করা (ফোড়াটা বড্ড আওরাচ্ছে)।

আওসানো—ভেজাইয়া দেওয়া, ধাক্কা দিয়া বন্ধ করা।

আঁককাড়া-বাঁ—দাগ কাটা।

আঁকড়ানো—জড়াইয়া ধরা।....আঁকড়াআঁকড়ি—জড়াজড়ি।

আখলানো, আখালানো—ধৌত করা।

আগবাড়ানো—কোনও বিষয়ে অভিজ্ঞ না হইলেও সকলের আগে তাহাতে হাত দেওয়া। প্রথম ধান কাটার অনুষ্ঠান বিঃ।

আগলানো—পাহারা দেওয়া। অনিষ্ট হইতে রক্ষা করা (ফসল—)।

অবরোধ করা, বাধাদানের জন্য অপেক্ষা করা (তাকে ধরবার জন্য সে পথ আগ্‌লে বসে আছে)।

আগানো—এগনো, অগ্রসর হওয়া (বর্তমানে দেশ অনেক এগিয়ে গেছে)।

আওড়ে ধরা—শক্ত করিয়া ধরা।

আঙলানো—আঙুল দিয়া ঘাঁটা, ঘাঁটাঘাঁটি করা।....আঙলাআঙলি—খোঁচাখুঁচি।

আঁচ করা—অনুমান করা, to guess.

আঁচানো—উচ্ছিষ্ট হাতমুখ ধোয়া। আচমন করা।

আছড়ানো—জলের ছিটাছড়া দেওয়া। উপরে তুলিয়া নীচে সজোরে নিক্ষেপ করা (ওকে আছড়িয়ে মার)।

আজড়ানো—ভাণ্ড খালি করা। নিঃশেষ করা।

আজ্জানো—বীজ বপন বা বৃক্ষাদি রোপণ করা ('ক্ষেতে আজ্জায় কপালে ফলে'-প্র)।

আঞ্জা—অস্ত্রাদি দ্বারা মাছ তরকারি ইঃর গায় অগভীর সমান্তরাল দাগ কাটা (ভাজার জন্য কইমাছ আঞ্জা)।....আঞ্জা—দুই বাহুর বেষ্টনী (এক আঞ্জা খড়)।....আঞ্জাইয়া ধরা—দুই বাহু দ্বারা বেষ্টন করিয়া ধরা।

আঁটা—আঁট করা, শক্ত করা (গিঁটটা আরো আঁটাও)। গঁদ দিয়া জোড়া লাগানো। স্থান হওয়া (এত ছোট ঘরে কি সব জিনিস আঁটে ?)। দমন করা, স্বমতে আনা (তাকে আঁটা সহজ নয়)।....আঁটাআঁটি—বাঁধাবাঁধি।

আঁড়লানো-মে—হাতড়ানো।

আড়ি করা-বাঁ—কাজে আলস্য করা। **আড়িপাতা**—লুকাইয়া শোনা।

আড়ে খুন্তায় লাগা-বাঁ—নাছোড়বান্দা হইয়া লাগিয়া থাকা। সর্বতোভাবে শত্রুতা করা। তুঃ কণ্ঠে পরাণে লাগা-ম।

আত্তি করা—কাজ করা। ঔৎসুক্য প্রকাশ করা। দুঃখ করা।

আফসানো—আস্ফালন করা। আফসোস করা।

আমরানো—উত্তাপে ম্লান হইয়া যাওয়া।

আমলানো—টকিয়া যাওয়া, খাদ্যাদি পচিয়া উঠা।

আলানো-য. মে—অম্লযুক্ত হওয়া।....অলেই যাইছে-মে—বাসি হইয়া গিয়াছে।

ইটানো / ইটনো—ঢিল ছোড়া।....ইটাইটি—ঢিলাঢিলি। বাংলার বহু অঞ্চলে 'ইটা' বলিতে ঢিল বুঝায়।

উকটানো, উটকানো—তন্ন তন্ন করিয়া খোঁজা।

উখড়ানো / উখড়নো, ওখড়ানো—উৎপাটন করা (আগাছা—)।

উগরানো / উগরনো, ওগরানো—উদগিরণ করা, বমি করা। চাপে পড়িয়া গৃহীত দ্রব্য ফেরত দেওয়া। ঘাস আগাছা ইঃ উৎপাটন অর্থেও কোথাও কোথাও 'উগরান্' শব্দের ব্যবহার আছে।

উগানো—আদায় করা, সংগ্রহ করা (খাজনা—, বাকি—)।

উঙানো—তন্দ্রাবিষ্ট হইয়া বসিয়া বসিয়া ঢোলা।

উচটানো—পায়ের মাথা দিয়া আঘাত করা।....উচোট, হোঁচট—stumble.

উঁচলানো—চালুনির সাহায্যে তুষ চোকল ইঃ পৃথক করা, sift. তন্ন তন্ন করিয়া খোঁজা।

উঁচানো / উঁচনো, ওঁচানো—উপর দিকে তোলা (লাঠি —)।

উছলানো-মে—বমি করা (লোকটা উছলেছে)। উছলিয়া পড়া, overflow.

উজড়ানো—নিঃশেষ করা, ধ্বংস করা। খালি করা (ভাণ্ড—)।....উজাড়——নিঃশেষ, ধ্বংস।

উজানো / উজনো—স্রোতের বিপরীত দিকে যাওয়া; গা-ঢাকা দিয়া চলিয়া যাওয়া।

উটকানো / উটকনো, ওটকানো—জিনিসপত্র উলটপালট করিয়া খোঁজা।

উতরানো / উতরনো, ওতরানো—অবতরণ করা। উত্তীর্ণ হওয়া (পরীক্ষায়—)।-মে—দুধ গরম করা।

উতো দেওয়া-চ. য. খু—ভিজা কাঠ ইঃ শুকাইবার জন্য রান্নার পর উনানের উপর রাখিয়া দেওয়া।....উতা / উতো—উত্তাপ। আউতা—অনুত্তাপ।

উনা—গলা, উত্তাপে দ্রবীভূত হওয়া।....উনা—কম ('উনা ভাতে দুনা বল, অতি ভাতে রসাতল'-প্র)।

উনানো—গলানো (ঘি—)।

উপড়ানো / উপড়নো, ওপড়ানো—উৎপাটন করা (আগাছা—)।

উপাড় আনা-মে—সম্বন্ধ আনা, পাত্র-পাত্রীর খবর আনা।

উবচানো / উবচনো—উপচানো, আধার প্লাবিত করিয়া বাহিরে পড়া।

উবরানো / উবরনো—উদ্বৃত্ত হওয়া (নিমন্ত্রণ বাড়িতে ডাল তরকারি—)।

উবা—অদৃশ্য হওয়া, হাওয়ার সঙ্গে মিশিয়া যাওয়া (কর্পূর উবে যায়)।

উভরানো-মে—উপুড় করা, ঢালা, pour,

উলসানো / উলসনো—উল্লসিত হওয়া (উলসে ওঠা)।

উলানো—লেলানো (কুকুর—)।

উশানো—সিদ্ধ করা (ধান—)।

উশুরা-বী—বিকীর্ণ করা, ছড়াইয়া দেওয়া (ভিজা ধান উশুরে দেওয়া)।

উসকানো / উসকনো, ওসকানো—বাড়াইয়া দেওয়া (প্রদীপের সলতে—)। উত্তেজিত করা, to incite (বৈরী নাগাদের উসকাচ্ছে)।

একজাই করা—একুনে হিসাব করা।

এড়ানো / এড়নো—বর্জন করা, to avoid (দেনদার মহাজনকে এড়িয়ে চলে)। লঙ্ঘন করা (সে আমার কথা এড়াতে পারবে না)।

এলানো—মেলিয়া দেওয়া, আলুলায়িত করা ('শ্রাবণ-গগন, ঘোর ঘনঘটা, তামসী যামিনী এলায়েছে জটা'-র)। চিড়া কুটিবার সময় ঢেঁকির গড়ে জট পাকানো চিড়াগুলি হাত দিয়া বার বার নাড়িয়া চাড়িয়া দেওয়া।

এলিয়ে যাওয়া-বা—খারাপ হওয়া।

ওলানো—নামানো (ঘট—)।

ওসানো—ধান ভানিতে গড়ে ধান দেওয়া (ধান ওসানো)।

ককানো—আর্তনাদ করা।....ককানি, কুকানি—আর্তনাদ।

কচটানো কষটানো—হাত দিয়া চটকানো, মাখা। রগড়াইয়া ধোয়া, to rinse.

কচলানো—হাতদিয়া মাখা (ভাত—)। রগড়ানো (চোখ—)।

কড়কানো—ধমক দেওয়া, তিরস্কার করা।

কড়মড়ানো—কড়মড় করা, রাগে দাঁতে দাঁত ঘষা।

কদরানো-রাঢ়—আপন মনে বকা।

কপচানো—শেখানো বুলি আওড়ানো। ছাঁটা (চুল কপচানো)।

কবলানো—কবুল (স্বীকার) করানো।....কবুল [আ°]—স্বীকার।

কষা, কসা—শক্ত করা, to tighten (বাঁধনটা আরো কষ)। কষ্টিপাথরে ঘষিয়া সোনা পরীক্ষা করা (সোনা—)। অঙ্ককরা (অঙ্ক—)। অল্প তেলে ভাজা (মাংস—)। কোনও পণ্যের দর নির্ধারণ করা (দর—)।

কাঁচানো—পাকা অবস্থা হইতে কাঁচা অবস্থায় ফিরাইয়া আনা (পাশা খেলায় গুটি কাঁচানো)।

কাছড়ানো—উপরে তুলিয়া সবলে নীচে নিক্ষেপ করা।

কাছা—বস্ত্রাদি গুটাইয়া পরা।

কাছানো—নিকটবর্তী হওয়া ; আসন্ন হওয়া ('তর মরণ কাছাইছে'-ম)।

কাটা—কর্তন করা (গাছ—)। খনন করা (পুকুর—)। খণ্ডন করা (কথা—)। অতিবাহিত হওয়া (সময়—)। দূর হওয়া (বিপদ—)। বাজারে চলা (মাল কাটা)। বিন্যাস করা (সিঁথি—)। দুই আঙুলের নখ একত্র করিয়া টিপুনি দেওয়া (চিমটি—)। নিঃসৃত হওয়া (গোরুটার মুখ থেকে লাল কাটছে)।····কাটাকাটি—খুনোখুনি।····কাটাকুটি—লেখা ইঃ সংশোধন (লেখায় এত কাটাকুটি কর কেন)।

কাড়া—ছিনাইয়া লওয়া। টানিয়া বাহির করা (খড়ের গাদা হইতে খড়—)। পরিষ্কার করা (গোহাল কাড়া)। প্রথম ব্যবহার করা (অশৌচান্তে নূতন হাঁড়ি—)। ····কাড়ানো—অঙ্গীকার করানো।

কাঁড়া—গড়ে ফেলিয়া ঢেঁকির পাড়ে চাল হইতে তুষকণা দূর করা (ভিক্ষার চাল কাঁড়া আর আকাঁড়া)।

কাঁড়ানো-মে—আঁচড়ানো।

কান্দানো-ম—কলার কাঁদি হইতে ছড়াগুলি পৃথক করা। কাঁদানো।

কাবানো-মে—চীৎকার করা। **কামানো**—ক্ষৌরিকরা। উপার্জন করা।

কালানো—হাত পা ঠাণ্ডা হইয়া যাওয়া (কালিয়ে যাওয়া)।

কিরা কাড়া—শপথ করা। **কু-কাটা**—কাহারও অনিষ্ট চিন্তা করা।

কুটা / কোটা—কাটিয়া টুকরা টুকরা করা (মাছ—, তরকারি—)। ছেঁচা, পিষ্ট করা (হলুদ—, কুল—, চিড়া—)।

কুলানো / কুলনো—প্রয়োজনানুরূপ হওয়া (দশ টাকায় কুলুবে না)।

কোঁকানো-মে—ককানো, আর্তনাদ করা।

কেচা—থেঁতো করা।····কেচা—থেঁতো করা বাঁশ (কেচার বেড়া)।

কোঁকড়ানো / কুঁকড়নো—কুঞ্চিত করা বা হওয়া (লজ্জাবতীর পাতা ছোঁয়ামাত্র কুঁকড়ে যায়)।

কোঁচকানো / কুঁচকনো—কোঁকড়ানো, to wrinkle

কোঁচানো—কুঞ্চিত করা, to pleat (কাপড়—)।

কোদলানো—কোদাল দিয়া মাটি কোপানো।

কোদা, কোঁদা, কুদা, কুঁদা—অঙ্গ সঞ্চালন পূর্বক তর্জনগর্জন (নাচাকুদা)।

কোঁদা / কুঁদা—যন্ত্রের সাহায্যে কাটিয়া কারুকার্যমণ্ডিত করা।

কোরা—কুরুনি দিয়া চাঁচা (নারিকেল—)। **ক্ষীরানো**—দুধ দোহন করা।

খড়ি পাড়া / -পাতা—অঙ্কপাত করা, হিসাব করা ('মিছা খড়ি পাড় কাহ্নাঞি কপট নাটে'—শ্রীকৃ)।

খণ্ডানো—ব্যতিক্রম করা ('অদৃষ্টের লিখন খণ্ডাবে কোন্‌জন ?')

খতানো—হিসাব করা (খতিয়ে দেখা)।

খরানো—বেশি ভাজা হওয়া, প্রায় পুড়িয়া যাওয়ার মত অবস্থা হওয়া (চাল খরাইয়া গেলে মুড়ি ভাল হয় না)।

খলানো—বাসনকোসন ইঃ জলমাজা করা, জলে চুবাইয়া ঘষিয়া ধোয়া।

খপখপানো—খপ খপ শব্দ করা (নূতন জলে মাছ খপখপায়)। রাগে গজ গজ করা। **খসা**—বিচ্যুত হওয়া। আলগা হইয়া পড়া। নিঃসৃত হওয়া।

খাউজানো—চুলকানো, নখ দিয়া ক্ষত স্থান আঁচড়ানো।

খাটা—পরিশ্রম করা। মানানসই হওয়া (পাঞ্জাবির সঙ্গে বুট খাটে না)। ফলপ্রসূ হওয়া (এবিষয়ে তার কথা খাটবে না)। ভাড়া খাটা (তার পাঁচখানা জাল-নৌকা খাটছে)। **খাটানো**—কাজে নিয়োগ করা (জন খাটানো)। ব্যবসায় ইঃ তে নিয়োগ করা (টাকা—, ভাড়া—)। টাঙানো (মশারি—)। বিন্যস্ত করা (তাঁবু—)।

খাবলানো—খাবল দেওয়া, খাবল মারা ; হাতের কোষ পরিমাণ কোনও জিনিস উঠাইয়া লওয়া।… খাবল, খাবলা—হাতের কোষ, খাবা (এক খাবলা ময়দা—হাতের কোষে যে পরিমাণ ধরে সেই পরিমাণ ময়দা)।….খাবলা খাবলা—অনেক পরিমাণ ('নিজের বেলায় খাবলা খাবলা, পরের বেলায় রত্তি'-প্র)।

খামচানো, খিমচানো—নখ দ্বারা আঁচড়ানো।

খিঁচা / খেঁচা—জোরে টানিয়া ধরা (বাঁশটা খিঁচে ধর)। আক্ষেপযুক্ত হওয়া (রোগীর হাত পা খিঁচছে)।

খিচানো / খিচনো, খিঁচনো—বিরূপ অঙ্গভঙ্গি করা (মুখ—)।….খেঁচুনি / খিচনি—তড়কা রোগ, convulsion….খিঁচুনি / খিচনি—ভেংচানি, ভেংচি।

খিচড়ানো, খিজড়ানো—আঙুল বা কাঠি দ্বারা কোন কিছু (আবর্জনাদি) খোঁচানো।

খুঁড়া / খোঁড়া—খনন করা (পুকুর—)। গর্ত করা (মাটি—)। মাটিতে ঠোকা (মাথা—)। প্রশংসার ছলে কোনও সুস্থ ব্যক্তির অনিষ্ট করা ('সাঁজের

প্রদীপ নড়েচড়ে, যে আমার খোকামণিকে খোঁড়ে, তার মুখখানি পোড়ে'-ন)। **খুদা / খোদা**—খনন করা (পুকুর—)। কাটিয়া কারুকার্য মণ্ডিত করা to engrave. **খেদানো**—তাড়াইয়া দেওয়া।

খেপা—রাগান্বিত হওয়া (পাগল খেপেছে)। দূরে নিক্ষেপ করা [জাল (খেপলা জাল) খেপা]।....**খেপানো**—রাগানো, উত্ত্যক্ত করা (পাগলকে—)।

খেয়া দেওয়া, খিয়া দেওয়া—নৌকা দ্বারা পারাপার করা।

খোঁচানো—খোঁচা দেওয়া, সূক্ষ্মাগ্র কোনও বস্তু দ্বারা গুঁতা দেওয়া। বিনা কারণে উত্ত্যক্ত করা (খোঁচাইয়া ঝগড়া করা)।

খোসলানো—খোসা ছাড়ানো, to peel.

গগানো—যন্ত্রণাসূচক শব্দ করা।

গছা—গ্রহণ করা ('তোকে মাটিতে যেন গছে না'—মেয়েলী অভিসম্পাত)।

গছানো—ন্যস্ত করা ; কৌশলে কোনও কিছু গ্রহণ করিতে বাধ্য করা (বন্দী মাল গছানো)। **গজড়ানো**—রাগে গজড়্ গজড়্ করা।

গজানো—উদ্গত হওয়া, অঙ্কুরিত হওয়া (ধানের চারা)। মাথায় আসা (বুদ্ধি)। প্রাদুর্ভূত হওয়া (বর্তমানে চারদিকে অনেক রাজনৈতিক দল গজাচ্ছে)।

গতানো—গছানো, গ্রহণ করানো।

গঁধা—গন্ধ বাহির হওয়া (গঁধাছে-মে)।

গবরানো-মে—কলম দিয়া হিজিবিজি আঁকা।

গলা—তরল হওয়া। দ্রব হওয়া। পচা। ফাটিয়া যাওয়া (ফোড়া—)। নিঃসৃত হওয়া। প্রবেশ করা, ঢোকা।....**গলানো**—তরল করা। ঢোকানো। ফাটানো। নিবিষ্ট করা (তার সব কিছুতেই মাথা গলানো চাই)।

গাইছানো-মে—শস্যক্ষেত্রের আগাছা উৎপাটন করা।

গাওয়া—গান করা। রটনা করা (কুৎসা—)।

গা করা—গায়ে মাথা, যথোচিত মনোযোগ দেওয়া।

গাঙানো-বী—চীৎকার করা। √গাঙা।....গাঁ গাঁ—গো মহিষাদির ডাক।

গাঁজা—মাতিয়া উঠা (খেজুর রস—)। ঠাসিয়া ভরা (বাক্সে কাপড়চোপড় গাঁজা)।....**গাঁজানো**—সন্ধিত করা। মদে পরিণত করা।

গাড়া—পোঁতা (খুঁটি—)। ....নিংড়ানো (গামছা—)। ....শিকড় গাড়া—শিকড় মাটিতে প্রবিষ্ট করা। স্থায়ী হইয়া বসা। ....আড্ডাগাড়া—আড্ডা জমানো, আড্ডা স্থাপন করা।....হাঁটুগাড়া—হাঁটু মুড়িয়া বসা।

গাঁথা √গাঁথ্ <গ্রন্থ্—গ্রন্থন করা, তন্তুযুক্ত করা, to string (মালা—)। সন্নিবদ্ধ করা (দেয়ালে ইট গাঁথা)। অনুপ্রবিষ্ট হওয়া (মর্মে)। রচনা করা (ছড়া—)।

গাদা—ঠাসা, ঠাসিয়া ভরা (বন্দুকে বারুদ গাদা)।....গাদা বন্দুক—যে বন্দুকের নলে বারুদ ঠাসিয়া ভরিতে হয়।...গাদানো √গাদা।

গাবা, গাবানো—দূষিত জলে ঝাঁকে ঝাঁকে মাছের ভাসিয়া উঠা এবং খাবি খাওয়া। ধাতু নির্মিত বাসনপত্রে একরূপ দাগ পড়া।

গাবা, গাবানো—গর্ব করা to vaunt (সে বড্ড গাবায়)।

গালা √গাল্ <গল্—নিষ্কাশিত করা (ভাতের ফেন—)। ফাটাইয়া দেওয়া (ফোড়া) ;....গালা—শিঙি টেংরা ই:র কাঁটার আঘাত (শিঙির গালা বড়ই কষ্টদায়ক)।....গালা মারা, গালা দেওয়া—শিঙি ই:র কাঁটায় খোঁচা মারা।

গিজড়ানো—দাঁত বাহির করিয়া হাসা।

গিলা / গেলা √গিল্ <গিল্, গির্—গলাধঃকরণ করা। খাওয়া (বিদ্রূপে—'পিণ্ডি গেলা')। **গিলানো / গিলনো, গেলানো**—গলাধঃকরণ করানো। খাওয়ানো।

গুজরানো—অতিবাহিত করা (দিন—)।

গুটানো / গুটনো, গোটানো √গুটা <গুড়্—জড়াইয়া লওয়া (নাটাইয়ে সুতা—)। জড় করা (কাগজপত্র—)। টানিয়া সঙ্কুচিত করা (আস্তিন—)। কারবার বন্ধ করা (কারবার—)

গুড়ানো / গুড়নো √গুড়া <গুড়্—কুড়ানো, জড় করা (বকুল ফুল—)।

গুঁড়ানো / গুঁড়নো √গুঁড়া <গুণ্ড্—গুঁড়া করা, চূর্ণ করা।

গুড়ি মারা—হাত পা গুটাইয়া জড়সড় হইয়া থাকা, to creep, to cower,

গুণ করা—ওষুধ করা (গুণ করে ভেড়া বানানো)।

গুমরানো / গুমরনো—শোক দুঃখ ই:র বেগ চাপিয়া রাখিয়া নীরবে যন্ত্রণা ভোগ করা।

গুমসানো / গুমসনো—গুমট করা, যুগপৎ গরম ও বাতাসের অভাব হইতে অস্বস্তিকর অবস্থার সৃষ্টি হওয়া। ভাপসা গন্ধ ছাড়া (শস্যাদি স্তূপীকৃত থাকিয়া প্রায় পচিয়া উঠিলে যেরূপ গন্ধ বাহির হয়)।

গুমানো—কাঁচা শস্যাদি স্তূপীকৃত থাকিয়া ভাপসা গন্ধযুক্ত হওয়া।

গুরুলে যাওয়া—গুলিয়ে যাওয়া। মাথায় না আসা।

গুল মারা—ধাপ্পা দেওয়া। মিথ্যা কথা বলা।

গেঁজানো—এক কথা বার বার বলিয়া বিরক্ত করা।

গোঙানো, গেঙানো—মুমূর্ষু অবস্থায় গোঁ গোঁ শব্দ করা।

ঘনানো—কাছে আসা, নিকটবর্তী হওয়া। গাঢ় করা।

ঘবড়ানো, ঘাবড়ানো—হতবুদ্ধি হওয়া।

ঘষটানো√ঘষটা, **ঘষড়ানো**√ঘষ্‌ড়া<ঘৃষ্‌—ক্রমাগত ঘষিয়া যাওয়া। তেমন যোগ্যতা না থাকিলেও কোনও বিষয়ে সফলকাম হইবার জন্য ক্রমাগত চেষ্টা করা।....ঘষ্টিঘর্ষনা ('তৎসংক্রান্ত ঘষ্টিঘর্ষনা এইরূপ হইতে লাগিল'—আঘচ্)।

ঘাঁটা√ঘাঁট<ঘট্ট—নাড়াচাড়া করা।.... **ঘাঁটানো**—উত্তেজিত করা (আমাকে ঘাঁটাবে না)।

ঘাপানো—গালাগালি দেওয়া (এত ঘাপাও কেন?)

ঘামা—ঘর্মাক্ত হওয়া।....**ঘামানো**—প্রতিমায় রং দেওয়া শেষ করিয়া গর্জন তৈল দ্বারা উহার ঔজ্জ্বল্য বাড়ানো (প্রতিমা ঘামানো)। চালনা করা, বুদ্ধি খরচ করা (মাথা—)।

ঘুচা / ঘোচা—বিলুপ্ত হওয়া, অপগত হওয়া (সম্বন্ধ—, দুঃখ—)।...**ঘুচানো ঘুচনো, ঘোচানো**—লোপ করা, দূর করা। উন্মুক্ত করা, খোলা (দরজা—)। উচ্ছিষ্টাদি পরিষ্কার করা।

ঘুরা / ঘোরা√ঘুর্<ঘূর্ণ—বেড়ানো। ছোটাছুটি করা (কাজের ধান্ধায়—)। ঘূর্ণিত হওয়া (মাথা—)।....**ঘুরানো / ঘুরনো, ঘোরানো**—ঘূর্ণিত করা, চক্রাকারে কোনকিছু চালনা করা (চরকা—, লাট্টু—)। মিছামিছি বার বার আসিতে বাধ্য করা (পাওনাদারকে—)। বেড়াইয়া আনা (খোকাকে একবার ঘুরিয়ে আন)।

ঘেটকানো-বাঁ—ঘোলা করা (জল—)।

ঘেঁতানো—এক কথা বার বার বলিয়া বিরক্ত করা।

চকসানো—চকাস করা, (বাদলার পর) আকাশ পরিষ্কার হওয়া।

চটক্কানো—মাখা, থাসা (ময়দা—)।

চড়া—উপরে উঠা, আরোহণ করা। মূল্য বৃদ্ধি হওয়া।....বাড়ি চড়া—বাড়িতে আসিয়া আক্রমণ।

চড়ানো—উপরে তোলা। জিনিসপত্রের দাম বাড়ানো। চাপানো (উনুনে হাঁড়ি—)। চপেটাঘাত করা।

চরকটানো-মে—বিশৃঙ্খল ও অপরিষ্কৃত করিয়া রাখা।

চলকানো—উপচাইয়া পড়া, to fall out (পূর্ণ পাত্র হইতে জল—)।

চাগানো—চাঙ্গা করা, অবসাদ হইতে মুক্ত করা, উত্তেজিত করা। উপর দিকে তুলিয়া ধরা (বেড়াটা একটু চাগাও)।

চানকানো—চমকানো। মাছ তরকারি মশলা ইঃ অল্প ভাজা করা। অবসাদ দূর করা, শরীর চাঙ্গা করা। প্রতিমার চক্ষুদান করা।

চারানো—চারানি করিয়া দেওয়া, ভাগ করিয়া দেওয়া (খরচপত্র সকলের মধ্যে চারিয়ে দাও)। ছড়ানো।

চালা—চালুনির সাহায্যে তুষ কুঁড়া ইঃ পৃথক করা (খৈ—, আটা—)। চালনা করা, (ঘুঁটি—)। চালিত করা (বাটি—)।....**চালানো**—গতিশীল করা, চালনা করা (কল—)। পরিচালনা করা (কারবার—)। চালু করা (বাজারে নূতন মাল—)। গছানো (রদ্দীমাল—)। নির্বাহ করা (কম টাকায় সংসার—)।

চিকরানো—চেঁচানো, চীৎকার করা। **চিক্কুর মারা**—বিদ্যুৎ চমকানো।

চিতানো / চিতনো—চিৎ হইয়া শোয়া। বুক ফুলাইয়া চলা।

চিপড়ানো—নিংড়ানো। **চিপসানো**—চুপসানো দ্র।

চিপা—নিংড়ানো (গামছা—)।

চিমড়ানো—শুকাইয়া অস্থিচর্মসার হওয়া।

চিল্লানো—চীৎকার করা।....চিল্লাচিল্লি—চেঁচামেচি।

চুকা / চোকা—শেষ হওয়া (ব্যাপার—, সম্বন্ধ—)। দূরীভূত হওয়া (আপদ—)। মিটিয়া যাওয়া (বিবাদ—)।....**চুকানো / চুকনো, চোকানো**—শেষ করা, মেটানো (ঝগড়াঝাটি—)। পরিশোধ করা (দেনা—)। চুক্তি করা কোনও কাজ করাইবার পূর্বে মজুরি ঠিক করিয়া দেওয়া।

চুটিয়ে বলা—মিন মিন না করিয়া জোরের সহিত বলা।....চুটিয়ে কাজ করা—মনোযোগ দিয়া শক্তি প্রয়োগ করিয়া কাজ করা। (চুটানো / চুটনো)।

চুপসানো / চুপসনো, চোপসানো—তুবড়াইয়া যাওয়া, কুঞ্চিত হওয়া, to get shrivelled (চোপসা গাল)। শোষিত হওয়া ও ছড়াইয়া পড়া (চোষ কাগজে কালি চোপসায়)।

চুবানো / চুবনো, চোবানো—ঝট্ করিয়া জলে ডোবানো (বলির পূর্বে পাঁঠাকে জলে চুবিয়ে আনা)।....নাকানি চোবানি খাওয়া—জব্দ হওয়া।

চুমরানো—কার্যসিদ্ধির জন্য চাটুবাক্য বলা। গোঁফে তা দেওয়া (গোঁফ—)।

চুয়ানো/চুয়নো, চোয়ানো √চুয়া<চ্যু—বিন্দু বিন্দু করিয়া ক্ষরিত হওয়া বা করা (কলসী থেকে জল চোয়াচ্ছে)। চোলাই করা, to distil (মদ—)।

চুলকানো / চুলকনো—নখ দ্বারা আঁচড়ানো (মাথা—, খোসপাঁচড়া—)।

চুলবুলানো—চলিয়া যাইবার জন্য অস্থিরতা প্রকাশ করা।....চুলবুলে—চঞ্চল।

চেরা, চিরা,—বিদীর্ণ করা, ফাড়া (পেট—, কাঠ—, বাঁশ—)। ফাঁক করা।

....**চেরানো, চিরানো**—বিদীর্ণ করানো, ফাড়ানো।

চোখানো √চোখা<চোক্ষ—তীক্ষ্ণ করা, মুখ সরু করা (পেন্সিল—)।

....চোখা—তীক্ষ্ণ ; সরুমুখা (চোখা অস্ত্র)। ঝাঁজালো (লোকটা বড় চোখা চোখা কথা বলে)। তোখড়, চালাক (চোখা লোক)।

চোটানো—আঘাত করা, কোপানো (কুড়ুল দিয়ে—, কোদাল দিয়ে—, লাঠি দিয়ে—)। ধমকানো, ক্রোধ প্রকাশ করা, চোটপাট করা।

চোপানো—অস্ত্রাদি দ্বারা কোপানো। খোড়া।...চোপ—কোপ, দা কুড়াল খাঁড়া ইঃর আঘাত।

চোবলানো—চোষা (পাকা আম—)। ছোবল মারা।

চোয়ানো চুঁয়ানো—ঈষৎ দগ্ধ করা।....চোঁয়া ঢেকুর—অম্ল উদগার।

চৌদ্দ পোয়া হওয়া—সটান লম্বা হইয়া শোয়া....চৌদ্দ পোয়া—সাড়ে তিন হাত (বাঙালীর গড় উচ্চতা, height)।

ছটকানো—বিক্ষিপ্ত হওয়া। সরিয়া যাওয়া (কিউ থেকে ছট্‌কে পড়া)।

ছড়া—আঁচড়াইয়া যাওয়া—(কুলকাঁটায় হাতট ছড়ে গেছে)।....**ছড়ানো** √ছড়া ছিটানো। ইতস্তত নিক্ষেপ করা।

ছাওয়া √ছাহ্<ছদ্—আচ্ছাদিত করা (চাল—)।....**ছাওয়ানো** √ছাহা।

ছাঁটা—কাঁচি দ্বারা মানানসই করিয়া কাটা (চুল—)। ঢেঁকির সাহায্যে চাল হইতে তুষকণা পৃথক করা (চাল—)। গাছের ঘন ডালপালা কাটিয়া ছাট করা (ভাদ্রের শেষে কাঁঠালগাছ ছেঁটে দিতে হয়)।

ছাড়া √ছাড়্<ছর্দ্—ত্যাগ করা (চাকরি—)। বন্ধন মুক্ত করা (গোরু—)। বদল করা (বাসি কাপড়—)। অব্যাহতি দেওয়া (চোরকে ছেড়ে দেওয়া)। দূর হওয়া (জ্বর ছেড়েছে)। চীৎকার করা (গলা—)। কোথাও হইতে

প্রস্থান করা (তিনি বাড়ি ছেড়েছেন আজ দু'মাস)। চলিতে আরম্ভ করা (এতক্ষণে ট্রেন ছেড়ে গেছে)। বাদ দেওয়া (উচিত কথা বলতে সে বাপকেও ছাড়ে না)।....**ছাড়ানো**—তাড়ানো (ভূত—)। মুক্ত করানো (হাজত থেকে—)। পৃথক করা (কলার খোসা—, পাঁঠার ছাল—)।

ছাঁদা—দড়ি দিয়া শক্ত করিয়া বাঁধা, দোহনকালে গাভীর পিছনের পা বাঁধা। পত্তন করা (ব্যবসা ছাঁদা)।

ছানা—মাখা, চটকাইয়া মাখা (ময়দা—)।....ছানামাখা।

ছাপা—মুদ্রিত করা (বই—, কাপড়—)। উপচাইয়া উঠা (পুকুর ছেপে উঠেছে)। গোপন করা (তল্লাসিতে কিছুই পাওয়া যায় নি, মাল সব ছেপে ফেলেছে)।....লুকাছাপা—গোপন (সত্য লুকাছাপা থাকে না)।

ছাবানো—পুরাতন পুকুর ডোবা ইঃর পাঁক তোলা।

ছিটকানো / ছিটকনো—বিক্ষিপ্ত হওয়া, ছড়াইয়া পড়া (ভাজনা খোলা হইতে খই ছিটকিয়ে পড়া)।

ছিটানো / ছিটনো—ছড়ানো, to sprinkle (জল—, কাদা—)।

ছিনানো / ছিননো—কাড়িয়া লওয়া।... ছিনতাই—বলপূর্বক গ্রহণ।

ছিদেমকষা-ন—প্রাপ্যের কিছুটা দেওয়া।

ছিপছিপানো—টিপ টিপ করিয়া বৃষ্টি পড়া (সারাদিন ছিপছিপাচ্ছে)।

ছিপা, ছিপানো / ছিপনো—গোপন করা, to hide.

ছেওয়ানো [ছে<ছেদ—খণ্ড]—খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটা (কাঠ—)।

ছেঁকা—নরম আঁচে অল্প তেলে ভাজা।....ছেঁকা দেওয়া—শরীরে তপ্ত কিছু ছোঁয়াইয়া ক্ষত করা। **ছেঁচড়ানো**—মাটিতে ফেলিয়া জোরে টানিয়া নেওয়া।

ছেঁচা—থেঁতো করা, পিষ্ট করা (হলুদ—)। সেচন করা (জল—)।

ছেঁচুড় পাড়া—পাছা মাটিতে ঠেকাইয়া হাতের তালুতে ভর করিয়া চলা।

ছেঁড়া ছিঁড়া √ছিড়্<ছিন্দ্—ছিন্ন করা, ফাড়া (কাগজ—, কাপড়—)। বিচ্ছিন্ন করা, টানিয়া তোলা (চুল—, গাছের পাতা—)। বিকৃত হওয়া (দুধ ছেঁড়া)। মোচড় দেওয়া (কান—)।

ছেপানো——থু থু ফেলা।....ছেপ—থুথু।

ছোঁচ দেওয়া—জল ছড়া দেওয়া (সকাল সন্ধ্যায় দুয়ারে—)।

ছোঁচা—জলশৌচ করা।....**ছোঁচানো**—জলশৌচ করানো (মলত্যাগের পর শিশুকে—)।

ছোপানো, ছোবানো—রঞ্জিত করা (কাপড়—)।....ছোপ—দাগ (জামাটার পানের ছোপ লেগেছে)।

ছোবলানো—ছোবল মারা, সাপের মত কামড়ানো, to bite as a snake.

ছোলা—খোসা ছাড়ানো (আলু—)। ছাল ছাড়ানো (পাঁঠা—)। চাঁচা (কোদাল দ্বারা উঠানের দূর্বাঘাস—)।....ছোলা—ডালশস্য বিঃ।

জড়ানো—পেঁচানো, গোটানো (নাটাইয়ে সুতা—)। আবৃত করা, বেষ্টন করা (কাগজ দিয়ে—, গায়ে চাদর—)। জাপটাইয়া ধরা (সে ভয়ে তাকে জড়িয়ে ধরল)। লিপ্ত হওয়া (মোকদ্দমায়—)।

জমকানো—জাঁকিয়া বসা, জাঁক জমকের সহিত অবস্থান করা।

জাওরানো—জাবর কাটা (গোরুটা জাওরাচ্ছে)।

জাড়া—শীত লাগা (জাড়াছে-মে)। **জালানো**—অঙ্কুরিত হওয়া (বীজ—)।

জারা√জার্ <জৄ—জারিত করা (সোনা—)।....**জারানো**—জারিত করানো।

জিগানো / জিগনো—জিজ্ঞাসা করা (সে কি জিগাইল ?)

জি(জী)য়ানো / জি(জী)য়নো—বাঁচাইয়া তোলা (সাপে কাটা মরা—)। জ্যান্ত রাখা, বাঁচাইয়া রাখা (মাছ—)।

জিরানো / জিরনো—বিশ্রাম করা (একটু জিরিয়ে নে)।

জিলকানো—বিদ্যুৎ চমকানো (আকাশ জিলকাচ্ছে)। বাংলার বহু অঞ্চলে বিদ্যুৎকে 'জিল্‌কি' বলা হয়। মনে হয় শব্দটি আ° জিল্লা (ঔজ্জ্বল্য) হইতে আসিয়াছে।

জুড়ানো / জুড়নো—ঠাণ্ডা করা বা হওয়া ('দুধ দেব জুড়িয়ে'। তার কথায় প্রাণ জুড়ায়)। শান্ত হওয়া ('খোকা ঘুমাল পাড়া জুড়াল')। তৃপ্ত হওয়া (রূপ দেখে চোখ জুড়ায়)। শান্তি পাওয়া (তুই মলে আমার হাড় জুড়ুবে)।

জুবড়ানো / জুবড়নো, জোবড়ানো—বেশি ভিজিয়া যাওয়া (বৃষ্টিতে জামা-কাপড় সব জুবড়ে গেছে)। ধেবড়ানো, অস্পষ্ট হওয়া (লেখা জুবড়ে যাওয়া)।

জুবানো-বাঁ<বুজানো—বুজাইয়া দেওয়া।

জো করা—ওষুধ করা, তুকতাক করা।....জো—উপায়। সুবিধা।...জোকাল—চাষের উপযুক্ত সময়।

জোখা—মাপা, দৈর্ঘ্য প্রস্থাদি নির্ণয় করা।....মাপজোখ (ঘরের—)।

জোতা—যুক্ত করা, এক সঙ্গে বাঁধা (জোয়ালে হেলে জোতা)।

ঝটকানো—'অস্ত্রের আঘাতে দ্বিধা করা'-র।

ঝলকানো—মুহূর্তকাল তীব্র আলোক প্রকাশ করা (বিদ্যুৎ ঝলকাচ্ছে)।

ঝলসানো—আগুনে পোড়ার মত জ্বালা করা (গরম হাওয়ায় সারা শরীর ঝলসে যাচ্ছে)। তীব্র আলোকে দৃষ্টি বিভ্রম ঘটানো (গাড়ির লাইটটা সকলের চোখ ঝলসে দিলে)। কাঁচা মাংস ইঃ ঈষৎ দগ্ধ করা, to roast.

ঝাঁকড়ানো—নাড়া দেওয়া (গাছ—)। দোলায়িত করা (সে কেবলই মাথা ঝাঁকড়াতে লাগল)।

ঝাঁজানো—'তীব্রতা উৎপাদন'-র (লঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে ভর্জিত দ্রব্য ঝাঁজানো)।

ঝাঁটানো—ঝাঁটা মারা। ঝাঁটা দিয়া পরিষ্কার করা (উঠান—)।

ঝাড়া—ঝাড়ন ইঃর সাহায্যে ধুলাবালি দূর করা (বিছানা—)। খড়কুটা হইতে শস্য, শস্যাদি হইতে তুষকণা ইঃ পৃথক করা (পাটায় ধান ঝাড়া। কুলা দিয়া চাল ডাল ঝাড়া)। মন্ত্র পড়িয়া ভূত রোগ বিষ ইঃ দূর করা।....গায়ের ঝাল ঝাড়া—গালি দিয়া ক্রোধ, উত্তেজনা লাঘব করা।....টাকা ঝাড়া—টাক ফেলা, টাকা খরচ করা।....নাক ঝাড়া—নাক হইতে শিকনি ফেলা।...মুখ ঝাড়া—অপ্রীতিকর কথা বলা।

ঝামটানো—ধমক দেওয়া। মুখ নাড়া, ভর্ৎসনা করা।

ঝামরানো—জল ভারাক্রান্ত মেঘের ন্যায় হওয়া (সর্দিতে মুখ ঝামরে গেছে)। ম্লান এবং বিবর্ণ হওয়া ('ঝলকত দামিনী মালা। ঝামরি ভৈ গেল বালা।' —গোবিন্দ দাস)।

ঝালা—পান (solder) দিয়া ধাতু দ্রব্য জোড়া দেওয়া। পুরাতন পুকুর ডোবা ইঃ র পাঁক তোলা (পুকুর—)।....ঝালানো।

ঝিমানো / ঝিমনো—তন্দ্রা বা নেশাঘোরে ঢোলা। মৃদু বৃষ্টিপাত হওয়া (আকাশ ঝিমুচ্ছে)। ঝুঁট খাওয়া-মে—হোঁচট খাওয়া।

ঝোড়া—ডালপালা কাটিয়া ছোট করা (ভাদ্রে কাঁঠালগাছ ঝুড়ে দিতে হয়)।

টকা—টকিয়া যাওয়া (দাঁত—)। পচিয়া ওঠা (গরমে বাসি ডাল—)।

টপকানো—ডিঙানো, to jump over (দেওয়াল—)।

টলা√টল্ <টল্—এদিক ওদিক করিয়া যাওয়া (লোকটা টলতে টলতে যাচ্ছে, বোধ হয় মাল খেয়েছে)। বিচলিত হওয়া (মন—)। অন্যথা হওয়া (তার কথা কিছুতেই টলবে না)।...**টলানো**—বিচলিত করা। অন্যরূপ করানো।

টলকানো—কচুপাতার বা পদ্মপাতার জলের মত হঠাৎ পড়িয়া যাওয়া।

টসকানো-বাঁ—নাড়ানো। নষ্ট হওয়া, ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়া (শরীর তার একেবারে টসকে গেছে)।

টাঁকা√টাঁক<তর্ক্—মেসিনে সেলাই করিবার পূর্বে হাতে সেলাই করিয়া কাটা কাপড় জুড়িয়া লওয়া। অমঙ্গলের প্রতীক্ষা করা।....টাঁক—লুব্ধ দৃষ্টি।

টাটানো—টন টন করা (ফোড়াটা বড্ড টাটাচ্ছে)। ঈর্ষান্বিত হওয়া (প্রতিবেশীর সুখৈশ্বর্য দেখে চোখ—)।

টাবানো—চারে মাছ আনিবার উদ্দেশ্যে ছিপের মাথা দিয়া জলে ঘা দেওয়া।

টালকানো—ঠাণ্ডা হওয়া।....টালকা—ঠাণ্ডা (বাসি টালকা ভাত)।

টালানো-ফ. ব.—বিরক্ত করা। -বাঁ—গালে থাপ্পড় মারা।

টিঁহিকানো-মে—উঁকি মারা।

টুকা / টোকা—লিখিয়া লওয়া (ওর নাম ধাম সব টুকে নাও)। বই দেখিয়া নকল করা (টুকে পাশ করা)। পরের দোষ ধরা (পরকে টোকা)। ....টোকাটুকি।

টুটা√টুট<ত্রুট্—ভগ্ন হওয়া (ঘটি—)। কমা, হ্রাস পাওয়া। দূর হওয়া (তার গর্ব টুটে গেছে)। বিরক্ত হওয়া ('হর তোকে মনে টুটে'-কবিক)।

টুকানো / টোকানো—কুড়ানো, মাটি হইতে তুলিয়া লওয়া (বকুল ফুল)।

টুয়ানো / টোয়ানো—ইঙ্গিতে অগ্রসর হইতে নির্দেশ দেওয়া (টুইয়ে দেওয়া)। চুপি চুপি ভালভাবে লক্ষ্য করা। **টুসানো**—ঢুঁ মারা।

ঠাস মারা—ফিক ধরা (কোমরে—)।

ঠিক দেওয়া—অঙ্ক যোগ করা।

ঠাহরানো, ঠাওরানো—বুঝিয়া উঠা, স্থির করা (আমি তো কিছুই ঠাওরাতে পারছিনে)।

ঠিকরানো / ঠিকরনো—পাত্র হইতে ছিটকাইয়া পড়া। বিচ্ছুরিত হওয়া (জানলা দিয়ে আলো ঠিকরে পড়ছে)।

ডবডবানো—দাম্ভিকতা প্রকাশ করা।

ডরানো—ভয় পাওয়া, ভয় করা।....ডর—ভয়।

ডাংড়ানো—গোমহিষাদিকে নির্দয়ভাবে প্রহার করা।

ডাকা—শব্দ করা (কাক ডাকছে ক্বা-কা)। আহ্বান করা (ডাক্তার ডাক)। গর্জন করা (মেঘ ডাকছে)। সম্বোধন করা (বাবাকে বাবু ডাকা)। প্রার্থনা

করা (ভগবানকে ডাকা)। স্ত্রীপশুর সঙ্গম ইচ্ছা প্রকাশ করা (চার বছর পর বক্‌নাটা ডাকল)।

ডাবা—নীচের দিকে বসিয়া যাওয়া (চালের মাঝখানটা ডেবে গেছে)। প্রবিষ্ট হওয়া (ছুরিটা হৃৎপিণ্ড পর্যন্ত ডেবে গেছে)।…**ডাবানো**—প্রবেশ করানো। নীচের দিকে হেলাইয়া দেওয়া।

ডালানো—অনাবশ্যক ডালপালা ছাঁটাইয়া দেওয়া।

ডুকরানো / ড্‌করনো—চীৎকার করিয়া কাঁদা। সজোরে ডাকা (ষাঁড়টা বড্ড ডুকরাচ্ছে)।

ড্‌মানো / ড্‌মনো—খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটা।….ডুম—খণ্ড (কাঠের—)।

ডেরি দেওয়া—ধোয়া থালাবাসন দেয়ালের গায়ে হেলাইয়া রাখা।

ডেঁহি যাওয়া-মে—ডিঙাইয়া যাওয়া।

ঢলা—হেলিয়া পড়া। কাহারো দিকে ঝোঁকা (সে কংগ্রেসের দিকে ঢলেছে)।

ঢলানো—কেলেঙ্কারি করা, সুরুচিতে বাজে এইরূপ কাজ করা।….ঢলাঢলি নীতি বিগর্হিত আচরণ। যে পুরুষ এইরূপ আচরণ করে তাহাকে বলা হয় 'ঢলানে', স্ত্রীলোক হইলে 'ঢলানী' (পাড়া ঢলানী)।

ঢালা—কোনও জিনিস এক পাত্র হইতে অন্য পাত্রে পাতিত বা নিষ্কাশিত করা (শিশি হইতে বৈয়ামে ঘি ঢালা)।….**ঢালানো**—উপর হইতে মাটি ইঃ কাটিয়া নীচের দিকে ছড়াইয়া দেওয়া (মাটি—)।

ঢিপানো—ঢিকানো, আস্তে আস্তে কাজ করা।….যে সব কাজই আস্তে আস্তে করে—ঢিপাই পণ্ডিত (বিদ্রূপে)।

ঢিলানো / ঢিলনো—ঢিল ছোঁড়া। **ঢু ঢু করা**—বৃথা কাজে ফিরা।

ঢুঁড়া / ঢোঁড়া√ঢুঁড়্‌<ঢুন্‌ঢ্‌—এদিক ওদিক খোঁজা। বেড়ানো।….ঢুঁড়ঢুড়ানী—পাড়া-বেড়ানী, যে রমণী বাড়ি বাড়ি বিনা কাজে বেড়ায়।

ঢ্‌সানো / ঢ্‌সনো—ঢুঁ মারা, মাথা বা শিং দিয়া গুঁতা মারা।

ঢেঁকরানো ঢেঁকরনো—উদগার তোলা।….ঢেঁকুর, ঢেকুর—উদ্‌গার।

ঢেকরানো-পূব—পাড়ায় পাড়ায় অনর্থক ঘুরিয়া বেড়ানো।….ঢেকুর—উদ্দেশ্য হীন ভ্রমণ।….ঢেকুরা—যে উদ্দেশ্যহীনভাবে এ বাড়ি ও বাড়ি ঘুরে ফিরে।

ঢোয়া—জিনিসপত্র একস্থান হইতে অন্যস্থানে বহন করা।…ঢোয়ানো—বহন করানো।….ঢোয়াই, ঢোলাই—বহন কার্য।

তকরার করা [আ° তকরার]—বিবাদ করা।

তকোল্লবি করা-বী—সত্য গোপন পূর্বক প্রতারণা করা।

তড়কানো—হাত পা খিঁচা, আক্ষেপযুক্ত হওয়া।....তড়কা—শিশুদের আক্ষেপ রোগ।

তড়পানো—আস্ফালন করা, অতিশয় উৎসাহ প্রকাশ করা।

তড়বড়ানো—ব্যস্ততা প্রকাশ করা।

তত্ত্বকরা, তত্ত্ব লওয়া—খোঁজখবর লওয়া।   **তলানো**-বাঁ—বমি করা।

তাংড়ানো—উদ্ধার করা। সঞ্চয় করা।

তাকুত করা / তাউত করা-মুস—সেবাশুশ্রূষার ভিতর দিয়া সুস্থ করিয়া তোলা।

তাড়া √ তাড়্ <তড়্—দ্রুতবেগে যাওয়া, আক্রমণার্থ পশ্চাদ্ধাবন করা (বাঘটা তেড়ে আসছে। সে তার দিকে তেড়ে গেল)। পতিত জমি আবাদ করিবার জন্য কোদলানো (জমি তাড়া)।....তাড়ানো—তাড়াইয়া দেওয়া, বিদায় করা। চরানো (গোরু—)।

তাপানো√তাপা<তপ্—তাপ লওয়া, গরম করা, রোদ বা আগুন পোয়ানো।

তিষ্ঠা√তিষ্ঠ্—বাস করা, শান্তিতে থাকা (সে কোথাও তিষ্ঠিতে পারে না)। তিষ্ঠানো / তিষ্ঠনো√তিষ্ঠা—শান্তিতে থাকিতে দেওয়া (ছেলেটাকে কোথাও তিষ্ঠুতে দেয় না)।

তুবড়ানো / তুবড়নো, তোবড়ানো—টোল খাওয়া, চুপসাইয়া যাওয়া।.... তোবড়া—বসা ('ঠাকুমার তোবড়া গাল')।

তেওড়ানো—বাঁকিয়া যাওয়া (তক্তাটা তেওড়ে গেছে)।

তেরিমেরি করা-পুব—বিরূপ আচরণ প্রকাশ করা।

থ বনা—হতভম্ব হওয়া।

থকা—থামা, নিরস্ত হওয়া। পরিশ্রান্ত হওয়া (থকে যাওয়া)।

থমকানো—হঠাৎ নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া পড়া, (সে থমকে দাঁড়াল)।....থমক —হঠাৎ স্থিরতা, sudden stop.

থিতানো / থিতনো—তরল পদার্থের ময়লা ইঃ আস্তে আস্তে তলায় পড়া।

থুবড়ানো / থুবড়নো—উপুড় হইয়া পড়া (সে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল)।

থ্যোড়া, থোরা—কুচি কুচি করিয়া কাটা, to mince (মাংস—)। সূক্ষ্মভাবে কোপানো (বেড়ার জন্য ফাঁপা বাঁশ থোড়া)।

দগ্ধানো—দগ্ধ করা। সন্তপ্ত করা বা হওয়া (দগ্ধে মারছে। দগ্ধে মরছি)।

দমা√দম্<দম্—দমিয়া যাওয়া, নিরুৎসাহ হওয়া।

দর্শা—ঘটা, হওয়া (প্রয়োজন দর্শে)।...**দর্শানো**√দর্শা—দেখানো (কারণ দর্শাও)।

দলা√দল্<দল্—দলন করা, পদদলিত করা।...দলানো—দলিত করানো।

দলা করা পূব—জমানো, স্তূপীকৃত করা। ....দলা—পিণ্ডাকার বস্তু (ভাতের)। মাটি ('কলারে দলা হলুদরে ছাই'-চট্ট)।

দশা পাওয়া—ভাবাবেশে জ্ঞানশূন্য হওয়া। **দাও মারা**—সুযোগমত সহজে লাভ করা।

দাওয়া—পক্ক ধান্যাদি কাটা (ধান দাওয়া)।....দাওয়া <দার্বট—বারান্দা।

দাঁড়ানো—দণ্ডায়মান হওয়া। জমা, স্থির হইয়া থাকা (রাস্তায় জল দাঁড়িয়ে গেছে)। সবুর করা, থামা (দাঁড়াও, দেখছি কি হয়েছে)। প্রতিষ্ঠিত হওয়া (তার ছেলেরা সব দাঁড়িয়ে গেছে)।

দাগা—দাগ দেওয়া, চিহ্নিত করা। তপ্ত লৌহশলাকাদি দ্বারা ছেঁকা দেওয়া (গোরু—)। ছোড়া (কামান—)। বিবিধ শব্দ দ্র।

দাপানো—দাপট দেখানো (দাপিয়ে চলা)।...দাপাদাপি—লাফালাফি; আস্ফালন। **দাবড়ানো**—ধমকানো, দাবড়ি দেওয়া।

দাবানো—দমন করা (দাবিয়ে রাখা)।

দামাটি ঘুরনো-ন— অন্যায়ভাবে আধিপত্য বজায় রাখিয়া চলা।

দামুড়ে খাওয়া / দোমাড়ে খাওয়া-বী—কোনরূপ বাছবিচার না করিয়া খাওয়া (গোরুটা দামুড়ে খায়)।

দিক করা, দিগদারি করা-মে—বিরক্ত করা, ব্যতিব্যস্ত করা।

দিশা লাগা—দিগভ্রম হওয়া। **দুখানো**-বী—হাত পা কন কন করা।

দুমড়ানো / দুমড়নো, দোমড়ানো—বাঁকা করা বা বাঁকিয়া যাওয়া। ভাঁজ করা। মোচড় দেওয়া। **দোমত করা**—ভাঁজ করা।

দোয়া / দোহা√দুহ্‌<দুহ্‌—দোহন করা, to milk (গাই—)।

ধসা√ধস্<ধ্বস্—ধসিয়া পড়া, ভাঙিয়া পড়া (নদীর পাড়—)।

ধসকানো—ভাঙিয়া পড়া, শিথিল হওয়া (রোগে শরীর ধসকে গেছে)।

ধাতানো—ভর্ৎসনা করা, ধমক দেওয়া।...ধাতানি—ধমক্, ভর্ৎসনা।

ধামসানো—তন্ন তন্ন করিয়া খোঁজা, বিছানাপত্র উলটপালট করা।

ধারা—ঋণী হওয়া, to owe (আমি তার কাছে পাঁচ টাকা ধারি)।

ধারানো—অস্ত্রাদি পাথরে ঘষিয়া কিংবা শান দিয়া ধারাল করা।

ধোঁকা—রুগ্ন শরীরে ঘন ঘন নিঃশ্বাস প্রশ্বাস ফেলা, হাঁপানো।

ধোনা √ধুন্ < ধ্বন্—একরূপ যন্ত্রদ্বারা তুলার জট ছাড়ানো এবং ধুলাবালি পরিষ্কার করা (তুলা ধোনা)।....ধুনরী—যে তুলা ধুনে, ধুনকর।

নড়া—আন্দোলিত হওয়া ('জল পড়ে পাতা নড়ে')। শিথিল হওয়া, কিঞ্চৎ স্থানচ্যুত হওয়া (দাঁত—)। সরা, এক স্থান হইতে কিঞ্চিৎ দূরে অন্য স্থানে যাওয়া (সে আর ঘর থেকে নড়তে চায় না)। অন্যথা হওয়া (কথা যেন নড়ে না)।

নাই দেওয়া [নাই<স্নেহ]—প্রশ্রয় দেওয়া (কুকুরকে নাই দিলে মাথায় ওঠে)।

নামা √নাম্<নম্—অবতরণ করা, উপর হইতে নীচে আসা বা যাওয়া। পতিত হওয়া (বৃষ্টি—)। ভেদ হওয়া (পেট নামা)। কমা (জ্বর নামা, দর—)। বসিয়া যাওয়া, নীচের দিকে হেলিয়া পড়া (ঘরের চালটা নেমে গেছে)। হীন হওয়া (দেখি, সে কদ্দূর নামতে পারে)। নামানো √ নামা।

নিংড়ানো / নিংড়নো—মোচড় দিয়া আর্দ্র বস্ত্রাদি হইতে জল বাহির করা।

নিকচানো, নিকটানো / নিটকানো—নির্লজ্জের মত হাসা, কাহাকেও ব্যঙ্গ করিয়া হাসা। **নিকলানো**—বাহির করা।

পাত্রের তলায় পড়িয়া থাকা তরল পদার্থের শেষটুকু ঢালিয়া বাহির করা।

নিকানো / নিকনো—জল মাটি গোবর ইঃ দ্বারা উঠান মেঝে দেওয়াল ইঃ লেপা। ভিজা স্তাতা দিয়া ঘর দুয়ার মোছা (ঘর—)।

নিকুচিকরা—শেষ করা, খতম করা।

নিকেশ হওয়া—সর্বস্বান্ত হওয়া ('ওটা ধর্ম ধর্ম করিয়া নিকেশ হবে'—আঘদ্)।

নিছানো / নিছনো—মাঙ্গলিক দ্রব্য দ্বারা বরণীয় ব্যক্তির অঙ্গ মোছানো (উদ্দেশ্য—আপদবালাই দূর করা)।....নিছনি ডালা—বরণডালা।

নিড়ানো / নিড়নো—পরিষ্কার করা। নিড়ানি দ্বারা শস্যক্ষেত্রের ঘাস আগাছা ইঃ উৎপাটন করা।

নিবড়া—শেষ হওয়া ('এগার নিবড়ে যখন বারতে প্রবেশ'-কৃত্তিবাস)।

নুঁচা—চুলকানো (গা নুঁচতে নুঁচতে কথা বলা বড় বিশ্রী ঠেকে)।

নেংচানো—খোঁড়াইয়া চলা।

নেতানো—অবসন্ন হইয়া পড়া, খুব দুর্বল হইয়া পড়া (নেতিয়ে পড়েছে)।

পচরানো-মে—জিজ্ঞাসা করা।

পটা—বশবর্তী হওয়া, রাজি হওয়া (সে পটেছে)। **পটানো**—রাজি করানো, স্বমতে আনা।

পটকানো—পরাস্ত করা বা হওয়া। রোগে পড়া।....রোগাপটকা।

পদানো—প্রশংসা করা। বাগাড়ম্বর করা (খুব যে পদাচ্ছিস্)।

পঁয়ষট্টি দেওয়া-ন—পলায়ন করা।

পরখানো—পরীক্ষা করা (বন্ধুকে পরখাও)।

পলা—বঁটি কাটারি ইঃ দ্বারা ডাঁসা ফল কেচা কেচা করা (আম পলা)।

পলানো-রাঢ়—নূতন ধান বাড়ি আসার মুখে উঠান আঙিনার সংস্কার সাধন করা (আগনে পলানো)। পলায়ন করা।

পস্তানো—কোনও ভুল বা অন্যায় কার্যের জন্য অনুতাপ করা।

পঁহরানো-মে—সাঁতার কাটা।

পাকড়ানো—ধরা, সবলে ধরা (পকেটমার—)। কোনও কাজ উদ্ধারের জন্য কাহারো পিছনে লাগিয়া থাকা (বড়বাবুকে পাকড়াও, হয়ে যাবে)।....ধরপাকড় —গ্রেপ্তার এবং আটক।

পাকলানো—চোখ রাঙানো, বীরত্ব প্রকাশ করা। দন্তহীনদের কোনকিছু চিবানো।....পাকাল্যা—বীরত্ব ('বীরের পাকাল্যা দেখি / রাজা বড় হৈলা সুখী'-কবিক)।

পাখলানো—ধোয়া, প্রক্ষালন করা।....ধোয়াপাখলা।

পাছড়ানো—কুলা দিয়া শস্যাদি ঝাড়িয়া কুটাকণা কাঁকর ইঃ পৃথক করা। আছাড় দেওয়া, জাপটাইয়া ধরা।....পাছড়াপাছড়ি—জাপটাজাপটি।

পাজানো—জাবর কাটা। **পাঁজানো**-বী—ধার দেওয়া।

পাতন দেওয়া—আড়ি পাতা, লুকাইয়া শোনা।

পানান—দোহন করিবার পূর্বে হাতে বাঁট টানিয়া বা বাছুর দিয়া টানাইয়া বাঁট শক্ত করা তথা পালানে দুধ নামানো। কখনো দোহন করা অর্থেও পানানো ব্যবহৃত হয় (গাই পানান)।

পারশ করা—ভাতের থালা সাজাইয়া ভোক্তার সমুখে রাখা ; পরিবেশন করা।

পালটানো—বদলানো, পরিবর্তিত হওয়া বা করা (দিন পালটাচ্ছে। কথা তিনি কখনো পালটাবেন না)। উলটাইয়া দেওয়া (ভাজিবার কালে মাছ —)।

পাশানো—তাস খেলায় 'পাশ দেওয়া'।

পিঁজা / পেঁজা √পিজ্, পিন্জ্—তুলা ইঃর বীচি ও আঁশ টানিয়া টানিয়া পৃথক করা (তুলা পেঁজা)।

পিটপিটানো—বার বার চোখ মেলা ও বোঁজা।

পিতপিতানো-পূব—কাজে অকাজে কাহারো প্রতি সর্বদা বিরক্তি প্রকাশ করা।

পিঁধা / পিন্ধা—পরিধান করা (কাপড়—)।

পিলপিলানো—পিল পিল করা ; পিপীলিকার ন্যায় বহুর সমাবেশ হওয়া (বিয়ে বাড়ি লোকে পিলপিলাচ্ছে)।

পেচাল পাড়া—এক কথা বারবার বলা। বাজে বকা।

পেরনো—নদ্যাদি পার হওয়া ; অতিক্রম করা। অতিবাহিত হওয়া (বছর—)।

পোষা √পুষ্<পুষ্—পালন করা (গোরু—)।...**পোষানো**—সংকুলান হওয়া (পাঁচ টাকায় পোষাবে না)। মনের মিল হওয়া, বনিবনাও হওয়া।

পোহানো / পোয়ানো—প্রভাত হওয়া ('রাত পোহাল')। রোদ বা আগুনের তাপ গ্রহণ করা (রোদ পোয়ানো)। সহ্য করা (ঝামেলা—)।

ফড়ফড়ানো—অধিক কথা বলা (লোকটা বড় ফড়ফড়ায়)। ফড়্ ফড়্ শব্দ করা (আকাশে ঘুড়ির—)। **ফরকানো**—ফাঁক করা।

ফরফরানো—চঞ্চলতা প্রকাশ করা (সফরী ফরফরায়)। পক্ষ সঞ্চালন করা। কম্পিত হওয়া।

ফলা √ফল্<ফল্—ফলধরা, ফলবান হওয়া (নারকল গাছটা এবার ফলেছে)। উৎপন্ন হওয়া (খনায় বলে, 'রোদে ধান ছায়ায় পান অধিক ফলে')। ফলপ্রদ হওয়া, সত্য হওয়া (তার অভিশাপ ফলেছে)।....**ফলানো** √ফলা—উৎপাদন করা (অধিক শস্য ফলানো)। জাহির করা (বড় মানুষি ফলানো)।

ফসকানো—পিছলাইয়া যাওয়া (পা—)। হাত ছাড়া হওয়া, আয়ত্তির বাহিরে যাওয়া, to slip from hold.

ফাড়া √ফাড়্<স্ফট্—ছেঁড়া (কাপড়—)। বিদীর্ণ করা (ছুরি দিয়ে পেট—)। চেরা (কাঠ—)। ...ফাঁড়া—গ্রহবৈগুণ্য, রিষ্টি।....**ফাঁড়া কাটানো**—শান্তি স্বস্ত্যয়নাদি দ্বারা গ্রহদোষ দূর করা।

ফাঁদা—পত্তন করা, আরম্ভ করা (ব্যবসা—)। কুমতলব আঁটা।

ফাণ্টা মারা—রৌদ্রে শুকাইয়া চৌচির হওয়া (খরায় মাঠঘাট সব ফাণ্টা মেরেছে)।

ফাবড়ানো—ফাবড়া নিক্ষেপ করিয়া ফল পাড়া।

ফিকা—নিক্ষেপ করা, ছুড়িয়া ফেলা (খেপলা জাল—)। ...ফিকা—ফেকাসে।

ফিরা / ফেরা—প্রত্যাগমন করা, ফিরিয়া আসা, ফিরিয়া যাওয়া (আমার আজ বাড়ি ফিরতে দেরি হবে)। পিছনের দিকে বা পাশের দিকে ঘোরা, to turn. পরিবর্তিত হওয়া, ভালর দিকে যাওয়া (কপাল—, দিন—)। বেড়ানো (পাড়ায় পাড়ায়—)।.... **ফিরানো / ফিরনো, ফেরানো**—ফিরাইয়া আনা (তিনি ছেলেকে কাশী থেকে ফিরিয়ে এনেছেন)। বদলানো (কাপড়টা আজই ফিরিয়ে আনবি)। বিদায় করা, বিমুখ করা (ভিখারীকে ফিরিয়ে দেওয়া)। লাগানো (রং ফেরানো)।....ফিরানি-পুব—দ্বিরাগমন।

ফুকরানো / ফুকরনো—উচ্চৈঃস্বরে কাঁদা। গলা ছাড়া।

ফুকাচি মারা-য—উঁকি মারা।

ফুঁকা / ফোঁকা—ফুঁ দেওয়া, ফুঁ দিয়া বাজানো (শিঙা—)। ধূমপান করা (বিড়ি ফুঁকা)। উড়াইয়া দেওয়া, অপব্যয় করা (ধন সম্পত্তি ফুঁকে দেওয়া)।

ফুরানো / ফুরনো—শেষ হওয়া ('কাজের সময় কাজি, কাজ ফুরুলে পাজি'—প্র)। কাজ করাইবার পূর্বে কি কাজ, কত মজুরি ইঃ নির্ধারণ করিয়া দেওয়া। ....'ফুরনে কাজ করানো'—চুক্তি করিয়া কাজ করানো।

ফুলসানো—আগুনের উত্তাপে কাঁচা মাংস ইঃ ঝলসাইয়া লওয়া।

ফুসলানো—গোপনে নানারূপ প্রলোভন দেখাইয়া বলিয়া কহিয়া স্ববশে আনা বা আনিবার চেষ্টা করা (ফুসলিয়ে ঘরের বা'র করা)।

ফেটানো—নাড়িয়া নাড়িয়া ফাঁপানো (বড়ির জন্য ডালবাটা—)। কোথাও এই প্রক্রিয়াকে 'ফেনানো' বলা হয়।

ফেঁসানো—ঘষিয়া ঘষিয়া কাটা (করাত দিয়া—)।

ফোড়ন দেওয়া—গরম তেলে ঘিয়ে নানা রকম গোটা মশলা ভাজিয়া ব্যঞ্জনাদির সহিত মেশানো।...ফোড়ন কাটা—অপরের কথাবার্তার ফাঁকে ফাঁকে মন্তব্য প্রকাশ করা।

বখা—কুসঙ্গে মিশিয়া নষ্ট হওয়া (ছেলেটা বখে গেছে)।

বদলা লওয়া—প্রতিশোধ গ্রহণ করা (খুনের বদলে খুন করা)। রোজ হিসাবে জনখাটানো।

বনা—মতের বা মনের মিল হওয়া (তার সঙ্গে আমার বনে না)। হওয়া (থ বনে গেছি)।....**বনানো**—সদ্ভাব বজায় রাখা (বনিয়ে চলা চাই)।.... বনিবনাও—সদ্ভাব, মনের মিল (তাদের ভাইয়ে ভাইয়ে বনিবনাও নাই)।

বরাত দেওয়া—কোনও কাজের ভার দেওয়া।...বরাত ফেরা—ভাগ্য সুপ্রসন্ন হওয়া।

বর্তা, বর্তানো—বাঁচিয়া থাকা (কোন রকমে বেঁচেবর্তে আছি)। সংকটমুক্ত হওয়া (এ যাত্রায় সে বর্তে গেল)। প্রাপ্য হওয়া (পিতার সম্পত্তি পুত্র-কন্যাকে বর্তে)।

বলকানো—দুধ ইঃ উথলানো পর্যন্ত গরম করা (দুধ—)।....এক বলকা দুধ—এক বলকের (উথলানোর) দুধ।

বলা—কহা, কওয়া, উল্লেখ করা। বৃদ্ধি পাওয়া (পুরানো সরিষা নাকি ওজনে বলে)। পেঁচানো, জড়ানো (নাটাইয়ে সুতা বলা)।

বাঁইচা দেওয়া—ভারানীকে ধান ভানিতে দেওয়া।

বাইল দেওয়া-পূব—মিথ্যা প্রলোভন দেখানো. ভাঁওতা দেওয়া।

বাঁউড়ানো—অতীত হওয়া, পার হওয়া (সন্ধ্যে বাঁউড়ে গেল)।

বাওয়া √বাহ্<বহ্—চালনা করা (দাঁড়—)। উপরে উঠা, উচ্চস্থানে বিচরণ করা। (গাছ—, ঘরের চাল—)। নিক্ষেপ করা, ফেলা (জাল বাওয়া)।....বাওয়া—এক শ্রেণীর আমন ধান।

বাখনানো— প্রশংসা করা। **বাখান কাড়া-বাঁ**—গালি দেওয়া।

বাগানো—ছলে বলে লাভ করা। বশ মানানো। পরিপাটি করা (চুল—)।

বাছা—নিড়ানি দ্বারা শস্যক্ষেত্রের ঘাস ইঃ উৎপাটন করা (ক্ষেত—)। খুঁজিয়া বাহির করা (উকুন বাছা)। একত্রীভূত ভালমন্দ জিনিস হইতে কোন একটি পৃথক করা (ঠগ বাছতে গাঁ উজাড়-প্র।

বাতকে ওঠা—চমকিয়া ওঠা। **বাতলানো** √বাত্‌লা—বুঝাইয়া বলা।

বাতা—গোমহিষাদির মুখে ও খুরে ঘা হওয়া।

বাদ করা—হিংসা করা। **বাদ সাধা**—প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করা।

বানানো—তৈয়ার করা (দা—)। কোনও কিছুর সদৃশ করিয়া তোলা (বোকা—)। (বৈষ্ণবদের ভাষায়) আনাজ তরকারি খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটা (এঁচড় বানানো)।

বারাবানা /—ভানা—ঢেঁকিতে ধান ভাঙা, চাল তৈয়ার করা।

বারানো, বারান দেওয়া—নিজেদের ব্যবহার করিবার পূর্বে নূতন ফল শস্য প্রথম দেবতাকে (প্রায়ই গ্রামদেবতা) নিবেদন করা।

বাসানো-রাঢ়—গন্ধ করা। (বাসাচ্ছে)

বিকানো / বিকনো √বিকা <বি-ক্রী—বিক্রীত হওয়া বা বিক্রি করা ('কোন হাটে তুই বিকোতে চাস ওরে আমার গান'—র)....বিকিকিনি—বেচাকেনা।

বিগছালি করা-বী—ছট্‌ফট্ করা।

বিগড়ানো / বিগড়নো—বিকৃত হওয়া, নষ্ট হওয়া (মাথা—, কল—)। বিরুদ্ধে যাওয়া বা বিরুদ্ধে নেওয়া (সাক্ষী—)। কুপথে নেওয়া, নষ্ট করা।

বিগুড়ে যাওয়া-বী—বিগড়ে যাওয়া।

বিচ্‌রানো—অন্বেষণ করা, খোঁজা ('থানে থানে বন বিচারিআঁ বড়ায়ি। কুঞ্জের মাঝে দেখিল কাহ্নাঞি'—শ্রীকৃ)।

বিনানো / বিননো—বিনুনি রচনা করা, to plait. সুর করিয়া কাঁদা।

বিয়ানো / বিয়নো √বিয়া <বি—প্রসব করা (পশু সম্পর্কে)।

বিলাত যাওয়া—ক্ষৌরি করিতে নাপিতদের গ্রামে নিজ নিজ এলাকায় যাওয়া। বিদেশে যাওয়া।

বিলানো / বিলনো—বিতরণ করা।

বিষ করা-পূব—ব্যথা করা। (মাথা বিষ করা)।

বুড়ানো / বুড়নো—ডুব দেওয়া।....বুড়—ডুব ('বুড় দিয়া তুলিল মাটী')।

বুলা √বুল্ <বল্—বিচরণ করা, ঘুরিয়া বেড়ানো, to wander about ('রাধিকা হারাআঁ বড়ায়ি বুলে থানে থানে'—শ্রীকৃ)।

বুলানো / বুলনো—কোন কিছুর উপর মৃদু হস্তচালনা করা (রোগীর মাথা বুলানো)। উপরে উপরে দেখা (চোখ বুলানো)।

বেরনো / বেরুনো—বাহির হওয়া (তাঁর ঘর থেকে বেরুনো নিষেধ)।

ব্যাপার করা—বেচাকেনায় লাভ করা (আজ আমি এক পয়সাও ব্যাপার করতে পারিনি)। সামাজিক বা ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি করা।

বোঁটানো—বোঁটা হইতে ছিঁড়িয়া লওয়া (সুপারি—)।

বোনা—বপন করা (বীজ—)। বয়ন করা (কাপড়—)।

ভড়কানো—ভয়ে অস্থির হওয়া (মোষটা এতলোক দেখে ভড়কে গেছে)।

ভস্মুরে যাওয়া-রাঢ়—ভুচুরিয়া যাওয়া / ভুচুরে যাওয়া-পূব, পণ্ড হওয়া।

ভদ্রালাগা—কোন কাজে কেবলই বাধা পড়া, হয় হয় করিয়াও না হওয়া।

ভাঁওয়ানো—কোনও মতলবে ঘোরাঘুরি করা।

ভাংচি দেওয়া—কুমন্ত্রণা দেওয়া।

ভাঙতি দেওয়া-পূব—কোন কাজে বাধার সৃষ্টি করা।

ভাজ পাওয়া—টের পাওয়া।

ভাঁড়ানো—ঠকানো, ঠকাইবার উদ্দেশ্যে গোপন করা (নাম—)।

ভানা√ভান্<ভগ্ন—শস্যাদি হইতে তুষ পৃথক করা (ধান ভানতে শিবের গীত)।

ভাপানো—ভাপে সিদ্ধ করা। কোনও জিনিস সম্পূর্ণ রাঁধিবার পূর্বে হাঁড়ির মুখ ঢাকিয়া বাষ্পের উত্তাপে অল্প সিদ্ধ করিয়া লওয়া।

ভাবড়ানো, ভেবড়ানো—'অকৃতকার্যতা-নিবন্ধন চিন্তা করা'-র।

ভালা-বাঁ—দেখা। **ভেবড়ে যাওয়া**—চিন্তায় চিন্তায় ভাঙিয়া পড়া।

ভিড়া—লাগা, লগ্ন হওয়া (ঘাটে জাহাজ—)। মিলিত হওয়া (দলে—)।

ভিয়ান করা—মিষ্টান্ন ইঃ পাক করা।

ভুঁকা/ ভোঁকা-রাঢ়—বিদ্ধ হওয়া (কাঁটা—)।

ভুলকি মারা—উঁকি মারা। **ভির্মি যাওয়া**—মূর্চ্ছা যাওয়া।

ভেক লওয়া—বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়া।

ভেকানো-রাঢ়—চীৎকার করা। **ভেজানো**—আওজানো দ্র।

ভেদানো—লাথি মারা, to kick. (ফুটবলে ভেদানো)।

ভেবাচেকা খাওয়া—হতভম্ব হওয়া।

ভেরেণ্ডা ভাজা—বিনা প্রয়োজনে কোনও কাজ করা। বেকার বসিয়া থাকা।

ভোগা দেওয়া—ফাঁকি দেওয়া ('ছেলের হাতের মোয়া নয়, ভোগা দিয়ে খাবি')। **ভোয়া-মা**—ধোয়া।

ভ্যাঙানো, ভ্যালসানো—ভেংচানো, বিদ্রূপসূচক মুখভঙ্গি করা।

মঙ্গলানো—কোন শুভকার্যের সূচনা করা (এয়োতীরা ঢেঁকি মঙ্গলাচ্ছে)।

মচকানো—সশব্দে ভগ্নপ্রায় হওয়া; মাংসপেশী বা অস্থি স্থানচ্যুত হওয়া, to sprain (পড়ে গিয়ে তার পা মচকে গেছে)।

মজা√মজ্>মসজ্—তন্ময় হওয়া (হরিনামে—)। মুগ্ধ হওয়া (কথায়—, রূপে—)। ভরাট হওয়া, বোজা (পুকুর ম'জে গেছে)। বেশি পাকিয়া যাওয়া (আম—, কলা—)।....**মজানো√মজা**—মুগ্ধ করা। কলঙ্কিত করা, নষ্ট করা (কুল—)। তৈতরকারি ভাপে অল্প সিদ্ধ করিয়া লওয়া; ইহাতে ব্যঞ্জনাদি সুস্বাদু হয়। বিপদে ফেলা।

মটকানো—কোন কিছু সশব্দে মোচড়ানো (আঙুল—)।

মটকা মারা—নিদ্রার ভান করা। **মনে লাগা**—পছন্দ হওয়া।

মনোক্তর করা-ধাঢ়—পছন্দ করা।

মরা√মর্<মৃ—প্রাণত্যাগ করা। হ্রাস পাওয়া (খিদে—)। ভাবিয়া কষ্ট পাওয়া ('মরার আগে মরব না ভাই'-র)।

মরানো—রগড়ানো (গামছা দিয়ে গা—)।

মলন দেওয়া, মলান করা—গোরু দ্বারা মর্দন করাইয়া ধানগাছ হইতে ধান পৃথক করা।....মলন—মর্দন, পায়ে দলন।

মলা√মল্<মৃদ—মর্দন করা, ডলা (কান মলা)। তামাক মলা—শুকনা তামাক পাতার সঙ্গে চিটা গুড় মিশাইয়া ঢেঁকিতে কোটা বা হাতে মর্দন করা।

মাটি করা,—নষ্ট করা। **মাটি হওয়া**—নষ্ট হওয়া।....**মাটি দেওয়া**—কবর দেওয়া। **মাঠে মারা যাওয়া**—বৃথা নষ্ট হওয়া।

মাড়া√মাড়্>মৃদ্—পেষণ করা, মর্দন করা (খলে ঔষধ মাড়া)।....মাড়া দেওয়া—মলন দেওয়া।

মাড়ানো—পদদলিত করা। মর্দন করা (ধান—)। পদার্পণ করা (শ্যাম সেই যে চলে গেল, আর এবাড়ি মাড়াল না)।

মানা √মান্<মান্—সম্মান করা (গুরুজনদের—)। গ্রাহ্য করা (নিষেধ—)। বিশ্বাস করা (ঠাকুর দেবতা—, পরলোক—)। স্বীকার করা (কুকুর পোষ মানে)। পালন করা (কুলাচার—)। মানত করা (কালীর উদ্দেশে পাঁঠা-মানা)। মনোনয়ন করা (সালিশ মানা)।....মানা—নিষেধ ('সে যে মানে না মানা'-র)।

মানানো—খাপ খাওয়া (কোটের সঙ্গে পাজামা মানায় না)। স্বীকার করানো (হার মানানো)।

মারা √মার্ <মৃ—হত্যা করা (বাঘ—)। প্রহার করা (চোরকে—)। প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত করা (গরীবের ভাত মারা)। চুরি করা (পকেট মারা, ঘড়ি মারা)। প্রয়োগ করা (বেত—, চড়—)। লাগানো (খামে টিকিট—)। হালকা ধরনের কোনও কাজ করা (লাফ—, ইয়ারকি—)। শুকাইয়া ফেলা (ভাতের ফেন মারা)।

মালুক মারা-বী—ডিগবাজি খাওয়া।

মিয়ানো / মিয়নো—ভাজা বড়া ইঃর শুষ্ক ও কড়কড়ে ভাব না থাকা, ঠাণ্ডা ও নরম হইয়া যাওয়া (মুড়িগুলি মিইয়ে গেছে)। নিস্তেজ হওয়া ; উৎসাহ উদ্যম হ্রাস পাওয়া। **মুখ করা**—গালি দেওয়া।

মুখ সামলানো—সংযত হইয়া কথা বলা।

মুখানো / মুখনো—মুখিয়ে থাকা, কিছু করিবার জন্য উৎসুক হইয়া থাকা।

মুচড়ানো / মুচড়নো, মোচড়ানো—মোচড় দেওয়া, পাক দেওয়া (কোমরটা কেবলই মোচড়াচ্ছে)।

মুড়ি দেওয়া—আবৃত করা, জড়ানো to wrap oneself up (সে লেপ মুড়ে শুল)।

মুষড়ানো / মুষড়নো, মোষড়ানো—দমিয়া যাওয়া, নিরুৎসাহ হওয়া, হতাশ্বাস হওয়া (পিতার মৃত্যুতে সে একেবারে মুষড়ে গেছে)।

মেটা / মিটা—সম্পন্ন হওয়া, অবসান ঘটা, চুকিয়া যাওয়া।····**মিটানো / মিটনো, মেটানো**—মীমাংসা করা, শেষ করা, পরিশোধ করা (দেনা—)।

মেলা / মিলা √মিল্‌ <মিল্—একত্র হওয়া ('দশে মিলে করি কাজ')। মানানসই হওয়া, সমান হওয়া (শাড়ির সঙ্গে ব্লাউজের রং বেশ মিলেছে)। মিশ্রিত হওয়া (জলে তেলে মেলে না)। লভ্য হওয়া (বর্তমানে চাকরি মেলা দুরূহ ব্যাপার)। নির্ভুল হওয়া (অঙ্ক মেলা)।

····**মিলানো / মিলনো, মেলানো**—একত্র করা। সংগ্রহ করা, জোটানো (সুখাদ্য—)। তুলনা করা (দুটো জিনিস মেলাও দেখি, তবেই ভালমন্দ টের পাবে)। অদৃশ্য হওয়া (মেঘের কোলে চাঁদ মিলিয়ে গেল)।

মেলা √মেল্‌ <মীল্‌—উন্মীলিত করা (চোখ—)। বিস্তার করা, ছড়াইয়া দেওয়া (ছাদে কাপড়—)।

মেলা করা, মেলা দেওয়া—যাত্রা করা (বিবিধ শব্দ 'মেলানি' দ্র)।

মোড়া—দুপাট করা, ভাঁজ করা, to fold (ছুরিটা মুড়ে রাখ)। আবৃত করা, জড়াইয়া রাখা, to wrap (বইটা কাগজ দিয়ে মোড়। বড্ড শীত, লেপ মুড়ে শোও)।

যোগানো—যোগান দেওয়া, সরবরাহ করা, to supply (গোয়ালাই এতদিন আমাদের দুধ যোগাত)।

রগড় করা—কৌতুক করা।

রগড়ানো—মর্দন করা, মাজা (গামছা দিয়ে গা রগড়ায়)।

রটা √রট্ <রট্—প্রচারিত হওয়া (গুজব রটেছে)।...**রটানো** √রটা—প্রচার করা (কাহারো কুৎসা রটাবে না)।

রড় দেওয়া—দৌড় দেওয়া। পলায়ন করা।

রহা / রওয়া—থাকা ('যে সয় সে রয়'-প্র)। সবুর করা (এতদিনই যখন গেছে, আর একটা মাস রও)।

রোচা √রুচ্ <রুচ্—রুচিকর হওয়া (রোগীর কোন পথ্যই রোচে না)। মন চলা, ইচ্ছা হওয়া ('মন রোচে ত যা, খিদে লাগে ত খা'-প্র)।

রোখা √রুখ্ <রুষ্—বাধা দেওয়া, বিরুদ্ধে যাওয়া (অন্যায়কারীদের রোখা প্রত্যেকেরই উচিত। ওকে রোখা দুরূহ)। থামানো (গাড়োয়ান, গাড়ি রোখ, রোখ)। আক্রমণার্থ সম্মুখবর্তী হওয়া (পকেটমার বলতেই লোকটা রুখে এল)। ক্রুদ্ধ হওয়া (রুখে ওঠা)।

রোজ করা—কোনও জিনিস প্রতিদিন নিয়মিত পাইবার ব্যবস্থা করা (গোয়ালা থেকে দুধ রোজ করা)।

লটকানো—লম্বিত করা, টাঙানো, ঝুলানো (ফাঁসিকাঠে—)।

লড়া—লড়াই করা, ঝগড়া করা (শত্রুর বিরুদ্ধে লড়া। এমন মুখরার সঙ্গে লড়বে কে ?) নড়া, আন্দোলিত হওয়া।...লড়াদশা—নাকাল অবস্থা (আমার লড়াদশা দেখে কে ?)।

লপটানো, লেপটানো—জড়িত বা লিপ্ত হওয়া ; আঠার মত লাগিয়া থাকা (খাতাপত্র সব কালিতে লপটে গেছে। সারা গা কাদায় লেপটেছে)।

লাগ পাওয়া—স্পর্শ করিতে পারা, নাগাল পাওয়া। সাক্ষাৎ পাওয়া (একদিন না একদিন তার লাগ পাবই)।...দিনের লাগ পাওয়া—সুদিনের মুখ দেখা।

লাগা √লাগ্ <লগ্—লগ্ন হওয়া (কাপড়ে দাগ—, ঘরে আগুন—)। লিপ্ত হওয়া (গায়ে কাদা—)। ঠেকা, স্পর্শ করা (কপালিতে মাথা—, গায়ে বাতাস—)। আবশ্যক হওয়া ('লাগে টাকা দিবে গৌরীসেন'-প্র)। নিযুক্ত হওয়া (চাকরিতে—)। আরম্ভ হওয়া (গ্রহণ লেগেছে)। প্রবৃত্ত হওয়া (দেশের কাজে—)। পছন্দ হওয়া (মনে লাগা)। আঘাত পাওয়া (চোট—)। অনুভূত হওয়া (শীত—, মজা—)। ভিড়া (তীরে নৌকা—)। খাপ খাওয়া (এ জামা তার গায়ে লাগবে না)। অনিষ্ট সাধনে প্রবৃত্ত হওয়া (পিছনে লাগা)। সমকক্ষ হওয়া (এদের পুজার কাছে ওদের পুজা লাগে না)।

লাগানো √লাগা <লগ্—সংলগ্ন করা (কপাটে রং—)। স্পর্শ করানো

(মাথায় মাথা—)। জমিতে চারা রোপণ করা (চারা—)। প্রয়োগ করা, ব্যবহার করা (কাজে—)। ভিড়ানো (তীরে নৌকা—)। ঘটানো, বাধানো (ঝগড়া—)। গোপনে কাহারো বিরুদ্ধে কিছু বলা (কর্তার কাছে বৌয়ের নামে—)।····লাগানি—আড়ালে নিন্দা।

লাফানো—লাফ দেওয়া। আস্ফালন করা (বড্ড যে লাফাচ্ছিস)।

লাজবাসা-রাঢ়—লাজ পাওয়া, লজ্জিত হওয়া (লাজ বাসি)।

লেংচানো, নেংচানো—লেংড়ানো-পূব—খোঁড়াইয়া হাঁটা।

লেপা, নেপা—লেপন করা, নিকানো (ঘর—)।

লেলানো—আক্রমণের জন্য উসকাইয়া দেওয়া (কুকুর লেলিয়ে দেওয়া)।

লোফা—শূন্য হইতে কোনও বস্তু মাটিতে পড়ার আগেই ধরিয়া ফেলা (সে বলটা লুফে নিলে)।

শানকাড়া—ঘোমটা দেওয়া।

শানা √শান্ <শম্—ক্ষুৎপিপাসা নিবৃত্ত হওয়া, শান্ত হওয়া (সেকালে প্রত্যেক গ্রামেই এমন দু'একজন বৃকোদর দেখা যেত, যাদের একটি আস্ত পাঁটাতেও শানাত না)।

শানানো √শানা <শাণ্—শান দেওয়া, অস্ত্রাদিতে ধার দেওয়া।

শিগানো / শিগনো—খুঁটি পুঁতিয়া উহার চারিদিক গাদিয়া দেওয়া।

শাপড়ানো—খাইয়া শেষ করা (ভাত—)।

শিকায় ওঠা—বন্ধ হওয়া (তার কারবার শিকায় উঠেছে)।

শিঙা ফোঁকা—প্রাণ ত্যাগ করা।

শিথলানো / শিথলনো—শিথিল বা আলাদা করিয়া রাখা, খুলিয়া রাখা (এয়োতীদের শাঁখা—)।

শীতল দেওয়া—সন্ধ্যায় দেবতার উদ্দেশে ভোগ দেওয়া।

শুকানো / শুকনো √শুকা, **শুখানো / শুখনো** √শুখা <শুষ্—শুষ্ক করা (রোদে কাপড়—)। শুষ্ক হওয়া (খরায় পুকুর সব শুকুচ্ছে)। উপবাস করা (সে সারাদিন শুকিয়ে আছে)। কৃশকায় হওয়া (সে দিনে দিনে শুকুচ্ছে)।

শুধরানো / শুধরনো, শোধরানো √শুধ্রা <শুধ্—সংশোধন করা বা সংশোধিত হওয়া (ভুল শুধরিয়ে দেওয়া, ওর চরিত্র আর শোধরাবে না)। সারিয়া উঠা, নীরোগ হওয়া (শরীর আর শুধরুচ্ছে কোথা !)।

শুলানো / শুলনো—টনটন করা, ব্যথা করা (ফোড়াটা বড্ড শুলুচ্ছে)।

শোঁখা / শুঁখা শোঁকা / শুঁকা √শুঁখ্, শুঁক্ <শিন্‌ঘ্—ঘ্রাণ লওয়া (ফুল—)।

শুঁখানো / শুঁখনো, শোঁখানো—ঘ্রাণ লওয়ানো (রোগীকে ওষুধ—)।

শোধা—পরিশোধ করা (ঋণ—)।

শোনা / শুনা √শুন্ <শ্রু—শ্রবণ করা। আদেশ উপদেশ পালন করা, to obey (ছেলেটা মায়ের কথা খুব শোনে)।····শুনানো / শুননো, শোনানো √শুনা—শ্রবণ করানো (তিনি তাঁর স্বরচিত গান আমাদের প্রায়ই শোনাতেন)। কটূক্তি করা (লোকটাকে বেশ শুনিয়ে দিলুম)।

শোষা / শুষা √শুষ্ <শুষ্—শোষণ করা (তৃষ্ণার্ত মাঠ বৃষ্টির জল সব শুষে নিয়েছে)।

শ্রাদ্ধ গড়ানো—কোনও ব্যাপার ঘোরালো হইয়া উঠা (শ্রাদ্ধ অনেকদূর গড়িয়েছে)। **সটকানো**—পলায়ন করা, সরিয়া পড়া (সে সটকেছে)।

সন্ধ্যা করা—আহ্নিক করা। সারাদিন অতিবাহিত করিয়া সন্ধ্যাবেলায় আসা (সন্ধ্যা করবি নে)।

সন্ধ্যা দেওয়া—সন্ধ্যাকালে বাস্তুগৃহে, পূজামণ্ডপে, দেবতার থানে, তুলসী মঞ্চে ধূপ দীপ জ্বালা (বিবিধ শব্দ দ্র)।

সরফরালি করা—বাহাদুরি করা।

সরা—তফাত যাওয়া। চলা। নড়া। নিঃসৃত হওয়া। ব্যবহার করা (জল—)।

সরানো √সরা—স্থানান্তরিত করা। চুরি করা (টাকা পয়সা—)।

সাজা √ সাজ্ <সস্‌জ্—সজ্জিত হওয়া (তাড়াতাড়ি সেজেগুজে নাও)। ভান করা ('সাধু সেজে বেটা পাকা চোর'-র)। সেবনের উপযোগী করিয়া দেওয়া (তামাক—, পান—) ।····সাজানো √সাজা—সজ্জিত করা (এয়োরা কনে সাজাচ্ছে। ····সাজা দেওয়া—শাস্তি দেওয়া। ····সাঁজাল দেওয়া—মশা ইঃ তাড়াইবার জন্য সন্ধ্যায় খড়কুটা জ্বালাইয়া ধূমের সৃষ্টি করা (গোয়ালে সাঁজাল দেওয়া)।

সাঁজুড়া—একসঙ্গে বাঁধা বা জোতা ('সাঁজুড়িয়া পালে পালে আনয়ে চামরি' —কবিক)।

সাঁতলানো—ব্যঞ্জনাদি রাঁধিবার পূর্বে মাছ তরকারি মশলা ইঃ অল্প ভাজিয়া লওয়া। তৎপর্যায়ঃ—চানকানো, ছঁওকানো, ছেই মারা।

সাতানো—অকারণে অত্যাচার উৎপীড়ন করা, কাহাকেও অযথা দুঃখ কষ্ট দেওয়া। **সাপটানো** √সাপটা—জড়াইয়া ধরা।

সাবড়ানো √সাব্‌ড়া—সাবাড় করা। খতম করা।

সামলানো—সংযত করা (মুখ সামলে কথা বলবি)। সাবধানে রাখা (টাকা পয়সা—)। রোধ করা (এখন ঠেলা সামলাও)।

সামানো (হামানো-পূব)—প্রবেশ করা ('তোহ্মার বচন মোর না সাম্বাএ কানে'-শ্রীকৃ)।

সামায় যা-মে—ঢুকে পড়।

সামুটানো—সামলানো।

সারা √সার্ <স্থ—মেরামত করা (ছাতা—)। শেষ করা (আগে কাজ সার)। আরোগ্য লাভ করা (তিনি অনেক করে সেরে উঠেছেন)। সর্বস্বান্ত করা, বিপদে ফেলা (ওর ভাগ্যেই ওকে সারবে)। ....**সারানো** √সারা—মেরামত করানো (ঘড়ি—)। দূর করা (রোগ—)। শোধরানো (দোষ—)।

সিটকানো / সিটকনো—নাকমুখ কুঞ্চিত বা বিকৃত করা।

সুঝা √সুঝ্—পরিশোধ করা (ঋণ—)।

সেঝা / সিঝা,—জা<সিঝ্, সিজ্—সিদ্ধ হওয়া (ভাত সিজেছে)।

....**সিঝানো / সিঝনো, সেঝানো,—জা**<সিঝা, সিজা—সিদ্ধ করা (ধান সিঝিয়েছে। ধান সিজেইছে-মে)।

সেঁধা, সেঁধানো / সেঁধনো—প্রবেশ করা (বাকুলে সেঁধতেই সে থমকে দাঁড়াল)।

হচলপাচল করা-মে—আন্দোলন করা।

হড়কানো—পিছলাইয়া যাওয়া (গোড় হড়কেইলা / গোড় হড়কি গেলা-মে)।

হপকানো—ভয়ে অস্থির হওয়া (রঙিন ছাতা দেখে মোষ হপকায়)।

হাঁকা—উচ্চৈঃস্বরে ডাকা।....হাঁকানো—চালানো (গাড়ি—, মোটর হাঁকাইয়া যাওয়া)। তাচ্ছিল্যভরে বিদায় করা (ওকে হাঁকিয়ে দাও)।....হাঁকাহাঁকি—ডাকাডাকি।....ডাকহাঁক—শোরগোল।

হাঁকড়ানো—চীৎকার করা। প্রহার করা, তাড়না করা।

হাজান-ব—উনন ধরানো, আগুন জ্বালানো।

হাঁটকানো—উলটপালট করিয়া খোঁজা (চুল হাঁটকে উকুন আনা)।

হাতড়ানো—অন্ধের মত খোঁজা (তিনি অন্ধকারে হাতড়াতে লাগলেন)।

হাতানো—হাত দিয়া আদর করা, হাত বুলানো। হাত দিয়া ঘাঁটা।

হাপুর দেওয়া-ফ—হামাগুড়ি দেওয়া।

হামলানো—গাভীর হাম্বাধ্বনি করা (গাইটা বাছুরের জন্য বড্ড হামলাচ্ছে)।

হালা-বী—কাঁপা (গোরুটা জাড়ে হালছে)। হেলা, হেলিয়া পড়া।

হিঁচড়ানো / হিঁচড়নো, হেঁচড়ানো / হেঁচড়নো—মাটিতে ফেলিয়া টানিয়া নেওয়া। সে তাকে হিঁচড়ুতে লাগল)।

হিঁটে দেওয়া-বী—জল ছিটাইয়া দেওয়া।

হুটোপাটি করা, হুড় করা-মে—চেঁচামেচি করা, লাফালাফি করা।

হুলানো—লেলানো, আক্রমণের জন্য পিছনে ধাবিত করানো।

হোঁচাল মারা-বী—হঠাৎ টান দেওয়া (দড়ি ধরে—)।

হেঁটরি দেওয়া-মে—সতর্ক করিয়া দেওয়া।

হেঁটিয়ে আনা-বী—কমাইয়া আনা (কাজ—)।

হেদানো / হেদনো—প্রিয়জনকে না দেখিয়া ব্যাকুল হওয়া (মায়ের জন্য শিশুর হেদিয়ে ওঠা)।

হোঁকড়ানো—খোঁড়া, প্রশংসার ভিতর দিয়া শিশুদের হানি করা।

হোঁকড়ানো—একরূপ হুঁ হুঁ শব্দে বাছুরকে গাভীর ডাকা।

সঙ্কেত-পরিচয়

(ক) অঞ্চল বা জেলা সঙ্কেত

আসা	উত্তরবঙ্গ সংলগ্ন আসামের কোন কোন অঞ্চল		
উব	উত্তরবঙ্গের বহু অঞ্চল		
ক	কলিকাতা ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চল		
কাম	কামরূপ (পশ্চিমাংশ)		
কো	কোচবিহার	খু	খুলনা
গো	গোয়ালপাড়া (পশ্চিমাংশ)		
চ	চব্বিশপরগনা (প্রধানত উত্তরাঞ্চল)		
চট্ট	চট্টগ্রাম	জ	জলপাইগুড়ি
টা	টাঙ্গাইল ও ঢাকার মানিকগঞ্জ অঞ্চল		
ঢা	ঢাকা	ত	তরাই অঞ্চল (শিলিগুড়ি)
ত্রি	প্রধানত কুমিল্লা জেলা (বাংলাদেশ) ও আগড়তলা		
দচ	দক্ষিণ চব্বিশপরগনা (ক্যানিং, বারুইপুর, জয়নগর, ডায়মণ্ড-হারবার, বজবজ প্রভৃতি অঞ্চল)		
দা	দার্জিলিং		
দি	দিনাজপুর (বাংলাদেশ) ও পশ্চিম দিনাজপুর		
ন	নদীয়া (পশ্চিমবঙ্গ) ও কুষ্টিয়া (বাংলাদেশ)		
নো	নোয়াখালি	পদি	পশ্চিম দিনাজপুর
পব	বিভাগপূর্ব ভৌগোলিক পশ্চিমবঙ্গ, প্রধানত গাঙ্গেয় অঞ্চল		
পা	পাবনা	পু	পুরুলিয়া (মানভূম)
পূব/পুব	বিভাগপূর্ব ভৌগোলিক পূর্ববঙ্গের বহু অঞ্চল		
ফ	ফরিদপুর	ব	বরিশাল
বগু	বগুড়া	বর্ধ	বর্ধমান
বাঁ	বাঁকুড়া (তৎসংলগ্ন মেদিনীপুর ও পুরুলিয়ার কোন কোন অঞ্চলসহ)		
বী	বীরভূম (মুর্শিদাবাদের পশ্চিমাঞ্চল সহ)		
ম	ময়মনসিংহ সদর, নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ		
মা	মালদহ	মু	মুর্শিদাবাদ

মে	মেদিনীপুর	য	যশোহর
রং	রংপুর	রা	রাজসাহী
রাঢ়	বাঁকুড়া, বীরভূম, পুরুলিয়া ও মেদিনীপুরের বহু অঞ্চল		
শ্রী		হা	হাওড়া
হিজ	হিজলী (মেদিনীপুর)	হু	হুগলী

(খ) ভাষা সঙ্কেত

অস°	অসমীয়া	তে°	তেলুগু
আ°	আরবী	পো°	পোর্তুগীজ
ই°	ইংরেজী	প্রা°	প্রাকৃত
ও°	ওড়িয়া	ফা°	ফারসী
কা°	কানাড়ী	বৈ°	বৈদিক
তা°	তামিল	স°	সংস্কৃত
তু°	তুর্কী	সাঁ°	সাঁওতালী
হি°	হিন্দী		

(গ) গ্রন্থকার ও গ্রন্থাদির সঙ্কেত

সাধারণত ( ) প্রথম বন্ধনীর ভিতর উদ্ধৃতির পর বসানো হইয়াছে।

আঘদু	আলালের ঘরের দুলাল —টেকচাঁদ ঠাকুর
কবিক	কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী। কবিকঙ্কণ বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল (১) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও (২) সাহিত্য অকাদেমি প্রকাশিত)
কেক্ষেমা	কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ বিরচিত মনসামঙ্গল (কলিঃ বিশ্ববিদ্যালয়)
খব/খবচ	খনার বচন
চৈমঙ্গ	চৈতন্য মঙ্গল (জয়ানন্দ)
জ্ঞা. মো. দা	শ্রীজ্ঞানেন্দ্র মোহন দাস
পূগী	পূর্ববঙ্গ গীতিকা (কলিঃ বিশ্ববিদ্যালয়)
বংশীদা	দ্বিজ বংশীদাস (মনসামঙ্গল)
বলোসা	বগুড়ার লোক সাহিত্য—খোদেজা খাতুন (বাঙলা একাডেমী : ঢাকা)
বিগুপ্ত	বিজয় গুপ্ত (মনসামঙ্গল)
বাগচী	কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচী

পালিত	শ্রীহরিদাস পালিত	বিদাস	বিপ্রদাস (মনসাবিজয়)
ভট্টাচার্য	ডঃ বিজনবিহারী ভট্টাচার্য	মারাগা	মানিকচন্দ্র রাজার গান

মৈগী — মৈমনসিংহ গীতিকা (কলিঃ বিশ্ববিদ্যালয়)

র — রবীন্দ্রনাথ

রায়ম — রায়মঙ্গল—কবি কৃষ্ণরাম দাস বিরচিত (ডঃ শ্রীসত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত)

যখুছ — যশোর খুলনার ছড়া (শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী সম্পাদিত, বাঙলা একাডেমী, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত)

রারচ — রামেশ্বর রচনাবলী (ডঃ পঞ্চানন চক্রবর্তী সম্পাদিত, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত)

শ্রীকৃ — শ্রীকৃষ্ণকীর্তন (শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ সম্পাদিত, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত)

সা. প. প	সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা	শেঠ	শ্রীহরিহর শেঠ (চন্দন নগর)

(ঘ) বিবিধ সঙ্কেত

দ্র	দ্রষ্টব্য	√	ধাতুর চিহ্ন
পৃ	পৃষ্ঠা	<	আগেরটি পরেরটি হইতে উৎপন্ন
প্র	প্রবাদ / প্রয়োগ উদাহরণ		
ইঃ	ইত্যাদি	>	আগেরটি হইতে পরেরটি উৎপন্ন
বিঃ	বিশেষ		
তুঃ	তুলনীয়		
মুস	মুসলমানদের মধ্যেই অধিক শুনা যায়। মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত।		

অশুদ্ধি সংশোধন

পৃষ্ঠা	পঙক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৬	১৭		
১৬	২৫		
১৬	২৮	আচ্ছাদক	আচ্ছাদন
২১	২১		
২৪	২৯		
২৪	৩০		

পৃষ্ঠা	পঙক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২১	১২	জুম্মাঘর	জুম্মাঘর
২৫	৪	masoury	masonry
২৫	২৪	বারন্দা	বারান্দা
২৭	২৯	সম্পার্কে	সম্পর্কে
২৮	১	শশুপুত্র	শিশুপুত্র
৩৪	১৫	ভাত্তর	ভাওর
৩৫	৭	আচ্ছদক	আচ্ছাদন
৩৮	৯	দুয়ায়ে	দুয়ারে
৪৮	২৭	আচার-অনুষ্ঠান	লোক-উৎসব ও সংস্কার
৪৯	২৩	উলুখড়	উলুখড়
৫৩	৬	গনা	গিনা
৫৩	১৮	গাচৈ	গোচৈ
,,	৩০	অষ্টমীভে	অষ্টমীতে
,,	৩০	শ্রীদুর্গার ম্লজা	শ্রীদুর্গার পূজা
৬৪	১৭	ঢঁকির কালি	ঢেঁকির কালি
৭৭	৪	'মাইটা পাওয়া'	'মাইট পাওয়া'
১২৮	২০	ঘলা হয়	বলা হয়
১২৯	১১	আউথ	আউথ
১৩০	৬	থাম্বরূপে	থাম্বরূপে
১৩৪	১৩	আচার-অনুষ্ঠান দ্র	বিবাহের খুঁটিনাটি দ্র
১৪৪	১৯	য়াঢ়	রাঢ়
১৯০	৬	আচার-অনুষ্ঠান	লোক-উৎসব ও সংস্কার
১৯২	১১	ভারবোল	ভাঁড়বোল
১৯৩	১২	আচার-অনুষ্ঠান	লোক-উৎসব ও সংস্কার
১৯৪	৫	শুশু-ক	শুশুক
১৯৯	২৩	চেওড়া	চওড়া
২১০	১৩	আঁটকুল্লা	আঁটকুড়া
২৯০	১৭	থাবলানো	থাবলানো